হিন্দু সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি. এল।

সন ১[illegible]২ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আলোচনা-কার্য্যালয়।

১০৮ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

সন ১৩২৫ সালের সূচীপত্র।



কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর।
পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীকালীকায়ৈ নমঃ।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

দ্বাবিংশ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২৫। [প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষের অভ্যর্থনা।

(১)

আনন্দে ভাসিছে বিশ্ব, আশার আশ্বাসে তব,
এস বর্ষ স্বর্গ হ'তে বরণ করিয়া ল'ব,
আজি এই মধু মাসে
সারা ধরা মৃদু হাসে
অলক্ত-সিন্দুর-রেখা প্রকৃতি সতীর ভালে,
পরা'য়ে দিয়াছে ঊষা আজি নব-কুতূহলে।

(২)

বহিছে বুঝিবা বিশ্বে করুণার প্রবাহিনী,
এনেছ কি বর্ষ তুমি বহিয়া এ তরঙ্গিনী?
এনেছ কি সুধা-রাশি
মরতে দেবের হাসি
নন্দন-মন্দার-পুষ্প এনেছ কি তব সনে,
ধরিত্রীরে উপহার দিতে প্রেম-সম্মিলনে?

নিবেদন—জগদম্বার কৃপায় ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে "আলোচনা" দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই দারুণ দুর্দ্দিনে, কালী-কাগজের এই দারুণ দুর্মূল্যের দিনে কত মাসিক পত্রিকা অস্তিত্ব হারাইয়াছে কিন্তু "আলোচনা" আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আজও ঠিক সমভাবে বাহির হইতেছে। ইহাতে কৃপাময়ী মায়ের কৃপা ও সহৃদয় গ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের অনুকম্পা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পত্রিকা চালাইতে এখন অসমর্থ [illegible] হইলেও [illegible] মায়ের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এবং গ্রাহকগণের সহানুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের দয়া সমভাবে থাকিলে আমরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না। অনেকে পত্রিকার মূল্য বর্দ্ধিত করিতে বলিতেছেন কিন্তু সাধারণের প্রতি চাহিয়া আমরা তাহাও করিলাম না। এক্ষণে আমাদের সুশিক্ষিত পরিচালকস্থানীয় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—তাঁহারা যেন এই দুঃসময়ে প্রত্যেকে অন্ততঃ একজন করিয়া গ্রাহক করিয়া দিয়া আমাদের সহায়তা করেন এবং ক্রমশঃ সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিব, তাহা যেন সকলে যথাসময়ে গ্রহণ করেন। এইটুকু সহানুভূতি পাইলেই আমরা আশাতীত উপকৃত হইব। ইতি

কর্ম্মকর্ত্তা—আলোচনা।

(৩)

তীর ভূমি ছাপাইয়া ছুটেছে তটিনী-চয়,
হাসিতেছে সারা ধরা ফুলে-ফুলে ফুলময়,
বরষ তোমার তরে
আজি এ সুষমা ঝরে
অমর-সঙ্গীত রবে মুখরিত সমীরণ,
ফুটিয়াছে নানা পুষ্প মরি কিবা অতুলন।

(৪)

ছড়া'য়ে "বিমল কান্তি" হাসিছে প্রকৃতি রাণী,
আজ তব আবাহন গায় লক্ষ বিহঙ্গিনী.
সুনীল-সরসী-জলে
ফুটন্ত সরোজ দলে
ভ্রমিছে ভ্রমরা বঁধু আজি কত কুতূহলে.
শুনা'তেছে প্রেমগান "পঙ্কজিনী" শ্রুতি-মূলে।

(৫)

বর্ষ! তব অভিসারে প্রকৃতি-রূপসী-রাণী,
সোহাগে প্রাণেশ আশে সাজায়েছে তনুখানি,
নানা অর্ঘ্য উপাদান
দিতে প্রেম-প্রতিদান
রেখে'ছে যতনে তার বিশাল-হৃদয়-প'রে,
তোমারে স'পিবে বালা সলাজ আবেশ-ভরে।

(৬)

অমরার প্রান্ত হ'তে, শুনি তব আগমন,
আনন্দ-উৎসবে দেখ বিশ্ববাসী নিমগন,
আনন্দে আকুল করি
এস বর্ষ মর্ত্ত 'পরি
হাসাইয়া ধরণীরে, লয়ে স্বর্গ সুষমায়,
মুগ্ধ করি সারা বিশ্ব স্নেহ-প্রেম-আকাঙ্ক্ষায়।

(৭)

রচেছে প্রকৃতি-রাণী কুসুমেরি কুঞ্জবন,
পাতিয়া রেখেছে তায় হরিতের আস্তরণ,
ফুল-সিংহাসন'পরে
নানা ফুল থরে থরে
সাজায়ে রূপসী রাণী বসে আছে তব তরে,
বারেক চরণ তায় রাখ বর্ষ দয়া ক'রে।

(৮)

বর্ষ! তব আগমনে সবি হেরি মধুময়,
গিয়াছে হৃদয় হ'তে আজি শোক-তাপ-ভয়,
প্রভাতী, আঁধার নিশি
মধুরে উজলি দিশি—
এস বর্ষ সাথে ল'য়ে স্নেহ ও করুণা-প্রীতি,
পুণ্য পরশে ত্রিদিব জিনিয়া হাসুক সারাটী ক্ষিতি।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

একেশ্বরবাদ।

আর্য্যেরা আদিম অবস্থায় জড়োপাসক ছিলেন। তাহারা জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মেঘ, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক নৈসর্গিক দৃশ্যে এক এক দেবতার রূপ কল্পনা করিয়া পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের তেত্রিশকোটী দেবতা প্রকৃতির অনন্তত্বজ্ঞাপক। যে হিন্দু অনন্ত বিশ্বকে অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির বিকাশ বলিয়া ধারণা করেন তিনি অনন্তরূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বিবিধশক্তি সমুদ্ভূত হইলেও আমরা সমস্তই একেশ্বরে আরোপ করিয়া থাকি। মন আমিত্ব জ্ঞানে পূর্ণ। যখন সেই মনের সাহায্যে বিশ্বের আদি কারণ স্থির করিবার চেষ্টা করা যায়, তখন সেই মনের সাহায্যে সৃষ্টিস্থিতি সংহার-কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা

স্বভাবসিদ্ধ। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই যে একেশ্বরবাদ আবহমানকাল প্রচলিত আছে এবং সকল ধর্ম্মই মূলতঃ এক। কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা হয় মাত্র। সকল ধর্ম্মেই এই কয়েকটী বিষয় পাওয়া যায়।* যথা—

১। এক পরমেশ্বর আছেন।

২। তিনি সকলের পূজার্হ।

৩। সদ্‌গুণ এবং বিশুদ্ধতা সেই পূজার প্রধান অঙ্গ।

৪। পাপ করিলে অনুতাপ করা উচিত।

৫। পরজীবনে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

ঈশ্বর সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন তাঁহাকে সাকার বা নিরাকার যে ভাবে ভাবনা করা হউক, তাঁহার যথার্থ রূপ নির্ণয় করা মানবের পক্ষে অসাধ্য। শ্রীশঙ্কর, বুদ্ধ, মহম্মদ, কনফিউসিয়াস প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ মনের প্রকৃত্যানুযায়ী ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি বা মানব-মূর্ত্তি কেবল কল্পনার ফল মাত্র। আগম, নিগম, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম-পুস্তকে তাঁহার স্বরূপ পাওয়া যায় না। তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত, আবার তিনিই সংসারে মায়াযোগে লীলাখেলা করিতেছেন—সতী, উমা, অম্বিকা, দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা, পার্ব্বতী, হৈমবতী, কিরাতী, কপাল-মালিনী এ সকল সেই এক মায়ের নাম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহার দ্বারা আমরা অন্য কিছু বুঝি আর নাই বুঝি, বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের মিলন যে ভারতবর্ষেই প্রথমে সংসাধিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কল্পনা ও যুক্তি মানুষকে অনেক সময়ে বিব্রত করে। সাকার নিরাকার নাম ভেদমাত্র। তিনি সাকাররূপে প্রতিপন্ন এবং নিরাকাররূপে উপলব্ধ, দেশভেদে সমাজভেদে বহু সংজ্ঞা হইলেও আসল কথা কেহ ভুলিয়া যায় না। বৃন্দাবন বলিলে মাধবীলতার কুঞ্জ, প্রমোদোদ্যান, শারদ জ্যোৎস্না, মধুর মুরলীধ্বনী ও সুন্দরী রমণী প্রভৃতি কত কি মনে হয় বটে, কিন্তু সেজন্য কেহ রাধাকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় না। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ব্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং নিশিথেশ্বরং বা কদাচিত ন জানামি চান্যৎ সদাহং শরণ্যে গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী—"

সংসারী এক ভাবে তাঁহাকে দেখেন আর সন্ন্যাসী আর এক ভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন কিন্তু সকল সৃষ্টি-সামগ্রীর পরিণতি এক, এত যত্নের এই অমূল্য দেহের শেষ পরিণতি মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি সকল সামগ্রীরই শেষ সেইরূপ একে। স্বরূপ জ্ঞানের সাহায্যে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আকারভেদ নামভেদ যতই হউক না কেন মূল সেই এক। পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন আবার পঞ্চভূতেই অবসান। পঞ্চভূত শেষে একরূপে মিশিয়া যায়—শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, হরিৎ, শ্যামল শেষে কৃষ্ণবর্ণে লয় হয়। তাই সাধক বলিয়াছেন—

নমস্তে নিত্যরূপায় বিশ্ববীজ সনাতন

* Lord Herbert Cherbury.

নমঃ সর্ব্ব স্বরূপায় প্রধান পুরুষাত্মনে
বিশাল বিশ্বরূপস্তং কারণাঞ্চ কারণম্
নমস্তেস্তু জগন্নাথ মম নাথ মম প্রভো
ত্বংহি কাশীশ্বরো দেব বৃন্দাবনবিহারক
ত্বং তারা ছিন্নমস্তাচ ভৈরবী ভৈরব স্তথা
পরমার্থদ তীর্থঞ্চ ত্বং সিদ্ধি শুদ্ধিরেবচ
তন্ত্রমন্ত্রাদি লক্ষ্য ত্বং ত্বংনমামি জগৎপ্রভো।

শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকাল ও একাল। *

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লাঞ্ছনা ও গৌরব)

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি মনের আশা॥"

বঙ্কিমীযুগের সহিত বর্ত্তমান রবীন্দ্রির যুগের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা বক্ষ্যমান্ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বড়ই ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন, বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্যের কথায় তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না। তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমবাবু "বঙ্গসাহিত্যের আদর" শীর্ষক একটি ঝিঠেকড়া নক্সা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর মুখে বাঙ্গালা গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা এখন লজ্জায় হেঁটমুণ্ড হই। বঙ্গ রমণীর হস্তে বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিয়া উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বলিতেছেন—"ছাই ভস্ম বাঙ্গালা গুলো পড কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে। ওগুলো immoral, obscene, filthy" ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় যে এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো রাণীর গল্প, বা নলদময়ন্তীর উপাখ্যান ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস বা সৎসাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে, এ ধারণা তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদের ছিল না। আসল কথা বাঙ্গালা বই দেখিলে ইহারা শিহরিয়া উঠিতেন, উহা স্পর্শ করিলে তাঁহাদের নাকি 'হাত ময়লা' হইত। তারপর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ যে ইংরাজী বা অন্য কোন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদিত হইতে পারে, এ ধারণাও তাঁহাদের কল্পনায় আসিত না। 'বাঙ্গালা বই ইংরাজীতে তর্জ্জমা' একথা তাঁহারা আষাঢ়ে গল্প মনে করিতেন। বঙ্কিম বাবুর জীবিতকালেই তাঁহার 'বিষবৃক্ষের' ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী তৎকালে 'বিষবৃক্ষকে' 'Poison tree' নামক ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে কতটা অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বুঝিবার শক্তি তৎকালে তাঁহার বা তত্তুল্য শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল না। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদরের' একস্থানে বঙ্কিম বাবু উচ্চ শিক্ষিত বাবুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন;—"কিঃ ছাঃ, বাঙ্গালা-ফাঙ্গালা ওসব ছোট লোকে পড়ে,

---

* রায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বাহাদুরের সভাপতিত্বে পাবনা টাউন হলে "কিশোরী মোহন ইনষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীর ৩৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

ওসব আমাদের মাঝখানে চলন নাই। ওসব কি আমাদের শোভা পায়?" কি সাংঘাতিক কথা! বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা পড়িতে ঘৃণা বোধ করে, একথা আজিকার দিনে কেহ বলিলে তাহাকে অবশ্যই 'বয়কট' হইতে হইত। কিন্তু এমন দিন ছিল,—বেশী নয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—যে এসব কথা, এমন সব ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। কেহ কেহ আবার ভার্য্যার অনুরোধে এক আধ খানা বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজেদের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিতেন।

১২৭৯ সালে "বঙ্গদর্শনের" সূচনায় বঙ্কিম বাবু তৎকালের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া আমাদের বক্তব্যে মন দিব। তিনি লিখিয়াছিলেন;—"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায় তাঁহাদের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জানা আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক-মাত্রেই হয় ত বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল-শূন্য, নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কাল চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব?

ইংরেজী ভক্তদিগের মত এইরূপ। সংস্কৃত পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যে শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপি বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক তাঁহাদের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষায় বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্যবিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজীতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচার, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদয় ইংরেজীতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরেজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজীতে হয়, ষোল আনা, কখন বার আনা, ইংরেজী। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখন বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখনই দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরেজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদের

এখনও অনেক ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজীতে পঠিত হইবে।"

সুখের বিষয় (অবশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়) এই পঁয়তাল্লিশ বৎসরে হাওয়া অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। মেঘ কাটিয়া গিয়া নব সূর্য্যালোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমবর্ণিত বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা আর তেমন নাই। সাহিত্যতাপসগণের একনিষ্ঠ সাধনায় ও কালের অপ্রতিহত প্রভাবে বঙ্গভাষা আজ আর দীনা, হীনা, উপেক্ষিতা নহে। বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থকার ও সাময়িক পত্র-প্রচারকগণ আজ বিশেষভাবে সম্মানিত ও ভাগ্যধর বলিয়া সর্ব্বদা সমাদৃত। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এখন তাঁহাদিগের গ্রন্থ বা পত্রিকা পাঠে বিন্দুমাত্র বিমুখতা প্রকাশ ত করেন না, বরং সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতি-গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাঁহারা মাতৃভাষার আদর করিতে শিখিয়াছেন। একদিন যে ভাষার পঠন-পাঠন 'নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্র হইতে নিষ্কর্ম্মা রসিকতা ব্যবসায়ী'র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ সেই ভাষার অনুশীলন ও চর্চ্চায় হাইকোর্টের জজ, বিলাৎ ফেরৎ ব্যারিষ্টার প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ নিযুক্ত ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়? গত বৎসর কলিকাতার প্রাদেশিক সমিতিতে বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বঙ্গভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনীষিগণ মাতৃভাষাতে দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন। ইঁহারাই এখন সাহিত্যসম্মিলন ও সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্ব করিতেছেন। ইঁহাদের মাতৃভাষায় লিখিত 'অভিভাষণ' আজ বাঙ্গালীর কলঙ্ক কালিমা অপসারিত করিয়া এক নূতন পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। আজ সাহিত্যের রাজ্যে বড় আনন্দের দিন, যে, বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালী মাতৃভাষায় গ্রন্থ-রচনা, পত্রিকা-প্রচার, বক্তৃতা-দানক্রমে দেশহিতে ব্যাপৃত। বহি পড়ার ভার একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপর ছিল বলিয়া বঙ্কিম বাবু দুঃখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, শুধু ছাত্রগণ নহে, অভিভাবকগণের মধ্যেও পাঠ-পিপাসা জাগ্রত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কৃতবিদ্যগণ বর্ত্তমানে অযথা ইংরেজীর ব্যবহার একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র, অভিভাষণ, প্রবন্ধ পাঠ, প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন, মন্তব্য প্রকাশ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই বঙ্গভাষায় হইতেছে। তা' ছাড়া এখন ইংরেজীতে ডবল এম, এ, ডিগ্রীধারী মহাশয়গণও অসঙ্কোচে বঙ্গভাষায় কথা কহেন, ইংরেজীওয়ালায়' কাছে নিঃসঙ্কোচে বাঙ্গালায় চিঠিপত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের সম্ভ্রম বা 'প্রেষ্টিজ'এর কিছু মাত্র হানি হয় বলিয়া ইঁহারা মনে করেন না বরং মায়ের ছেলের" মায়ের ভাষা ব্যবহারে গৌরব ও মহত্ত্বই প্রকাশ পায়।

অল্পকালের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় যে অমূল্য সম্পদ-দান করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা শক্তি-শালিনী এবং সাহিত্য সমৃদ্ধিবান্ হইয়াছে। বিশ্বের সাহিত্যসভায় আমাদের বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্র নাথ "এসিয়ার মহাকবি" আখ্যায় পূজিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যজাতি তাঁহার "গীতা-ঞ্জলির" ইংরেজী অনুবাদ পাঠে সানন্দ-চিত্তে তাঁহাকে সমুচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন। মূল বঙ্গভাষায় লিখিত "গীতাঞ্জলী"র আস্বাদ পাইবার আশায় অধুনা পাশ্চাত্য নরনারী বঙ্গভাষা শিক্ষায় জন্ম উৎসুক ও তৎপর হইয়া পড়িয়াছেন। এখন নাকি ওদেশে বঙ্গভাষা পঠন-পাঠনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন ভাষাতত্ত্বজ্ঞ মনীষী মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইবে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আজ পূত-সলিলা-ত্রিবেণী। সংস্কৃত ও ইংরেজীর সঙ্গমে নব্য বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিণতি হইবে। ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সম্পদরাশি বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে সংগৃহীত ও সন্নিবিষ্ট হইয়া আজ বঙ্গ-সাহিত্যকে পূর্ণাবয়ব দান করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, শ্রেণী পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা এখন অবশ্য পাঠ্য। মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষাদান সম্বন্ধে চারিদিকে আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। আশা হয়, এ আন্দোলন, একদিন সার্থক হইবে এবং সে শুভদিন অদূরবর্ত্তী।

বঙ্গের বাহিরে এক বৃহত্তর বঙ্গ সৃষ্ট হইয়া তত্তৎ প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হইতেছে। তাহার প্রমাণ ভাগলপুর ও বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান এবং সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা। মুঙ্গের, মহীশূর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এলাহাবাদে বাঙ্গালী পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস" "পাণিনি-কার্য্যালয়", "হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার -সমিতি" প্রভৃতি বঙ্গের গরিমা বৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষায় পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য্য বাস্তবিকই এ যুগের বাঙ্গালাভাষার মহিমাজ্ঞাপক।

শুনিয়াছি, ভারতের বাহিরে—আমেরিকায় বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালী সেখানে সম্ভ্রমে শিক্ষক-পদে বারত হইয়া মাতৃভাষার প্রচার ও অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে, বঙ্গভাষার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা।

এখন দেশব্যাপী সাহিত্য সাধনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষায় পত্রাদি লেখা পর্য্যন্ত অপমানজনক মনে করিতেন, কালের কি বিচিত্র মাহাত্ম্য তাঁহারাই আজ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক। কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আদালতের উকীল, দাওয়াই-খানার ডাক্তার, বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এখন সাহিত্য চর্চ্চার একটা বিপুল ধুম পড়িয়া গিয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

উপসংহার। সেকাল ও একালের বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থার ইহাই মোটামুটী তুলনা। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহার বিচার-ভার সুধী পাঠকগণের উপর রহিল।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

হরিনাম। *

(১)

"হরিহরযে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমো,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ,
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন॥"

চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবান শ্রীহরির মধুর আহ্বানে—তাঁহারই আদেশ ও অনুগ্রহে আজ এ অধম এই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে—সাধু-ভক্তগণ-সেবিত এই পরম পবিত্র হরিসভায় যোগদান করিতে পারিয়াছে, ইহা এ অকিঞ্চনের পক্ষে যারপরনাই সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহার অপার কৃপায় আজ আমরা বিষয়কার্য্যের বিষম জঞ্জাল দূরে রাখিয়া, এই পুণ্যদ হরিসভা-মন্দিরে সমবেত হইতে পারিয়াছি, কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সেই শ্রীভগবান শ্রীহরির রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। তারপর সমাগত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, সাধু-ভক্ত সকলের পদে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও অভিবাদন করিতেছি; তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদে এ পাপী-পাষণ্ডের কঠোর প্রাণে হরি-ভক্তির মধুর বন্যা প্রবাহিত হউক।

আজ আমি দু'টী হরি-কথা শুনিবার ও বলিবার নিমিত্ত এ হরিসভায় উপনীত হইয়াছি। ভক্ত ব্যতীত ভগবানের কথা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" তেমন করিয়া কেহ বুঝাইতে পারে না; আমি বাগ্মীও নহি, ভক্তও নহি, সুতরাং আমার এ হরি-কথা ভক্তগণের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিবে, তেমন বিশ্বাস করিবার দুরাশা বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। মিছরির টুক্‌রা যেমন করিয়া খাও মিষ্ট লাগিবেই,—অমৃত অসুরের হস্তে পড়িলেও তাহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি অন্তর্হিত হয় না, হরিনাম যেমন করিয়া লওয়া যায় বা যাহার মুখে শুনা যায়, তাহাতেই পুণ্য আছে—একটা স্বার্থকতা আছে; এ দীনের ইহাই একমাত্র ভরসা। সমবেত সাধু-ভক্তমণ্ডলী অধমের এ অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমা করিবেন। অথবা এ ক্ষমা প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি? যেহেতু—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

স্বয়ং ভগবান হৃষীকেশই হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সকল করাইতেছেন। সুতরাং কর্ম্মমাত্রেই আমাদের দোষগুণ কিছুই থাকিতে পারে না; দোষগুণ যদি কিছু থাকে সকলই সেই আদর্শ পুরুষ শ্রীভগবান শ্রীহরির।

কিন্তু কথা শুধু মুখে বলিলেই তো হইবে না,—হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস—অচলা ভক্তি থাকা চাই যে, তিনিই সব—তাঁহারই সব।

* হাঁসাইল হরিসভার জন্য লিখিত ও পঠিত।

মনে ভক্তি-বিশ্বাস থাকা চাই,—যে ভক্তি-বিশ্বাসের বলে আমরা বলিতে পারি,—কে আমি? কি আছে মোর বিনা ভগবান?

তাঁহারি শকতি পেয়ে,
তাঁরি পূত নাম গেয়ে
তাঁরি রচা ফুল-ফল,
তুলসী ও গঙ্গাজল,
তাঁহারি রাতুল পদে করিব প্রদান।
ভাল-মন্দ তাঁরি সব, সকলি সমান॥

ক্ষুদ্র আমি, দুর্ব্বলহৃদয় আমি, পাতকী-পাষণ্ড আমি, অবিশ্বাসী আমি; আমার সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস—অচলা ভক্তি কোথায়?—তাঁহার পদে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া প্রাণে শান্তি পাইবার মত শক্তি-সাধনাই বা আমার কোথায়? হায়! কবে আমি প্রেম-ভক্তিমাখা মধুরস্বরে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারিব,—

যাহার প্রসাদলব্ধ এ শরীর-মন,
করিনু তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ।

কবে আমি ভক্তিভরে গাইতে পারিব,—

"আমি জানি মম তুমি মাত্র সার,
সকলি অসার যাহা কিছু আর,
তোমারি পূজন, তোমারি ভজন
করি যেন আমি মরি হে।"

(বিজয়-গীতিকা)

সে শুভদিন কি হইবে?—তাহা কি পারিব? এ অভাগার—এ পতিতের প্রতি কি পতিতপাবন শ্রীহরির সে দয়া হইবে?

ক্ষুদ্র আমি—অণু আমি নাহিক সম্বল,
তাঁহারি করুণা মম ভরসা কেবল।

আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "হরি-নাম"। কবি বলিয়াছেন,—

"কোটি কোটি ব্রহ্মা যাঁর উদ্দেশে ধেয়ায়।
পঞ্চমুখে সদাশিব যাঁর গুণ গায়॥
চারি বেদ যাঁহার গুণের অন্ত নাহি পায়।
লক্ষ্মী-সরস্বতী যাঁহার চরণ ধেয়ায়॥
নারদ প্রহ্লাদ শুকদেব মহাশয়।
যাঁর গুণ গায় সদা আনন্দ হৃদয়।" (অজ্ঞাত)

এ অধম কি সে নাম কীর্ত্তন—সে পুণ্য-পবিত্রতাপূর্ণ হরিনামের আলোচনা করিতে সমর্থ হইবে?

নারদাদি মুনিঋষিগণ আজীবন যে অমিয় মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, শুক, শনক ও কপিলাদি মহাপুরুষেরা যে নাম-সুধারস পানে আত্মহারা হইয়াছিলেন, এ বিশ্বের কত শত ভক্ত সাধক, সাধু-মহাজন যে নামে পবিত্র অশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,—আমার পক্ষে সে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রয়াস পাওয়া পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘিবার স্পৃহার ন্যায় অতীব ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু মূঢ় মন বুঝে না, তাই তাঁহার নামের পসরা মাথায় বহিয়া সমাগত সাধু-ভক্ত-মহাজনদিগের পবিত্র পদ-প্রান্তে দাঁড়াইতে সাহসী হইলাম। একমাত্র ভরসা তাঁহার অপার করুণা। প্রার্থনা, তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক। আপনারা সকলে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহার জয়গান করুন।

"নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

বলিয়া আমিও তাঁহার পদারবিন্দে প্রণতি করিতেছি। সকলেই ভক্তিভরে সমস্বরে বলুন,—

"তোমার হাতের গড়া এই সে হৃদয়,
সঁপিলাম তব করে—জয় প্রেমময়।" (আরতি)।
অনলে সলিলে, কঠিনে কোমলে,
সমলে বিমলে সকলেই তুমি।
অন্তরে বাহিরে, তুমি চারি ধারে,
তাই ভক্তিভরে, ডাকি তোমা আমি।"
(বিজয়-গীতিকা।)

'তোমাকে ভক্তিভরে ডাকি' এরূপ বলিবার অধিকারও ত প্রভু আমার নাই। 'ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট' একথা জানি। কিন্তু আমার যে তাহাও নাই,—আমি যে সে ধনের বড় কাঙ্গাল। আমার কি আছে?—কি দিয়া তোমার অর্চ্চনা করিব? এ দীনের যে কিছুই নাই। করুণাময়। তোমার অহেতুকী অপার করুণাই অধীনের একমাত্র ভরসা। জয় জগদীশ্বর! হরিবোল! হরিবোল। হরিবোল।

(২)

'হরিবোল! হরিবোল!' নাচে গোরা বাহু তুলি,
ধূলায় সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি,
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজস্র বিতরি।
'হরিবোল! হরিবোল!'—গাইতেছে নরনারী,
'হরিবোল। হরিবোল।'—গায় ভাগীরথী;
'হরিবোল। হরিবোল!'—গাহিতেছে পশুপক্ষী,
'হরিবোল! হরিবোল! গায় জলপতি॥"
(কুরুক্ষেত্র)।

একদিন নদীয়ায় এমনি মধুর হরিনামের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল—প্রেমের ঝড় বহিয়াছিল। সে সুপবিত্র নাম-প্লাবনে নদে হাবুডুবু খাইয়াছিল—হরিনামের সে মধুর ধ্বনিতে বনমালীর বংশীরব ভ্রমে যমুনা আবার উজান বহিয়াছিল। তখন 'বিশ্ব ভরি উঠেছিল কি মধুর রোল।—শুধু হরিবোল! হরিবোল!' সে অমৃত নির্ঝরিণীর আময় মধুর শীতল প্রবাহে এ বিশ্ব জুড়াইয়াছিল—ধন্য হইয়াছিল; কত পাতকী-পাষণ্ড—কত জগা-মাধা তরিয়াছিল! ভারতের সে স্বর্গযুগ আর এখন নাই। এখন আর বঙ্গের প্রতি গৃহে—গোঠে, মাঠে, ঘাটে তেমন প্রেম-ভক্তিমাখা প্রাণস্পর্শী মধুর হরিধ্বনি শুনা যায় না, এখন আর 'হরি' বলিতে কেহ তেমন করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয় না—নামরসে ভাবাবেশে তেমন করিয়া আর ভক্ত মূর্চ্ছা যায় না। হায়। কবে আবার ভারতের সে শুভদিন ফিরিয়া আসিবে?—কবে আবার 'হরি' বলিতে ভক্তের নয়নজল ঝরিবে?—আবার কবে বঙ্গের গৃহস্থ ডাকিয়া বলিবে, "যাঁদের 'হরি' বল্‌তে নয়ন ঝরে, তারা এসেছেরে ভাই, তারা এসেছে!"

আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায় মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা হরিসভার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, হরিসঙ্গীত শ্রবণে নিদ্রা-সুখের ব্যাঘাত হইল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহারা মনে করেন, হরিসভা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত অলস লোকের বিশ্রাম-ভবন, ভক্তের প্রাণখোলা হরিসঙ্গীত অশিক্ষিতের বিকট সঙ্গীত-আলাপন! আর ভাবে ভোলা ভক্তের ভাবনৃত্য, অসভ্যের তাণ্ডব নর্ত্তন! তাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য হরিসভার অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না! ফলতঃ হরিসভা, যদি অশিক্ষিত—

অসভ্যের তাণ্ডবনৃত্যের আগার এবং হরিসঙ্গীত যদি ভাব-ভক্তিবিহীন অপ্রীতিকর কঠোর চীৎকারমাত্রই হয়, হরিসভা হইতে যদি জগতের কোনরূপ কল্যাণই সংসাধিত না হয়, তবে তেমন হরিসভায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত কাহারও যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ হরিসভা তাহা নহে। হরিসভা প্রেমভক্তির অনন্ত অমৃত নির্ঝরিণী—হরিসভা স্বর্গীয় পীযূষ-কুম্ভ; হরিসঙ্গীত সে অমৃত কুম্ভের দেববাঞ্ছিত মৃতসঞ্জীবনী সুধা-প্রবাহ। এ অমৃত পানে পাপ-তাপ দূরে যায়—বিশ্বপ্রাণীর প্রাণ জুড়ায়, মাটির মানুষ সোণার মানুষ হইয়া যায়। এই হরিণাম—'হরিবোল! হরিবোল!' মধুরধ্বনি শুনিয়াই একদিন নদীয়ার সোনার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমভরে বলিয়াছিলেন,—

"এই যে আমি মরেছিলাম।
হরিনাম শুনে প্রাণ পেলাম॥"

হরিনামে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, পাষাণ-কঠিন পাষণ্ডের প্রাণে ভগবদ্ভক্তির মধুর বন্যা প্রবাহিত হয়। সংসারাসক্ত—বিষয়ানুরক্ত জীব আমরা,—আমরা মরিয়াই আছি। জানি না কবে শ্রীভগবানের দয়া হইবে, কবে আমরা হরিনামামৃত পানে আবার বাঁচিয়া উঠিব। এস, ভাই! পাপী-তাপী তোমরা সব ছুটিয়া এস, এস, আমরা সকলে মিলিয়া ঐ মহা-তীর্থের যাত্রী হই; এস, আমরা সকলে মিলিয়া পবিত্র হরিসভায় যোগদান করি,—'হরিবোল! হরিবোল!' বলিয়া মানব জন্ম সার্থক করি।

হৃ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া 'হরি' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ বা সংহার। সংহার অর্থে প্রত্যাহরণ বা প্রত্যা-কর্ষণ, নিঃসারণের বিপরীত ক্রিয়াই সৃষ্টি। সুতরাং যিনি স্রষ্টা, তিনিই সংহারকর্ত্তা। শ্রীভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্য সম্পাদন করেন, সুতরাং হরিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা; যিনি এই ত্রিশক্তিসম্পন্ন তিনিই হরি—তিনিই ভগবান, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ। তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত যে সভা, তাহাই হরিসভা। ইহা আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে, ইহা শাস্ত্রোক্তি। যথা—

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যোহি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥

আবার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা হরি পূজেন, হরি ভজেন; কিন্তু কৃষ্ণ মানেন না, কৃষ্ণ পূজেন না, কৃষ্ণ ভজেন না। অধিকন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলেই বিদ্বেষে নাসাকুঞ্চন করেন; যেন দ্বিতীয় কংশ বা দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপু!

যখন হয় ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্ম-প্রভাব বাড়িয়া যায়,
তখন বিশ্বপতি অবতাররূপে আসেন এ ধরায়।
দুষ্কৃতে নাশি সুকৃতে রক্ষিতে নর-গৃহে জনম তাঁর,
জগতের হিতে প্রেমশিক্ষা দিতে যুগে যুগে
অবতার।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন সাধুগণের পরিত্রাণ এবং পাপাত্মাগণের নিধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ইহা স্বয়ং ভগবানের উক্তি। যথাঃ—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" (গীতা)

সুতরাং ভগবানের কথা—লোক-শিক্ষার্থ তাঁহার মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার কথা, অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? ভগবান নরদেহ ধারণ করিয়া এমন সব ক্রীড়া করেন, যাহা শ্রবণে মানুষ ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকে, যে কার্য্যে—যে লীলা দর্শনে লোক সকলের মানবোচিত কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিকাশ হয়, যে উচ্চ আদর্শ অবলম্বনে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা
তৎ পরোভবেৎ ॥"

আবার,—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"
(গীতা)

এই আদর্শ স্থাপনই শ্রীভগবানের মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার প্রধানতম কারণ। দৃষ্টান্তে যাহা হয়, উপদেশে তাহা হয় না; এই দৃষ্টান্ত বা আদর্শ প্রদর্শনই ভগবানের মনুষ্যদেহ ধারণের একমাত্র নিদান। তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার অভিপ্রায়মাত্রেই দুষ্কৃতের বিনাশ সংসাধিত হইতে পারে; কিন্তু লোক-শিক্ষার্থ আদর্শ মহাপুরুষের প্রয়োজন, তাই তিনি স্বয়ং এই আদর্শ মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যুগাবতারের ইহাই নিদান। সুতরাং ভগবানকে মানিলে তাঁহার অবতারকে মানিতে হয়, পূজিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়।

"যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোঽস্য বল্লভ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
শুক্লবর্ণঃ সত্যযুগে সুতীব্রতেজসাবৃতঃ।
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽয়ং পীতোঽয়ং দ্বাপরে বিভুঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমাং স্তেজসাং রাশিরে বচ।
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম। তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥"

রাম-কৃষ্ণাদি যুগাবতার। যুগে যুগে ভগবান এই অবতারত্ব পরিগ্রহ করেন। ইঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, ইহা অবিশ্বাস করিবার হেতু কি? ভগবান মানিলে—হরি পূজিলে তাঁহার অবতার রাম-কৃষ্ণকেই বা না মানিব—না পূজিব কেন? যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত ধর্ম্ম, সর্ব্বতেজের সমবায়, সর্ব্বমূর্ত্তির সমাবেশ, সকলের আশ্রয় ও সকলের আদি নররূপী নারায়ণ, তিনিই কৃষ্ণ। যথাঃ—

"ব্রহ্মণোবাচকঃ কোঽয়মৃকারো নেন্তবাচকঃ।
শিবস্য বাচকঃ যশ্চ ন কারো ধর্ম্ম এবচ ॥
নরনারায়ণে'ঽর্থশ্চ বিসর্গোবাচকঃ স্মৃতঃ ॥
সর্ব্বেষাং তেজসাং রাশিঃ সর্ব্বমূর্ত্তিস্বরূপকঃ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বজাতস্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥

রাম ও কৃষ্ণ নামের অপার মহিমা—অনন্ত শক্তি। এই রাম নাম কীর্ত্তন করিয়াই দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হইয়াছিলেন। রাম নামে ভাসে শীলা, তরে পাপী, পাষাণ উদ্ধার হয়। তাই,—

মুমূর্ষুর ক্ষীণ কর্ণে করে উচ্চারণ,
লেখে কণ্ঠে বক্ষে ভালে হরেকৃষ্ণরাম।
রাম নামের এমনি গুণ—কৃষ্ণ নামের

এমনি অনন্ত প্রভাব যে, উহা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে এমন পাতকী নাই যাহার মুক্তিলাভ না হয়। 'একবার রাম নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে।" নামের মাহাত্ম্য এমনি অপরিসীম! ইহাই ভক্ত কবির প্রাণ-কথা।—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥"

ইহাই কলির তারকব্রহ্ম নাম। কলির জীব একমাত্র এই নাম কীর্ত্তন করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারে। নামের বল বড় বল, নামের শক্তি বড় শক্তি। কলিতে ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের ন্যায় এমন মহা যজ্ঞ আর নাই। হায়! কবে বঙ্গের ঘরে ঘরে এ মহা যজ্ঞের বন্যা প্রবাহিত হইবে?

এখানে একটা গল্প মনে পড়িল। এক সিদ্ধ পুরুষের এক ভক্ত শিষ্য ছিল। এক দিন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসিল,—'প্রভু! কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য কি?' গুরু বলিলেন,—'ঐ পুরীষ-গর্ত্তস্থ কৃমি-কীটকে জিজ্ঞাসা কর, সেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দান করিবে।' শিষ্য তাহাই করিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে কৃমি-কীট কোথায় অন্তর্হিত হইল, সে আর উহা খুঁজিয়া পাইল না। শিষ্য পুনরায় গুরুকে বলিল,—'কৈ প্রভু কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য ত কিছুই বুঝিলাম না?" এবার গুরু বলিলেন,—ঐ যে সদ্যঃপ্রসূত কুক্কুর-শাবক দেখিতেছ, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ কুক্কুর-শাবক তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে। শিষ্য তাহাই করিল। কিন্তু 'কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য কি' একথা উচ্চারণ মাত্রই, সেই কুক্কুর-শাবক জীবলীলা শেষ করিল। শিষ্য বড় বিষণ্ণ হইয়া গুরুকে বলিল,—'ছিঃ! প্রভু! যে নাম শুধাইলে প্রাণীর প্রাণ সংহার হয়, আমি এমন প্রাণিসংহারক কৃষ্ণনাম করিতে চাহি না।' গুরু বলিলেন,—'যাও বৎস! ঐ নবজাত চণ্ডাল-শিশুকে একবার তোমার প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা কর।' শিষ্য এবারও গেল, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল,—'বল চণ্ডাল-পুত্র! কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য কি?' হরি! হরি! হরি! এবারও তাহাই হইল! চক্ষুর নিমিষে চণ্ডাল-পুত্র মানবলীলা সংবরণ করিল। শিষ্য বড় ক্ষুণ্ণ হইল; গুরুপদে মস্তক রাখিয়া বলিল,—'বল, দেব! কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য কি?' এবার গুরুদেব বলিলেন,—'যাও বৎস! ঐ নবজাত ব্রাহ্মণ-নৃপতিনন্দনের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, সেই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে সমর্থ হইবে।" এবার আর শিষ্য গুরুকে ছাড়িল না। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুসহ রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসিল;—'বল, রাজপুত্র! কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য কি?' শিশু রাজপুত্র উত্তর করিল,—'হে কৃষ্ণ-ভক্ত মহাপুরুষ! তুমি আমার গুরু, তোমাকে নমস্কার। স্মরণ করিয়া দেখ, সেই কৃমি-কীট, কুক্কুর-শাবক ও চণ্ডাল-পুত্র প্রভৃতির কৃষ্ণনাম শ্রবণে পাপজীবন পরিত্যাগের কথা। আমিই সেই কৃমি-কীট। প্রতি জন্মে তোমার নিকট কৃষ্ণ নাম শ্রবণে আমার এরূপ উর্দ্ধগতি লাভ হইয়াছে - এবার আমি ব্রাহ্মণ-রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে জন জন্মে জন্মে এরূপ কৃষ্ণনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে পরিণামে

সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করে। বুঝিলেন এখন কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য কি? মুহূর্ত্ত মধ্যে এক দিব্য রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে গুরু, শিষ্য ও রাজপুত্র একত্র একই আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। কৃষ্ণ-নামের এমনি গুণ!—এমনি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য!

গল্পটা একটু রূপক-রাগ-রঞ্জিত হওয়া অসম্ভব নহে। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুতুল্য। ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান; বিষয়বুদ্ধি বা সাংসারিক লাভ-ক্ষতি গণনার নাম জ্ঞান নহে, উহা জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার উপায় মাত্র। সংসারের জীব শ্রীভগবানের নামরূপ অমৃত-সাগরে স্নাত ও পবিত্রীকৃত হইলে, তাহার পশুভাব দূর হইয়া ক্রমোন্নতি প্রভাবে প্রাণে ব্রহ্মভাবের উদয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে মনের কুণ্ঠা দূর, শান্তির রাজত্ব ও বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে।

বিষয়াসক্ত মানব আমরা; আমরাও ঐ কৃমি-কীটের ন্যায় নিয়ত বিষয়রূপ পূরীষগর্ভে আকণ্ঠ ডুবিয়াই আছি। আমরা ত ঐ কামুক কুক্কুরের ন্যায়ই হীন লালসার বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন ঘুরিতেছি! ক্রোধ-চণ্ডাল ত আমাদের স্কন্ধে চাপিয়াই আছে; আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র স্বার্থের ব্যাঘাত ক্রোধানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আজীবন পাপীর সহবাসে আমরাও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। কৃষ্ণ-নামের পবিত্র মলয়ানিল স্পর্শে আমাদের বিষয়াসক্তি ছিন্ন, পশুভাব দূরীকৃত ও চণ্ডালত্ব মোচন হইয়া আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইবে; তখন আমরা শান্তির রাজত্ব ও বৈকুণ্ঠ লাভে কৃতার্থ হইব; আমাদের মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে। কৃষ্ণ-ভক্ত কবি বলিয়াছিলেন,—

"শুন শুন ওহে নর বল হরি হরি।
কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন কেশব মুরারী॥
গোবিন্দ মাধব রাম জয় হৃষীকেশ।
যে নাম শুনিলে নাহি থাকে পাপ লেশ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম বিনা সকলি অসার।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাই ত্রিভুবনের সার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ভাই ভরিয়া বদন।
হৃদয় ভরিয়া ভজ কৃষ্ণের চরণ॥
নামেতে তরিবে ভবে নাহিক সংশয়।
কৃপার সাগর বড় কৃষ্ণ দয়াময়॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

দেবতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দেবতাগণ অনেকেই আপনার লোক অপেক্ষা নিম্নতর লোকে প্রকাশ হইতে পারেন। নিম্নতর লোকের মূলীভূত পদার্থ তাহাদের দেহে লাগাইয়া উক্ত লোকের অধিবাসীদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন। ভূলোকে আসিতে হইলে ভূলোকের কঠিন পদার্থের আবরণে তাহাদের গাত্র আবৃত করিয়া তাঁহারা প্রকাশ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহ তেজঃ-তত্ত্ব-প্রধান বলিয়া তাঁহারা এক সময়ে নানা স্থানে প্রকাশ হইতে পারেন। ইহাদের দেহ মন্ত্রাত্মিক বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়। যে

দেবতার যে মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা হেতু সাধকের দেহেরও চতুঃপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে একপ্রকার স্পন্দন হইতে থাকে, সেই স্পন্দন সেই দেবতা যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানের স্পন্দনের অনুরূপ। এইরূপে সম অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া হেতু ইচ্ছাশক্তির বলে সেই দেবতার আকর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে সেই দেবতার সাধক সমীপে আবির্ভাব হইবার খুব সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থায় সাধকের সহিত সেই দেবতার লোক পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তারের মত একটী সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা (কেবল মাত্র এক এক অণু দ্বারা সাজান দীর্ঘ রেখার মত) একটী সংযোগ হয়, এতদ্বারা দেবতার মনোভাব (আশীর্ব্বাদ আদি) ও সাধকের মনোভাব (প্রার্থনাদি) আদান প্রদান হইয়া থাকে। এই উপায়ে সাধকের মনোভাব ও মনোবেদনা সেই দূর-লোকবর্ত্তী দেবতার গোচর হয়, দেবতাও সাধককে ও সাধকের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনুকূল স্পন্দনে স্পন্দিত দেখিয়া নিজ শক্তি বিকাশের সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই অনুকূল ও বিপরীত স্পন্দন আদি কি উপায়ে কিরূপে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারগণ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন ও তাহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুসারে নানা প্রকার মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

তন্ত্রের বীজ মন্ত্রাদির স্বর এইরূপে আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি, মূর্খের কল্পনা নহে। বেদের মন্ত্রাদির উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিৎ এই তিন প্রকার স্বরের সাহায্যে যথারীতি উচ্চারণ করিতে আমাদের পক্ষে নানা কারণে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রাদি আমাদের দেশ কালোচিত সুন্দর ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। মন্ত্র সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে, অন্য সময়ে এ বিষয়ে লিখিবার সঙ্কল্প রহিল।

দেবতারা মায়াবী—নানা প্রকার মূর্ত্তি ইচ্ছামত ধারণ করিতে পারেন, একেবার বহু মূর্ত্তি ধরিতে পারেন। তবে তাহাদের শাস্ত্রে বিগ্রহবন্ত বলা হইয়াছে, ইহার অর্থে ইহাদের একটী করিয়া বিশেষ রূপ আছে, ইহাই সেই দেবতার স্বরূপ ও ধ্যেয় এবং আরাধ্য। এই-রূপেই তিনি নিজ আবাসস্থানে আছেন।

ভূলোকে নানা স্থানে মন্দির আদি মধ্যে নানা প্রকার দেব মূর্ত্তি গঠিত থাকা দেখা যায়। এই মূর্ত্তি সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দেবগণ যেরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া সাধকদের দেখা দিতেন, সূক্ষ্মদর্শী ও স্বেচ্ছায় ভুবলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি স্থানে গমনশীল ঋষিগণ দেবতাদের আবাসস্থানে তাঁহাদের মূর্ত্তিমান অবস্থায় বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। দেবতাদের দর্শন করিতে হইলে তাঁহাদের মন্ত্র জপ, ধ্যান আদি করিতে হয়, এইরূপে তাঁহারা সদয় হইয়া সাধককে দর্শন দেন, অথবা সাধক নিজ চৈতন্য শক্তিকে দেবতার অনুরূপ অবস্থায় পরিণত করিয়া দেবতার দর্শন পাইবার যোগ্য শক্তিশালী হইয়া উঠেন। সাধন ব্যতীত অন্য উপায়েও দেবতা দর্শন করা যায়। আমাদের ভূলোকের পদার্থ স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অবস্থায় রহিয়াছে—এ বিষয় আমাদের

জ্ঞান আছে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ স্থূল, তরল পদার্থ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম, বাষ্পীয় অবস্থার পদার্থ আরও সূক্ষ্ম, আমাদের দৃষ্টি শক্তি বলে কঠিন, তরল এবং বাষ্পীয় অবস্থায় কতক পদার্থ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই, অতি সূক্ষ্ম গ্যাস আমরা দেখিতে পাই না, গ্যাসকে আরও সূক্ষ্ম করিলে যে অবস্থা হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না, তাহার পর আর এক অবস্থা আছে তাহাও আমরা দেখিতে পাই না—এই দুই অবস্থার পদার্থকে ইংরাজীতে ইথিরিক ও সুপার ইথিরিক বলে, শাস্ত্রে ইহা মরুৎ ও ব্যোম-তত্ত্ব-ঘটিত অবস্থা। সুতরাং আমরা ভূলোকের জিনিষের অনেক দেখিতে পাই না। এই সকল দেখিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে বাড়াইতে হইবে, তাহার পরে আরও অধিক বাড়াইলে আমরা ভুবলোকের সমস্ত বস্তু দেখিতে পাইব।

দৃষ্টিশক্তি আরও বাড়াইলে আমরা স্বর্গলোকের বস্তু দেখিতে পাইতে পারি। এই অবস্থায় দেবতা দেখিবার জন্য আমাদের সাধনার আবশ্যকতা হয় না, আমরা ইচ্ছামত দেবতাদের দর্শন করিতে পারিব। এইরূপে দৃষ্টিশক্তি বাড়ান যাইতে পারে। পরাবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা সমিতির অনেক সভ্যগণ এইরূপে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিবার অনেক গূঢ়-তত্ত্ব লোকসমাজে প্রচার করিতেছেন; দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা করিবার উপযোগী গ্রন্থাদিও উক্ত সমিতি প্রচার করিয়াছেন।

এই তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতির প্রধান কার্য্যস্থান মান্দ্রাজ সহরের নিকট আদিয়ার নামক পল্লীতে। তত্ত্ববিদ্যা সমিতির সভাপতি শ্রীমতী আনি বেশান্ত থাকেন, কতকগুলি উন্নত ব্যক্তি এখানে মধ্যে মধ্যে থাকেন। জীবন্মুক্ত ঋষিবৃন্দ এখানে অনেক সময়ে আসিয়া থাকেন। সাধকদের মধ্যে এক জন শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার সাহেব অনেক সময় এই স্থানে থাকেন। ইনি একজন দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সাধক। সূক্ষ্মদেহে নানাস্থানে ও গ্রহলোকে যাতায়াতের ক্ষমতা ইহাঁর আছে। ইহাঁর সূক্ষ্ম দর্শন ঘটিত ব্যাপারের অনেকগুলি পুস্তক আছে তাহা ঐ স্থানে কিনিতে পাওয়া যায়।

ঋষিদের আদেশে জনৈক দেবতা আদিয়ারে তত্ত্ববিদ্যা সমিতিতে এক সময় আসিয়াছিলেন। আর্য্যজাতির পর নূতন মনুর অধীনে আবার যে জাতি, জগতে হইবে সেই জাতি গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই জাতীর আবাসস্থান শাস্ত্রোক্ত সপ্তদ্বীপের মধ্যে যে দ্বীপ হইবে সেই দ্বীপ-সৃষ্টির সূচনা হইতেছে এই বিষয় উক্ত লেডবিটারকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, সাহেব তাঁহার প্রণীত ইনার লাইফ্ নামক গ্রন্থে এই বিষয় লিখিয়াছেন। এই দেবতা সাধন-মার্গে বিশেষ উচ্চশ্রেণীর ছিলেন না। আমাদের মানবদের পরমহংস অবস্থা তাঁহার অবস্থা। তাঁহার শরীর জ্যোতির্ম্ময়, ও বাষ্প দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে হয়। এই বাষ্প নানা প্রকার বর্ণের। মানবদেহ যেমন অস্থি-মাংস গঠিত স্থূলদেহ, তাহার চতুর্দ্দিকে ডিম্বাকার বাষ্প আবরণ যুক্ত লিঙ্গদেহ, তৎপরে উক্তরূপ আরও উজ্জ্বল সূক্ষ্মদেহ এবং তাহা অপেক্ষা বড় ও সূক্ষ্ম বাষ্প-

জড়িত কারণ-দেহ সূক্ষ্মদৃষ্টি সাহায্যে মানবদেহ এইরূপ দেখায়, এবং মানবদের কারণ-দেহ সাধনের উন্নতির সহিত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে, এমন কি উচ্চ অবস্থায় সাধকের কারণ-দেহ এক মাইল ব্যাপিয়া থাকে। মানবদের বলবুদ্ধি কিন্তু মধ্যাস্থিত সেই অস্থি-মাংস-গঠিত সেই ক্ষুদ্র অংশটিতেই ক্রিয়াশীল থাকে। দেবতা-দেহ মানব-দেহ হইতে ভিন্ন প্রকারের, ইহাদের ক্রিয়াশীলতা বাষ্পীয় দেহের প্রান্তভাগেই থাকে, মধ্য স্থলে ইহাদের তত ক্রিয়াশীলতা থাকে না। ইহাদের কারণ-দেহ মানবদের কারণ-দেহ অপেক্ষা বড়। এই দেহ আবার মনের ভাবের দ্বারা কমবেশী হইয়া থাকে। দেবতাটির কারণ-দেহ এক মাইল ব্যাপী ছিল, কিন্তু উক্ত সংবাদ দিবার সময় তিনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে তাহার মানসিক উত্তেজনা এত বেশী হইল যে তাঁহার শরীরের বর্ণাদির দীপ্তি আরও বেশী হইতে লাগিল ও তাঁহার কারণ-দেহ প্রায় পঞ্চাশ মাইলব্যাপী হইয়া পড়িল।

দেবজাতি সৃষ্টির ক্রমোন্নতির সর্ব্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। স্থাবর, উদ্ভিদ, জন্তু, মানব ও শেষ দেব-জাতি বলা যায়। এইরূপে দেখিতে গেলে আমরা দেববৃন্দকে দুইভাগে বিভাগ করিতে পারি। আজন্মদেব অর্থাৎ যে দেবতারা কখনও মানব-জন্ম গ্রহণ করেন নাই। মানবগণ পশু-জন্ম পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া শেষে মানব-জন্ম লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ দেবতাগণ এ নিয়মে দেবত্ব জন্মলাভের পূর্ব্বে মানব-জন্ম লইয়া মানব থাকেন না। দেবজাতি মানবজাতি হইতে উন্নতি পথে উত্থিত হইবে ইহা সৃষ্টির নিয়ম নহে।

তবে মানব জাতি আপন কর্ম্মফলে দেবত্ব লাভ করিতে পারে। এইরূপে অনেকে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতির কার্য্যে উচ্চ পদ লাভ করিয়া গিয়াছেন শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের নাম সাধ্য দেব। সুরথ রাজা দেবী-আরাধনাফলে সাবর্ণি মুনির পদ পাইবেন। রাজা নহুষ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলিরাজা এককালে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ইহারা তাঁহাদের দেবত্ব ভোগের পর পুনরায় মানুষ হইবেন বা অপর কোন উচ্চতর অবস্থায় চলিয়া যাইবেন। মানব জাতি ক্রমঃমুক্তি অবলম্বন করিয়া প্রজাপতি পর্য্যন্ত হইতে পারেন।

পরাবিদ্যা-সমিতির বঙ্গীয় শাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন Philosophy of the Gods নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি উক্ত সমিতির কলিকাতার আফিস হইতে কিনিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে দেবতত্ত্বের বিষয় অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। দেবতাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সৃষ্টির ক্রমোন্নতির কার্য্য বিপথে না যাইয়া যাহাতে ঠিক পথে চলিতে পারে তাহা দৃষ্টি রাখাই অনেক দেবতার প্রধান কার্য। "জগতে জীব সকল শক্তিমান্ ও অনেক অংশে আপন কার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীন। ইহাদের বুদ্ধির দোষে ইহারা এমন কর্ম্মের উৎপত্তি করে যাহাতে এই ক্রমোন্নতির গতির পরিবর্ত্তন বা ব্যাঘাত

ঘটে, এই সময়ে উপযুক্ত শক্তিপ্রয়োগে ক্রমোন্নতিমার্গকে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিতে দেওয়া দেবতার সাহায্যে হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহাদের দ্বারা উক্তরূপে স্রোত ফিরান অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন উপরের কোন দেবতার অবতাররূপে প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইনি আসিয়া সকল বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া জগতের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়াদেন।

এই সময়ে অনেক দেবতাকে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে অবতারের সহায়তার জন্য জন্ম লইতে হয়। অনেক দেবতা উন্নত মানবমণ্ডলীকে সাধনমার্গে শিক্ষা দিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে থাকেন।

অসংখ্য দেবতামণ্ডলী প্রত্যেক গ্রহের অধিপতি দেবতার অধীনে অসংখ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা এমন ঘটনা দেখিতে পাই না যাহার পশ্চাতে দেবতার হাত না রহিয়াছে। নদী বহিয়া যাইতেছে, ঝড় হইতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, সকলই দেবতারা অন্তরালে থাকিয়া নিয়মমত সকল কার্য্য যাহাতে হয় তাহা দেখিতেছেন। দেবতারা ইন্দ্রিয় সকলের চালক। মানবদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয় সকল বাহির হইতে যে শক্তি পাইয়া থাকে তাহা মানবের চৈতন্য গোচর করিবার কার্য্য দেবতাদের দ্বারা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে অগ্নি মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাক্‌শক্তি হইলেন, বায়ু নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস হইলেন। সূর্য্য, চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টি হইলেন। অধিদেবতা মানবদেহে কেশরূপে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রদেব মনরূপে মানবের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। যম অপান বায়ুরূপে নাভিতে আশ্রয় করিলেন। অপদেবতা শুক্ররূপে শিরে আশ্রয় করিলেন।

খনিজ ধাতু, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি মধ্যে আকৃতি গঠনে সহায়তা করা দেবতাদের কার্য্য। ধাতু মধ্যে কেমন সুন্দর সুন্দর আকার, বর্ণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। গেঁড়ি, শামুক প্রভৃতির চিত্র কিরূপ সুন্দর, পুষ্প পত্রাদির বর্ণ ও চিত্র ও আকারেরর কিরূপ সৌন্দর্য্য কেনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকে। এই সকল গঠনে দেবহস্ত নিযুক্ত, ইহা স্বাভাবিক সৃষ্টি নহে। পুষ্পের অভ্যন্তরে মধু রাখিয়া তদ্দ্বারা ভ্রমর আনিয়া সেই ভ্রমরের সাহায্যে পুষ্পের রেণু অন্য পুষ্প মধ্যে প্রেরণ করা, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি যে স্থানে থাকে সেই স্থানের লতাপল্লবাদির ন্যায় চিত্র তাহাদের গাত্রে প্রকাশ করিয়া তাহাদের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এই সকল দেবতাদের কার্য্য।

দেবতাদের অপর একটী গুরুতর কার্য্য করিতে হয়, এই কার্য্য জন্য তাহাদিগকে কর্ম্মবিধাতা বলা হইয়া থকে। ব্যক্তিগত কর্ম্ম এবং (National) জাতীয় কর্ম্মের ফল প্রদান করা ইহাদের দ্বারা হইয়া থাকে। প্রত্যেক লোকের জন্ম হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাদের শুভাশুভ কর্ম্মের হিসাব করা হয়, এবং তদনুসারে সেই ব্যক্তির লিঙ্গশরীর দেবতাগণ গঠন করিয়া দেন, এবং আত্মা যে জীবন পৃথিবীতে ভোগ করিবে সেই জীবনে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের কতকটা

ভোগ হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন, এবং যে দেশে ও যেরূপ বংশে জন্ম হইলে তাহার নির্দ্ধারিত প্রারব্ধ ভোগের সুবিধা হইবে তাহা দেবতাগণ স্থির করিয়া থাকেন। আমাদের ভিতর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে জন্মের পর ষষ্ঠ দিবসে বিধাতাপুরুষ কপালে জীবনের ভবিষ্য ঘটনা সকল লিখিয়া দিয়া যান, এই বিশ্বাস ভুল, কারণ গর্ভে জন্ম লইবার পূর্ব্বেই এই সকল বিষয় স্থির হইয়া যায়।

দেবতাদের সহায়তায় লোকে একত্র মিলিত হয়, একত্র বাসের লোক দূর স্থানে চলিয়া গিয়া পৃথক হইয়া যায়, তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্ম-ভোগের জন্য এইরূপ করিতে হয়। কর্ম্ম-সূত্রে বহুদূরবর্ত্তী কোন লোকের সহিত মিলিত হইয়া কোন ঘটনা হইবে, দেবতারা কৌশলে এক স্থানের লোককে অন্য স্থানে আনিয়া মিলাইয়া সেই কার্য্য ঘটাইবার সুযোগ করিয়া দেন দেবতাগণ মানবের পশ্চাতে সর্ব্বদাই রহিয়াছেন, দেখিতেছেন মানব নিজ স্বাধীন ইচ্ছার বলে এমন কোন কার্য্য করিয়া না ফেলেন যাহাতে সেই মানবের প্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগের সুযোগ নষ্ট হইতে পারে, দৈবাৎ এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়া পড়িলে অন্য কোন উপায়েও সেই ফল তাহার ভোগ করিয়া দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন লোকের অপঘাত মৃত্যু পূর্ব্বজন্মজনিত কর্ম্মফলে ঘটিবে না, অথচ বহু লোকের এরূপ ভোগ থাকায় একটা ট্রেণে সংঘর্ষণ (collision) হইবার দেবতাগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং যাহাদের ঐরূপ অপঘাত মৃত্যু কপালে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের সেই ট্রেণে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যবশতঃ উক্ত সৌভাগ্যবান্ লোকটীরও সেই ট্রেণে যাইবার যোগ্য কার্য্য থাকায় সেও ঐ ট্রেণে যাইবার জন্য বাহির হইল, তাহার অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যু না থাকায়, সে নিজ স্বাধীন ইচ্ছার বলে ঐ কার্য্যে যোগ দিতে যাইলেও দেবতাগণ তাহাকে কোন গতিকে গাড়ী ফেল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কাহারও অদৃষ্টে উক্তরূপ মৃত্যু থাকিলে তাহাকে কোন রকমে ঐরূপ গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন। আবার গাড়ীর কোন লোকের অদৃষ্টে মৃত্যু না থাকিলে দেবতারা তাহাকে গাড়ী হইতে তুলিয়া রক্ষা করিবেন। সেই লোকটী মনে করিবে কি করিয়া যে সে রক্ষা পাইল তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না। একদা আমাদের ভারতবর্ষের কোন স্থানে অতিশয় ঝড় ও বজ্রপাত হইতেছিল। কতকগুলি পথিক একটী ভগ্ন মন্দিরে আশ্রয় লয়। আকাশে ক্রমাগত বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছিল, কিন্তু কোন বজ্রপাতের শব্দ হইতেছিল না। লোকদের মধ্যে একজন বলিল আমাদের মধ্যে একজন পাপী আছে যাহার মস্তকে বজ্র পড়িবে, কিন্তু এতগুলি নিরপরাধী লোক সঙ্গে থাকায় বজ্র পড়িতে পারিতেছে না, কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই একে একে বাহিরে যাইয়া একবার করিয়া দাঁড়াইয়া দেখা উচিত, যে পাপী হইবে তাহার উপরই বজ্র পড়িবে। সকলের ইহাতে মত হইল, এক এক করিয়া বাহিরে যাইয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসে কিন্তু কাহারও আঘাত বজ্র

পড়িল না। অবশেষে তাহারা দেখিল একটী লোক ভগ্ন কোণে লুকাইয়া রহিয়াছে,—কাঁপিতেছে ও অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, তাহারা সকলে তাহাকে টানিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ বজ্রপাতের শব্দ হইল, বজ্র লোকটির মাথায় পড়িল না কিন্তু মন্দিরে পড়িয়া মন্দিরের সকল লোক কয়েকটীকে নষ্ট করিল। এইরূপে দেবতাগণ কার্য্য করিয়া থাকেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমাদের পূর্ব্বে কত জন্ম হইয়া গিয়াছে। কত জন্মে কত কাজ করিয়াছি, তাহার স্থির করিয়া ফলভোগ করান অতি দুরূহ কার্য্য, ইহাতে ভুল ভ্রান্তি ঘটিতেও পারে। একথা সত্য নহে। দেবগণের স্মরণশক্তি কখনও ভুল করে না। উচ্চ অবস্থায় দেবগণ চিত্রগুপ্ত, লিপিকা প্রভৃতি নিয়মমত হিসাব রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদের আদেশে দেবগণ কার্য্য করিতেছেন, এ ব্যাপারে ভ্রম ঘটে না। ব্যক্তিগত কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যেরূপ দেখিলাম জাতিগত কর্ম্মও এইরূপ ফল দিয়া থাকে। আমরা ভারতের আর্য্যজাতি, অনার্য্যদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছি, তাহার ফলে আমাদের পতন, আলেকজাণ্ডার হইতে ক্লাইভ পর্য্যন্ত সকলেরই আক্রমণ আমাদের সহ্য করিতে হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নষ্ট করিবার জন্য ভারতে জন্ম লইলেন, দেবতাগণ জুটিলেন, অনেক কৌশলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিল ও সেই হইতে আর্য্যদের বীরকুল ধ্বংস হইল। অত্যাচার সহ্য করিবার পথ উন্মুক্ত হইল। স্পেন আমেরিকায় মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি সুসভ্য সাম্রাজ্য জয় করিল, অধিবাসীদের উপর কি না অত্যাচার করিল, তাহার ফল আমেরিকার হাতে স্পেন পাইল। সেই পেরু সেই মেক্সিকো হইতে এক নূতন জাতির উদ্ভব হইল, সেই জাতি স্পেনের আমেরিকায় যাহা কিছু ছিল সকল ধ্বংস করিয়া দিল। আমাদের নারদদেব ঋষি হইতেছেন, তিনি ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মফল নাশ করিবার জন্যই বিবাদ লাগাইয়া থাকেন। নচেৎ এরূপ উচ্চ অবস্থার মুনি ঝগড়া বাধাইয়া আনন্দলাভ করিবার লোক কখনও হইতে পারেন না।

দেবগণ যেরূপ আকৃতি গঠনে সহায়তা করেন, আবার তাঁহার আকৃতি নষ্ট করিবার পক্ষেও সহায়তা করিয়া থাকেন। যমরাজ এ বিষয়ে একজন প্রধান দেবতা। লোকের আকার নষ্ট হইবার সময় হইলেই তাহার মৃত্যু ঘটান ও মৃত্যুর পর নিয়মিতরূপে জীবের পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ ধ্বংস করা ইত্যাদি দেব-সহায়তায় হইয়া থাকে। ক্ষিতি (solid), অপ (liquid) এবং তেজ (gas) লইয়া যে দেহ তাহাকে ভাণ্ডদেহ বলে, মরিলে এই দেহ শ্মশানে ধ্বংস হয়। কিন্তু মরুৎ ও ব্যোম লইয়া আমাদের আর একটি দেহ আছে তাহাকে পিণ্ডদেহ বলে। এই দেহ আমরা দেখিতে পাই না, এই দেহও আমাদের স্থূল দেহের অন্তর্গত। এই দেহ ভাণ্ডদেহ নাশের সহিত নষ্ট হয় না। এই দেহ লইয়া জীব মানুষের অদৃশ্য হইয়া এই পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দেহ যতদিন থাকে [illegible]

প্রেতত্ব অবস্থা। এই দেহ নাশ হইতে মৃত্যুর দিন হইতে অনেকস্থলে এক বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে, সচরাচর এই জন্যই এক বর্ষ কাল ব্যাপিয়া মাসিক ও বাৎসরিক আদি পিণ্ডদানের ব্যবস্থা। এই সময় মানবের পক্ষে অতি কষ্টকর সময়, দেব-সাহায্যে এই সময় অনেক ফল হয়।

আমরা দেখিলাম, দেবজাতি ব্যতীত মানব-সৃষ্টি ও মানব-জাতির ক্রমোন্নতির কার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। বরং পশুজাতি উপরিতন মানবজাতির সহায়তা ব্যতীত অনেকটা উন্নতি লাভ করে ও শেষে মানবজন্ম পর্য্যন্ত মানবের বিনা সাহায্যে লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানব দেবতার সাহায্য ব্যতীত এক পাও অগ্রসর হইতে অক্ষম। মানবের জন্মসময় তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মার্জ্জিত লিঙ্গ-শরীর গঠন-কার্য্যে দেবতার সাহায্য দরকার। এইজন্য শাস্ত্র কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, এ সম্বন্ধে আমরা অন্য সময় আলোচনা করিব। জন্মের পর হইতে প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাৎ দেবতা রহিয়াছেন। জীবিকার্জ্জন জন্য চাস আদিতে দেব হস্ত অলক্ষিতে কার্য্য করিতেছে। মানবের সুবিধার জন্য সময়ে জল দেওয়া, শীত আতপ আদি ঋতু পরিবর্ত্তন করা, ঝড়বৃষ্টি করা, কৃষিতে নানা বিপদ বিঘ্ন দূর করা, নদনদীর দ্বারা জল দান করা, অগ্নি প্রজ্জ্বালন করা, আবশ্যকীয় সাহায্য লাভ করাইয়া দেওয়া, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করাইয়া দেওয়া, অনিষ্ট কার্য্যে নাশ ও ইষ্ট কার্য্যে উন্নতি হয় যেখান, পীড়া ইত্যাদি হইতে রক্ষা করা, জগতের অনিষ্টকারক [illegible] আসুরিক [illegible] সকলকে বশীভূত রাখা, উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বিবাহ আদি সম্বন্ধ ঘটান, ইত্যাদি মানবজীবনে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহাতে দেবগণের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব থাকে না। এক এক শ্রেণীর দেবতাগণ এক এক প্রকার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবী যেমন সম্রাট, রাজা, জমিদার, কোটাল, গভর্ণর, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস দ্বারা বাহ্যিক ব্যাপারে শাসিত হয়, সেই মহাবিষ্ণু আশ্রিত সংসার হইতে ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবী আদি সমস্ত লোক সেইরূপ অবাঙমনসগোচর বিরাট সৃষ্টি-কর্ত্তার নির্দ্দেশে নানা শ্রেণীর দেবগণ দ্বারা অলক্ষিতে শাসিত হইতেছে। চক্ষুষ্মান ইহা দেখিতে পায়। আমরাও ইচ্ছা করিলে দেখিবার যোগ্য চক্ষু লাভ করিতে পারি।

আমরা দেখিলাম, দেবতারা আমাদের হিতের জন্য কতই না খাটিতেছেন। কাজেই আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী। এই ঋণ আমাদের কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্য সততঃ আমাদের দেবতাদের নিকট কৃতজ্ঞ-ভাব মনে থাকা উচিত, এবং দেবঋণ পরিশোধ দেবতাদের পূজাও করা উচিত। দেবতাদের দেহ সূক্ষ্ম, আকাঙ্ক্ষাও সূক্ষ্ম। তাঁহাদের কারণ-দেহ, এই দেহের পোষণ জন্য আমাদিগকে দেবতা যত্নপূর্ব্বক নানাবিধ পবিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তাহা দেবতাদের সম্পূর্ণভাবে ভোগে আনিতে হইলে ঐ দ্রব্য সকলকে কারণ-অবস্থায় পরিণত করিয়া দিতে হয়। অগ্নি এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা যে দ্রব্য অগ্নিতে দিব তাহা ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে কারণ-

অবস্থায় পরিণত হইবে ও দেবতাদের গ্রহণ-যোগ্য হইবে, এই জন্য শাস্ত্রে হোম-কার্য্যের বিধান হইয়াছে। যথাবিধি হোম করিলে, দেবতাদের দ্বারা আমরা যে সকল উপকার পাইতেছি তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া দেবতাদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমের অগ্নিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অর্পণ করিলে তাঁহারা সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের চক্ষু নাই দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহারা আসেন না, উক্ত দ্রব্য তাঁহারা লইতেছেন না ইহা জ্ঞান করা একেবারে ভুল।

মেকলে বাঙ্গালী জাতিকে ungrateful (অকৃতজ্ঞ) বলিয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত আছি আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঢক্কা বাজাইতে সদাই উদ্যত। কিন্তু ভাই একবার প্রাণ খুলিয়া বল দেখি, এই যে দেববৃন্দ আমাদের জন্য এত করিতেছেন কখনও আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞহৃদয় হইয়াছি কি? আমাদের ভিতর এমন কয় জন আমরা আছি, যিনি বলিতে পারেন যে একদিনও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আমি অন্ততঃ একবার বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত অগ্নিতে দেব উদ্দেশে অর্পণ করিয়া দেব-ঋণ কথঞ্চিত পরিশোধ করিয়াছি অথবা পরিশোধ করিবার জন্য মনের ব্যাকুলতা পোষণ করিতেছি।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ,বি,এল, এফ, টি, এস্।

শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ীর মানস পূজা।

মূলাধোড়াখ্যপীঠে ত্রিভুবনজননী পঞ্চমুণ্ডাসনস্থা
সা দেবী ব্রহ্মরূপা প্রলয়ঘনঘটা মুক্তকেশী হসন্তী।
মেঘাঙ্গী কালিকা ত্বং রিপুরুধিরমুখী মুণ্ডমালাং
বহন্তী
যাচে শ্যামাকুমারো হরিহরবিধিভি র্বাঞ্ছনীয়ং
পদং তৎ॥

রাগিনী ভৈরবী।

নিশা অবশান হ'ল জাগ ব্রহ্মময়ি, শিবে,
আর কত ঘুমাবে মা, মঙ্গল আরতি নেবে।
কর মা, দন্তধাবন লহ দেবি আচমন,
সুগন্ধি জলেতে স্নান করে তুমি খুসী হবে।
রত্ন-সিংহাসনে বসে পুষ্পতেল মাখ কেশে,
আতর চৈনিক বাসে পর তারে, দয়াভাবে।
এস এস হৃদে এস হৃদয়-আসনে বস,
বাঁধ মাগো এলোকেশ পাদ্য যে মা, পাযে নেবে।
জনমে যা কেঁদেছিনু অশ্রুজল পাদ্য দিনু,
হৃদয়ে পেতেছি অর্ঘ্য নিবেদি মা ভক্তিভাবে।
লহ মাগো, আচমন দুখ কর বিমোচন,
কেঁদে মরে দীন হীন দয়া মাগো, হবে কবে।
মধুপর্ক বাটীভরা, পুনরাচমন তারা,
করালবদনা ঘোরা তোমায় মাগো নিতে হবে।
সোনারি কলস জলে স্নান কর কুতুহলে,
ধন্য হব তারা বলে প্রাণের জ্বালা ঘুচে যাবে।
রতন বসন পর, উত্তরীয় অঙ্গে ধর,
অচিরে মা শক্র হর একান্ত আশ্রিত ভেবে।
সীমন্তে সিন্দুর ধর অলক্ত মা, পায়ে পর,
কজ্জল চখেতে পর, দেখে মন মুগ্ধ হবে।
রতন নূপুর পর মঞ্জীর চরণে ধর,
হাতে হীরার বালা শঙ্খ গলে মুক্তাহার দেবে।

গলায় নক্ষত্রমালা ভালে পর শশিকলা,
অদ্ভুত তোমারি লীলা কবে মা, প্রসন্ন হবে।
জবায়ুঁযের আভরণ রেখেছি করে যতন,
নিবেদি যে মা, এখন ব্রহ্মময়ি তুমি নেবে।
লহ দেবি করে অসি, কাট রিপুশিরোরাশি,
দেখি খল খল হাসি বরাভয় পুত্রে দেবে।
চন্দন কস্তুরী মাখ বুকে মোর পদ রাখ,
শান্ত হ'য়ে দাঁড়া মাগো, অভাগা যে জবা দেবে।
জবাপরাজিতা দ্রোণ, বিল্বপত্র সচন্দন,
লহ মা রক্তচন্দন, পুষ্পাঞ্জলি নাও শিবে।
হাজার আট রক্তফুলে পূজি কৃপা পাব বলে,
মানসে গো কুতূহলে অপার করুণা ভেবে।
চম্পক করবী যত নাও মাগো, অবিরত,
অশ্রুজলে যে চর্চ্চিত দয়া করে তুমি নেবে।
ধূপ দীপ নে মা, তারা চামুণ্ডা ভীষণাকারা,
নৈবেদ্য হৃদয়ে ভরা তোরে মাগো, নিতে হবে।
সম্বিদা শোধন করে' ঢেলে দি মা, পাত্র ভরে,
পান কর মা, দয়া করে' এ অভাগা ধন্য হবে।
হীরক চষকে মধু পান কর হরবধূ,
দিব ভক্তি শুদ্ধি শুধু, পঞ্চতত্বে পূজা নেবে।
সোনার গেলাস ভরা পানার্থোদক লও তারা,
তুমি মা, দুর্গতিহরা: কবে মা, দুর্গতি যাবে।
তাম্বূল অধরে ধর, ঠোঁট দুটি রাঙ্গা কর,
তর্পণ যেঁ অশ্রুধার রাঙ্গাপায়ে মিশে যাবে।
হীরে দিয়ে তৈরি করা ছাতায় সোনার ঝারা,
নিবেদি যে ভবহরা, চামর অর্পিত এবে।
দর্পণ সোনায় পাখা নাও মাগো, দাও দেখা,
দয়া করে ন্যাস ব্যথা, কতদিনে দুখ যাবে।
মণিময় পাদুকা দি, তুমি যে অনন্ত-আদি,
দয়াময়ী তুমি যদি অদে কেন মা তারিবে।
সিন্দুর-করণ্ড নাও, হাতে মাগো, শাঁখা দাও,
আমায় অভয় দাও, ডাকি তোর দয়া ভেবে।
আজ্ঞাপয় আবরণে মহাকাল সযতনে,
পূজি মাগো, এতক্ষণে তুমি তায় খুসী হবে।
আবরণ মহাকাল পূজি দিয়ে পুষ্পদল,
পুন: তোরে দি কমল রেখেছি যা দেব ভেবে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সাবরণ পুন: পূজি শ্রীচরণ,
পুনরায় ত্রিতর্পণ করে জ্বালা ঘুচে যাবে।
সোনার থালার 'পরে ভাত খাও মা, দয়া করে,
খেচরান্ন ফলাহারে আসব পানীয় শিবে।
ছাগ মেষ পশুগণ ষড়রিপু যে ভীষণ,
লহ দেবি বলিদান চামুণ্ডে, রুধির খাবে।
আজ্ঞাপয় মহাকালি, দিব যে মা শিবাবলি,
সমাংস রুধির বলি নিয়ে তুমি বর দেবে।
এস শিবে, বিল্বমূলে উর্দ্ধমুখে কোলাহলে,
রিপুরক্ত মাংস বলি খেলে তুমি তুষ্ট হবে।
কালাগ্নিসদৃশরূপা বলি গ্রহ মহাতপা,
শুভাশুভ ফল বল, অভাগা কি শান্তি পাবে।
কর্পূর প্রদীপভাতি তোরে মা, করি আরতি,
জয় কালি বলে স্তুতি, এ পাপী যে মুক্ত হবে।
হাজার আট দীপমালা নাও তুমি হিমবালা,
ঘুচাও মনের জ্বালা তুমি ছাড়া কে ঘুচাবে।
হৃদি-দুখ-আগুনেতে হোম করি ভক্তি-ঘৃতে,
মূল মন্ত্র আহুতিতে তায় তোর তৃপ্তি হবে।
মূল মন্ত্র করি জপ ব্রহ্মময়ী মহাতপ,
ঘোচায় যে মহাপাপ বিভব জীবনে ভবে।
প্রদক্ষিণ করে' নমি, পূজন মা জানি আমি,
গুরু মূল মন্ত্র তুমি, তিন এক একই জীবে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি প্রসন্না হও শঙ্করি,
ডাকি তোরে প্রাণভরি পূজা সাঙ্গ হ'ল এবে।

করালবদনা কালী লোল জিহ্বা মুণ্ডমালী,
কভু মা যে বনমালী গোপীকান্ত ভাবি যবে।
দিগম্বরী দিগম্বরে আমরি কি রূপ ধরে,
থাক মাগো, যুগাজোড়ে অভাগার দুখ যাবে।
তোর স্তুতি কেবা জানে তন্ত্র বেদে হার মানে,
তাই মরি অভিমানে মায়ের ছেলে কোলে যাবে।
তোমার মহিমা যদি সারদা সহিত বিধি,
লেখে যদি নিরবধি উভয়ে অক্ষম হবে।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি জয় জগদীশ্বরী,
ডাক তোরে প্রাণ ভরি ক্ষমা কর দোষ শিবে।
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন আমি যে মা, ভক্তিহীন,
মন যেন হয় লীন রাঙ্গাপদে মিশে যাবে।
ইতঃপূর্ব্বং মন্ত্র বলি আত্মসমাপিত কালি,
এখন দি মা, করতালি অসীম করুণা ভেবে।
নির্ম্মাল্য লইনু করে চাণ্ডালী পূজার তরে,
যদি মা প্রসন্না তারে, দাসে পূজা-ফল দেবে।
দক্ষিণা দক্ষিণাকালি রত্নবৃষ্টি নে মা, বলি,
প্রাণটাও নাও কালি, ক্ষমা কর দাস ভেবে।
নির্ম্মাল্য মাথায় ধরি পাদোদক পান করি,
পূজা শেষ মহেশ্বরি তোমারি কৃপায় শিবে।
আজ্ঞাকর অনুষ্ঠান কোলে দি পান ভোজন,
মধুর আসব পান করে' তোর দয়া পাবে।
বহুদীপে আলোকিত নটমঞ্চ সুশোভিত,
নর্ত্তকীরা করে গীত তোমারি মহিমা শিবে।
নটীদের স্কন্ধে লীনা বাজায় মধুর বীণা,
শোন মাগো ত্রিনয়না তাদের তুমি মুক্তি দেবে।
বারযোষা শত শত গান করে সুসঙ্গীত,
দেখ মা, কৌতুক কত আনন্দে নাচিছে সবে।
নাটকাভিনয় দেখ অভাগা পাইবে সুখ,
কৃপা করে দেখ দেখ "চণ্ডমুণ্ডবধ" এবে।
মানসে করিনু পূজা ক্ষমা কর চতুর্ভুজা,
উড়ায়ে তোর নাম ধ্বজা তোর ছেলে কাছে যাবে।
শান্তিস্তব পাঠ করে' উঠি মা, আসন ছেড়ে,
মন আনন্দ করে' শান্তি শান্তি শান্তি রবে।
কুমার-রচিত গীতি মানসপূজন স্তুতি,
গাইবে যে জন নিতি তারে পূজার ফল দেবে॥

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীশ্যামাকুমার ঠাকুর।

বিজয়া।

রাজচন্দ্রপুরের আম কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা পল্লীর একখানা ক্ষুদ্র কুটীরে বিজয়া একটী পূজার ফুলের মত পবিত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আশৈশব মাতৃহারা শিশু পিতা রামচন্দ্রের ক্রোড়ে নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া খেলিয়া বেড়াইত, আর বৃদ্ধ রামচন্দ্র তাহার আনন্দ-পুতলী কন্যাটীকে সযত্নে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সংসারের দুর্ব্বিসহ জ্বালা হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করিত। বিজয়া যখন তাহার ঘন কৃষ্ণবর্ণ চুলগুলি এলাইয়া ছোট হাত দুটীতে করতালি দিয়া ইতঃস্তত বিচরণ করিত, তখন বৃদ্ধ তাহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সংসারের কাজকর্ম্মে মনযোগ করিত! শৈশবে মাতৃহারা হইয়া বিজয়া তাহার পিতার বক্ষে মাথা গুঁজিয়া মায়ের শোক ভুলিয়াছিল। বৃদ্ধ রামচন্দ্রও এই বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র অবলম্বন কন্যাটীকে পাইয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া, সংসারের কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে

পারিয়াছিল। এই বিজয়া একটী ছোট মেয়ে; কিন্তু সে তাহার পিতার সংসারে শোক-ভুলানো গানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যখন রাত্রি আসিত, বিজয়া ঘুমাইত, দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা ঘরের দাওয়ায় একখানি চেটা পাতিয়া গরুর দড়ি বুনিত; প্রভাত হইলে, সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া, কন্যাটীকে খাওয়াইয়া, বাজারে দড়িগুলি বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। বিক্রয়-লব্ধ পয়সার দ্বারা দৈনন্দিন জিনিষপত্র কিনিয়া, আবার ঠিক সময়ে গৃহে ফিরিয়া কন্যার হাত ধরিয়া আদর-সোহাগ করিত। এইরূপে নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া বৃদ্ধ কন্যাটী লইয়া তাহার দুঃখের দিন-গুলি কাটাইত।

যেরূপে হউক, বৃদ্ধের দিনগুলি যেমন ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল, বিজয়ার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও তাহার সুন্দর গণ্ডকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল! বিজয়া এখন আর ছোট মেয়েটী নহে! যৌবন-শ্রী তাহার সমস্ত অঙ্গে ভগবান অযাচিতভাবে ঢালিয়া দিয়াছেন! রামচন্দ্র তাহার লক্ষ্মী-স্বরূপিনী কন্যার প্রতি চাহিয়া তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন! হিন্দুর ঘরের কন্যা, বিবাহ না হইলে জাত যায়! একি কম দায়! বৃদ্ধ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কূল পাইল না। বিজয়ার বিবাহের পাত্র সংগ্রহের জন্য কত স্থানে অনু-সন্ধান করিল, কিন্তু দরিদ্রের কন্যার পাত্র কোথায় জুটিবে? বৃদ্ধ হতাশ হৃদয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল! পরিশেষে জাতি-ধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া তাহাকে এক অশীতিপর বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিল। হায়! হিন্দু-সমাজ! তোমার কি কঠোর নিয়ম! বিধাতার নির্ব্বন্ধ অনুসারে সেই বৃদ্ধের সহিত বিজয়ার শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে বলিতে পারি না—বিবাহ হইয়া গেল! বিজয়া সেই দিনই তাহার পিতার নির্ব্বাচিত স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে গ্রামান্তরে চলিয়া গেল! আর বৃদ্ধ পিতা রামচন্দ্র তাহার হৃদ্‌পিণ্ড ছেদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আদরিণী কন্যাকে বিদায় দিলেন।

হায়! এই বিদায় তাহার শেষ বিদায় হইল! কিছুদিন যাইতে না যাইতে বিজয়ার সংসার পুতুল খেলার মত ভাঙ্গিয়া গেল! অভাগিনীর অগোচরে সেই নির্ম্মম কাল-চোর তাহার কণ্ঠরত্ন—স্বামীধনকে অপহরণ করিল! বিজয়া এই শোকাবহ ব্যাপারে কাঁদিল না। উঠিয়া সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া, গড়া পরিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিল। পরে স্বামীর সৎকারাদি করিয়া তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরের রক্ষার জন্য সেখানেই পড়িয়া রহিল।

এই অচিন্তনীয় সংবাদ যখন বিজয়ার বৃদ্ধ পিতার কর্ণগোচর হইল, তখন বৃদ্ধ সেই শূন্য ঘরে আছড়াইয়া পড়িল! তাহার করুণ-ক্রন্দনে সেখানকার সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল! তারপর একদিন বিজয়াকে আনিবার জন্য, তাহার শ্বশুর-গৃহে গমন করিল। কিন্তু বিজয়া আসিল না। পিতা ফিরিয়া আসিল; আর সেই বালিকা বিধবা তাহার স্বামীর ভিটায় একটা সামান্য আলো জ্বলিবে না বলিয়া আসিল না! এ যে বিধবার দেবতার মন্দির,

তাহার দেবতা যে এ তীর্থের মন্দির রক্ষার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন! তাই বিধবা তাহার পিতার বক্ষে ফিরিয়া আসিল না! সেই শূন্য ঘরে স্বামীর স্মৃতিমন্দিরে বিজয়ার দিনগুলি সুচারুরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়, সকল সময়ে দিনগুলি সুন্দররূপে কাটে না। সেই গ্রামে একজন জমীদার ছিলেন। কুক্ষণে বিজয়া তাঁহার কু-নজরে পড়িল। গ্রামে একজন কুচরিত্রা নিচকুলোদ্ভবা বিধবা ছিল। জমীদার প্রথমে তাহাকে দুতীরূপে খাড়া করিল। কিন্তু বিধবা বিজয়া তাহার এই কুৎসিৎ প্রস্তাবে পদাঘাত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল! তখন জমীদার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন! সেদিন জ্যোৎস্না-রাত্রি! উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ-গঙ্গায় জ্যোৎস্নার তরঙ্গলীলা খেলিতেছে—নিম্নে কলনাদিনী তটিনীর তরঙ্গলীলা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, ঠিক এমনি প্রকৃতির সেই নিবসা দরবারে পাপিষ্ঠ জমীদার যেখানে বিজয়া নির্ভয়ে ঘুমাইতেছিল, সেইখানে প্রবেশ করিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা আর লিখিতে পারিব না! হায়, পরদিবস বি গার রক্তমাখা অচৈতন্য দেহ দেখিয়া প্রতিবেশীরা নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ দিল। পুলিস বিজয়ার রক্তাক্ত দেহ হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিল। তারপর অনেক অনুসন্ধানের পর পুলিস জমীদারকে গ্রেপ্তার-পূর্ব্বক চালান দিল। যথা সময়ে ধর্ম্মাধিকরণে জুরির বিচারে পাষণ্ড জমীদারের দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল! বিজয়াও ফিরিয়া আসিল! এদিকে বিজয়ার পুণ্য চরিত্রে দুষ্ট লোকে কলঙ্ক আরোপ করিয়া নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। সুতরাং বিজয়া সমাজচ্যুত হইল! বিজয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার স্বামীর শেষ-চিহ্ন ধ্বংস করিয়া পিতার বক্ষে আসিয়া মুখ লুকাইল! কিন্তু তাহার সংস্পর্শে বৃদ্ধ পিতা রামচন্দ্রেরও শেষ বয়সে দুর্দ্দশার একশেষ হইল। বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পিতাও সমাজচ্যুত হইল! হায়, অভাগিনী বিধবা কন্যাকে গৃহে স্থান দিয়া ইহারও আর কোথাও স্থান হইল না! যাহার কোথাও স্থান নাই, মৃত্যু তাহার চির-বিশ্রামের স্থান! অভিমানে ক্ষোভে দুঃখে অভাগিনী বঙ্গবিধবা একদিন উদ্বন্ধনে সংসারের সকল যন্ত্রণা জুড়াইল। হায়, হিন্দু-সমাজ! তোমার এই মহত্ব!!

বিজয়া মরিয়া গেল! তথাপিও বৃদ্ধ রামচন্দ্রের সমাজে স্থান হইল না। বিজয়ার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, একবার এই বৃদ্ধ রাম-চন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বলুন, আমরা এখন কোথায় যাই?" আমিও ইহার পক্ষ হইতে হিন্দু সমাজপতিগণকে জিজ্ঞাসা করি "বিজয়া তো মরিয়া গেল! এখন ইহারা কোথায় যাইবে?"

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোস্তার রাজবংশ।

সেকালের কলিকাতার অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি পোস্তার রাজবাটীর সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরাজ-বণিকগণের সৌভাগ্যসূর্য্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হয় নাই, যখন পলাশীর যুদ্ধের প্রবল বহ্নি বঙ্গ-গগনে ধূমায়িত হইতেছিল, যখন লর্ড ক্লাইব ইংরাজ রাজত্বের সূচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই রাজবাটীর বিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ধর অকাতরে প্রচুর অর্থসাহায্য দ্বারা লর্ড ক্লাইবের সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ইনি যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে নয় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ সরকার বাহাদুর তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিতে চাহিলেও তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ সৌজন্যতার বলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহার উপর গভর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ইনিই নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইবের নিকট পরিচয় করিয়া দিয়া তাঁহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তখন নবকৃষ্ণ তাঁহার মুন্সীর কার্য্য করিতেন; পরে ইনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজা নবকৃষ্ণরূপে শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

লক্ষ্মীকান্ত ধরের কোন পুত্র-সন্তানাদি ছিল না; একমাত্র কন্যা পার্ব্বতী দাসীই তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইনিই পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের মাতা। মহারাজ সুখময় রায় ঐ রাজবংশের একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক; তাঁহার যশোরাশি বহুদিন হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে, কাননে কান্তারে, নগরে পল্লীতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। পার্ব্বতী দাসী একবার জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন রেল জাহাজ কিছুই ছিল না, ভাল রাস্তারও সম্পূর্ণ অভাব, পথে দস্যু-তস্করেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। কথিত আছে, মাতৃভক্ত সুখময় মাতার পুরী গমনের কষ্ট অপনোদনার্থ এক বৃহৎ রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে বিপুল রাস্তা মাতৃভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এখনও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উলুবেড়িয়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত ২৮০ মাইল বিস্তৃত এই রাস্তা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বি, এন, আর ট্রেণে যিনি পুরী গিয়াছেন, তিনিই ইহা দেখিয়া থাকিবেন; রেল লাইনের কোথাও বামে, কোথাও দক্ষিণে থাকিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া এই রাস্তা চলিয়াছে। এই নদীবহুল দেশে তখনকার সময়ে পান্থশালা, কূপ, সেতু প্রভৃতি পথিকের আবশ্যকীয় দ্রব্য সমন্বিত এই বিশাল পথ বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। তাম্বুলি-কুলতিলক বালেশ্বরের স্বর্গীয় মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুর এই সকল কূপের অনেকগুলি সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা সুখময়ের দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, পরে হেষ্টিংসের সময়েও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এবং পারস্যের শাহ ঐ

উপাধি মঞ্জুর করেন। ইনি ৪০০০ সৈন্যের অধ্যক্ষ হইবার ক্ষমতা পাইযাছিলেন। ইং ১৮১১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে মহারাজা সুখময়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল,—রাজা রামচন্দ্র রায বাহাদুর, বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র রায, বাবু বৈদ্যনাথ রায়, বাবু শিবচন্দ্র রায এবং বাবু নরসিংচন্দ্র রায।

রাজা রামচন্দ্রও মহারাজা উপাধি ও চার হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে ইঁহার মৃত্যু হয়। রাজা রামচন্দ্রের পুত্র রাজনারায়ণ রায এবং ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়। রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায—ব্রজেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র।

মহারাজা সুখময়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অপুত্রক অবস্থায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।

সুখময়ের তৃতীয় পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় অশেষ গুণালঙ্কৃত ছিলেন; তাঁহার দানের কথা লোকবিখ্যাত। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন; তাঁহার দুই পুত্র ছিল, কুমার রাজকৃষ্ণ এবং কুমার কালীকৃষ্ণ। কুমার রাজকৃষ্ণের দুই পুত্র,—কুমার জয়গোবিন্দ রায় ও কুমার শ্যামদাস রায়। রাজা কালীকৃষ্ণের দুই পুত্র,—কুমার দৌলতচন্দ্র ও কুমার নাগরনাথ রায়।

মহারাজা সুখময়ের চতুর্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

মহারাজা সুখময়ের পঞ্চম পুত্র রাজা নর সিংহ রায় বাহাদুর লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট তাঁহার দানশীলতার জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ৪ ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইহা একটী বিশেষ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। ইঁহার একমাত্র পুত্র কুমার রাজকুমার রায।

কুমার রাজকুমার রায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাপ্রসাদ রায বর্ত্তমান ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দেবীপ্রসাদ রায় পরলোকগত, তাঁহারই পুত্র সুযোগ্য বংশধর কুমার হরিপ্রসাদ রায়বাহাদুর এখন ঐ প্রাতঃ-স্মরণীয় রাজবাটীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন।

আমরা এই রাজবাটীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, লোকহিতকর কার্য্যে এই বংশের কোন বংশধর পশ্চাৎপদ নহেন। দুঃখী লোকের তপ্তাশ্রু দূর করিতে, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে, সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ও সহায়তা করিতে বঙ্গের এই প্রাচীন রাজবংশ যেন চিরকালই মুক্তহস্ত। সরকার বাহাদুর অনেকবার অনেক রাজবংশধরকে ইঁহাদের বদান্যতার পরিচয়স্বরূপ রাজা, মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, এবং আমরা এখনও দেখিতে পাই যে, বিনা উপাধি প্রাপ্তিতেও কোন কোন বংশধর কেবল মাত্র বদান্যতা ও সৌজন্যতার গুণে লোকের দ্বারা রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। বস্তুতঃ, লোকে যাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহাকে

স্বতঃই "রাজা" বলিয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা "রাজা" আর কে আছে? তিনি যে হৃদয়ের রাজা। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ রাজাই হইয়াছিলেন।

এই পুরাতন ঐতিহাসিক রাজবাটী এখনও বর্ত্তমান। যেখানে মহারাজা সুখময়ের পবিত্র পদধূলি বিরাজ করিত, সে পুণ্যময় রাজবাটী এখনও সগর্ব্বে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর সেই রাজবাটীরই ভিতর সেই অতুলনীয় কীর্ত্তি-কলাপে মণ্ডিত হইয়া এখনও যে উপযুক্ত বংশধর কুমার হরিপ্রসাদ রায়বাহাদুর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই প্রতিকৃতি আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা "আলোচনা"র পাঠকগণকে উপহার দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। সুখের বিষয় ইনিও সেই পুরাতন রাজবংশের অতুলনীয় কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যে মহৎ গুণের জন্য এই বংশ বহুকাল হইতে স্মরণীয় হইয়া আসিতেছে,সেই বদান্যতা কুমার হরিপ্রসাদেরও যথেষ্ট আছে, এবং নানা প্রকার লোকহিতকর কার্য্যে ইনি সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। কুমার হরিপ্রসাদ মিষ্টভাষী,নানাপ্রকার সদ্‌গুণ-মণ্ডিত এবং অমায়িক প্রকৃতিসম্পন্ন যুবক। সাহিত্যানুশীলনে এবং সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে ইঁহার যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভগবান ইঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল।
সহঃ সম্পাদক।

কবি-কুঞ্জ।

অনন্ত-সাগর।

নীল পয়োধিতে ক্ষুদ্র ফেণ-মালা
একে একে উঠি; একে একে মিশে;
মাঝেতে শুধুই মধু-কল-তানে
মিলে সবে তারা ক্ষণ-সুখ আশে।
অনন্ত সাগরে যত সব প্রাণী,
পর পর পর ওই ঊর্ম্মি-মত,
লভিয়া জনম, ক্ষণকাল পরে,
আবার ডুবিয়া যাইছে নিয়ত।
তারাও আবার, জীবনের মাঝে,
জুড়াইতে শ্রম পান করি' হায়।
মোহন-মধুর মিলন-অমিয়
এক অন্য সনে মিশাইতে ধায়।

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ, বি, এল।

কামনা।

হেরিতে তোমায় আকুল পরাণ
দেখা ত হে তুমি দাও না,
কোথা হে প্রাণেশ। কেমনে বা আছ
দেখিতে তোমায় পাই না।
হৃদয়ের স্রোত বহিছে সতত
ধোয়াতে তোমার চরণ,
একটী বার ত আসনা গো তুমি
হে মোর প্রিয় দরশন!
হৃদয়ের দ্বার করিয়ে উন্মুক্ত
জীবন-উষার আলোকে,
অন্বেষিছি কত জীবন জীবন!
নেহারিতে ওগো তোমাকে।
হৃদয়ের মম আকুল উচ্ছ্বাস
তোমারি প্রেমেতে মজিতে,
বারেকের তরে দয়া করে ওগো!
চাহ না কি তুমি আসিতে।
আকুল বেদনা নয়নের বারি
তোমারি উদ্দেশে বহিবে;

দেখিব না কভু হে মোর প্রাণেশ !
নয়ন ফিরায়ে চাহিবে ॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম কাব্যনিধি।

মায়ার বাঁধন।

হায় মায়া ! কি কঠোর বাঁধন তোমার !
কেমনে বাড়াই পা উপায় নাই আর।
দারাপুত্র পরিবার
ঘিরিয়াছে চারিধার,
যে দিকে নেহারি শুধু আমার আমার।
হায় মায়া ! কি কঠোর বাঁধন তোমার !
পরায়েছ পায় বেড়ী,
শক্তি নাই নড়ি-চড়ি,
মুক্তি নাই যত দিন জীবন-সংসার।
হায় মায়া ! কি কঠোর বাঁধন তোমার।
প্রভাতে উঠিয়া যবে,
ছেলেরা অস্ফুট রবে,
"বাবা" শব্দে বাক্য-সুধা ঢালে অনিবার ;
তখন সংসার ভুলে,
ছেলে-পিলে কোলে তুলে,
সুকোমল সুধাধরে চুমি বার বার।
হায় মায়া কি কঠোর বাঁধন তোমার !
কাজ করি' দিবাশেষে,
ফিরে ঘরে দেখি এসে,
পাখা করে আছে বসে প্রেয়সী আমার ;
নিজেরে ভুলিয়া আমি,
ভুলিয়া জগত-স্বামী,
ভাবি শুধু বার বার আমার আমার !
হায় মায়া কি কঠোর বাঁধন তোমার !

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

প্রাণোচ্ছ্বাস।

(কেন) আবরি ও তনু অঙ্ক পরশনে
মদিরা-অলস নয়নে চাহিয়া।
রিক্ত করিয়া সোণার স্বপন
পুলকিত কর কেন এ হিয়া?
নিরাশায় শ্রান্ত ক্ষুব্ধ মুরছনা
ভাঙ্গিয়া স্বপন বাজে বেসুরে ;
অতীতের সুখ ব্যর্থ কামনা
সব লয়ে স্মৃতি ভেসে যায় দূরে।
(তখন) মর্ম্মণ-কল্লোল নাচিয়া নাচিয়া
চারিধারে মোর বেড়িয়া বেড়ায়,
তব আলিঙ্গনে উঠি যে কাঁদিয়া
(যেন) মেঘের কোলেতে হাসিটী লুকায়।
সরলতা লোটে নম্র আননে
লজ্জা, দৈন্যে, সিক্ত করিয়া হিয়া
মুগ্ধ কাহার ললিত আলিঙ্গনে
রুদ্ধ ক্লেশে উঠ না ত চমকিয়া।
(আজি) মরণ-কল্লোল ঘেরে চারিধারে
জানায় আসি শান্তির বারতা ;
(তার) গর্জ্জন শুনি খোঁজে কাহারে
মুখে মাখি স্থির কাতরতা।

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

শ্রাদ্ধ সভা। নানা দেশের পণ্ডিতগণ সেই সভায় বিদায় লইতে আসিয়াছেন। কেহ স্মার্ত্ত, কেহ বৈদান্তিক, কেহ নৈয়ায়িক কেহ বা বৈয়াকরণিক। চারিদিকে চারি প্রকার বিচার হইতেছে। স্মার্ত্তগণ একাদশী তত্ত্বের বিচার প্রসঙ্গে একাদশীর দিন বিধবার জলগ্রহণ করা যাইবে কি না এতৎ প্রবন্ধে নানা শাস্ত্র-বচনের অবতারণা করিতেছিলেন। নৈয়ায়িক-গণ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি শ্রুতি-কঠোর পরিভাষাসঙ্কুল দুর্বোধ্য ভাষার জাল

রচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে তাক লাগাইতেছিলেন। বৈয়াকরণিকেরা কোন একটি ধাতু পদ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সে বিষয়ে নানা ব্যাকরণের নানা সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেছিলেন। আর বৈদান্তিকগণ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়. প্রতি দেহভেদে পৃথকভাবে বিকাশ পায় মাত্র—এই তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য শত শত শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাই যুক্তি সাহায্যে ব্যবস্থাপিত করিতেছেন। চারিদিকেই মহা কোলাহল। কেহ কাহারও কথা শুনিতেছেন না, সকলেই নিজের নিজের কথাই বলিতেছেন। কথার উপর কথা চাপান হইতেছে, কাজেই তর্কের কোন শৃঙ্খলা বজায় থাকিতেছে না।

এমন সময়ে সেই বিচার সভার মধ্যস্থলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রবীণ ভদ্র মাতুল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বড় লোক এবং এক জন ইংরাজী শিক্ষিত দেশ প্রখ্যাত ব্যক্তি। তিনি হাত জোড় করিয়া কহিলেন,—

"মহাশয়গণ, এ শ্রাদ্ধ সভায় ও সমস্ত বৃথা তর্ক বিতর্ক না করিয়া কোন একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া বাদ-বিচারে প্রবৃত্ত হউন। শ্রোতৃবর্গ যাহাতে বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন, এমনভাবেই বিচার করুন। ইহা শ্রাদ্ধ সভা। শ্রাদ্ধ কি? শ্রাদ্ধ দ্বারা কি ফল? শ্রাদ্ধ মৃত ব্যক্তির বাস্তবিক কি উপকার সাধন করে? শ্রাদ্ধান্ন পিতৃগণের কিরূপ তৃপ্তিপ্রদ—এই সকল বিষয়ই মীমাংসিত হউক। সরলভাবে বুঝাইতে হইবে, সকলেই শুনিবে।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, সেই ইংরাজী শিক্ষিত মাতুল মহাশয়ই প্রশ্ন করিবেন। বৈদান্তিকগণ সেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। উত্তর যুক্তিযুক্ত হইল কিনা তাহার বিচারক নৈয়ায়িক হইবেন। স্মার্ত্ত ও বৈয়াকরণিকগণ শ্রোতা রহিবেন। আবশ্যক মত তাঁহারা বলিবেন।

প্রশ্নকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রথম প্রশ্ন উত্থিত হইল— "শ্রাদ্ধ কি?" বৈদান্তিকগণ মধ্যে এক জন মুখপাত্র-স্বরূপ উত্তর দিবার জন্য সম্মুখে বসিলেন। উত্তর আরম্ভ হইল।

"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রীয় কর্ম্মই শ্রাদ্ধ। ইহা পিতৃযজ্ঞ। এই শ্রাদ্ধান্ন দেবতাগণের অমৃতের মত পিতৃগণের প্রিয় ভোজ্য। শ্রাদ্ধান্ন পিতৃগণ যে ঠিক ভোজন করেন, তাহা নহে; দৃষ্টি করেন মাত্র। ঐ দৃষ্টি দ্বারাই তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ ঘটে।

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি অমৃতং দৃষ্ট্বৈব তৃপ্যন্তি।" (ছান্দোগ্য)

দেবতারা অমৃত পান করেন না, দৃষ্টি করেন মাত্র। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্থূলদেহ লইয়া ত গমন করেন না যে, সত্য সত্যই অন্ন ভোজন করিবেন। স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয় যে সময়ে থাকে না—সে অবস্থায় শরীরের নাম সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গ শরীর। লিঙ্গ শরীর বায়বীয়, সে শরীরে মনই কেবল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া বিরাজ করে। স্থূলদেহের যাবতীয় সংস্কার লইয়া প্রেত মনই লিঙ্গদেহে সেই সংস্কার দ্বারা চালিত হয়। সংস্কার বশতঃই মৃতের পান-

ভোজনেচ্ছা জন্মে। আবার সেই সংস্কারবশতঃ পান-ভোজনেচ্ছার পরিপূরণে তৃপ্তি, অন্যথা অতৃপ্তি ঘটে। সংস্কারান্ধ ক্ষুধা তৃষ্ণা, তাহার পূরণ অপূরণ জনিত সুখ দুঃখের সহিত প্রকৃত সুখ দুঃখের অনুভবাংশে কোন পার্থক্য নাই। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উদ্ভূত বাহ্য ভোগ আর খাঁটী মানস ভোগে বাস্তবিক প্রভেদ নাই। স্বপ্নদর্শন জনিত লাভালাভ স্বপ্নে থাকে না, তাই মিথ্যা; জাগরণের মত উহা যদি স্থায়ী হইত, তবে স্বপ্নও জাগরণের মতই স্পৃহনীয় হইত।

মাতুল মহাশয়।—সংস্কার কাহাকে বলে?

বৈদান্তিক।—দেহীর জীবদ্দশায় যে বাসনাগুলি তৃপ্ত বা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, লিঙ্গদেহে তাহাই অনুবর্ত্তিত হয়। কার্য্যানুযায়ী বাসনাগুলি দেহীর চিত্তে চিত্রবৎ অবস্থিতি করে, উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাই সংস্কার। সংস্কারমূলকই স্মৃতি। সংস্কারের অপর নাম ভাবনা। দেহী যাহা যাহা করিয়া যায়, যে যে ইচ্ছা পূর্ণ বা অপূর্ণ করিয়া যায়, সেই সব মৃত্যুর পরও সংস্কাররূপে গমন করে। লিঙ্গদেহে দেহী সম্পূর্ণ পরাধীন। স্থূলদেহের স্থূল সংস্কার লিঙ্গদেহে সূক্ষ্ম সংস্কার। স্থূলদেহের সংস্কার অন্যথা করা পরাধীন মৃতের পক্ষে অসম্ভব। কৃতকর্ম্ম অনুযায়ী যে জাতীয় অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল দেহী লইয়া যায়, তাহার বশে অবশ্য জীব সুখদুঃখ ভোগ করে। স্থূলদেহে যে যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত বুদ্ধিবৃত্তি, বিশেষ—জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল; লিঙ্গদেহে সেই সেই জ্ঞানেরই কার্য্য হইবে।

তবেই দেখুন, মৃত্যুর পর স্থূল দেহাভ্যস্থ সংস্কারের গুণে মৃতের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ জন্মে। যাঁহারা জন্মিবার জন্য লালায়িত থাকে, তাহারা দেহান্বেষণার্থ নানাদিকে ভ্রমণ করে; কাজেই তজ্জনিত ক্ষুধা তৃষ্ণা (অবশ্য সংস্কারমূলক মানসিক) হয়। আমরা শ্রাদ্ধ দ্বারা সেই ক্ষুধাতৃষ্ণার পূরণ করি। দেহের জন্য মৃত ব্যক্তিকে যখন অপেক্ষা করিতে হয়, তখন তাহারা আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভুক্ হইয়া অবস্থিতি করে। অন্তরীক্ষে বায়ুর সহিত বায়বীয় দেহসম্পন্ন জীবগণ ঘুরিয়া বেড়ায়। ভূতযোনি বলিয়া আমরা যাহাদিগের নামে ভয় পাই—ইহারা সে ভূতযোনি নহে। ভূতযোনি পৃথক, তাহার বিনাশ গয়াধামে পিণ্ড দ্বারা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়—কলিকাতা ৭৫।১নং হ্যারিসন রোডে চাটুর্জ্জ্যে কোম্পানীর দ্বারা উক্ত ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় খাঁটি ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে গমন করিতে অনুরোধ করি। ইহাদের ঔষধ সমস্তই অকৃত্রিম এবং আশুফলপ্রদ। এই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলে ভদ্র এবং সুশিক্ষিত। ইহাদের নিকট প্রতারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা [illegible] বিশেষরূপে জানি।

আলোচনা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল।

গীতায় অন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সমন্বয়।

সৃষ্টি এবং লয়, আত্মা এবং পরমাত্মাতে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, এমন সমগ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া জ্ঞানার্জ্জনের পরাকাষ্ঠা। কেবল 'সৃষ্টি' শব্দ এতদূর ব্যাপক যে জড়-চেতন, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, সকলেরই সমাবেশ ইহাতে হইয়া যায়। সামান্য তৃণ হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে বিশালকায় হস্তী পর্য্যন্ত, তারকা হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত সকলেই সৃষ্টির অন্তর্গত। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বস্তুর সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যখন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তখন এই সারা বিশ্বের যথার্থ জ্ঞান মানব কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে? পরন্তু ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রযত্ন করাই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। কারণ ঈশ্বর জ্ঞানময় এবং মনুষ্য ঈশ্বরেরই অংশ। মনুষ্য কেন, যেখানে যেখানে জ্ঞানের অংশ (ইহা যতই অল্প হউক না কেন) পাওয়া যায়, সেখানে সেখানে ঈশ্বরাংশের অস্তিত্ব আছে বুঝা উচিত। অতএব আপনারই জ্ঞানার্জ্জনের কারণ অথবা আকর, জ্ঞানরূপী জগদীশ্বরের নিদর্শনের জন্য, উহাতে আপনার আত্মার লয়ের জন্য চেষ্টা করা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা মহান কর্ত্তব্য।

সৃষ্টি-স্থিতি-আদির নিয়ম বুঝিবার এবং উহার দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বের ভাবনা হৃদপটলের উপর অঙ্কিত করিবার মানসে জ্ঞানার্জ্জন করা ভিন্ন আর কোন সাধনা নাই। প্রকৃতির নিয়মে জ্ঞানবানদিগের সর্ব্বদা একই রকম সত্যতার অনুভব হয়। জ্ঞান এবং সত্য প্রায় পর্য্যায়বাচী শব্দ। কারণ ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে সত্যের অনুভব হওয়াই জ্ঞানের অনুভব। মোট কথা এই যে, সত্যের উপলব্ধিই জ্ঞান-প্রাপ্তি। যে সত্যের কোন নিয়মের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই সত্যের অনুভূতি হওয়ার অর্থ ততটুকু জ্ঞানের অনুভব করা। যদি কোন লোকের সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সত্যতার জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার পক্ষে কিছু জানিবার আর বাকী নাই। অতএব সে লোক অসত্যের আচরণ

সরাইয়া—মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া—মুক্ত হইয়া গিয়াছে; সে জ্ঞানময় ঈশ্বরের সদৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সে স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের জ্ঞান-প্রদীপ্ত মুনিঋষিগণ এইরূপ সত্যের অনুসন্ধানে সদাসর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। তাঁহারা জ্ঞানের বহু অংশ স্বায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয়ে সত্য-জ্ঞানের অংশ যত অধিক উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তত অধিক ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানীদিগের গ্রন্থ হইতে [illegible] জ্ঞানাংশের অনুরূপই সত্যের উপলব্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল জ্ঞানান্বেষীদিগের জ্ঞান-প্রাপ্তির মার্গ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ইহার কারণ রুচি, স্বভাব এবং সংস্কারের বিচিত্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহাকে যে মার্গ ভাল লাগিয়াছিল, তিনি সেই মার্গে নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্যোগ করিয়াছিলেন। একের অপেক্ষা অধিক শাস্ত্র রচনা হইবার ইহাই কারণ। তত্রাচ শাস্ত্র যতই হউক না কেন, উদ্দেশ্য সকলের একই ছিল। উহা কি?—সত্যের উপলব্ধি বা সত্য-জ্ঞান প্রাপ্তি। কারণ জন্মের সার্থকতা এবং পরমপুরুষার্থের সিদ্ধির ভিত্তি ইহার উপর গুপ্ত, ইহাই সেকালে বুঝা যাইত; এবং উহাই একালে বুঝা যাওয়া উচিত।

ইহাই আমাদের ষড়দর্শন এবং উপনিষদের সাধ্য বিষয়। উহাতে সত্যের অনুসন্ধান, সত্যের নিদর্শন এবং সত্য প্রাপ্তির-সাধনার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে দেওয়া আছে। প্রাণিশাস্ত্র, শরীরশাস্ত্র, বনস্পতিশাস্ত্র, মানসশাস্ত্র প্রভৃতি যতপ্রকার আধুনিক শাস্ত্র আছে, উহাদের যদিও প্রধান সাধ্য বিষয় উহা নহে, তত্রাচ উহারাও সত্যের অনুসন্ধান এবং উপলব্ধির সাধন প্রভৃতিরই বর্ণনা করে। সত্য সর্ব্বদা অব্যভিচারী। দেশ, কাল এবং পাত্রভেদে উহাতে ভেদ হইতে পারে না সেইজন্য ইউরোপ, আমেরিকা, চীন এবং জাপানের চিন্তাশীল বিদ্বান ব্যক্তিগণও সত্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সকল সিদ্ধান্তে ভারতের দার্শনিক পণ্ডিত এবং অন্যান্য বিষয়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত উপনীত হইয়াছিলেন। সত্য যদি অব্যভিচারী না হইত—জ্ঞানের যদি একই রূপ না হইত—তাহা হইলে এমন আশ্চর্য্যজনক সংযোগ ঘটিত না। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে আকাশ অনন্ত; ইহা ধ্রুব সত্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সত্য-সাধক বিদ্বানগণও ঠিক এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন।

পদার্থের বাহ্যাকৃতি বিভিন্ন হইলেও উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহতির নিয়ম একই রকমের সত্য-সূত্রে অনুস্যূত। ইহা হইতে বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু যে বনস্পতি শাস্ত্র সম্বন্ধিনী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহাতে কখনও প্রাণিশাস্ত্রের সীমার ভিতর, কখনও শরীরশাস্ত্রের সীমার ভিতর এবং কখনও মানসশাস্ত্রের সীমার ভিতর পৌঁছিয়াছিলেন। তখন উনি জানিতে

পারিলেন এবং পরীক্ষার দ্বারা জগৎকে জানাইলেন যে সকলের মূলে একই সত্য নিহিত আছে ; সকলের নিয়মন এবং সংহরণ একই প্রকার নিয়মের দ্বারা হইয়া থাকে ; যেখানে ইচ্ছা তুমি অনুসন্ধান কর, সত্য জ্ঞান সর্ব্বস্থানে একই রকমের পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে জ্ঞানের নিরূপণ আছে —তাহা শ্রীকৃষ্ণ কৃত হউক বা ব্যাসদেব কৃত হউক বা অন্য কোন লোকের কৃত হউক ; উহার নিরূপণ কর্ত্তা পূর্ণজ্ঞানী না হউন, তিনি একজন যে বিশিষ্ট জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্যজ্ঞানের আলোকের দ্বারা তাঁহার হৃদ্‌সরোজ সম্পূর্ণরূপে বিকসিত ছিল। জ্ঞানপ্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন মার্গ তিনি ভালরূপেই অবগত ছিলেন। কারণ তিনি গীতাতে তৎকালীন জ্ঞাত ঐ সকল মার্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে মার্গ ভিন্ন হইলেও সাধ্য সকলকার এক। মার্গভেদ কেবল অধিকারভেদ সূচক। অর্জ্জুনকে গীতাকার নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্যই অর্জ্জুন যাহাতে সেই মার্গ দ্বারা আপনার ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন, তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাই উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মার্গেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উহার কারণ এই যে সত্যজ্ঞান প্রাপ্তি—যাহাকে এক কথায় মুক্তি বা মোক্ষ বলা যাইতে পারে অন্য মার্গের সাহায্যেও হইতে পারে। কিন্তু উপস্থিত অবসর এবং পাত্র বিশেষত্বের বিচার করিয়া অর্জ্জুনকে তিনি অন্য মার্গ অবলম্বন করান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। তিনি সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম্মযোগ নামক মার্গ সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রশস্ত।

উপনিষদ মীমাংসা, বেদান্ত এবং যোগশাস্ত্রের আলোচনা এবং গীতা নিরূপিত সিদ্ধান্তের দ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের তুলনা করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে সাধ্য সকলকারই এক। ন্যূনাধিক মাত্রায় সত্যজ্ঞানের উপলব্ধি সকলেতেই এক প্রকার। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে ঐ সকল শাস্ত্রান্তর্গত প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত গীতার সিদ্ধান্তের সহিত এত সামঞ্জস্য হইত না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের দ্বারা রচিত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল মিলাইয়া দেখিলে এই কথা অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দ্বারাও এই সকল শাস্ত্রকারগণ অনেকাংশে ঐ সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। যে সকল মীমাংসা গীতার এবং অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের গৌরবের বস্তু। যদি সত্য সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্ব সময়ে অবাধ না হইত, তাহা হইলে এমন সমন্বয় কখনও অসম্ভব হইত না।

ষড়দর্শন, উপনিষদ এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে এবং গীতার সিদ্ধান্তে যে কোন কোন স্থানে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তাহারও বিশিষ্ট কারণ আছে। জ্ঞানের উন্মেষ সকলেতে এক রকম হয় না। জ্ঞানাংশের ইয়ত্তা অনুসারে সত্যের অনুসন্ধানে মনুষ্য কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় যেখানে সেখানে

ভেদভাব হইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। কাহার সিদ্ধান্তে কতটুকু এবং কোন কোন স্থানে ভ্রম অথবা প্রমাদ আছে, ইহা বলিয়া দেওয়া সমালোচকের কর্ত্তব্য। খুব সম্ভবতঃ এই সকল শাস্ত্র মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, অবস্থা, শিক্ষা এবং সংস্কার অনুসারে রচিত হইয়াছিল। অতএব যে সকল ভেদ এবং বিরোধাভাস আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা বাস্তবিকই অধিকারী ভেদ সূচক মাত্র।

গীতাতে প্রায়ই সকল শাস্ত্র-জ্ঞানের সমন্বয় দেখিয়া ইহাই বলিতে হয় যে জ্ঞানান্বেষিদিগের পরিশীলনের জন্য উহাপেক্ষা অধিক উপযোগী গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, —সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

জনসমুদায়ের নিকট এই অকিঞ্চিতকর লেখকেরও সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা—অল্পজ্ঞানং পরিত্যজ্য গীতাজ্ঞানং সমাপ্নুহি।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব

এম্‌-এ (প্রিভ.)।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবন।

ছাত্রজীবনই মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্বরূপ। ছাত্রজীবন যেরূপ ভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইবে, মানবও সেইরূপ হইবে। ছাত্রজীবন মানবজীবনের এক মূল্যবান অধ্যায়। এই অধ্যায় সুসম্পন্ন হইলে, প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। ভবিষ্যৎজীবনের 'সুখ-দুঃখ' এই অধ্যায়ের উপরেই নির্ভর করে।

শুধু তাই নয় ছাত্রজীবনের সুগঠন ও পরিচালনার উপরেই দেশের এবং মানবজাতির মঙ্গল-অমঙ্গল, উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। ছাত্রেরাই দেশের আশা-ভরসা-স্থল—ভবিষ্যতে তাহাদিগকেই দেশের নেতৃত্ব ও অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রজীবন বড় দায়িত্বপূর্ণ। সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করিবার জন্য ছাত্রজীবন নহে কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের জন্যই ছাত্রজীবন।

মনুষ্যত্ব লাভ করা মানুষ মাত্রেরই উদ্দেশ্য। এই মনুষ্যত্ব বিকশিত করিবার জন্য দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়। ছাত্রজীবনে এই মনুষ্যত্বলাভের পথ অনেকটা পরিস্কৃত হয়। বলিতে গেলে, ছাত্রজীবনেই এক রকম জীবনের গতি নিরূপিত হইয়া যায়।

যে দেশে যে পরিমাণে ছাত্রজীবন সুগঠিত করে, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত হয়। জাপানের উন্নতির কারণ অনেকাংশে ইহাই।

এক দেশের পক্ষে এক সময়ে যাহা উপযোগী, অন্যদেশের পক্ষে অন্য সময়ে তাহা উপযোগী নাও হইতে পারে। ইহা বুঝিতে না পারাই যত বিরোধের কারণ। ইহা বুঝিলে,প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়।

প্রাচ্য বলিতে অবশ্য ভারতের কথাই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে ধরিব। কারণ চীন-জাপান প্রভৃতি দেশের জ্ঞান আমাদের খুব অল্পই আছে। আর পাশ্চাত্য বলিতেও আমরা ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশের বিষয় এক রকম কিছুই জানি না। [illegible] প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিতে ভারত ও [illegible]

আমরা বিশেষভাবে ধরিব।

এখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনের বিশিষ্টতা, দোষগুণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কি, দেখা যা'ক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্র-জীবনের তুলনা করিলে আমাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। সকল জিনিষের পক্ষেই ইহা খাটে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাত্রজীবন তুলনা করিলে আমাদের নিজ দোষ গুণ দেখিতে পাইব এবং পরস্পরের নিকট কি কি শিক্ষণীয় আছে বুঝিতে পারিব। আমাদের দোষ-গুণ আমরা নিজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু অন্যে তাহা বেশ বুঝিতে পারে। নিজের অবস্থা অন্যের তুলনায় অনেকটা বুঝা যায়। ইহা অল্প লাভ নয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রথমেই বেশ একটি স্পষ্ট বিভিন্নতার উপলব্ধি হয়। সর্ব্ব-বিষয়ে প্রাচ্য অন্তর্মুখ এবং পাশ্চাত্য বহির্মুখ। ধর্ম্মজগতে প্রাচ্যের এবং কর্ম্মজগতে পাশ্চাত্যের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। সমস্ত দেশেই দেশের চিন্তা ও কর্ম্মানুযায়ী ছাত্রজীবন গঠিত ও পরিচালিত হয়; তাই, প্রাচ্য-ছাত্র অন্তর্মুখ এবং পাশ্চাত্য-ছাত্র বহির্মুখ। প্রাচ্য-ছাত্রজীবন ধর্ম্মলাভের এবং পাশ্চাত্য-ছাত্রজীবন পার্থিব সাফল্যলাভের উপযোগী করিয়া গঠিত হয়। এখন যে সেরূপ না হয়, তাহা নয়। তবে, বিংশশতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে সংঘর্ষ হইয়াছে—তাহার ফলে প্রাচ্য অনেকটা পাশ্চাত্যের মত আদর্শলাভ করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মহীন নয়, এখনও চিরন্তন ধর্ম্মের অন্তঃশীলা প্রাচ্যের অন্তরে অন্তরে বহিতেছে। প্রাচ্য-ছাত্র পাশ্চাত্য-ছাত্রের আদর্শ-লাভ করিতে বসিয়াও, এখনও তাহার ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

সব দিকেই দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য-ছাত্র পার্থিব বিষয়েই উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। প্রাচ্য-ছাত্র যেরূপ ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করে, পাশ্চাত্য-ছাত্র সেইরূপ বিশেষভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব অনুভব করে। প্রাচ্য ধর্ম্ম-পরায়ণ ও মোক্ষকামী এবং পাশ্চাত্য রাজনীতি পরায়ণ ও পার্থিব উন্নতিকামী। অধিকাংশ পাশ্চাত্য ছাত্রের বড় বড় রাজনৈতিক এবং দেশের নেতা হওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য প্রদেশ যেভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার ছাত্রও যে তদনুরূপ হইবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি? আর প্রাচ্য ধর্ম্মানুরাগী, তাহার ছাত্রও ধর্ম্মবীর হইবার জন্য বহুযুগ হইতে সাধনা করিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে বহু ধর্ম্মবীরের জন্মও হইয়াছে। আর, পাশ্চাত্যে বহু শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, দেশের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের অনুযায়ী ছাত্রজীবন গঠিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্যের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাচ্যে এক নব আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার ফলে, প্রাচ্য ছাত্রেরও দেশের নেতা এবং বড় বড় রাজনৈতিক হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যের চিরন্তন ধর্ম্ম-ভাব, এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ধর্ম্মই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু। ভারতীয় ছাত্র এখনও এই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আছে। ভারতীয় ছাত্রজীবন পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে এখনও যুগ যুগান্তের নিজস্ব ধর্ম্মভাব হারায় নাই।

পাশ্চাত্য-বিধানের অনুরূপ, ভারতে অনেক বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে, ভারতীয় ছাত্রজীবন পাশ্চাত্য-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের ন্যায় এদেশের ছাত্রেরাও ক্রমশঃ বিপ্লবপন্থী, রাজনৈতিক প্রভৃতি হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ছাত্রজীবন অনুকরণ করিতে যাইয়া প্রাচ্য-ছাত্র তাহাদের দোষের অনুকরণই বেশী করিয়াছে। গুণটা বড় বেশী ধরে নাই। আধুনিক প্রাচ্য-ছাত্র আর পূর্ব্বের ন্যায় বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, ধর্ম্মানুরাগী ও সংযত ব্রহ্মচারী নয়। আজকাল আর প্রাচ্যের ছাত্র পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাস্পদ হয় না। মধুর সামগান ও বন্দনাগীতি আর প্রাচ্য-ছাত্রের মুখ হইতে নিঃসৃত হয় না। আর দেশবাসী তাহাকে দেব-বালক বলিয়া ভক্তি করে না। অতীতের সেই মহান্, গৌরবময় ভারতীয় ছাত্রজীবন আজ অস্তমিত! আর সেই দেবত্বময় ছাত্র-জীবন প্রাচ্য-ছাত্রের মনে পড়ে না। কখনও কখনও সেই পবিত্র ছবি স্বপ্নের ন্যায় মনের ভিতর ভাসিয়া উঠে মাত্র। পাশ্চাত্য-ছাত্রের গুণ ছাড়িয়া দোষ অনুকরণ ব্যতীত ইহার কারণ আর কিছুই নয়। প্রাচ্য-ছাত্র আপনার শ্রেষ্ঠ সেই ধর্ম্মভাব ভুলিয়া গিয়া, সংযম ও ত্যাগ, বিনয় ও নিষ্কাম বিদ্যালাভ ছাড়িয়া— পাশ্চাত্য-ছাত্রের বাহ্য-সৌষ্ঠব, বিলাস-বাসনায়, বিদ্যার বৃথা অভিমানে আকৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য সকল পাশ্চাত্য-ছাত্রের পক্ষে একথা বলা যায় না; কিন্তু পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনে এই সকল যথেচ্ছাচার ও দোষই বড় বেশী দেখা যায়। পাশ্চাত্য-ছাত্র বিপ্লব ও হঠকারিতায় যে অগ্রণী তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উত্তেজনা, দেশব্যাপী আন্দোলন ও বিদ্যার বাহাদুরী লাভ পাশ্চাত্য-ছাত্রের কাম্যবস্তু। বিনয়, সংযম ও ত্যাগকে পদদলিত করিয়া কেবল বিদ্যালাভই যেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কিন্তু মূঢ় আমরা, তাই ভুলিয়া যাই যে, "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি।" অবশ্য পাশ্চাত্যের সকল ছাত্রকে অবিনয়ী, যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সমস্ত পাশ্চাত্য-ছাত্রকে এই অপবাদ দিলে অবিচার করা হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচার বিশেষরূপে দেখা যায়। প্রাচ্য ছাত্রজীবনে ঐসব খুব কমই ঘটে। পাশ্চাত্যের প্রবল সংঘর্ষের পূর্ব্বে প্রাচ্য ছাত্রজীবনে ঐ বিদেশীয় ভাব একেবারেই ছিল না। সুতরাং আজকাল ভারতে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তাহার জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষাই দায়ী।

আধুনিক ভারতীয় ছাত্র যদিও পাশ্চাত্য-ভাবে ক্রমশঃ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি তাহারা নিজের চিরন্তন ধর্ম্মভাব একেবারে বিসর্জ্জন দেয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্র এখনও চরিত্র ও ধর্ম্মবলে জগতের অন্য জাতীয় ছাত্রের আদর্শস্থানীয়। আজকাল ভারতের অধিকাংশ ছাত্র পাশ্চাত্য-ছাত্রের ন্যায় বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারে নাই বটে; কিন্তু নিভৃতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া বহু মহদ্গুণে জগদ্বাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয়

ছাত্র জীবনেও যে অবনতির কীট প্রবেশ করে নাই, এমনও বলা যায় না। ভারতীয় ছাত্র কেবল মানসিক শক্তির পরিচালনা করিয়া শারীরিক সামর্থ্যে হীন হইয়া পড়িতেছে;—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—এই মন্ত্রের প্রচার যে ভারত একদিন করিয়াছিল, আজ সেই ভারতই উহা অদৃষ্টের পরিহাসে বিস্মৃত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করিয়া, জগতের শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যালাভই হইতেছে, কিন্তু লব্ধবিদ্যা কাজে লাগিতেছে না এবং উহা হইতে দেশের কোনও প্রকৃত উপকার বড় একটা হইতেছে না। তারপর, পাশ্চাত্য-ছাত্রের গুণ ছাড়িয়া দোষ অনুকরণ করিতে যাইয়া প্রাচ্য-ছাত্র অবিনয়ী, যথেচ্ছাচারী, অহঙ্কারী ও বিপ্লবপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে; চরিত্রের ভিত্তি ও ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মবল হারাইলে প্রাচ্য-ছাত্রের অস্তিত্বও বোধ হয় লোপ পাইবে। আমরা চাই যে, ছাত্রগণ বিনয়ী, নিরহঙ্কারী হউক,—কিন্তু আমরা চাই না যে, তাহারা নির্জীব "গোবেচারী ভাল-মানুষ" হউক। সুখের বিষয়, দেশে জাগরণের দিন আসিয়াছে, প্রাচ্যের অতীত আদর্শানুযায়ী বিদ্যালয়, দেশে স্থাপিত হইতেছে। ইহা একটী শুভ লক্ষণ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনের যথার্থ সম্মিলনে যে পূর্ণ ছাত্রজীবন গঠিত হইবে, তাহা অতি সুন্দর ও জগতের প্রকৃত হিতকারী হইবে।

পাশ্চাত্য-ছাত্রের দোষের কথাই আমরা বড় বেশী বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের নিকট কি প্রাচ্য-ছাত্রের কিছুই শিখিবার নাই? আর, প্রাচ্যের নিকটও কি পাশ্চাত্য-ছাত্রের কিছুই শিক্ষনীয় নাই?

দোষ-গুণ উভয়েরই আছে; জগতে কেহ সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে—তবে ইহার কম-বেশী আছে। প্রকৃত ছাত্র আকৃতি ও প্রকৃতিভেদেও সর্ব্বত্রই এক এবং পাশ্চাত্য-ছাত্রদের মধ্যেও ধর্ম্মবীর আছে—তবে প্রাচ্যের তুলনায় বড় কম। কিন্তু পাশ্চাত্য-ছাত্রের কর্ম্মবীরের তুলনায় প্রাচ্য হীনপ্রভ। পাশ্চাত্যদেশে ছাত্রদের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত কর্ম্মা যুবক দেখা যায় যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের প্রবল আত্মনির্ভরতা, নির্ভীকতা, পরোপকারেচ্ছা ও সজীবনা দেখিয়া তাহাদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, তাহাদের মধ্যেই বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব ক্রীড়া করিতেছে; তাহারাই মানুষের মত মানুষ। জীবন—তাহারাই প্রকৃতরূপে উপভোগ করিতেছে। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করা তাহাদের সার্থক।

আর আমরা কি হইয়াছি? শরীরে দুর্ব্বল আমরা—কি করিতে পারি? যেজন্য জগৎবাসীর নিকট আমরা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইতাম—সেই চরিত্র ও ধর্ম্মবল আমরা হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের জীবন আজ স্পন্দনহীন—বৈচিত্র্যবিহীন।

পাশ্চাত্য আজ এই বিষয়ে প্রাচ্য হইতে কত উচ্চে তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার মূলে দুইটী কারণ বর্ত্তমান! সে দুইটী বেশ স্পষ্ট।

পাশ্চাত্য প্রবল রজোগুণে সজীব; আর প্রাচ্য তাহার গৌরবময় ও শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ—যাহাকে যুগযুগান্ত হইতে অবলম্বন করিয়া জগতের পূজা পাইয়া আসিতেছে,—সেই ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রাচ্য আজ আপনাকে তমোগুণে নিমজ্জিত করিতে বসিয়াছে। তামসিকতা পক্ষাঘাতের ন্যায় প্রাচ্যকে প্রাণহীন, নিস্পন্দ করিয়া তুলিতেছে। প্রাচ্য-ছাত্রের সেই গৌরবময় অতীতের আর কিছুই নাই। রজোগুণের চিরপূজারী পাশ্চাত্য—আজও সজীব, আজও তাহারা জীবনকে উপভোগ করিতেছে। কিন্তু উহার অবশ্যম্ভাবী উচ্ছৃ-ঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়াছে,—কর্ম্মস্রোতে ধর্ম্ম ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যে যেন একটা কিসের অভাব অনুভূত হইতেছে। বোধ হয় প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম-শিক্ষার্থে দীক্ষাগ্রহণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠি-য়াছে। পাশ্চাত্যের প্রবল কর্ম্মস্রোত ও প্রাচ্যের চিরন্তন ধর্ম্মস্রোত যখন মিলিত হইয়া এক জীবনী শক্তিময় প্রয়াগ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিবে—তখনই জগতের উন্নতি অতি সহজ-সাধ্য হইয়া আসিবে; তখনই জগতের ছাত্র ও মনুষ্যজীবন পূর্ণতালাভ করিবে। তখনই পৃথিবীতে প্রকৃত ছাত্রের এক বিরাট দল দেখা দিবে। বেশ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়ের নিকটই পরস্পরের বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। কাহাকেও অবহেলা করা যায় না; তবে উভয়ের দোষ-গুণের মধ্যে কম-বেশী আছে।

পাশ্চাত্য-ছাত্রজীবনে আর একটা বিশিষ্টতা দেখা যায়। সেখানে অধিকাংশ ছাত্রই আজীবন ছাত্রজীবন অবলম্বন করিয়া কোন এক অভিলষিত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম করিয়া থাকে। বিদ্যা-লয় হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের লেখাপড়ার শেষ হয় না। তাহারা চিরকাল ছাত্র—আজীবন বিদ্যার্থী। কিন্তু আজ কাল ভারতে ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায়। এখানে অধিকাংশ ছাত্রেরই বিদ্যালয়ের পড়া শেষ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রজীবন শেষ হয় এবং কয়েক বৎসর পরেই অনেকে সংসারী হইয়া পড়ে, সমস্ত লব্ধ বিদ্যা অফিসের কেরাণীগিরিতে পর্য্যবসিত হয়। কষ্ট-শ্রমার্জ্জিত বিদ্যা—কেবল অর্থকরী ব্যবসাদারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বহু পরিশ্রমের ফল এই বিদ্যার এরূপভাবে অপ-ব্যবহার হয়। কিন্তু উপায় নাই। ভারতবাসী যতদিন না আবার পূর্ব্বের মত অনায়াসে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে—ততদিন ঐরূপ ঐকান্তিক বিদ্যার্জ্জন ও ছাত্রজীবন এদেশে দেখা যাইবে না। অতীতে, প্রাচ্যে এরূপ গৌরবময় ছাত্রজীবনের অভাব ছিল না। আজকালও যে এদেশে ঐরূপ ছাত্র নাই—তা নয়, তবে, প্রাচ্যের তুলনায় সাগরের জল-বিন্দুবৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজকাল আমরা সামান্য একটু ইংরেজী বুলি ও লেখাপড়া শিখিলেই বড় বিদ্যাভিমানী হইয়া পড়ি। কোনরূপ দৈহিক পরিশ্রম করিলে মনে করি মানহানী হইল। রেলে যাওয়া আসার সময় নিজের ছোট পুঁটুলিটি

লইতে লজ্জা বোধ করি; বাজার হইতে পাঁচ সের চাল আনিতে "লোকে কি বলিবে" ভাবিয়া বিচলিত হই। আরও কত কি!

কিন্তু পাশ্চাত্য ছাত্রে ঠিক ইহার বিপরীত। পূর্ব্বোক্ত কাজ করিতে তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ তো করেই না, বরং ঐরূপ কাজ করিতে পারিলে আনন্দিত হয়। তাহারা মোট বহিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। বাঙ্গালার আদর্শ-ছাত্র, পূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ঐটী চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

পাশ্চাত্য ছাত্রের এই নিরভিমান পরিশ্রম আমাদের শিক্ষণীয়। প্রাচ্যের অতীত যুগে এরূপ ছাত্রের অভাব ছিল না। এইরূপ পরিশ্রম করিতে তাহারা একটুও লজ্জা বোধ করিত না। তাহারা বিদ্যার্থী এবং দেশ-সেবক উভয়ই ছিল। আতুর ও বিপন্ন নরনারী তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকিত। তাহাদের নিকট "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ছিল। দেশের সেবায় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। অতীতের প্রাচ্য ছাত্র-জীবনের এই সুমহান্ আদর্শ লাভ করিয়া পাশ্চাত্য ছাত্র আজ জগৎ-পূজ্য। আমাদের মধ্যেও ঐ উচ্চভাব ধীরে ধীরে আবার প্রবেশ করিতেছে। প্রাচ্য ছাত্র আবার নিরভিমান দেশ-সেবক হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্যই আজ আমাদের এই বিষয়ে শিক্ষাগুরু। আমাদের অতীতের সেই উচ্চ আদর্শ—সেই বিস্মৃত ছাত্রজীবনের গৌরব-গাথা পাশ্চাত্যই মনে পড়াইয়া দিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনে বহু বিভিন্নতা—বহু বিরোধী ভাব দেখা যায়। মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জগতের বিস্ময়ের বিষয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—বহু জ্ঞান গরিমাময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—সম্পূর্ণ বিরোধ-ভাবাপন্ন। বিধাতার সৃষ্টি কি বৈচিত্র্যময়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই গভীর বিভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া' নোবেল'-পুরস্কার-প্রাপ্ত রাডার্ড্ কিপ্‌লিং (Rudyard Kipling) সাহেব বলিয়াছিলেন যে,—

East is East, and West is West,
And the twain can never meet.

প্রাচ্য প্রাচ্যই এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই; দুইটীতে কখন মিল হইতে পারে না। প্রাচ্যের গৌরবোজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথকে 'নোবেল'-পুরস্কার দিয়া পাশ্চাত্য তাহার ঐ উক্তি বিফল করিয়াছে। জগৎ দেখিল যে, অন্য বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মিলন হোক বা না হোক, সাহিত্য-ক্ষেত্রে হইতে পারে। জগৎ দেখিল যে, দুই সম্পূর্ণ বিরোধভাবও সময় আসিলে মিলিতে পারে। জগৎ-সভ্যতার লীলা-স্থল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে গৌরবান্বিত প্রাচ্য পাশ্চাত্য, যে দিন গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত হইবে, সেদিন বসুন্ধরা ধন্য হইবে—বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইবে। জগৎ সে দিন এক বিচিত্ররূপ ধারণ করিবে; মানব-সভ্যতা সেদিন পূর্ণাঙ্গ হইয়া মহাসাগরাভিমুখে ছুটিয়া যাইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার এই দুই বিশাল স্রোতস্বিনী, যেদিন মিলিত হইবে, সেদিনই জগতে এক নব আদর্শের সৃষ্টি হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভ

হইতে জগৎ যে মিলনের দিকে ছুটিয়াছে—তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। সেই দিনই বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানের চরম সাধিত হইবে। সুদূরবর্ত্তী সেই সমুজ্জ্বল গৌরব-দীপ্তিময় মহামিলন কবে জগৎ দেখিবে! *

শ্রীনীহার রায়।

প্রণয়-চিত্র। *

"দুর্গেশ-নন্দিনী"র মুখ্য উদ্দেশ্য কতকগুলি প্রণয় চিত্র-প্রদর্শন। সেই চিত্রাবলীর মধ্যে চারিটী চিত্র সহজেই আমাদিগের নয়নাকর্ষণ করে—(১) আয়েষা, (২) তিলোত্তমা, (৩) বীরেন্দ্র সিংহ এবং (৪) ওসমান। আমরা পর পর এই চিত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

১। আয়েষা—আয়েষায় প্রণয় অনন্ত—অসীম। শত্রু-মিত্র, আত্ম-পর, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী, বিজেতা-বিজিত প্রভৃতি যে সব দ্বৈধ ভাব অসংখ্য সীমা-বেষ্টনের দ্বারা মানব-সংসারকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আয়েষার প্রণয় সে সকলের অতীত। বীরেন্দ্র সিংহ তাহার কে? শত্রু, পর, বিধর্ম্মী, বিজিত। কিন্তু তবুও তাহার প্রণয় বীরেন্দ্র সিংহোন্মুখী।

আয়েষার প্রণয় স্থির ও গম্ভীর। স্বল্প-সলিলা তটিনী স্বভাবতঃই চঞ্চলা ও কল্লোলময়ী বলিয়া কি ঐ অতলস্পর্শ পয়োনিধিও সেইরূপ হইবে? কখনই নহে। তাই আয়েষার প্রণয়-পারাবারে চাঞ্চল্য নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, কোলাহল নাই। তবে মনোবৃত্তিসমূহের স্ব স্ব প্রকাশিকা ভাষা আছে, তাই আয়েষার ঐ অনন্ত প্রণয়েরও ভাষা আছে। সে ভাষা তাহার নীরবাশ্রুধারা ও অনন্তভাবময়ী নিস্তব্ধতা—কেবল মাত্র কতকগুলি সযত্ন-গ্রথিত শব্দগুচ্ছ নহে। যেখানে ভাব অনন্ত, সেখানে ভাষা শব্দময়ী হইতে পারে না, কেননা কথা যতই অবয়ব প্রসারণ করুক না কেন উহা কখনও অনন্ত ভাবের অনন্তত্ব পাইতে পারে না। বস্তুতঃ এক বিন্দু অশ্রুতে যত ভাব আছে, একখানি পুস্তকে তত ভাব পাওয়া যায় না—এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতায় যতটুকু হৃদয়-ভাব প্রকাশিত হয়, এক প্রহর সুদীর্ঘ ভাষণে ততটুকু হয় না। আয়েষা কারাগারে জগৎ-সিংহের সম্মুখে একবার কয়েক বিন্দু নীরবাশ্রু-পাত করিলেন—জগৎসিংহ বুঝিলেন যে, সে ক্ষণিক রোদনে কি ভাব আছে—বুঝিলেন সেটী আয়েষার ঐ অনন্ত প্রণয়-ভাব। তার পর আবার জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার মিলন ঘটাইয়া আয়েষা নীরবে একবার কাঁদিলেন—আমরা বুঝিলাম, সেটী তাহার ঐ অনন্ত প্রণয়ভাব।

আয়েষার প্রণয় ত্যাগোজ্জ্বল—নির্ম্মল। ইহাতে ঘৃণিত, পূতিগন্ধময়, কাম-কলুষ নাই—সেই দেব-দুর্লভ, সৌরভময়, আত্ম-বিসর্জ্জন যাহার পবিত্র হোমাগ্নিতে পূত হইয়া কলঙ্কী

---

* ২৩শে চৈত্র, ১৩২২, গৌহাটী 'ছাত্রসম্মিলনীর' সাপ্তাহিক অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ, বেদান্তরত্ন, এম্. এ. মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

* ইংরেজী ১৯১১ সালে রিপন কলেজ ডিবেটিং ক্লাবে লেখক কর্ত্তৃক "দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্র সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল।

মানুষ দেবতার পদে সমারূঢ় হইতে পারে। আয়েষা স্বপ্রণয়-প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করিয়া জগতৎসিংহকে প্রণয় দান করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি জগৎসিংহের আশা করেন না। কথাটা যথার্থ। কিরূপেই বা করিবেন? জগৎসিংহ যে রাজপুত—তিনি যে যবনী—প্রতিবন্ধকতা যে পর্ব্বত-প্রমাণ, এ সমস্ত তিনি ভালরূপেই জানিতেন এবং জানিয়া শুনিয়াও জগৎসিংহকেই ভাল-বাসিয়াছিলেন। এইখানে আয়েষাকে দোষ বিজন বেষ্টিতা কাসার মধ্যবর্ত্তিনী এক কুমুদিনী বলিয়া বোধ হয়। কুমুদিনীকে সুধাকর অনাদর করিয়া তারকাকেই প্রেম-সুধা ঢালিয়া দেয়। তারকাই তাহার প্রেমিকা—কুমুদিনী নহে। কিন্তু কুমুদিনী এরূপ অনাদৃতা হইয়া নীলচন্দ্রাবাস হইতে বহুদূরে থাকিয়াও সুধাকর পানে চাহিয়া থাকে। সুধাকর ফুল্লরজনীতে তারকাক্রীড়ারত হইয়া হাসিলে সেও হাসে, আবার সুধাকর সুর্য্যের প্রচণ্ড তেজে হততেজ ম্লান হইলে সেও ম্লান হয়। আয়েষাকে জগৎসিংহ প্রণয় দান করেন নাই, তিলোত্তমাকেই প্রণয় দান করিয়াছিলেন। এইরূপে জগৎসিংহের প্রণয়ে বঞ্চিতা হইয়া কত দূরে আছেন কিন্তু তবুও তিনি জগৎ-সিংহের সুখে পরম সুখিনী—জগৎসিংহের দুঃখে পরম দুঃখিনী, তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের বিবাহের পর আয়েষা মনে মনে ভাবিলেন,—"ইহাকে লইয়া তিনি সুখী হইবেন ত।" এই কথা কয়টিতে আয়েষার নিঃস্বার্থ প্রণয় যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। আয়েষা কাহার সুখের জন্য ভাবিতেছেন? জগৎসিংহের সুখের জন্য নয়। আয়েষা জগৎসিংহের সুখের সহিত নিজের সুখকে যে এক করিয়া ফেলিয়াছেন! তাই জগৎসিংহের সুখ ব্যতীত নিজের সুখ ভাবিতেও পারেন না। বস্তুতঃ আয়েষার এ প্রণয় এই স্বার্থদ্বন্দ্ব মত্ত-জীব-সংসারে বিরল-দৃশ্য বা অদৃশ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা অতীন্দ্রিয় (transcendental)—অপার্থিব, এই ইন্দ্রিয়-রাজ্যে, এই পৃথিবীতে এরূপ প্রণয় কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই আমাদিগের সময়ে সময়ে ভ্রম হয়—আয়েষা বুঝি মানবী নয়,—দেবী, বুঝি তিনি আমাদিগের কল্পনাক্ষেত্রে একটী চারুকল্পিতা মানস-প্রতিমা।

কিন্তু বাস্তবিক আয়েষা তাহা নহে। তিনি দেবী হইয়াও দেবী হইতে পারেন নাই—আমাদিগের এই ধরাধাম-বর্ত্তিনী কোনও এক মানবী। তাঁহার এই মানবত্বের বিকাশ এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার জীবনাভিনয়ের শেষ দৃশ্যে। তিনি জগৎ-সিংহের সহিত তিলোত্তমার বিবাহের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সেই ঘন-নীলবসনাবৃত উন্মুক্ত উদার আকাশ-তলে, সেই সুবিস্তৃত ঘনান্ধকারময়ী রজনীতে সেই বিশাল-নীলবক্ষঃ পরিখা সমীপে নির্জ্জন বাতায়নে তিনি একাকী বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক-খানি কৃষ্ণাভ মেঘ তাঁহার হৃদয়-গগনের এক প্রান্তে উদিত হইয়া সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি নারীজনোচিত দুর্ব্বল দৃষ্টিতে

দেখিতে লাগিলেন—দেখিলেন সমস্ত বহির্জগৎ যেমন এক বিপুল অন্ধকার কবলিত সেইরূপ তাঁহার অন্তর্জগৎও এক বিশাল বিষাদকালিমা-গ্রস্ত—দেখিলেন এই নিবিড় তমঃ ভেদ করিয়া ক্ষীণমাত্রও আলোক-সঞ্চারের আশা নাই—ভাবিলেন এই অন্ধকার চিরস্থায়ী হইবে। ক্রমশঃ সেই মেঘ তাহার কৃষ্ণত্বের ঘোরতা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। আয়েষা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য-ধীরতা হারাইয়া ফেলিয়া ভীতিচঞ্চলা হইয়া উঠিলেন—মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না। মুক্তির উপায় তাঁহার নিজেরই অঙ্গুলিতে তাঁহার সেই বহুমূল্য বিষধর হীরকাঙ্গুরী। আয়েষা সেই গরলাঙ্গুরী পানে জীবন পরিত্যাগে উদ্যতা হইলেন। আয়েষার মানবত্ব এইখানে। এইখানেই আয়েষা আত্ম-বিসর্জ্জন-পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতে পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার সেই পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রণয়ে সূচ্যগ্রবিন্দুবৎ একটী স্বার্থ-কালিমার ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই এ কালিমা-বিন্দু বিধৌত হইল। আয়েষা সর্ব্বভূতপ্রভব পরমেশ্বরের প্রিয়শিষ্যা। সুতরাং তাঁহার এই হৃদয়-দৈন্য কতক্ষণ থাকিতে পারে? শীঘ্রই আত্ম-জ্ঞানের দিব্য জ্যোতির দ্বারা হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই বিষাদের কৃষ্ণ মেঘ অচিরাৎ অপসারিত হইল। তিনি সেই বিষাঙ্গুরী পরিখা-জলে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার সেই সহজ-সুদৃঢ় চিত্তে সামান্য নারীজনোচিত দৌর্ব্বল্যের জন্য তিনি নিজেকে নিজেই ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—"এই জন্যই কি জগদীশ্বর আমাকে নারীজন্ম দিয়াছেন!" (ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ বি, এল।

কবি-কুঞ্জ।

ত্যাগী বিশ্বপতি।

একি হেরি বিশ্বরাজ, কেন হেন ভিক্ষুসাজ,
কেন আজি ছিন্ন ঝুলি করে,
রাজবেশ পরিহরি কেন ওহে ত্রিপুরারী,
করিতেছ ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে।
থাকিতে সুবর্ণ দুল, কর্ণেতে ধুস্তুরু ফুল,
মাখিয়াছ ভস্মরাশি গায়,
সর্ব্বদেহী তব প্রজা, তুমি সকলের রাজা,
তবে কেন ভূত পাছে ধায়।
আছে তব স্বর্ণহার, তবে কেন ফণীহার,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে তব দোলে,
অমৃত করিয়া দান, গরল করিছ পান,
এই কিগো ছিল তব ভালে!
থাকিতে সুরম্য স্থান, শ্মশানেতে বাসস্থান,
নির্ম্মাণ করেছ পশুপতি,
অদ্ভুত তোমার লীলা, দয়াময় একি খেলা
করিতেছ বিশ্বে, বিশ্বপতি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী, কবিনিধি।

দৈন্য।

(১)

ঐশ্বর্য্য হইতে নামিয়ে এনেছ
ডাকিয়ে দৈন্যেরে করিতে বরণ,
করিয়াছ দীনহীন পথের কাঙাল
হে দয়াল, হে দীন-শরণ।

(২)

পদে দলি তুচ্ছ বিভব-জঞ্জাল
ছিন্ন করি দিছ আসক্তি-বন্ধন ;
আঁধার হইতে আনিছ আলোকে
অনলে দহিয়া ভোগ-নিকেতন।

(৩)

অনন্ত লালসার ব্যর্থ আকিঞ্চন
ক্ষুদ্র হৃদি সদা ছিল যে যুড়ি,
নিষ্ফল বাসনা গরল সম
শূন্য বক্ষে হায় জ্বলিত পুড়ি !

(৪)

গরব-উন্নত ছিল যে শির
বিশাল ধরাকে দেখিত সরা ;
তুলি দিছ তায় নিজ হাতে ধরি
শত দৈন্য, শত কলঙ্ক-পসরা।

(৫)

ধন-মান-জ্ঞান-গরব-স্ফীত
যে বক্ষে তব ছিল না স্থান ;
দিয়েছে দীনতা, চিনায়ে তোমায়
বহিছে সে মরু-বুকে ভকতি-বাণ।

(৬)

অন্তর ছিঁড়িয়ে শোণিত-ধারায়
বহিছে সদা প্রেম-অশ্রুধার ;
মুছি গেছে ভোগ-আসক্তি-কালিমা
জাগিছে পরাণে বিভূতি তোমার।

(৭)

সর্ব্বস্ব হরিয়ে দেখা'য়েছ হরি !
সুষমা-পূরিত অলকা-মাধুরী ;
নবীন আলোকে মধুর পুলকে
বাজিছে মরমে প্রেমের বাঁশরী।

(৮)

কাচ বিনিময়ে লভিলে কাঞ্চন
কে ডরে দৈন্যেরে আর ?
নশ্বর বৈভবে পদে দলি' প্রভু
দীন হৃদি যুড়ি থাক' অনিবার।

(৯)

ডাকিয়ে আনিনি, ডাকিতে জানিনা
এ হৃদয়-গৃহ দৈন্যের আধার ;
অশ্রুজলে ধু'য়ে ভিক্ষা ক্ষুদ দিব
হে দয়াল, হে সর্ব্বস্ব আমার !

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

মাতৃ-আবাহন।

আয় মা আমার আদরিণী
দাঁড়া হৃদি শতদলে।
তোর তরেই যে রয়েছি বসে
মা তোর অভয় চরণ পাব বলে ॥
হবে না কি এ দীনে দয়া
চাস্ কিগো পাষাণী হতে।
পিতা তোমার পাষাণ বলে
তাই ভয় করি মা নানা মতে ॥
যদি না আসিস্ মাগো আছিস্ তো
চির অন্তরেতে।
তবু করিস্ খেলা কতই রকম
মা তোর কোলের ছেলের মন ভুলাতে ॥
আমি ভুল্‌বো না মা, তোর এ খেলায়
ধর্‌বো চেপে চরণ দুটী।
পূজো আমার নিতেই হবে
নৈলে ছেলে যে তোর কাঁদ্‌বে লুটি ॥

পাগল মায়ের পাগল ছেলে
সবই তখন পাগল হবে।
তোর তরে যে পাগল তারা
(তখন) সে এই মরু হতে বিদায় লবে॥

শ্রীরামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যবিনোদ।

মহত্ব।

যবে প্রাণপণে যুঝি' মোগলের সনে
ভূপতিত হিমু পাণিপথ রণাঙ্গনে
আনীত হইলা বিপক্ষশিবিরে বদ্ধ
হস্তপদ, মোগলের সেনাপতি ক্রুদ্ধ
শার্দ্দুলের প্রায় লেলিহান চাহনিতে
দেখিতে লাগিলা সমুৎসুকে চারিভিতে
আকবরের লাগি'। তৎপর লভি' আর
দরশন ক্রুর হাসি অধরের ধার
কহিলা বইরাম খাঁ "বৎস আকবর!
জীবনে তোমার এই প্রথম সমর!
শৃঙ্খলাবদ্ধ কাফের তব পদতলে
হস্ত কর পূত বিধর্ম্মীর রক্তজলে।"
ধীরে চতুর্দ্দশবর্ষীয় বীর কহে
"বন্দীগাত্রে অস্ত্রাঘাত যুদ্ধরীতি নহে॥"

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

দর্শন।

চরণ তোমার কি দিয়ে পূজিব,
এ জগতে যাহা সকলি তোমারি।
সাগর, ভূধর, অটবী, নিঝর,
বিভব, রতন, সকলি তোমারি॥
নিখিল জগৎ তোমারি প্রতিমা,
তোমারি স্বরূপ অনন্ত নীলিমা,
অনল, অনিল, জল, নভোনীল,
বন্দিছে নিয়ত চরণ তোমারি॥
জনকের স্নেহে রাজিছ, মা, তুমি,
জননী হইয়া সন্তানে চুমি,
শিশুর হাসিতে, দিবসে, নিশীথে,
বিমল সুষমা তোমারি॥
যখনি যেদিকে ফিরাই নয়ন
নিয়ত জননী দাও দরশন,
নিদাঘে, বসন্তে, শরতে, হেমন্তে,
কুসুম মাঝারে মহিমা তোমারি।
যদিও রাজিছ বিশ্ব নিখিলে,
অরুণে, তপনে, গ্রহে, তারাদলে,
তোমারি উপমা, কেমনে দিব মা,
তুমিই কেবল তুলনা তোমারি॥
অবোধ আমরা ভেবে হই সারা
দেখিনা তোমারে কখনো,—
আদর করিয়া, সদয়া হইয়া
ডাকিছ নিয়ত "আয় আয়" করি।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

আশীর্ব্বাদ।

(১)

তুমি খুকী হেসে হেসে
গেছ কোন দূরদেশে
আমরা মরতে আছি কাঁদিতে কেবল
তুমি সবে ভালবাস
সবে কাঁদে কোথা আছ?
কিছুই বুঝিনা খুকী পরাণ বিকল।

(২)

"দাদা ! দে খুকীরে আনি"
বলি কাঁদে খোকা ননী
তাহারা করেনা খেলা তুমি নাহি এ'লে
কাঁদে মা কাঁদিছে দাদা
কেহ নাই দিতে বাধা
তুমি নাহি এলে খুকী প্রবোধি' কি বলে।

(৩)

তুমি যদি পার আসি
মার কোলে পুনঃ বসি'
বিরহ-অনলে কর শান্তি বরিষণ
হাসি' পরিজনে তোষ
খোকাদের ভাঙ্গ রোষ
তাহাদের সাথে হয়ে ক্রীড়ায় মগন।

(৪)

আসিবারে এ ধরায়
মন যদি নাহি চায়
জ্বলি মোরা দুঃখে তুমি আসিও না তবে
হেথা যথা স্নেহগুণে
বেঁধেছিলে জনে জনে
তেমতি স্নেহেতে বাঁধ তথাকার সবে।

(৫)

যাঁর দুঃখ কথা স্মরি
আমরা সবারে ছাড়ি
সু-উদ্দেশ্যে তথা তুমি করেছ গমন
আমি আশীর্ব্বাদ করি
প্রাণপণে চেষ্টা করি
তুমি তাঁর দুঃখ হর দেবীর মতন।

(৬)

বিরহ-কাতর মন
কাঁদে যদি পরিজন
কহিব হয়েছ তুমি স্বরগের দেবী
কাঁদে যদি ননী খোকা
কহিব "তোমরা বোকা
কাঁদ কেন ? খুকী দেবী দরিদ্রেরে সেবি।"

(৭)

আবার আসিবে কবে
সুধাইবে তারা যবে
কহিব "আসিবে খুকী ত্বরায় আবার
তোমরা নিজের প্রাণ
তার মত করি দান
যাইবে মুছাতে দুঃখ যবে অনাথার।"

(৮)

অবসরে যদি পার
আসি খুকী বার বার
জননীরে দিয়ে যে'ও আশ্বাস সান্ত্বনা
কল্পনা হইয়া আসি
আমার হৃদয়ে বসি
হৃদি-বীণা বাজাইয়া গেও গীত নানা।

(৯)

রচি কবিতার হার
দিব সদা উপহার
ঘুচাইতে আত্মীয়ের মনের যাতনা।
কর্ত্তব্য-সাধন-পথে
যদি কোন বাধা ঘটে
দুঃখেতে দুঃখিত হয়ে হেথা আসিও না
মোদের ভুগিতে দাও নরক যাতনা
কর্ত্তব্য করিয়া হেলা হেথা আসিও না
আসিও না দাদা তব করিতেছে মানা।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অত্যন্ত শিশুগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ নাই। শাস্ত্রীয় দাহও নাই। শিশুদের বর্ত্তমান দেহের পরই কোন মায়া জন্মে না, বর্ত্তমান জন্মে তাহারা কোনরূপ পাপপুণ্যও লইয়া যায় না, কাজেই তাহারা অতিবাহিক দেহ বা বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হয় না। ঐ শিশুগণ মৃত্যু হইবামাত্রই একেবারে শস্যাদির সহিত সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহাদের দেহ-গ্রহণের জন্য অন্তরীক্ষে থাকিয়া অপেক্ষা করিতে হয় না। বর্ত্তমান জন্মে পারলৌকিক পুণ্য ও উৎকট পাপ করিয়া যায় না, কাজেই ভোগদেহ লাভ করে না। লিঙ্গদেহে সঙ্কল্পমূলক মানসিক সুখদুঃখ—তাহার নাম স্বর্গ-নরকভোগ—তাহা শিশুদের একেবারে সম্ভবই নহে। ভোগদেহে নরক ও স্বর্গ ভোগ করিতে হয়।

প্রথম অতিবাহিক দেহ। স্মৃতি শাস্ত্রের মতে দশাপিণ্ড দ্বারা এই অতিবাহিক দেহের নাশ ঘটে। তার পর লিঙ্গদেহ। লিঙ্গদেহে যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিতে পায় না, স্বর্গ-নরকভোগ যাহাদিগকে করিতে হয়, তাহারাই ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। যাহারা লিঙ্গদেহের পর ভোগদেহ পাইয়া তার পর স্বীয় কর্ম্মরূপ অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। আবার কাহারা বা ভোগদেহ না পাইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পাপ-পুণ্যবিশিষ্ট জীবগণ ভোগ-দেহ প্রাপ্ত হয় না।

আর শ্রাদ্ধ দ্বারা বায়ুরূপ দেহধারণের সুযোগ ও সুবিধাও দেওয়া হয়। যাঁহারা নিজের ক্ষমতায় আকাঙ্ক্ষিত সকলপ্রকার প্রার্থনীয় বস্তুই লাভ করে, তাঁহারা সন্তান দত্ত অন্নজলাদি আদরপূর্ব্বকই গ্রহণ করেন। নরকস্থ পাপীজনও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হন। রোগী ঔষধ খাইতে না পারিলে আমরা বলপূর্ব্বক তাহার দেহ ছিদ্র করিয়া ঔষধ দিয়া থাকি, তাহাতে রোগীর রোগের উপশমও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। তদ্রূপ যে জীব নিজ সুকৃতিগুণে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় না, আমরা মন্ত্র সাহায্যে, ইচ্ছা-শক্তির বলে ও যোগপ্রক্রিয়া গুণে সে বস্তু দিতেছি—এরূপ একটি সংস্কার দিতে পারিব, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

শ্রাদ্ধ পারলৌকিক আত্মার উপকারার্থ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বিশেষ।

মাতুল।—লিঙ্গশরীর কি খাঁটী বায়বীয় ? আর সে লিঙ্গশরীরে চলাচল হয় কিরূপ ?

বৈদান্তিক।—লিঙ্গশরীর বায়বীয়—এ কারণে গুরুত্ব তার নাই। জল, তেজ ও পার্থিব অংশ অতি সামান্য মাত্রায় আছে কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। মোট কথা স্থূল দেহের তুলনায় লিঙ্গদেহে যে পার্থিব অংশ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। লিঙ্গ-দেহের অপার্থিব আখ্যা। পার্থিব দেহের তুলনায় ইহার গুরুত্ব নাই। তবে পাপ-পুণ্যময়ী বাসনা, স্থূলদেহে অভ্যস্ত সংস্কার—যাহা দেহী লইয়া যায়, তাহা এক প্রকার ভার স্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। এই পাপপুণ্য-বাসনা বা সংস্কার দেহীকে যথেচ্ছ গতির অধিকারী করে

না; প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য দেয় না। তবে গন্তব্য স্থান, যেখানে যাওয়ার বাধা নাই—সে স্থানে পার্থিব দেহ অপেক্ষা বায়বীয় দেহে সত্বর চলাচল হইতে পারে এই মাত্র। দাঁড়াইল, শ্রাদ্ধাদির কার্য্য তিনটি। প্রথম, আকাঙ্ক্ষা পূরণ দ্বারা পারলৌকিক জীবের তৃপ্তি দেওয়া। দ্বিতীয়, অনুরূপ দেহধারণের আনুকূল্য করা। তৃতীয়, অভীষ্ট লোকে গমনের সহায়তা করা।

মাতুল।—মৃত ব্যক্তি শ্রাদ্ধস্থলে আইসেন কি?

বৈদান্তিক।—আসা অসম্ভব নহে। ভক্তির টানে ভগবানই আসেন। যোগ-সাহায্যে, মন্ত্রশক্তির বলে ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সন্তান সম্মুখে ভোজ্য পেয় রাখিয়া মৃত পিতামাতাকে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। অনর্থক কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য আনয়ন করা উচিত নহে। ইচ্ছাশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও তড়িৎশক্তি বলে অন্তরীক্ষস্থ পিতৃগণ বায়ুগতিতে শ্রাদ্ধস্থলে আগমন করেন কিনা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য আমরা দিতে পারিব না। আর যদি তাঁহারা শ্রাদ্ধস্থলে নাই আগমন করেন, তথাপিও শ্রাদ্ধান্ন দ্বারা দূরস্থ মৃত আত্মার সংস্কারমূলক তৃপ্তির কোনই বাধা হয় না।

মাতুল।—মুক্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে কোন উপকার আছে?

বৈদান্তিক।—বেদান্ত মতে নির্ব্বাণমুক্তি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্যক্ বাসনার ক্ষয়, মনের নাশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা অখণ্ড পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে শ্রাদ্ধ ফলদায়ক নহে। তবে কে এইরূপ নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, জানা ত সম্ভব নহে। আর কোটী কোটী ধার্ম্মিক ব্যক্তির মধ্যেই একজন নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী কি না, নিশ্চয় নাই। বংশে এইরূপ একজন মুক্তিলাভ করিলে ঊর্দ্ধতম সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়।

মাতুল।—শ্রাদ্ধ কতকাল পর্য্যন্ত মৃতের উপকারক?

বৈদান্তিক।—মুক্ত ও শিশুগণ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ উপকারক। তবে সপিণ্ডকরণের পরে কেহ কেহ মধ্যেই জন্মিয়া যায়। তথাপি যাঁহারা ভোগদেহে স্বর্গনরক-ভোগ করেন, পিতৃলোকে পিতৃদেবতারূপে বাস করেন অথবা কোন অপরিহার্য্য কারণে জন্মিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য বার্ষিক শ্রাদ্ধও আবশ্যক। কে জন্মিবে, কে না জন্মিবে—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা যায় না বলিয়া বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া যাওয়াই উচিৎ। প্রকৃত শক্তিহীন স্থলে মাত্র তিল, আতপতণ্ডুল ও গামছা প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াও বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া যাওয়াই ভাল। সামর্থ্য স্থলে খরচ না করা অন্যায়।

মাতুল।—শ্রাদ্ধ কয় প্রকার?

বৈদান্তিক।—এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রকৃত অধিকার আমার নাই। এ সকল কথা স্মৃতি শাস্ত্রের। স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয় এইবার উত্তর দিন।

তখন একজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া বলিলেন।

স্মার্ত্ত।—শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কি যুক্তি—তাহার আলোচনা আমাদের নব্যস্মৃতি গ্রন্থে নাই। ইহাতে শ্রাদ্ধ কয় প্রকার, শ্রাদ্ধের অধিকারী কে, শ্রাদ্ধ কোন্ দিন কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধে কি কি দ্রব্য আবশ্যক, শ্রাদ্ধের প্রণালী কি প্রকার শ্রাদ্ধের মন্ত্র কি—এই সকল কথারই সবিস্তার আলোচনা আছে।

মাতুল।—শ্রাদ্ধ কয় প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকার শ্রাদ্ধের অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

স্মার্ত্ত।—প্রধানতঃ, আদ্য শ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, দৈব শ্রাদ্ধ, কাম্যশ্রাদ্ধ, নিত্যশ্রাদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রাদ্ধ আছে, তাহার নাম আর করিলাম না। যথা পৈষ্টিক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে শ্রাদ্ধ নিত্য ও কাম্য। মৎস্য পুরাণে নিত্য, কাম্য ও নৈমিত্তিক এই তিন প্রকার শ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে।

প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নিত্য। অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্যে যে শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তাহাই বৃদ্ধি বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। বিবাহাদি অভ্যুদয়ে অনুষ্ঠিত বলিয়া আভ্যুদয়িক অপর নাম। পর্ব্ব উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহা পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ। প্রত্যেক বর্ষে মৃত্যুতিথিতে একজনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকে বার্ষিক সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বলে। একজনের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা একোদ্দিষ্ট। বার্ষিক শ্রাদ্ধও একোদ্দিষ্ট। দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ দৈব।

(আগামী বারে সমাপ্য)।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

কাঁঠালপাড়া।

আমার দেবতা।

(১)

বেলা দশটা বাজিয়াছে,—শিক্ষক শরৎবাবু স্কুলে যাইবে বলিয়া গৃহের বাহির হইয়াছেন—এমন সময় স্ত্রী শান্তিদেবী আসিয়া বলিল,—"প্রাণটা বড় জ্বালাতন হ'ল। নিস্তি নেই—আমি আর পারব না, তা' স্পষ্টই বল্‌ছি!"

শরৎ বাবু বলিলেন—"কি করবো শান্তি! বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ! আমার এমন সাধ্যি নেই যে, তোমায় এর চেয়ে ভালভাবে রাখি? সামান্য ৩৫৲ টাকা মাহিনায় আর কত হবে?

"আর বলো না! তোমার ওসব কথা শুনলে ত আমার পেট ভরবে না!—আমার বাপের বাড়ী কি ভাত কাপড় নেই?"

"কেন, কোন দিন কি উপোষ ছিলে?"

"পেট ভরে খেলেই হ'ল?—যদি, আর একখান কাপড়, একখানা সোণার গহনা পরতে না পেলুম, তা'হলে জীবনে সুখ কি?"

"দেখতে পাচ্ছ ত শান্তি! জিনিষ-পত্র সব দুর্মূল্য হয়েছে—"

"নেও-থাম—আমি নিশ্চিই বল্‌ছি—'তুমি অভাবে পড়েছ, অভাব নিয়ে থাক! আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও! এত জ্বালাও প্রাণে সয়?"

"তুমি গেলে বুড়ো মাযের কি হবে? আমিও সারাদিন বাড়ী থাকিনে! কে তাঁকে সময় মত ভাত-জল দিবে?"

"আমি দিব? আমার দেখছি তোমরা দাসী পেয়েছ? আচ্ছা কালই আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো; ধ'রে রেখো দেখি!"—বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে শান্তি তথা হইতে চলিয়া গেল! শরত বাবু মনে মনে বলিলেন—"ধনি-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি!"

(২)

শরতের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। শরতের স্ত্রী ধনীর নন্দিনী! সে স্বামীগৃহে আসিয়া সুখী হইতে পারে নাই! সে আত্ম-সুখান্বেষিনী—আপনার দেহ পরিপাট্যে ও বেশ-বিন্যাসে সদাই ব্যতিব্যস্ত। সে দীন-স্বামী-গৃহে সুখী হইতে পারিবে কেন? স্বামীর জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের মধ্যে শান্তির প্রাণটা যে খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। কোথায় সে ইন্দ্রপুরী-বিনিন্দিত অট্টালিকা—আর কোথায় এই ধূলিবালিপূর্ণ জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, কঞ্চির বেড়া দেওয়া—তাতে না আছে সৌন্দর্য্য না আছে আলো! পিতৃগৃহের সেই [illegible] অট্টালিকা, পিতামাতার আদর স্নেহ! সেই সব কথা শান্তির মনে আসিয়া [illegible] করিয়া [illegible]ইতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে মনে মনে স্থির করিল, একবার বাপের বাড়ী যাইতে পারিলে আর এ বনদেশে, জীর্ণ ঘরে আসিবে না! ছিঃ এতেও কি ভদ্রলোকের বৌ-ঝি বাস করিতে পারে?

পরদিন শান্তি পিত্রালযে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। শান্তির বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন,—"বৌমা! তুমি বাপের বাড়ী গেলে এদিকে কে দেখবে? আমিও ব্যারামে পড়েছি!"

শান্তি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"আর কারো বুঝি চোখ নেই!"—শান্তি মুখ ভার করিয়া পাল্কীতে গিয়া বসিল। অদূরে শরৎ বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, শান্তি তাহাকে একটী কথাও কহিল না। শরতের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। স্বামীর চোখে জল দেখিয়া শান্তির বড় আনন্দ হইল। সে মনে মনে বলিল—"বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌তে সাধ হয়েছিল, এখন ফলভোগ কর!" বেহারাগণ পাল্কী উঠাইল।

শরৎ বলিল—"শান্তি! চলিলে?"

"থাব নাত কি? কি স্বর্গসুখেই রেখেছ!"

স্ত্রী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। শরৎ অশ্রু-জল মুছিয়া মাতার ঘরে ঢুকিল। মাতা বলি-লেন—"বাবা! বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কেন?"

শরত বলিল—"মা! আমি পাঠিয়ে দেই নাই; সে আপনি চলে গেল!"

(৩)

শান্তি পিত্রালয়ে আসিয়া নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা তিন গুণে রঞ্জিত করিয়া বাপের নিকট বর্ণনা করিল। শান্তির বাপও সব কথা

শুনিয়া বলিলেন—"অভাগী, তোর কপালে সুখ নেই! এমন শান্ত-নিরীহ জামাই, তারে তুই গরীব বলে অগ্রাহ্য করে বাপের বাড়ী চলে এলি! বলি তোর বাপের বাড়ীর ভাত ক'দিনের জন্য? দিনান্তে একবেলা খাস্ না খাস্ স্বামীর ঘরে থাকবি—স্বামীর সংসার করবি! তা' না বাপের বাড়ী চলে এলি? স্বামী যে কি ধন চিন্‌লি নে? স্বামী বৃদ্ধ, আতুর, মাতাল, গরীব, যাই হোক, মেয়ে মানুষের তিনিই দেবতা! যা, এখনও সময় আছে—জামায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চা'গে!—দেখ, ও-বাড়ীর বিজয়ের স্ত্রী দিনান্তে একবেলা খেতে পায় না, তবু সে বিজয়কে কত ভালবাসে—ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। বৌটি যেন লক্ষ্মী, স্বামীই তার সব!—স্বামীর কষ্ট হবে বলে সে বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত যায় না! তুই এমন অভাগী? যা, এখনি ফিরে যা'!"

মায়ের উপদেশে শান্তি কাঁদিয়া স্নেহময় পিতার নিকট গেল! পিতা বলিলেন—"কাঁদিস্ নে মা! তোমায় আর সে কাঙালের ঘরে পাঠাব না।"

অশ্রুমুখী শান্তির অশ্রুজল থামিল।

বৈকালে শান্তি বিজয়দের বাড়ীতে বেড়াইতে গেল! বিজয়ের স্ত্রী সরলা বলিল—"ঠাকুর ঝি! এ তোমার বড় অন্যায়! স্বামী দেবতা, তাঁকে তুমি আদর যত্ন না করে অবহেলা করে ফেলে এসেছ? ছিঃ।"

"আস্‌ব না—সেখানে উপোস থাকব নাকি?—আর সে ঘরে কি মানুষ থাকতে পারে? খড়ের ছাউনী—কঞ্চির বেড়া দেওয়া—এলো মেলো!"

"তোমার দাদার এ ঘরটী বড় সুন্দর নাকি? আমি এতে থাকি কেমন করে—আর তুমি উপবাস থাক? এ কথা বল্‌ছো কেন? তোমার স্বামী ৩৫৲ টাকা বেতন পান, তোমায় দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেন না কি?"

শান্তি নীরব।

ঠাকুর ঝি। স্বামীর ভালবাসার চেয়ে সতী স্ত্রীর সংসারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আর কি আছে? স্বামী দেবতা, তিনি যে ভাবে রাখবেন সতী স্ত্রী সেইভাবে থাকবে। স্বামীর সুখ-দুঃখে চির-সঙ্গিনী হবে!"

"যে ভাবে রাখবে সেই ভাবে থাকব? কেন—কিসের জন্য?

"তিনি তোমার স্বামী, তুমি তাঁর দাসী!"

"দাসী! কিসের দাসী?—বাবা টাকা দিয়ে একটা গোলাম কিনে দিয়েছেন,—আমি তার দাসী?"

ঠাকুর ঝি। "আমি তোমায় আর বেশী কি বল্‌বো? জেনে রেখো ভাই, স্বামীকে ঘৃণা করা অধোগতি।—তুমি স্বামীর দাসী কিনা, স্বামী তোমার দেবতা কিনা, একদিন তা বুঝ্‌তে পার্‌বে? এমন সময় আস্‌বে, যখন কেবল অনুশোচনা দ্বারা হৃদয়ের কলঙ্ক ধৌত বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না!"

"আচ্ছা বৌ! তোমায় একটা কথা বলি?"

"কি? বল!"

"এই অনন্ত সুখময় জগতে সুখ-পিপাসু মানব সুখ না চাহিবে কেন?"

"কেন—তুমি কিসে অসুখী?"

"কিসে নয়? ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে বাস, পরণে মোটা কাপড়, পেটে মোটা ভাত! এ-ও আবার সুখ?

ঠাকুর ঝি। মেয়েলোকের স্বামী-ভক্তি, স্বামী-সেবাই যে অনন্ত সুখ! যে স্ত্রীলোক দিনান্তে শাকান্ন খেয়ে স্বামী-পদ-পূজা করতে পারে; তার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে ঠাকুর ঝি?

"বৌ! তুমি দেখ্‌ছি ভারি পতিব্রতা! আমি তো এ রকম পারব না। আজীবন সুখে ছিলুম—সুখই চাই—দুঃখকে বরণ করতে পারব না। তবে আজ যাই, এ বিষয়ে আর একদিন বলব!"—শান্তি চলিয়া গেল!

(৪)

ধনি-নন্দিনী শান্তি এখন একজন বিবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাইবার সময় তাহার ঘরে ভাত দিয়া আসিতে হয়, আঁচাইবার জল দিতে হয়, বিছানা পাতিয়া দিতে হয়!—এক কথায়,—সে পিত্রালয়ের সুখ-অমরাবতীর আনন্দময় নন্দন-কাননের অতুল সুখ অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সুখের দিন শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়! শান্তিরও সে সুখের দিন শীঘ্রই অবসান হইল! একদিন শান্তির পিতা স্নেহের কন্যা, ধন-সম্পদ সকলই ত্যজিয়া, সমস্ত বাটী-খানি বিরাট হাহাকারে ভাসাইয়া কোথায় এক অজানা দেশে চলিয়া গেলেন। শান্তি চারিদিকে অন্ধকার দেখিল!

শান্তির নিদারুণ-যন্ত্রণায় হৃদয় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। সে আজ সংসারে বড় একা! এত বড় সংসারে তাহাকে আদর-স্নেহ করিবার কেহই নাই! জননী শান্তিকে দেখ্‌তে পারে না, ভ্রাতারা শান্তিকে তেমন আদর-স্নেহ করে না, আর ভ্রাতৃ-বধূরা? শান্তি ত তাদের চোখের বালি। শান্তিই সকলের অশান্তি! মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-জায়াদের স্নেহহীন আচরণে শান্তি বড় মর্ম্মাহতা!—আজ সে সকলের কাছে উপেক্ষিতা—লাঞ্ছিতা! এ সময় তাকে আদর-স্নেহ করিবার কেহই নাই। শান্তি ভাবিল—'একজন ছিল তাঁকে আদর-স্নেহ করিবার! কিন্তু সে তাঁহাকে উপেক্ষা করে—তাঁহার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা দূরে ঠেলিয়া, আত্ম-অহঙ্কারে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছে! মনে পড়ে তাঁহার সেই বিষাদমণ্ডিত মুখখানি—সেই স্নেহপূরিত করুণ দৃষ্টি, সেই ম্লান আঁখির প্রতপ্ত অশ্রু! হায়, হায় সেই আরাধ্য দেবতাকে সে নির্ম্মম অবজ্ঞাভরে দূরে—অতি দূরে ঠেলিয়া আসিয়াছে!

শান্তির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। যে মোহে সে এতদিন আচ্ছন্ন থাকিয়া হিন্দু-স্ত্রীর কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছিল—আজ তাহার সে মোহ ঘুচিল। স্বামী যে কি ধন সে এখন বেশ চিনিতে পারিল। সে বেশ বুঝিল—স্বামী বাস্তবিক স্ত্রীলোকের দেবতা, কায়মনোবাক্যে স্বামীর পদ-সেবা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম! স্বামী ভাল হউন, মন্দ হউন, তিনিই স্ত্রীর পরমগুরু; স্বামী-গৃহে দুঃখে থাকিলেও স্ত্রীলোকের সেই স্বর্গসুখ।

"ওকি ঠাকুর ঝি! কাঁদ্‌ছ যে? কেন, কি হয়েছে?" অশ্রু-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শান্তি কহিল,—"বৌ! কেন আমি স্বামী-গৃহ ছেড়ে এলেম!

এখানে আর যে থাকতে পারিনে ?”

“তা’ত আমি আগেই বলেছিলেম, বাপের ঘরে হাজার সুখ হলেও সে সুখই নয় ? পরের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। দেখ, রামচন্দ্র বনে গেলেন, সীতাদেবী রাজভোগ ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বন-বাসিনী হলেন। আর সেদিন নল-দময়ন্তীর কথা ত শুনেছ ! একখানা কাপড় তাই স্বামী-স্ত্রী দু’জনে ভাগ করে পরেছিলেন।”

“বৌ ! এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—তিনি আমার দেবতা,—আমি তাঁর দাসী।

“ঠাকুর ঝি ! তুমি যে তোমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছ এতে আমি বড়ই সুখী হলেম। তোমার স্বামীকে আস্‌তে চিঠি লিখে দেই—কেমন ?”

“না বৌ ! চিঠি লিখে দরকার নাই—আমি নিজেই গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্‌ব। তিনি দেবতা—অবশ্যই দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন !”

“সেই ভাল ঠাকুর ঝি ! তাই যাও।”

(৫)

এদিকে শান্তিহারা শরৎ বাবু দিন দিন অশান্তির তীব্র হুতাশনে বিদগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার দেহের সে লাবণ্য-প্রভা মলিন হইয়া গিয়াছে, সে সুপুষ্ট দেহখানি শুষ্ক কৃশ হইয়া গিয়াছে।—নিদারুণ নিদাঘ তপনতাপে সুন্দর তরুটি কুঞ্চিত ও মলিন হইয়া গিয়াছে। কার্য্যে-কর্ম্মে আহারে-বিহারে সকল বিষয়েই শরৎ এখন উদাসীন !

একদা বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে শরতের মনে কত কথাই উদয় হইতেছিল।—এই ত সংসার। সংসারে স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু কে কাহার ? কেবল নিশার স্বপন।—শান্তি। তাহার কে ? সে শান্তিকে কত ভালবাসিত, কত আদর স্নেহ করিত, তবুও শান্তি তাহার হইল না। সংসারে কে কাহার ?

এমন সময় ধীর পদবিক্ষেপে এক অবগুণ্ঠনবতী আসিয়া শরৎ বাবুকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ! শরৎ বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া বলিল,—“একি ! শান্তি যে ? ভাল আছ ত শান্তি ?”

আহা ! কণ্ঠস্বর কি স্নেহ-সজল ! শান্তি দেখিল—স্বামীর চক্ষুদুটী গভীর স্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া আছে ; বুঝি তার প্রতি স্বামীর বিন্দুমাত্র রাগ নাই। শান্তির চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া অনুতাপ-অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল। শান্তি ভাবিল,—“দেবতা আর কোথায় থাকে—কোন্ স্বর্গে ? এ যে তার সাক্ষাৎ ইষ্ট দেবতা।” শান্তির হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে স্বামীর পদযুগল ধরিয়া বলিল,—“দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি জ্ঞানহীনা !” শান্তির অশ্রুজলে শরতের পদ-যুগল সিক্ত হইতেছিল। শরৎ বলিল,—“শান্তি ! আমি এখনও তোমার সেই দরিদ্র স্বামীই আছি ! আমার সে শক্তি নাই যে, তোমায় সোণা-দানা, দিয়ে বিবি করে রাখি !

শান্তি বলিল—আর আমার সোণাদানা, টাকা-কড়ি, ভোগবিলাসের সাধ নাই ! আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি আপনিই আমার সুখ ! আপনিই আমার সর্ব্বস্ব ! আপনিই “আমার দেবতা”।

শরৎ পদবিলুণ্ঠিতা শান্তিকে তাঁহার কম্পিত বক্ষের কাছে টানিয়া লইল !

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন [illegible]

স্বর্গীয় মহারাজা রণজিৎ সিংহ।

জগতে কত লোক আসে—কিছুকাল থাকে এবং তাহার পরে কোথা চলিয়া যায়, কে তাহার সংখ্যা করে? কিন্তু যাহার আসায় আনন্দ, অবস্থানে আনুরক্তি এবং প্রয়াণে মানব-হৃদয়ে একটা বিষাদের ছায়াপাত হয়, লোকে হায় হায় করে, এ জগতে তাহার জন্মই সার্থক।

নশীপুরের স্বনামধন্য বদান্যবর মহারাজা রণজিৎসিংহ হঠাৎ এ ধরাধাম হইতে মহা প্রস্থান করিয়াছেন, যাইবার কোন লক্ষণ পূর্ব্বে সূচিত হয় নাই, মহারাজ কোন পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই—তাঁহার অসুস্থসংবাদ ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিত না, মহারাজ লাট-ভবন হইতে আসিলেন; কর্ম্মবীর জগতের শেষ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া রজনীতে সামান্য অসুস্থতা বোধ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, প্রাতঃকালে আর উঠিলেন না, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব পত্নীপুত্র কাহারও সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইল না, কাহাকেও কোন কথাও বলিলেন না, নিজেই নিজের ভাবে বিভোর হইয়া যথার্থই মহাপুরুষের ন্যায় মায়ার আবরণ ছিন্ন করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা সেদিন ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে পোস্তা রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা-সভায় তাঁহার সহিত শেষ সম্মিলিত হইয়াছিলাম; তার পর আট দশ দিন পরে শুনিলাম—মহারাজ আর নাই। এখনও [illegible] পড়ে, তাঁহার সেই [illegible] হাসি মুখ, সেই অমায়িকতা জড়িত সাদর সম্ভাষণ। অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াও মহারাজ কিছুমাত্র অহঙ্কারী ছিলেন না; সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেন, সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন,—ইহা মহারাজা রণজিৎ সিংহের অমায়িক চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। সে দিন পোস্তা রাজকুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি যেরূপ দীনভাবে মিলিত হইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন—সেরূপ দীনতা, নিরহঙ্কারীতা আমরা আর কোন মহারাজের চরিত্রে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ এ দরিদ্র সাহিত্যিকের মহা সহায় ছিলেন; কোন বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া কখন বিফল-মনোরথ হইতে হয় নাই, মৎপ্রণীত যাবতীয় পুস্তক পাঠে প্রচুর আনন্দলাভ করিয়া কত সাহায্য করিয়াছেন, তিনি অযাচিতভাবে বহু প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। হায়! এমন দরিদ্র সাহিত্যসেবীর চিরবন্ধু এ জগতে আর মিলিবে না, তাই তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমরা যেন একটা বিশেষ সুহৃদ হারাইলাম বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজের চরিত্রের অনুরূপ করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতে ভালবাসিতেন; কুমার হরিপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন—আপনার স্বভাব অতি অমায়িক, আপনি আপনার মহৎ বংশের মান রাখিতে পারিবেন, তার পর তিনি পোস্তা রাজবংশের মহারাজ সুখময় হইতে আরম্ভ করিয়া কত কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করেন—যাহা সাধারণ লোকে জানিত না; আপনাকে হীন করিয়া পরকে বড় করিতে কেবল মহারাজা নশীপুরই জানিতেন, এই মহত্ত্বগুণে আজ তাঁহার

জন্য শুধু আমরা কেন যাঁহারা তাঁহার সহিত ক্ষণেকমাত্র আলাপ করিয়াছেন—তাঁহারাই শোকে মুহ্যমান, হায় হায় করিয়া বলিতেছে—যাহা গেল, ঠিক তেমনটী আর হইবে না।

মহারাজের পারিবারিক জীবনও বেশ সুখকর ছিল। সাধ্বী পত্নী মহারাণী কমলকুমারী ও পিতৃপথানুবর্ত্তী চারিটী পুত্রের গুণে তিনি সংসারে অতুল সুখে সুখী হইয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া এতাবৎ কাল স্বর্গীয় গুণময় পিতার সাংসারিক সকল বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা পিতৃকীর্ত্তি যে সম্যক্‌রূপে বজায় থাকিবে, আমরা সে ভরসা খুব করিতে পারি। মৃত্যুকালে মহারাজের বয়স হইয়াছিল ৫৩ বৎসর, তিনি রাজা উদমন্ত সিংহ বাহাদুরের বংশধর যাহার নামের রাস্তা এখন কলিকাতায় রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের সময় রাজা দেবী সিংহ লর্ড ক্লাইবকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন; উহারই ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা উদ্‌মন্ত সিংহ—ইনি সাতিশয় ধার্ম্মিক এবং বদান্য ছিলেন। ইহার ভ্রাতা রাজা কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহের পুত্র আমাদের রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, ইনি ১৯১০ সালে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং পর বৎসর এই রাজবংশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমে "রাজা বাহাদুর" উপাধি-সম্মানে সম্মানিত হন,—এ বিষয় আমরা যথাসময়ে "আলোচনায়" প্রকাশ করিয়াছি। মহারাজা রণজিৎসিংহ বঙ্গদেশের আদর্শ জমীদার ছিলেন; তাহার গুণের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

যাও, কীর্ত্তিমান্! কীর্ত্তিরথে চড়িয়া অমরার অমরত্ব ভোগ কর, আমরা তোমার পবিত্র স্মৃতিটুকু বুকে করিয়া চির শান্তি অনুভব করি।

সম্পাদক।

দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আত্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তি রহিয়াছে, আমার বুদ্ধি বৃত্তি, জ্ঞান, চৈতন্য, জীবন আছে ও আর আছে আমার দেহ। আবার, হাত পা, মুখ, চোক, নাক, কাণ, মাথা বুক, পেট প্রভৃতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম আছে। এক একটী স্থানের এক একটী নাম হইলেও সেই স্থানের ভিতর অন্য অন্য নামেরও পদার্থ রহিয়াছে। যেমন দেহের যে স্থানকে হাত বলা যায়—তাহার ভিতর চর্ম্ম, লোমকূপ, পেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি ভিন্ন নামের অনেক উপকরণ আছে, হাত বলিলে, এই সকলের সমষ্টিকে বুঝায়—মোটের উপর আমাতে দুই প্রকারের জিনিষ পাওয়া যাইতেছে, এক প্রকার যাহা না থাকিলে এই দেহের অস্তিত্ব থাকে না, তাহাকে জীবন, চৈতন্য, জ্ঞান যাহা কিছু বলুন, অপরটি এই চৌদ্দ পোয়া দেহ, এই দেহের উপাদি

উক্ত চৈতন্য বা জীবনের দ্বারা চালিত হইতেছে।

এই ভাবে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমাদের প্রথমে বুঝিতে হইবে—সৃষ্টির ভিতর সমুদয় এক ধরণের হওয়াই শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া আমাদের ন্যায় ব্রহ্মেরও দুই অংশ থাকিতে হইবে। এক অংশ ব্রহ্মের দেহ, অপর অংশ ব্রহ্মের জীবন, চৈতন্য বা শক্তি। শাস্ত্র সকলও ইহার বিপরীত বলেন না। আমাদের দেহ আমরা দেখিতেছি চৌদ্দ পোয়া, ব্রহ্মের দেহ কিন্তু বিরাট, অর্থাৎ অতি বৃহৎ, তাঁহার দেহ অপেক্ষা বড় দেহ কাহারও নাই এবং থাকিতে পারে না, যে দেহের আদি নাই, অর্থাৎ এই স্থান হইতে ব্রহ্মের দেহ আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ কেহ বলিতে পারে না, কাহারও দেখিবার ক্ষমতা আছে ধরিয়া লইলেও সেই ব্রহ্ম দেহের আদি কেহ পাইবেন না, সে দেহের অন্ত বা শেষ নাই,কাজেই বুঝা যাইতেছে, সেই দেহ নাই—এমন কোন স্থান নাই, সুতরাং সেই দেহ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বুঝিতে হইতেছে। বায়ু যেমন সর্ব্বব্যাপী—তেমনি সেই দেহ, বাটী, পর্ব্বত, বন, সাগর, মহাসাগর, শূন্য, অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রশোভিত আকাশ-মণ্ডল সর্ব্বত্রই তাঁহার দেহ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অথচ ইহার বিশেষ একটী আকার নাই ও সূক্ষ্মতা হেতু এই দেহ দেখা যায় না।

যদি বলেন যে, ব্রহ্মের দেহ সর্ব্বত্র ব্যাপিত একথা কেন স্বীকার করিব; তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্ম যে অনন্ত, অনাদি, infinite একথা যখন সকল শাস্ত্রেই বলিতেছে, তখন ঐ সম্বন্ধে বিচার চলে না, কেবল infinite, অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক বিশেষণ গুলির অর্থ ভাবিলেই এইরূপ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যিনি সকলের উপর, যাঁহার উপর কেহ নাই, তাহার কখনও ক্ষয় থাকিতে পারে না, কাজেই তাহাকে অক্ষয় বলা হইয়াছে, তাহার দেহ যদ্যপি কোন স্থানে না থাকে—তবে তাহাকে অনন্ত বলা যায় কি প্রকারে, সেইখানেই ত তাহার দেহের অন্ত অর্থাৎ শেষ সীমা বুঝা যাইবে, তাহা হইলে তিনি অসীম হইলেন না ?

আমরা গণিত জ্যোতিষ (astronomy), শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যে স্থানকে আমরা গ্রহ-নক্ষত্রযুক্ত আকাশ বলিয়া দেখিয়া থাকি, সেই স্থান অসীম, সেই স্থানের ভিতর আমাদের সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহৎ বৃহৎ সূর্য্য আছেন ও কত (solar system) ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যতই অধিকদূরদর্শী দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হইতেছে, ততই নূতন নূতন গ্রহ সূর্য্য, দূরবর্ত্তী নক্ষত্র প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহা হইতে এই আকাশকেই বৈজ্ঞানিকগণ এমন একস্থান বলিতেছেন—যাহার সীমা নির্ণয় করা যায় না। এবং এই স্থানের কোথায় আদি, কোথায় শেষ—তাহা জানিবার উপায় নাই বলিতেছেন। তাহারাই আবার বলিতেছেন, এই স্থান মধ্যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত অনেক ব্রহ্মাণ্ড ও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি গণনাতীত সংখ্যায় রহিয়াছে।

এই সকল বৈজ্ঞানিকদের কথার সহিত

আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের উক্তি সকল একত্র করিলে আমরা বেশ নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডিত যে অসীম আকাশ আমরা দেখিয়া থাকি, উহা সেই শাস্ত্রকথিত কারণ-সমুদ্র। কারণ উক্ত শাস্ত্র সকলে কথিত আছে যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডেরই চতুর্দ্দিকে অসংখ্য এরূপ ব্রহ্মাণ্ড,জলমধ্যে মাছের ঝাঁকের মত ভাসিতেছে, বরং বালুকণা, যাহা সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে, তাহা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে তবুও এই সকল কারণ-সমুদ্রে ভাসমান্ ব্রহ্মাণ্ডের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না। কাজেই যে আকাশকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক Infinite space বলিয়াছেন, তাহাকেই আমরা শাস্ত্রোক্ত কারণ-সমুদ্র বলিতেছি, ইহাতে কাহারও ভিন্ন মতের কারণ থাকিতে পারে না।

তবে কারণ-সমুদ্রকেও আমরা অনন্ত বলিয়া জানিলাম, ব্রহ্মকেও অনন্ত বলিতেছি, দুইটী অনন্ত অসীম পদার্থ থাকিতে পারে না, তাহা হইলে দুইটী সীমাযুক্ত, সান্ত, অর্থাৎ যাহার অন্ত অর্থাৎ শেষ আছে—এইরূপ হইয়া পড়ে। কাজেই কারণ-সমুদ্রই ব্রহ্মের দেহ বলিয়া আমাদের ধারণা করিতে হইতেছে। দুইটী এক না হইলে দুইটীই অনন্ত অসীম হইতে পারে না। ইংরাজি বিজ্ঞান-শাস্ত্রই এই Infinite space, অর্থাৎ যে স্থানে সূর্য্য নক্ষত্রাদি বিরাজ করিতেছে, সেই আকাশকে কোইলন্ নামক এক পদার্থে পূর্ণ বলিতেছেন। ইংরাজিতে যাহাকে বস্তু অর্থাৎ matter বলে, তাহা কোন মূল পদার্থের বিকৃতি বা পরিবর্ত্তিত অবস্থা মাত্র বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের মত, Koilon সেই অবিকৃত অবস্থা, অর্থাৎ ম্যাটারের মূল উৎপত্তির কারণ, Koilonকে ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ম্যাটার হয়। ম্যাটার মূল পদার্থের বিকৃতি, কোইলন অবিকৃত আদি।

শাস্ত্রমতে কারণ-সমুদ্র মহৎ নামক অবিকৃত প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ। এই মহৎকে কোন কোন স্থানে প্রধানও নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিকদের ম্যাটারকে আমরা প্রকৃতির বিকৃতি বলি, ইহাই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতঘটিত ম্যাটার বা বস্তু। আর কোইলন সেই অবিকৃত প্রকৃতি, যা মহৎ অথবা প্রধান। আবার প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিয়া তবে ব্রহ্ম। ব্রহ্মে প্রকৃতি-পুরুষের মিশ্রিত সাম্যাবস্থা, কাজেই এই অবিকৃত প্রকৃতি পূর্ণ অনন্ত, অসীম কারণ-সমুদ্রই ব্রহ্মের দেহ ইহা বুঝা যাইতেছে।

আমাদের দেহ যেমন জীবন, চৈতন্য, সংজ্ঞা নামক এক প্রকার শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্মের এই বিরাট অনন্ত দেহরূপ কারণ-সমুদ্র যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়, যে শক্তি এই দেহের জীবন, সেই বিরাট চৈতন্য, সেই Spirit of Infinite Lifeকে শাস্ত্রে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই তন্ত্রে শিবতত্ত্ব, এবং ঐ বিরাট দেহকেই শক্তি-তত্ত্ব বলা হইয়াছে। দেহের সহিত আমাদের চৈতন্যের বা জীবনের যেমন পৃথক করিবার উপায় নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের দেহ ও ব্রহ্মচৈতন্য ও পৃথক করিবার নহে, কেবল আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য কল্পনা করা হইল মাত্র। আমাদের জীবন বা চৈতন্য যেমন আমাদের পদ প্রান্ত

হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য ব্রহ্মদেহের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অন্ধ মানবে যেমন দৃষ্টিহীনতাবশতঃ পড়িয়া যাইবার ভয়ে চলিতে পারে না, চলিতে সাহস করে না, খঞ্জের চলচ্ছক্তি না থাকা বশতঃ দৃষ্টিশক্তিবশতঃ চলিলে বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও শক্তির অভাবে চলিতে পারে না, কিন্তু যদ্যপি খঞ্জকে অন্ধের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যায়, তবে উহারা বেশ যাইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতি অবস্থায় জড়ত্ববশতঃ তাহাতে কোন ক্রিয়ার শক্তি থাকে না, আর পুরুষ অবস্থায় দেহ ব্যতীত ক্রিয়ার কোন ক্ষমতা চৈতন্যেরও থাকে না। কাজেই সাধকগণ পুরুষ-প্রকৃতি-মিলিত ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, একটী ছাড়া অপরটীর কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে হয় না।

মহানির্ব্বাণে ব্রহ্মসাধন ও আদ্যা কালিকা সাধন একই ব্রহ্মের সাধন বলিয়া তন্ত্রকার উক্তরূপ যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই matter এবং force এই দুইটী শক্তির বিদ্যমান্ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ম্যাটার বা বড় বস্তু দেখিতে পাই,সেইখানেই force রহিয়াছে, force আছে বলিয়া বস্তুটীর পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল একত্র হইয়া একটী বিশেষ রূপ ধরিয়া রহিয়াছে। এই দুইটীকে অন্ন ও প্রাণ বলিয়া উপনিষদে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্ন অর্থে matter, আর প্রাণ অর্থে force এই দুইটী শক্তি পৃথক অবস্থায় দেখা যায় না।

আমরা জিওগ্রাফি অর্থাৎ ভূগোলশাস্ত্র আজকাল সকলেই পড়িয়াছি। ইহা হইতে বুঝিয়াছি—আমাদের পৃথিবীর আকার গোল, পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে, জলের বৃহৎ ভাগের নাম মহাসাগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের নাম সমুদ্র, হ্রদ, নদী, তড়াগ ইত্যাদি। স্থলের সেইরূপ বৃহৎ ভাগের নাম মহাদেশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের নাম দেশ, প্রেসিডেন্সি, ডিভিজন, জেলা, থানা, গ্রাম ইত্যাদি। কয়েকটী গ্রাম লইয়া একটী থানা, কয়েকটী থানা লইয়া একটী জেলা, কতকগুলি জেলায় এক ডিভিজন, কয়েক ডিভিজনে এক প্রেসিডেন্সি, অনেক প্রেসিডেন্সি লইয়া এক দেশ হয়।

কারণ-সমুদ্ররূপ এই ব্রহ্ম দেহের ভিতরও আমরা ঐরূপ নানা প্রকার বিভাগ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, যে স্থান ব্রহ্মাণ্ডাদিতে পূর্ণ, ও যে স্থান খালি অর্থাৎ কোন ব্রহ্মাণ্ড আদি যে স্থানে নাই, আমাদের পৃথিবীর জল ও স্থল নামক বৃহৎ বিভাগের অনুরূপ এই বিভাগ। পৃথিবীতে যেমন এক এক গ্রাম্য বিভাগ সেইরূপ কারণ-সমুদ্রে এক এক ব্রহ্মাণ্ড, সাতটি ব্রহ্মাণ্ড একত্র করিয়া একটী বিভাগ আছে, তাহার নাম জগৎ ; এই জগৎ বলিলে সাতটী ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। আমরা চলিত ভাষায় আমাদের পৃথিবীকে জগৎ বলিয়া থাকি, এ সে জগৎ নহে! এই জগৎকে আমরা ভারতবর্ষের গ্রাম সমষ্টি লইয়া থানা-বিভাগের মত বলিতে পারি। এক সহস্র জগৎ লইয়া একটী বিভাগ হয়। এই বিভাগের নাম বিশ্ব। ভারতবর্ষে কয়েকটী থানা লইয়া জেলা হয়, ইহা তদনুরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে

পারে। এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ বিশ্ব একত্র করিয়া একটী মহাবিশ্ব নামক বিভাগ হয়। এই বিভাগকে আমাদের দেশের জেলার সমষ্টি লইয়া ডিভিজন নামক বিভাগের সহিত তুলনা করা যায়। আমাদের চলিত ভাষায় বিশ্ব শব্দে আমরা পৃথিবীকেই বুঝিয়া থাকি, বিশ্বের প্রকৃত অর্থ এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি হইতেছে। দুই শঙ্খ মহাবিশ্ব লইয়া এক লোক হয়। ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি স্থলে লোকের যেরূপ অর্থ, এই বিভাগীয় লোকের সে অর্থ নহে। এক মহাশঙ্খ লোক একত্র করিয়া একটী মহালোক নামক বিভাগ হয়। আমাদের দেশের কয়েকটী ডিভিজন লইয়া এক প্রেসিডেন্সি বিভাগের সামিল বলা যাইতে পারে। এক শত পদ্ম মহালোক মিলিত করিয়া একটী সংসার হয়। আমাদের চলিত কথায় আমাদের পরিবারবর্গ লইয়া একটী সংসার হয় আমরা বলি। এই অর্থে আমরা কাহাকেও সংসারী, কাহাকেও সংসারত্যাগী বলিয়া থাকি। মহালোক লইয়া সংসার নামক যে বিভাগ হয়, তাহা কত বিপুল একবার সকলে অনুমান করিয়া দেখুন। এই সংসার নামক বিভাগটীকে আমাদের পৃথিবী মধ্যস্থিত কণ্টিনেণ্ট অর্থাৎ মহাদেশের অন্তর্গত এক একটি দেশ নামক বিভাগ বলা যাইতে পারে।

কারণ-সমুদ্রে কত কণ্টিনেণ্ট আছে—তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। আমরা ক্ষুদ্র মানব আমরা একটী মাত্র কণ্টি বা দেশ অর্থাৎ সংসার নামক বিভাগের বিবরণ জানিতে পারিয়াছি, ইহাই আমাদের অতিশয় স্পর্দ্ধার কথা বলিতে হইবে। এই সংসারের উপর অপর কোন বিভাগ আছে কিনা তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কারণ-সমুদ্র ব্রহ্মের দেহ বলিলে এই সংসার নামক বিভাগকে ব্রহ্মের দেহের হস্ত-পদ-মস্তক-বক্ষরূপ দেহবিভাগের এক বিভাগ বা এক অঙ্গ বলা যাইতে পারে। মানুষের হস্ত নামক বিভাগের মধ্যে যেরূপ অস্থি, মজ্জা, স্নায়ুপেশী, শিরা প্রভৃতি উপবিভাগ আছে বলিয়াছি, সেইরূপ সংসার নামক বিভাগের মধ্যস্থিত মহালোক, লোক, মহাবিশ্ব, বিশ্ব, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি বিভাগগুলিকে ধারণা করা যাইতে পারে।

সংসার নামক বিভাগ ও তদন্তর্গত উপবিভাগগুলি প্রত্যেকই সেই সেই উপবিভাগ ও বিভাগের অধিপতি দেবতার পূর্ণ দেহ হইতেছে। সংসারের অধিপতি মহাবিষ্ণু, তাঁহার দেহ সংসারের সীমা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মহালোকের অধিপতি মহেশ্বর ইহাঁর দেহ মহালোক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটী লোকের অধিপতি পরমেশ্বর, ইহাঁর দেহ এক লোকের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। একটী মহা বিশ্বের অধিপতির নাম পরেশ্বর, তাঁহার দেহ মহাবিশ্বময়ব্যাপী। বিশ্বের অধিপতি হর, হর বিশ্বটী ব্যাপিয়া তাঁহাতে রহিয়াছেন, জগতের অধিপতি হরি, তিনি এক জগৎ অর্থাৎ শক্তিটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শরীর লইয়া বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর, তাঁহার শরীর ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে। এই পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান ব্যাপিয়া ঈশ্বরের শরীর

ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান।

ব্রহ্মের কারণ-সমুদ্ররূপ অনন্তদেহের মধ্যে এই সকল অধিপতি দেবতাদের দেহ রহিয়াছে। সুতরাং আমরা ইঁহাদের ব্রহ্মের দেহের এক একটী বিভাগ বা অঙ্গ ও তাহার ভিতরের উপবিভাগ বা অস্থিপেশী আদি উপাদান বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। কোন মানবের তুষ্টির জন্য তাহার দেহের সেবা করা অন্যতম উপায়। উপযুক্ত আহার দ্বারা রসনার তৃপ্তি করা, উদর পূরণ করা, মর্দ্দন দ্বারা করচরণের সেবা করা ইত্যাদি দ্বারা মানবের তৃপ্তি করা যায়, অর্থাৎ কোন এক অঙ্গের তৃপ্তিতেই দেহীর তৃপ্তি হইয়া থাকে সুতরাং আমরা যদ্যপি এক সংসার নামক বিভাগের অধিপতি দেবতা মহাবিষ্ণুর পূজাদির দ্বারা তুষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের এক অঙ্গের তুষ্টি করিয়া এই একাঙ্গ মাত্রের তুষ্টিতে ব্রহ্মেরই তুষ্টি হইয়া থাকে, এইরূপে অধিপতি দেবতার পূজা ব্রহ্মেরই পূজা। এই কারণে দেবপূজা ব্রহ্মেরই পূজা। এই দেবগণ ব্রহ্মের অঙ্গরূপে অঙ্গের ভিতর রহিয়াছেন। আমাদের দেহের এক এক অংশের যেমন এক এক পৃথক্ নাম আছে, ব্রহ্মের দেহের এক এক অংশের সেইরূপ পৃথক্ নাম কল্পনা করিয়া সেই নামীয় অংশের ভিতর আধার অস্থিমজ্জা স্নায়ুপেশী প্রভৃতি স্বতন্ত্র শরীরীয় পদার্থের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার দেহ-রূপ ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব রহিয়াছে। অস্থি মজ্জা স্নায়ুপেশী শিরা প্রভৃতি যেমন হাতের অন্তর্গত বলিয়া হাত নামক এক সাধারণের নামের ভিতর রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মদেহের হস্ত নামক এক অঙ্গ ইহাকে মহাবিষ্ণু বলিলে ইহার ভিতর মহেশ্বর, পরমেশ্বর, হর, হরি, ঈশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ হাতের ভিতরস্থিত অস্থি মজ্জা, শিরা স্নায়ুপেশী ধমনীর ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেহীর তৃপ্তিতে দেহের সর্ব্বাঙ্গের তৃপ্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের তৃপ্তিতে সর্ব্বদেব আদি জীবের তৃপ্তি। আবার কোন অঙ্গবিশেষের তৃপ্তিতে দেহীর যেরূপ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ কোন অধিপতি দেবতার পূজায় ব্রহ্মেরই পূজা হইবে না ত কাহার পূজা হইবে?

এইরূপে আমরা দেখিলাম দেবগণ আমাদের পূজ্য হইতেছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আমাদের অপেক্ষা উন্নত জীব বলিয়া ও উহারা আমাদের অজস্র হিতকর কার্য্যে সারাজীবন নিযুক্ত রহিয়াছেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পূজা পাইবার যোগ্য হইতেছেন।

অধিপতি দেবগণ ব্রহ্মের দেহের ভিতর তাঁহার দেহের অঙ্গ বা উপাদান স্বরূপে সেই দেহের ভিতর ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন, এবং ব্রহ্মের শক্তি আপনাদের দেহের মধ্যে দিয়া আপনার নিজ শাসিত ব্রহ্মাণ্ড আদির সমষ্টিতে ও তদন্তর্গত জীবদেহে পোষিত করিতেছেন। এই দেবদেহ ব্রহ্মের দেহের ভিতরের দেহ বলিয়া দেবদেহকে ত্বমেবসর্ব্বং বলিয়া স্তবস্তুতি করাও অযথা কথা হয় না। ব্রহ্ম পূর্ণ, তাঁহার দেহও পূর্ণ, দেহের প্রত্যেক অংশই পূর্ণ, এই অংশ ভাবে দেবদেহ সকলও পূর্ণ। আমরা আমাদের পৃথিবীর মানবকে গুরু বলিয়া পূজা করি, তাহাতে এই কারণেই ব্রহ্মপূজা করা হয়।

চলিত কথায় দেবগণকে অমর বলা হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের মরণ নাই। কিন্তু ইহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হইলে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ পাইয়াছি, সেইরূপ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, ঐরূপ বৎসরের শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু শাস্ত্রেই বলে। মহাবিষ্ণুর আয়ুর কাল আমরা এই প্রবন্ধেই পূর্ব্বে বলিয়াছি। তবে এই আয়ুষ্কাল গত হইলে উঁহাদের দেহ আমাদের দেহের মত নষ্ট হইবে না। দেবগণ আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কাল গতে অন্য স্থানে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ব্রহ্মার পদ লইয়া সৃষ্টির কার্য্য করিতেছিলেন তাহা শেষ হইলে আর অন্য কোন লোকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত নাও থাকিতে পারেন। অন্যত্র অন্য কার্য্য করিতে যাইলে তাঁহার ব্রহ্ম নাম আর থাকিবে না, কাজেই একভাবে তাঁহার মৃত্যু হওয়া বলা যাইতে পারে। দেবগণের সকলেরই আয়ুষ্কাল পরিমিত আছে; কিন্তু তাহা আমাদের মত মানবদের পক্ষে এত অধিক কাল যে আমরা চলিতভাবে উঁহাদের অমর বলিয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্।

বাসনা।

প্রভো!

আমি ভুলব এবার আপন জনে
তব বিশ্ব রূপে হয়ে আপন হারা।
রাখি' তোমার হৃদয় মাঝে
ভাবব মুদে আঁখি তারা॥
পাগল হ'য়ে তোমার পানে
জানাব দুখ, ওগো দুখহরা।
শেষ নিবেদন দাসের এখন,
অন্তে করো না চরণ ছাড়া।

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

অন্তর্দৃষ্টি।

রক্তাদি সপ্তধাতু গঠিত মানবের উৎপত্তির কোলেই বিপত্তি ও বিলয়ের অবস্থা অর্থাৎ জন্মই বিপন্মৃত্যুর প্রদর্শক। কেহ কখন এই তিনটি হইতে বিমুক্ত অবস্থায় মানব হইতে পারে না। এই অবশ্যম্ভাবী জন্মমৃত্যুর মধ্যস্থলে মানব জীবন একটা সসীম দিনের জন্য অসীম কর্ত্তব্য চিন্তা ও মহৎ ভাবনিচয়কে আশ্রয় করে। প্রথমে জন্মগ্রহণের পর কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া মানুষকে বাল্য হইতে ক্রমে বার্দ্ধক্যের সহিত—কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের সহিত মিলিত করে। সেই স্থলে সে জরার সহিত আলিঙ্গন করিলে আবার ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি, ক্রমসঙ্কোচভাব ধরিয়া তাহাকে আবার বালক করিয়া তুলে। এই ত মানবের অসার জীবনের অসার কার্য্য। এই অসারতার মধ্যে দুইটী পথ আছে, একটি বাহ্যদৃষ্টি অপর অন্তর্দৃষ্টি। বাহ্যদৃষ্টি এই অসার ভাবকে এক আকারে রাখিয়া দেয়। জন্ম হইতে মানুষ যাহা দেখে, যাহা শুনে, যাহা করে, সে চিরদিন সেইভাবে

বিমুগ্ধ থাকে। সুতরাং সে মানব হইলেও, তাহাকে পশুপক্ষী কীটাদি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, কেন না মানুষের মনুষ্যত্ব দেহে, রক্তে বা আস্থতত্ত্বে নয়,—গুণে এবং আত্ম ও পরতত্ত্ব মিশ্রণে। কেন এরূপ হয়? এ 'কেন'র উত্তর একটু গভীরতামূলক।

এই বাহ্যদৃষ্টির মধ্যে বাহ্য দৃশ্যই বর্ত্তমান থাকে। দৃষ্টির ভিতরে যে বিদ্যুৎগতি একটা শক্তি থাকে, তাহা তাহার থাকে না। সুতরাং সে উপরের ছায়ামাত্র দেখে বা প্রতিধ্বনি শুনে। বাহ্যভাবে হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে না। এই শক্তিই মানুষকে অন্তর্দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করে। তাহা ভাবগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। এইটি থাকিলেই সে বস্তুসকল বা কার্য্যনিচয়কে সাধারণ অপেক্ষা অন্যভাবে দেখিতে পারে। দেখিলেই সেই আকাঙ্ক্ষার মধ্য হইতে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি হয় ও তখন বাহ্য কার্য্যে সে একবারেই উন্মত্ত হয় না—ইহা বুঝা যায়। সে যা' দেখে,যা' শুনে, যা' খায়, একাগ্রচিত্তে তাহাদের ভাব সংগ্রহ করে। ইহাকেই ভাবুক বলে। উন্মাদ হইতেই ভাবুকতার বৃদ্ধি হয়, ক্রমে অভ্যাস বলে সে বাহিরের সবই এমন কি নিজেকেও হারাইয়া ফেলে। মানব রাজ্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বুদ্ধ, চৈতন্য নানক, যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মামোদী বীরগণ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, একলব্য প্রভৃতি কর্ম্মিগণ এই উন্মাদের বলেই ভাবুকপ্রধান, বীরপ্রধান হইয়া ভারতরাজ্যে অতুল যশঃশ্রী লাভ করিয়া গিয়াছেন। কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মানব হইয়া দেব সিংহাসনে স্থান পাইয়াছেন।

এই যে অধুনা বিজ্ঞানরাজ্যে বাষ্পীয় যন্ত্র, তাড়িত যন্ত্র, আকাশ যন্ত্র, আগ্নেয় যন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে, দিবারাত্রিকে এক করিতেছে, জলস্থলকে সমান রাখিতেছে, তাহার—মূলে উন্মাদ অর্থাৎ আপনহারা জীবনে সাধনের প্রবল ইচ্ছা, স্বার্থশূন্য হৃদয়ের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা—সার্ব্বজনীন সঙ্কল্পের পূর্ণ সাধনা। এই উন্মাদজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্পের মূলে প্রাতভার প্রকাশ ও সংযোজন আবশ্যক। তাহা হইলেই মানব শিক্ষাশিখরে উঠিয়া কীর্ত্তিবংশী-বাদনে বিশ্বের বরণীয় স্মরণীয় হইতে পারে। অতএব এই উন্মাদ মানুষকে বাহ্যদৃষ্টি হইতে অন্তর্দৃষ্টিতে লইয়া যায়। তখন তিনি মহৎ হইতে মহত্তর ভাব নিচয়ে নিবদ্ধ থাকিয়া উন্মত্তভাব প্রদর্শন করেন, তাহাকেই শিক্ষা বা জ্ঞান তন্ময়তা বলে। এই তন্ময়তার বাহ্য-কাণ্ড মানবজীবনে স্থূলসূক্ষ্ম মিশ্রণ ব্যাপার। ইহার বলেই সে ক্রমে স্থূলত্ব ত্যাগে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অতুল গৌরব বা অমূল্য শান্তির উপর আধিপত্য করিতে পারে। সিন্ধুর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধতা যে বাহ্যভাব তাহা ত্যাগ করিলে, তবে তাহার পবিত্র 'রত্ন' ভাব সকল চক্ষু ও অন্তরে প্রতি-বিম্বিত হইয়া সকলকে দেবভাবে আপ্লুত করে। ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া ভিতরের তত্ত্ব দেখিলে, অথবা সামান্য তরুপত্রের গঠন বর্ণ ত্যাগে তাহার সৃষ্টিবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইলে, তাহাদের বিরাট মূর্ত্তির আভাস পাইয়া মানুষ মানুষ হয়। এ মনুষ্যত্বের মূলে দৃষ্টি ও উন্মাদ-জনিত তন্ময়তা। সে দৃষ্টি বড়ই সুখাবহ—

গম্ভীর উন্মাদ ব্যতীত তাহা আসে না ; মরুভূমির উপর ধারাবিন্দু আসিতে আসিতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব যে হৃদয় ভাবনিবহে উন্মত্ত হয় না, তাহা হৃদয়ই নয়, সে দৃষ্টি দৃষ্টিই নয়। তাহাতে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ত্তব্য, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ন্যায় কিছুই থাকে না ; থাকে সাধারণ ভাব—জীবরাজ্যের একত্ব মাত্র অর্থাৎ সে পশুপক্ষীর সহিত এক হইয়া সমানভাবে কাল করে। সে ভাবে 'আমি মানুষ'—কিন্তু মানুষ তাহাকে মানুষ বলে না। সে দেখে শুনে চলে খায় শোয় পুত্রকলত্রকে খাওয়ায় ঐ সকলের গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। জীবন লইয়া জীবন্মৃতবৎ নররাজ্যের কলঙ্ক লইয়া ভ্রমণ করে। তাহার দ্বারা জীবরাজ্যও সন্ত্রাসিত হয। নিজের নিজের বুদ্ধি ও কর্ম্মগুণে অশান্ত জীবনকে ক্রমে অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করে, চন্দন ভ্রমে বিষের জলে ঝাপ দেয়। বিশেষ-ভাবে ছুটীয়া সিদ্ধিলাভের জন্য সাধন মন্দিরে গমন করে না বা করিতে পারে না। সুতরাং সে বা তাহার কার্য্যগুলি অরম্য, অভোগ্য, অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য। তাহার চলচ্ছক্তি, বাক্‌শক্তি, শ্রুতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি চিন্তাশক্তি থাকিলেও সে খঞ্জ মূক বধির অন্ধ ও জড়। সে সুধা-ফলের আশায় বৃক্ষে উঠিয়া রঙের ঘোরে অখাদ্য মাকাল ফল লাভ করে ; কণক ভ্রমে হরিদ্রা-খণ্ড সংগ্রহ করে। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবে কু দৃষ্টিকে আশ্রয় করে। আপাততঃ এ লাভে এ সংগ্রহে সে সন্তুষ্ট হইলেও তাহাদের কার্য্য পরম্পরায় ক্রমে সে অশান্তির কোলে মগ্ন হয়, আর শীঘ্র উঠিতে পারে না।

অতএব দৃষ্টিই মানুষকে বড় ও ছোট করিয়া থাকে। সৎশিক্ষার সহিত ক্রমে সুদৃষ্টি লাভ করিলে সুসংস্কার সম্পন্ন মানুষই দেবতা হইতে পারে। আবার অসৎ শিক্ষার সহিত কুদৃষ্টির যোগে দেবতাও মানুষ বা ক্রমে পিশাচ হইয়া উঠে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন।—আমরা অন্যান্য পত্রিকার মত "আলোচনার"মূল্য বর্দ্ধিত না করিয়া পূর্ব্ববৎ ১৷৷০ টাকাই রাখিলাম, অথচ এই ভয়ানক মহার্ঘতার দিনে, কাগজের এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে আমরা পত্রিকাখানিকে সাধ্যমত সৌষ্ঠবান্বিত করিতে যত্নের ত্রুটী করিতেছি না, এক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন,—তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমরা ক্রমশঃ সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সমর ঋণ।—ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ পুনরায় সমর-ঋণ তুলিবার জন্য সেদিন লাট-ভবনে মহাসভার আহ্বান হইয়াছিল। সেইদিনই নাকি সভাস্থলে নয় কোটি টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। এ সময় রাজার সাহায্যার্থ যথাসাধ্য সকলের এই "সমর-বণ্ড" ক্রয় করা উচিত। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে—ইহাতে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই। প্রজামাত্রেই এই দুর্দ্দিনে সাধ্যমত [illegible] ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।

পুরুষোত্তম।

প্রাণে বড় সাধ—তোমায় একবার দেখিব। কিছু করিব না—বলিব না—চাহিব না, শুধু একবার দেখিব। আগে ভাবিতাম তোমায় দেখিতে পাইলে কত কি করিব, কত কাঁদিব, কত কি বলিব, এখন বুঝিযাছি, যতক্ষণ কিছু করিবার, বলিবার, চাহিবার থাকে, ততক্ষণ তোমায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে দেখিলে চক্ষু আর কিছু দেখিতে চায় না, যাহাকে পাইলে ইন্দ্রিয় আপনার ইন্দ্রিয়ত্ব হারাইয়া ফেলে, সেই যে তুমি। যে ধামে যাইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই যে তোমার ধাম। তাই কিছু চাহিব না, শুধু যাইব—দেখিব। আর ফিরিব না।

সাধ আছে কিন্তু শক্তি কই জগন্নাথ! শ্রুতি যে হৃদয় কন্দরে গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" বলহীন, জীবনহীন, জড়মোহাচ্ছন্ন জড়ীভূত প্রাণ লইয়া কি তোমার ধামে যাওয়া যায়—তোমায় দেখা যায়? যেখানে গেলে জীব অগ্নিমধ্যস্থ কাষ্ঠখণ্ডের মত তোমার স্বারূপ্য লাভ করে—সেখানে যাওয়া কি সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি, অস্থির হৃদয়, অপ্রশস্ত প্রাণ, সংশয়াকুল অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান, মোহমুগ্ধ জীবের শক্তিসাধ্য? সুতরাং আমার পুরুষোত্তম দর্শনের সাধ বুঝি চিরদিন ফলশূন্য থাকিবে। বুঝি পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের বাসনার মত আমার এ বাসনা অনন্তকাল আমায় হতাশের তীব্র জ্বালাময় বৃশ্চিক দংশনে আকুল করিয়া রাখিবে। দীন শক্তিহীনের ভাগ্যে বুঝি পুরুষোত্তম দর্শন ঘটিবে না!

কেন ঘটিবে না? আমার প্রাণ—আমার প্রাণের প্রাণ—তাহাকে আমি দেখিব—এ আশা আমার মিটিবে না? কিসে আমি দুর্ব্বল? যাহার বলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিধৃত, যাহার ইচ্ছায় কোটী বিশ্ব পরিসৃষ্ট, স্থিত—যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত দেবতাসংঘ সৃষ্টিধর—তাঁহারই বলে আমিও সৃষ্ট—তাঁহারই ক্রোড়ে আমিও অবস্থিত, তাঁহারই চরণাশ্রয়ে আমিও আশ্রিত;—তাঁহারই বলে আমি তাঁহাকেই দেখিতে চাহিতেছি—এ আশা আমার মিটিবে না? যিনি বিশ্বের প্রাণ, তিনি আমারও প্রাণ, যিনি বিশ্বের আত্মা—তিনি আমারও আত্মা,—তাঁহাকে বুকে ধরিয়া আমি তাঁহাকে

দেখিব না! বিশ্বগুরো! তুমি যে আমারও গুরু! তবে কেন তোমায় আমি দেখিতে পাইব না জগন্নাথ!

তা' এ ভাবের আশা-নিরাশার জোয়ার ভাটায় যখন জীব ওলোট-পালোট খাইতে থাকে, তখন কাম্য বস্তুর কোন লীলা বা স্মৃতি-উদ্বোধক কোন কিছু যেখানে থাকে, সেই-খানেই সে জীবের প্রাণ স্বতঃ প্রধাবিত হয়। যে যাহাকে চায়, সে তাহার স্মৃতি বিজড়িত প্রতি পদার্থকে বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহে। একদিন সহসা ... পুরীধামে পুরু-ষোত্তম দর্শনে একদিন যাত্রা করিব।

Single line নাগপুরী রেল ধরিয়া ট্রেণ ছুটিয়াছে। একধী নামক Single line এর উপর দিয়া নাগপুরী (কুণ্ডলিনী) রেল পথে চিন্তার ট্রেণ দ্রুত ধাবিত হইতেছে। যায়গায় যায়গায় গাড়ি থামে, আবার সেই Single line ধরিয়া জলদগম্ভীর "গুরু" "গুরু" ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতে থাকে। আবার থামে—আবার ছোটে—এইরূপে অনেক প্রদেশ অতিক্রম করিল, অন্ধকারে রাত্রে। বাহিরে দুরন্ত অন্ধকার, কিছু দেখা যাইতেছিল না। চিন্তা-গাড়ীর ভিতরে আশার একটী ক্ষীণ আলোক গাড়ীকে আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল। এ গাড়িতে চড়িলে প্রায়ই নিদ্রা আসে। কিন্তু সে নিয়ম আমার পক্ষে খাটে নাই। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, নিদ্রার কবল চিরদিনের জন্য পরাভূত করিয়া চলিয়াছি। এখন আবার নিদ্রা! যদি কেহ একধী লাইনে চিন্তাগাড়ি চড়িয়া পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা করেন, তবে এই নিদ্রাটুকুকে সাবধান।

যতদূর যাই, অন্ধকারে বাহ্য জগৎ ততই বিলুপ্ত হইতে থাকে, গাড়ির অভ্যন্তরস্থ আলোকে মাত্র আপনার সত্ত্বা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকি। আর কত দূরে—কত দূরে তুমি জগন্নাথ, গাড়ির এইরূপ একটা একটা ধমকে আপনার আমিত্বটা ছুটিয়া যাইতে থাকে। "আমিত্ব" যত যায় "বোধ" তত নির্ম্মল শান্ত স্নিগ্ধতর হইতে থাকে। বাহিরে অন্ধকার যত বাড়িতে লাগিল, চিন্তগুলি শূন্য শব্দশূন্য হইতে লাগিল, গাড়ির "গুরু" "গুরু" ধ্বনিও তত গম্ভীরতর হইতে লাগিল। নব জাগরণ! প্রতি প্রভাতেই জাগরণ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু পুরী-যাত্রীর জাগরণ, নূতন নবীনতম।

আমি "পুরীতে"। প্রভাত হইয়াছে। অন্তর-বাহ্য এক আলোকে পরিব্যাপ্ত। গাড়ি কখন থামিয়া গিয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—আমি সেইখানে। গাড়ির সে "গুরু" "গুরু" ধ্বনি নাই—সে গতি নাই—সে আলোক-অন্ধকারের ভেদ নাই। সব অন্তর। আমি অন্তর অন্তঃ-করণময়—বিশ্ব প্রপঞ্চ অন্তঃকরণময়। সব অন্তরে অবস্থিত। সেই মাটি, সেই জল, সেই অগ্নি—বায়ু—আকাশ,—পুরীর মধ্যেও সেই সব—অন্তরে অন্তরময়—অন্তঃকরণময়—চৈতন্যময়! পুরীতে—অন্তরে—প্রবেশ করিতে লাগিলাম।

আনন্দগ্রাম! আনন্দের হাট! দেবতা-মণ্ডপ—মুক্তি-মণ্ডপ—...

পুরুষে পূর্ণ। আনন্দের নীরব নিথর সমুদ্র। সব অন্তরে। এত দিন "ছিলাম" সত্য, কিন্তু এমন "থাকা" কখনও অনুভব করি নাই। চৈতন্য ছিল বটে, কিন্তু এমন চিন্ময় বিকাশ দেখি নাই। আনন্দের স্বপ্ন ভোগ করিয়াছিলাম, আনন্দ এমন—তা জানিতাম না।

কিন্তু মণি-মণ্ডপে রত্ন-বেদীতে ও কি দেখিলাম। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ও যে চির দিনের পরিচিত, একান্ত—একান্ত আমার—আমার প্রাণ—আমার আত্মা। ও যে তুমি—আমার গতি—ভর্ত্তা—প্রভু—সাক্ষী—সুহৃৎ, আমার আত্মার আত্মা। আমি নাই—অথচ আমার। ও কি রূপ! চক্ষু নাই দর্শনময়, হস্ত নাই সর্ব্বগ্রাহী, পদ নাই সর্ব্বগ, ও যে আত্মা—পুরুষোত্তম—মা।

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃচ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম রহিয়াছে ইন্দ্রিয় নাই! অথবা সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় [illegible] চিৎ আনন্দ ত্রিবর্ণময়, অকর্ত্তা, নির্গুণ, অথচ গুণ ভোক্তা—মা। দক্ষিণে অনন্ত ব্যাপ্ত সৎ, মধ্যে চৈতন্য—উত্তরে আনন্দ।

এখানে আসিলে আর আমি থাকি না—তোমারই হই। এই তোমার ধাম, মা, এই আমার ধাম। হেথা পূজা নাই—প্রণাম নাই—পূজ্য পূজক, সেব্য সেবক—বর্জিত নিত্য [illegible] আর নাই, শুধু আনন্দ ভোগ। [illegible] আত্ম-[illegible]। [illegible] এখানে [illegible]

এত আপনার—এত আমাময় তুমি—কেমন করিয়া এতদিন না দেখিয়াছিলাম। মা—জগবন্ধু—জগন্নাথ! "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া "ব্রহ্ম সূত্রে" যে আদিকারণকে ভাষায় আঁকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—সেই—সেই পুরুষোত্তম!

অপানি পাদো যবন গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ সঃ শৃনোত্যকর্ণঃ
স চেত্তি বিশ্বম্ নহি তস্য চেত্তা
তমাহুরাদ্যং পুরুষং প্রধানং।

জড়জগতে পুণ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষে পুরীধামে তোমার এই স্বরূপেরই দারুময় মূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে। সৎ, চিৎ, আনন্দ, বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথ রূপে ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত, ইন্দ্রিয়াদির আভাস আছে—ইন্দ্রিয় নাই—ইহাই তোমার এ মূর্ত্তিত্রয়ের বিশেষত্ব। আর মন্দিরে পূজা নাই—প্রণাম নাই—শুধু ভোগ, শুধু আনন্দের হাট—শুধু দর্শন। আত্মহারা আত্মভরা আত্মদর্শন। যিনি তোমায় জড়ে এপ্রকারে মূর্ত্তি সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি মহাপুরুষ। জগন্নাথ-মা—তোমায় আমরা না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকি? আচ্ছা—সত্যই কি আমরা তোমায় কখন দেখিতে পাই না? যে মা থাকিলে আমরা থাকি না, যে না খাওয়াইলে খাওয়া হয় না—না দেখাইলে দেখা হয় না, না শুনাইলে শুনা হয় না—না চালাইলে চলা হয় না—সত্যই কি সেই তোমাকে আমরা না দেখিয়া, না পাইয়া জীবন [illegible] করি? [illegible] না। তোমার আমরা নিত্য

দেখি। নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গী তুমি—প্রতি নিশ্বাসের সাক্ষী তুমি, প্রতি ভোগের ভোক্তা তুমি। সর্ব্বত্র—অন্তরে বাহিরে—তোমায় না দেখিলে—জীব থাকে না, তুমি না দেখিলেও জীব থাকে না। আমরা দেখিয়াও দেখি না—নিত্য অবজ্ঞায়, উপেক্ষায়, অনাদরে তোমায় গ্রাহ্য করি না—পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাই—গায়ে গা ঠেকিলেও ফিরিয়া দেখি না। ইহাই জীবধর্ম্ম! তুমি প্রভো—জগন্নাথ—পুরুষোত্তম—আমাদের এ অনাদর উপেক্ষা করিয়া, আমাদের ভালবাস! তবু আমরা তোমার জীবনের মধু। তোমার এ স্নেহের কথা যেন কখনও না ভুলি।

মা—সখা—গুরো পুরুষোত্তম! ধীর স্থির—শান্ত—গম্ভীর—উদার—নিশ্চল—নির্ব্বিকল্প। ডুবাইয়া লও—মিলাইয়া লও—স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া লও—এ ক্ষুদ্র আমিত্বময় আমাকে রাখিও না—তুমি থাক—তুমি থাক—শুধু তুমি থাক। আপনি আপনাকে দেখ। জয় মা! তুমি পুরুষোত্তম। তোমাকে তুমিই দেখিতে পায়—অধমে তোমায় পায় না। তোমার স্মরণে অধম উত্তম হয়—তোমার কথা হৃদয়ে ফুটিলে আমাদের মত পুরুষাধমও বুঝি পুরুষোত্তম হয়, তাই তোমার একার ওই মহা নাম পুরুষোত্তম।

সনাতন! নূতনভাবে কেমন করিয়া তোমায় ডাকিব? কেমন করিয়া তোমার পূজা করিব—কেমন করিয়া তোমায় প্রণাম করিব। আত্মানন্দ—তোমার আনন্দের জন্যই ত জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের প্রিয়—তোমার ভোগের জন্যই আমাদের জগৎভোগ। জগতের জন্য আমরা জগৎকে ভালবাসি না—তোমার তৃপ্তির জন্যই ত আমরা জগৎমোহে। যাহা কিছু বলি সে তোমাকেই ডাকি—যাহা কিছু ভালবাসি সেত তুমি আমার অন্তরে থাকিয়া ভালবাস বলিয়া। আকুল তরঙ্গভঙ্গময় মায়া সমুদ্রের তটে সপ্রকাশ হে জগদাত্মন্—এ সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গ ত তোমারই আনন্দ ভোগের জন্য উদ্বেলিত; প্রতি তরঙ্গ ত' তোমারই চরণে নিত্য প্রণত। কু সু—সুখ দুঃখ—আলোক অন্ধকার—চেতন জড় সবই তোমার আনন্দ ভোগ। এ আনন্দের হাটে পচা, গলা, দুর্গন্ধ, যাহা কিছু তাহাও যে তোমার আনন্দ প্রসাদ! তাই' ত আমরা নির্ব্বিচারে যে যাহা পাই—তাহা অন্যের মুখে তুলিয়া দিই। ভোগ চাকাচাকিই যে তোমার এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ ক্রীড়া। হে আনন্দময়ী—হে সচ্চিদানন্দ—হে আনন্দ—আমাদের আনন্দে মাতাইয়া দাও। আমাদের চক্ষের অশ্রুধারাও যে আনন্দধারা, ইহা যেন আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

মানবের আদিম অবস্থা।

'মানবের আদিম অবস্থা'—কথাটা মুখে বলা বা কাগজে লেখা সহজ, কিন্তু উহাকে চিন্তার মধ্যে ফেলিলে আর সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে, এই দেখা যায়, ধরিতে যাও, ডুবিয়া যাইবে—আবার ওখানে উঠিবে, আবার ডুবিবে। তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ঘূর্ণিজলের ভীষণ আবর্ত্তে, প্রবাহের একটানা

বরণে সে যে কখন কোথায় কি ভাবে থাকে, কি ভাব বা কর্ম্মবৈচিত্র্যে ভাবুকের চিত্তকে সন্দেহে দোলায়মান করে, অতীতের অন্ধকার-ময় চিত্রগুলি বর্ত্তমানের আলোকে রঞ্জিত হইলেও কি এক রকম ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে, তাহা ঠিক বোঝা যায় না, কাজেই চিত্তের প্রসন্নতা, কর্ম্মের সফলতা দেখা বড়ই কঠিন হয়।

ব্রহ্মা হইতে স্বয়ম্ভুব মনু ও শতরূপার উৎপত্তি ও তাঁহাদের সংমিলনে যাহার জন্ম—সেই মানব বা মনুষ্য পদবাচ্য। এই পৌরাণিক চিরন্তন কাহিনী অথবা ডারউইনের theory ছাড়িয়া দিলে মনে করিতে হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য শক্তি, চিন্তা বা কল্পনার ক্রিয়া বিশেষেই মানবের জন্ম! ইহা জীবসৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ গঠন প্রণালী, সর্ব্বোচ্চ চিন্তার বিকাশ—সর্ব্বোচ্চ শিল্পের পরিচয়। পর্ব্বত-কায় হস্তী ও তিমি, মহাবিক্রমশালী সিংহ ও ব্যাঘ্র দেখিয়া মনে হয়, বুঝি অনন্ত কৌশল ও শক্তি এই সমস্ত জীবেই পূর্ণভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে—আবার যখন দেখা যায় একটী সামান্য মানুষ সামান্য ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা এত বড় জন্তুদিগকে চালিত করিতেছে, আজ্ঞা-ধীন করিতেছে, নাসিকায় দড়ি দিয়া নাচাইতেছে, তখন মানব ও ঐ সকল পশুর মধ্যে, বিশ্বশিল্পী যে কি অদ্ভুত শিক্ষাচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া উহাদের পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার অনন্ত শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে এ পার্থক্যে যে কিছু পক্ষপাত আছে, ইহা সম্ভবপর নয়,—তিনি সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি, তাঁহার করুণার ধারাগুলি সমভাবে সমপরিমাণে সকলের উপর নিরন্ত বর্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই, অল্পতা নাই, আধিক্য নাই। জীবরাজ্যে একটু প্রবেশাধিকার হইলেই তাহার উপলব্ধি হয়। মানব তাঁহার প্রিয়তম নয়, পুরীষকৃমিও তাঁহার নিকট ঘৃণিত নয়। ইহা তাঁহার লীলা বা সৃষ্টিবৈচিত্র্য। তিনি যে অনন্ত গুণসম্পন্ন স্রষ্টা তাহা সৃষ্টজীবের চক্ষে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, যখন সেই বিশ্বপিতার একটী অপ্রত্যক্ষ সঙ্কল্প হইতে মঙ্গলের একটী অজস্র নিঃসৃত গলিত স্তর হইতে, মানবের সৃষ্টি তখনই, সেই মুহূর্ত্তেই মানব যে এই উন্নতি বিধায়িনী শক্তি সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বর্দ্ধিত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে তাহা নয়, পরন্তু তাহা স্রষ্টারও অভিপ্রেত নয়। যদি তাহা হইত, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মানব যদি বর্ত্তমান উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত হইত—তাহা হইলে পরমে-শ্বরের সৃষ্ট যে কর্ম্ম এবং তাঁহার যে অনন্ত কৌশল,—সৃষ্টিচাতুর্য্য—তাহা থাকিত না। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনন্ত শক্তিতে মানবকে সৃষ্টির সময়ই—তাহার সূতিকাগারেই একেবারে মহত্তম করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা কিরূপে করিতে পারিবেন? সৃষ্টি যে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছার ফল! তাহার জন্যই তাঁহার এই কর্ম্মশালার সৃষ্টি। দেখা যায়, পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীসকল জন্মের পরক্ষণ হইতেই নিজ নিজ সংস্কার বলেই হউক অথবা কোন অপ্রত্যক্ষ ঐশীশক্তিতেই হউক কি এক বিদ্যুচ্ছক্তিতে আপন আপন

জাতীয় স্বভাব অনুযায়ী শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির ক্রমোন্নতিতে পূর্ণশক্তি লাভ করে। ইহা এক ভাবের সৃষ্টি,—ইহার উন্নতি অবনতি নাই,—শান্তি অশান্তি নাই,—উদ্দেশ্য বা আশা নৈরাশ্য নাই, যাহা আছে—তাহা একভাবের গঠন—এক জীবনের আসক্তি,—এক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ইহার মূল কারণ ঐ সকল জীবে জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব।

এ গঠন, এ আসক্তি, এ অভিব্যক্তি মানবের নিজস্ব নয়, ইহা সেই ভূমা পুরুষের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার প্রকৃতি—শান্তির পূর্ণ নিকেতন—ক্রীড়ার নির্ম্মল প্রণালী। তিনি সচ্চিদানন্দ, অব্যয়, অক্ষয় মহাপুরুষ, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট মানব অংশরূপ তাহা নহে বা হইতে পারে না; জন্ম মাত্রেই সে মাংসপিণ্ড স্পন্দহীন উত্থানশক্তিশূন্য, কেবল হস্তপদের নড়ন ও ক্ষুৎপিপাসা বা শারীরিক ক্রিয়া বৈরূপ্যের জন্য মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন বা স্বাভাবিক হাসি এই সকলই তাহার আদিম সম্পত্তি, কিন্তু অস্পষ্ট,—কেন না, তখন তাহা জ্ঞান ও শিক্ষাহীন। সে হাসি কান্নার মধ্যে কি পদার্থ বা শক্তি আছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে বয়সের সহিত জ্ঞান ও শিক্ষা তাহাকে এক অভিনব রাজ্যে আনিয়া ফেলে। ইহাই তাহার সীমাবদ্ধ মর্ত্ত্যজীবনের প্রথম কর্ম্ম—পরমেশ্বরের কর্ম্মশালার প্রথম নিদর্শন। যেমন অঙ্গার প্রথমে একটু অগ্নিদগ্ধ হইলে আর তাহার পূর্ব্বাগ্নির আবশ্যকতা থাকে না, ক্রমে নিজেই সমস্ত ধরিয়া অগ্নি হইয়া যায়—নিজত্ব হারাইয়া ফেলে—কাচ কাঞ্চন হয়, সেইরূপ ঐ প্রথম কর্ম্ম পরিস্ফুট হইয়া, ক্রমে তাহাকে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে আনিতে আনিতে নিজত্ব হারাইয়া এক অনন্ত কর্ম্মে আনিয়া ফেলে—ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকার্য্যের চরম লক্ষ্য এবং জ্ঞান ও শিক্ষায় মনোবুদ্ধির অদ্ভুত শক্তির প্রদর্শন। এরূপ কৌশল না থাকিলে তিনি মানবকে সকলের প্রধান করিতে পারিতেন না। তবে এই প্রধানত্ব ন্যায়তঃ তাঁহার ইচ্ছায় নহে, সৃষ্টির পারম্পর্য্য কার্য্যকারিতা, কেন না তিনি পক্ষপাতপরিশূন্য মহাপুরুষ, তাঁহার নিকট এটি ভাল, এটি মন্দ নাই। তিনি বিশ্বপিতা, পুত্রভাবে সকলেই তাঁহার সমান আদরের, সমান যত্নের, কেবল কর্ম্মগুণে জীবের সোপান পরম্পরায় উন্নতি ও অবনতি! অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মগুণে জীব মানব হইয়া এত জ্ঞানী হয় নাই, এত শিক্ষিত বা চিন্তাশীল হয় নাই। সৃষ্টির যে সময়ে তাহার জন্ম, তখন সে সব কিছুই ছিল না—একটী জীব ছিল মাত্র,তাহাও কি ভাবের তাহা বোঝা যায় না। সেই জীবের সঙ্গে জীবস্রষ্টার অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত পবিত্র আকাঙ্ক্ষা, সার্ব্বজনীন ইচ্ছা জ্ঞানরূপে শিক্ষার সহিত প্রযুক্ত হওয়ায়, তাহার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে, ইহাই মানবের মানবত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং পূর্ণত্ব, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষে তাহা যে কি, তাঁহার এই অনন্ত বিশ্ব মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্টতম তাহা তিনিই জানেন, তবে আমাদের দৃষ্ট জীবরাজ্যের কথা ধরিয়া আমাদের এ সকল কথার অবতারণা।

যদি বিচার পরম্পরায় ইহা ধ্রুব সত্য হয়, তবে আদিম অবস্থায় মানবের ছিল কি? এই জড় পিণ্ড দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আর কয়েকটী অদৃষ্ট পদার্থ,—জন্মের সহিতই তাহাদের পরিণতি—ভাষা, চিন্তা ও ভাব! তবে ভাষা প্রথম,—প্রথম ভাষার সহিত আনুরক্তি ঘটিলে তবে চিন্তা ও ভাব। প্রথম হইতে ভাষার সঙ্গেই এই দুইটি লুক্কায়িত থাকে মাত্র। চিন্তায় ভাবের উন্মেষ, ভাবে প্রেম, প্রেমে আপনহ হারান।

এখন দেখা যাইতেছে যে, মানবের আদিম অবস্থায় ছিল, 'সে' আর তাহার "ভাষা"। সে ভাষারও ভাষা তাঁহার, এই পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে তাহারা বাস করিত। এখন পর্য্যন্ত তাহাই আছে, কেহ কখন কাহাকেও ছাড়তে পারে না,—মানুষ আছে ভাষা নাই, বা ভাষা আছে মানুষ নাই—ইহা উন্মত্তের প্রলাপ,—মঙ্গলময়ী সৃষ্টিচিন্তায় ইহা থাকে না। এই ভাষা অবশ্যই আধুনিক মানবের সঙ্গে আকাশভূমি প্রভেদ। তাহা বলিয়া কি আদিম মানুষ বা ভাষা নগণ্য? তাহারা নগণ্য হইলে, এখনকার বিশ্ববিখ্যাত মানব ও ভাষা অবশ্যই নগণ্য। কেন না আদি ক্রমশঃ মধ্য ও অন্তে উপস্থিত হয়। আদি ছাড়িলে মধ্য বা অন্তর সত্বা থাকিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিও থাকিতে পারে না। এই ক্রমোন্নতির শক্তি, সৃষ্ট জীব বলিয়া শুধু যে মানুষের তাহা নয়,—তাহা হইলে সৃষ্ট অপর জীবেরও এ অধিকার থাকিত। ইহা স্রষ্টার অদ্ভুত খেলা, সৃষ্টির অনন্ত কৌশল, কার্য্যও মঙ্গল। এই শক্তি না পাইলে মানব বর্ত্তমান মানব শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত না,--পশুপক্ষীর ন্যায় এক গণ্ডীর মধ্যেই বাস করিত।

এরূপ বিচারক্ষেত্রে মানব অনন্ত সিন্ধুর এক টানা উন্নতাবনত তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া,—কর্ম্মের নৌকায় বাণিজ্যের জন্য নানা স্থানে যাইতেছে,—নানা ধন রত্ন উপার্জ্জন করিতেছে, জলে ডুবিয়া মুক্তা তুলিতেছে,—আকাশে উঠিয়া নক্ষত্র ধরিতেছে—পর্ব্বত ফাটাইয়া পৃথিবী খুঁজিয়া বহুমূল্য সম্পত্তি লাভ করিতেছে। ইহাই তাহার কর্ম্ম—ইহাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। ইহাকে ধরিয়াই সে, সুতিকাগারের সেই লালা মাখা গাত্র হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশে, বিবেকশক্তির ক্রম সাহায্যে, এতদুরে আসিয়া সামান্য শারীরিক শক্তি লইয়া মহান্ হইতে মহত্তর কার্য্য সাধন করিতেছে;—প্রাণিরাজ্যে নিজে মহত্তম হইয়াছে। আজ জলধি পার,—কাল পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন, পরশ্বঃ শূন্যে ভ্রমণ ও বিদ্যুদাগ্নির সহিত ক্রীড়া প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যসকল,—যাহা স্বপ্নরাজ্যের কথা—যাহা প্রহেলিকার ছড়া—তাহা হস্তমুষ্টিতে ধরিয়া অদ্ভুত ভাবে দেখাইতেছে,—স্বর্গের আলোক মর্ত্ত্যে আনিতেছে, মর্ত্ত্যের বালুকাকণাকে ছায়া-পথ দিয়া কোন এক মনোনয়নের অতীত স্থানে তুলিয়া দিতেছে। এ শক্তি কার? ইহা সেই অচিন্ত্য শক্তি মহিমময় পুরুষের শক্তি ও সেই শক্তিজাত মঙ্গল। সেই জন্য মানব সব পাইয়া সকলকে সব দিতেছে, সূর্য্যের জলশোষণ ও মেঘরূপে বারিবর্ষণ এই স্বাভাবিক শক্তি ইহার

প্রতিফলন!

দাও মানব, দাও, কর, আরও কত করিবে। যে বাঁচিবে সেই দেখিবে; তবে অতীতকাহিনী আদিমকালের একটী ক্ষুদ্র হইতে তুমি যে ক্ষুদ্রতর ছিলে তাহা ভুলিও না, ভুলিলে এ মহান স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে—আপনাকে ভুলিতে হইবে। এরূপ ব্যভিচার ঘটাইয়া তুমি যে উন্নত হইবে, তাহা সৃষ্টির বিধান গত নহে, ধর্ম্ম রাজ্যের পৌর্ব্বাপরিক নিয়ম নহে, কেন না তাহা তোমার স্রষ্টার ইচ্ছা প্রসূত হয় নাই। তোমার আদিম অবস্থা বড়ই ভয়াবহ ছিল। সেই অতীত যুগ এখন তোমার চক্ষে গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু তোমার চক্ষেই পড়িয়াছে,বর্ত্তমানের সৌন্দর্য্য চাকচিক্যে তুমিই ভুলিয়াছ। কিন্তু তুমি জানিও যে, বহুযুগ হইলেও, পরিখাবেষ্টিত দুর্গাভ্যন্তরস্থ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে গুপ্ত থাকিলেও, তোমার স্রষ্টা পালক ও চালকের চক্ষে তাহা সতত প্রতিভাত আছে। তাঁহার একটী অঙ্গুলিতাড়নে তুমি স্বাভাবিক ভাবে নাচিতেছ—খেলিতেছ—কত কি করিতেছ। তিনি নখ-দর্পণে তোমার সেই অতীত ও এই বর্ত্তমান দেখিয়া আবার দুর ভবিষ্যতের আলেখ্যে তোমার চিত্রের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছেন। আরও হাসিতেছেন—তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে, তোমার আবাসভূতা এই পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর বৃহস্পতি, শনি,নেপচুন প্রভৃতি-গ্রহমণ্ডলীর দেহ, অবস্থা ও গতি এবং তাহাদের বা অন্য কোন প্রকার অপ্রকাশিত লোকের মধ্যস্থ তোমা অপেক্ষা বৃহত্তর জীবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তোমাকে তোমার পাগলত্ব বুঝাইতে। এখন ভাব দেখি তোমার কি বাচালতা—কি আত্মগরিমা। এক হইতে দশস্কন্ধ তাহা হইতে শত বা সহস্র স্কন্ধ রাবণের কথা, দুই হাত হইতে বিংশতি হস্ত,—তাহা হইতে সহস্র হস্ত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কাহিনী শুনিয়াছ। আবার পুরাণে সহস্রমুখ ব্রহ্মাকে দেখাইয়া, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ শুনিয়াছ,—আত্মশক্তিতে প্রত্যয়শীল অর্জ্জুনকে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ প্রদর্শন একবার চিন্তার তলে আন দেখি। বাস্তবিক অনন্ত আকাশ অনন্ত সিন্ধুর ন্যায় বৃহত্তম সূর্য্যের তাপালোকের ন্যায় তুমি ভাবনার কুল পাইবে না। তখন তুমি বুঝিবে তুমি কি বা কে? তোমার এই অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ আদিম অবস্থায় তুমি কি বা কে ছিলে? বিজ্ঞানের দিকে ঐ দেখ একটি নক্ষত্র পড়িয়া পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। আবার ও ধারে তাকাও ঐ নক্ষত্রটি তোমার পরিদৃষ্ট শতসূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তম। আবার ক্ষুদ্রত্বের অনুত্বের দিকে তাকাও, এক সূচ্যগ্রধৃত জলবিন্দুতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বাস। তবে বোঝ, তোমার আদিমত্ব বর্ত্তমানত্ব ও ভবিষ্যৎ ক্রীড়ার মধ্যে আমিত্ব, তোমাকে লইয়া কখন কোথায় কি ভাবে বাস করিয়া আসিতেছে—করিতেছে ও করিবে।

সে রহস্য তুমি জান না। আধ্যাত্মিক ভাবে ঐশীশক্তি বুঝিলে তবে বুঝিবে। যখন সেই পরম পুরুষের আকাশ পাতালব্যাপী তুর্য্য মেঘমন্দ্রে বাজিয়া তোমার কর্ণে চক্ষে তোমার আদিম হইতে ভবিষ্যৎ নীলাতরঙ্গ আনিবে

তখন তুমি তোমার আদিম ও বর্ত্তমানের ধুলা-খেলা, ভবিষ্যতের পুতুলের নাচ বুঝিতে পারিবে। নতুবা তুমি মনে করিবে, আমি বরাবর এইরূপই আছি ও থাকিব। তুমি তা' নও,—তুমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জীব। কবি-বাক্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া অতীত ভবিষ্যৎকে ছাড়িয়া, 'সময়ের সার বর্ত্তমান' ভাব ভাব, কিন্তু এই ত্রিকালের সহ কর্ম্মরজ্জুতে তুমি বদ্ধ, তাহা তোমার অদৃষ্ট বলিয়াই তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। ঐ দেখ আকাশে রবি চন্দ্র গ্রহ তারা মেঘ বৃষ্টি, ঐ দেখ অনন্ত শূন্যে বায়ুর অবাধ প্রবহন ইত্যাদি দেখিয়া বা বুঝিয়া—বুঝ, তুমি ত্রিকালে লগ্ন, জীবরূপে তুমি এক দিনের বা এক জন্মের সম্পত্তি নও, কত অতীত হইতে আসিয়া শিক্ষা ও সংস্কার বলে বর্ত্তমানে তুমি বীর। পরে আবার সেই শিক্ষাধিক্যের পরিণতি দেখিবে,—দেখিবে কর্ম্মে,—যেমন করিবে তেমন হইবে। আদিম অবস্থায় তুমি যা'—এখন অন্যরূপ, পরে আবার ভিন্নরূপ ধরিবে। অণু হইতে ঘাস—তাহা হইতে বাঁশের উৎপত্তি, আবার কত আছে বা হইবে। ইহাই বিশ্বের খণ্ড ভাবে তোমার কর্ম্ম-প্রবণতার ফল—আদিম অবস্থার পূর্ণ না হয়,—আংশিক পরিচায়ক। অতএব মানব! বর্ত্তমানে আত্মহারা হইও না, আদিম অবস্থা-ভাব দেখ, তুমি কি ছিলে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছ।

তোমার এই আদিম অবস্থার ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমানতা আনিলে,—তাহা দেখিলে, সমাজকে সেই ভাবে জান,—সেই ভাবে দেখ, সেই ভাবে কর্ম্ম কর, তবে বুঝিবে, তুমি ব্যবহারিক ভাবে যথার্থই নিজত্বকে বাড়াইতেছ, নতুবা তোমার কাজ হইল কই, কেবল নিজে খাইলে, পরিবারবর্গকে দেখিলে—ইহা ত তোমার স্রষ্টার ইচ্ছা নয়। সুতরাং সে ইচ্ছা হইতে তোমার জন্মও নয়—তোমার সপ্তধাতুও সৃষ্ট বা পুষ্ট নয়। তবে তুমি ভ্রান্তির কোলে থাকিয়া রজ্জুতে সর্প বা কাচে মণি দেখিতেছ মাত্র। ও দেখা ও ভাবা ভুলিয়া যাও, মাকাল ফলের কান্তি ভ্রান্তি বা মরীচিকায় পিপাসা বাড়ায় মনে কর। স্থির দৃষ্টিযোগে আপনাকে ভাবিয়া, তোমার জাতীয় সমাজকে আপনার ভাব, নিজের মঙ্গলামঙ্গল সমাজে ঢালিয়া দাও, দেখিবে পাষাণ দ্রব হইবে—আত্মতত্ত্ব বা আত্মপ্রত্যয় যথার্থ হইবে। বংশ-পরম্পরা অতীতের স্মরণে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সুখসমৃদ্ধির আস্বাদ-গ্রহণে উন্নত হইবে। তখন তোমার আদি তত্ত্ব, আমিত্ব যতই অল্প থাকুক সকলে বলিবে তুমি মহৎ—কর্ত্তব্যশীল ও ন্যায়-পথাবলম্বী। দেখ তোমার জাতীয় সমাজ কি গতিতে ডুবিতে চলিয়াছে। ইহার সংস্কার অর্থাৎ বিষম-বিশেষের রাহিত্য ও স্থাপন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে—তবে উহা উঠিবে। কিন্তু সে উঠান তোমার একা হইবে না। বিভিন্ন দলের সকলে বা প্রধান প্রধান একত্র হইয়া, একপ্রাণতা, ধর্ম্মপ্রবণতা ও কর্ম্ম-সাফল্য প্রভৃতির আশ্রয়ে একত্ব গ্রহণ কর। একই ত ছিলে পৃথক হইয়াছ। তখন দেখিবে পৃথকত্ব ডুবিয়াছে—সমাজ উঠিয়াছে তাহার হস্তে একত্বের মালা, তখন সে মালা পরিয়া তুমি বা তোমরা

ধন্য হইবে। তাই বলি আদিমত্ব হারাইওনা, অহঙ্কার বাড়িবে, আমিত্ব ঘুচিবে। আদিমত্বের স্মৃতি বর্ত্তমানে স্থিতি পাইলে, বর্ত্তমান ও সুখের হয়ই, পরন্তু ঘোর তমোময় ভবিষ্যৎ বিদ্যুদালোক মালায় সাজিয়া নিকটে থাকে, তখনই লোকে দূরদর্শী বা ভবিষ্যৎ বক্তা হইয়া পড়ে। তাই তোমার আদিম অবস্থাকে ভালবাসিতে বলি। তোমার কর্ম্ম-জীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায় যাইতেছে—এই যাওয়া আসার সঙ্গেই কোন্ দিন অদৃশ্য হইবে, অতএব ইহাই তোমার কর্ম্ম। তুমি না করিলে অপরে করিবে কেন? জগতে জগৎ ক্রমে কর্ম্মহীনতায় অসার হইয়া পড়িবে,—বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা বন্ধ হইবে। সেই জন্যই ভগবান এই কথা বলিয়া কর্ম্মশূন্য কম্পিত অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন,—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

গীতা ৩য় অঃ ৮।

এই বুঝানতেই অর্জ্জুনের কর্ম্মে মতি ও জয় লাভ হইল। তাই বলি মানব! তোমার আদিম অবস্থা ভাবিয়া বর্ত্তমান অবস্থা ভাব—কর্ম্ম কর—তাহা হইলেই আত্মচিন্তার সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সমাজের চিন্তা আসিবে—জয়ীও হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব ও প্রাচ্যতারা সমিতি।

ভূলোকের মানব-জাতির নৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারের শৃঙ্খলা জন্য যেমন এক জন দেবতা পৃথক্ ভাবে ভারপ্রাপ্ত জগৎ শাসন করিতেছেন, সেইরূপ জগতের সমুদয় ধর্ম্ম ও সাধন প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ জন্য এক জন পৃথক্ দেবতা নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই দেবতাগণ মানব-জাতি হইতে সাধন-পথে উন্নতিপ্রাপ্ত ও মুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দেবতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁরা দেবজাতির মধ্যে জন্মলাভ করেন না।

এই দুইটী পদের নাম মনু ও জগদ্‌গুরু। যিনি নৈতিক ও সামাজিক শাসনে নিযুক্ত তিনি মনু বলিয়া আখ্যাত। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর অধিকার। যিনি ধর্ম্ম ও সাধন কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে জগৎগুরু আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি যিনি এই জগদ্‌গুরুর পদে অধিষ্ঠিত তাঁহার নাম মৈত্রেয়।

মৈত্রেয় ঋষি পরাশরের শিষ্য ছিলেন। পরাশর ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই বিষ্ণুপুরাণ নামে প্রচারিত। ইনি মিত্রাদেবীর গর্ভজাত পুত্র, এই জন্য ইহার নাম মৈত্রেয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রভাস-যজ্ঞের পর যখন শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবার জন্য যোগ আশ্রয় করিয়া বৃক্ষোপরি বসিয়াছিলেন তখন ইনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁকে কিছু বলিয়াছিলেন। উদ্ধব তৎকালে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয় ঋষির মিলন ও কথোপকথন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তৎকালে

উভয়ের মধ্যে কি কথা হয় তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, পুরাণকার তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরে যমুনা তীরে বিদুরের সহিত উদ্ধবের সাক্ষাৎ হয়, উদ্ধব বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীত্যাগের ব্যাপার সমুদয় বলিয়া শেষে বিদুরের প্রশ্নে আত্মজ্ঞান লাভজন্য বিদুরকে হরিদ্বারে মৈত্রেয়ঋষির নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন ও বলিলেন যে দেহ ত্যাগ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উক্ত মৈত্রেয় ঋষিকে সাধন সম্বন্ধে পথ দেখাইবার জন্য ভার দিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রভাস হইতে হরিদ্বার গমন করিয়াছেন ও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার শরণাগত হও।

ভগবান বেদব্যাস মৈত্রেয়ের পূর্ব্বে জগদ্গুরুর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তিনি এই সময় হইতে এই গুরুভার আপন পিতরে শিষ্য ও সখার উপর ন্যস্ত করিয়া আপনার কার্য্য করিবার জন্য মনোযোগ দিলেন ও আরও আড়াই হাজার বৎসর পরে আমরা তাঁহাকে গৌতম বুদ্ধরূপে জন্ম লইয়া পরানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চলোকে উচ্চ অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই।

জগদ্গুরুর ভার গ্রহণ করিয়া অবধি ইনি হিমালয়ের উপর বাস করিতেছেন। ইহাঁর যে শরীর এখনও আছে তাহা যদিও আমাদের দেহের মত স্থূল শরীর নহে, তত্রাচ সেই শরীর আমরা স্থূল দেহ লইয়া স্থূল চক্ষে দেখিতে পারি ও সেই দেহ স্পর্শযোগ্য। এই দেহ অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর কাল এই অবস্থায় রহিয়াছে। এইরূপে দেহরক্ষা করিবার বিধি আমাদের যোগশাস্ত্রে রহিয়াছে, ইহাকে যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেহ বলে। ইংরাজিতে Dream of Ravan (রাবণের স্বপ্ন) নামক একটি প্রাচীন যোগের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেখা যায়।

৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় সাতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিবার সময় একবার কেহ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনদাস বাবাজী নামক এক জন সাধু তাঁহার নিকট ছিলেন, ইনি যোগবলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে ইনি বলিয়াছিলেন, আমি ৫৪ প্রকার কল্প সাধন জানি, এই সকল সাধনের বলে মানবদেহ অমর হইয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক, এই সকল বিদ্যা পুরাকালে প্রচলিত ছিল, এখনও অধিকারী ব্যক্তিদের এই বিদ্যা শিখিবার লোকের অভাব হয় না, এই অবস্থায় গুপ্তভাবে বাহিয়াছে।

জগদ্গুরু হিমালয়ে থাকিয়া জগতের ধর্ম্মসকলের উপর দৃষ্টি রাখিতেছেন, আবশ্যক হইলে নিজে জন্ম লইয়া বা কোন পবিত্র দেহে আবিষ্ট হইয়া সাধনের গূঢ় রহস্য সকল প্রকাশ করিয়া কত তৃষাতুর সাধকের তৃষ্ণাদূর করিতেছেন। আমরা শুনিতেছি তিনি অর্ফিয়স-রূপে গ্রীকদের মধ্যে একবার প্রকাশ হইয়াছিলেন। জোরোয়াষ্টার রূপ ধরিয়া পারস্য দেশে প্রকাশ হইয়া পার্শিদের ধর্ম্ম সঞ্জীবিত করিয়াছেন। তিনিই সন্ন্যাসী জিজস্ ন্যায়

ব্যক্তির দেহে চারি বৎসরের জন্য আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যিশু খৃষ্টরূপে গ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

এবারেও তিনি সত্বর পৃথিবীতে নরদেহে বিচরণ করিবেন তাঁহার ঘোষণা চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে। পরাবিদ্যা-সমিতি এ সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব সকল প্রচার করিতেছেন, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান কেহই এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত নহে। সকল মতে ভাবী-অবতার আসিবার কাল নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিত হইতেছে।

জনৈক ভক্ত মুসলমান উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন তাহাতে নাকি তিনি ভাবী অবতার আসিবার কাল ১৯৫১ সালে বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। খৃষ্টিয়ান মিসনারিদের "ভাবীরাজা" নামে একখানি পুস্তিকা বাজারে বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। তবে তাহাতে সময়ের বিশেষ নির্দ্দেশ দেখা গেল না। থিয়জফিষ্টগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছেন। শ্রীমতী বসন্ত, ত্রিকালদর্শী লেডবিটার সাহেব প্রভৃতি থিয়জফির কর্ণধারগণ রাশি রাশি পুস্তিকা, পত্রিকা প্রভৃতিতে ভাবী অবতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভাবী অবতার শীঘ্রই আসিবেন ও আমরা তাঁহাকে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইব। এই অবতার জগদ্‌গুরুর নিজের অবতরণ, এবং ইহার উদ্দেশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত কোন নূতন ধর্ম্ম স্থাপন নহে। যিনি যে ধর্ম্মে আছেন তাঁহার সেই ধর্ম্মে ভক্তি ও মতিগতি দৃঢ় করিয়া দেওয়া ও প্রকৃত ধর্ম্মে যে মতভেদ নাই ও ইহাতে বর্ত্তমানে যে সকল অনাবশ্যকীয় আবরণ সকল পড়িয়া সাধককে আসল ধরিতে দিতেছে না তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া এইবার জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে জগতে ধর্ম্মভাবের কখনও কম কখনও বেশী হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন যেমন ধর্ম্মের গ্লানি হইতে থাকে ও অধর্ম্মের বেগ বেশী হয় তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া থাকি। আমরা দেখিতেছি যখন যখন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তাঁহাদের বিরোধী দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে সকলে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না,—তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্রও হইয়াছিল। বুদ্ধদেবেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছিল। খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব গভীর মর্ম্মবেদনায় বলিয়াছিলেন এ পবিত্র প্রেম সাড়ে তিন জন ব্যতীত আর কেহই গ্রহণ করিল না। তাঁহার তিরোভাবের অনেক পরে একদা শ্রীবৃন্দাবনে তিনি ৺বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন দিয়াছিলেন, তখন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত কথোপ-কথনে বুঝিয়াছিলেন যে,লোকে তাঁহার উপযুক্ত আদর না করা বশতঃই তিনি মর্ম্ম-বেদনায় লোকনয়নের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইলে এইরূপ বিরুদ্ধ দল থাকিবেন সন্দেহ নাই। অনেকেই তাঁহার অনুগামী হইবে ও তাঁহাকে ভক্তি ও আদর করিবেন, আবার অনেকেই তাঁহার কুৎসা নিন্দা করিবেন, এমন কি তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেও ক্রটী করিবে না, কার্য্যতঃ সম্ভব না হইলেও, সঙ্কল্প, শক্তিবলে ও মৌখিক গালি গালাজ করিয়া তাঁহারা নিজেদের নাম বাজাইতে চেষ্টা করিবেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে ছুইবার বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবন-চরিতে দেখা যায়। আমাদের সময়েই আমরা ঐরূপ ঘটিতে শুনিলাম।

পরাবিদ্যা-সমিতির কর্ণধারগণ মহাত্মাদের কৃপায় জগদ্‌গুরুর দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা এই মহাত্মাদের ও মহাত্মারূপ বিশাল শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ জগতে আসিলে যাহাতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা, আদর ও যত্ন হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি সকল বল প্রকাশ করিতে না পারে এইরূপ ইচ্ছা স্বভাবতঃ মনে জাগিয়া উঠায় ১৯১১ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে তাহারা প্রাচ্য-তারা সমিতি (Order of the Star in the East) নামক সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

এই সমিতিতে সভ্য হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে সভ্য হইতে হইলে কোন পয়সা খরচ করিতে হয় না, কিছু টাকা দিতে হয় না। ইহাতে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলের সমান অধিকার। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, পার্শি সকলেরই যোগ দিবার অধিকার আছে। সকলকেই এই মহাপুরুষের ভাবী আগমন জন্য আবশ্যকীয় শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে প্রস্তুত হইবার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়।

যাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত যে সত্বর জগতে জগদ্‌গুরু আসিবেন, এবং সেই আশায় জগদ্‌গুরু আসিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন ও তাঁহার চরণ আশ্রয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবেন এই ভাবে এখন হইতে জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত তাঁহারই এই সমিতির সভ্য হইতে পারেন। যিনি জগদ্‌গুরু আসিলে তাঁহার চরণাশ্রয়ে ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে দিনের সকল কার্য্যই এই মহাপুরুষের নাম মনে রাখিয়া করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য্যে ফাঁকি, জুয়াচুরি, অলসতা থাকিতে পাইবে না। ৺অদ্বৈত আচার্য্য যেমন প্রত্যহ নারায়ণে তুলসী দিয়া কাতরে তাঁহাকে সত্বর পৃথিবীতে আসিয়া লোকের অধর্ম্মভাব দূর করিবার জন্য দৈনিক কাতর প্রার্থনা করিতেন, আমাদের সেইরূপ প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় যাহাতে জগদ্‌গুরু সত্বর আসেন এই জন্য ব্যাকুল ভাবে যতক্ষণ হউক না কেন মনের সহিত আহ্বান করিতে হইবে। মৈত্রেয় ঋষিকে পুরাণে পরম কারুণিক বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধদের গ্রন্থে জগদ্‌গুরুর নাম বোধ সত্ব। তাঁহারা এই মৈত্রয়কে বোধিসত্ব বলেন, এবং করুণা ইহার একটি বিশেষ গুণ বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার অন্যান্য গুণ যে নাই তাহা নহে,

এইরূপে মহাপুরুষের সকল প্রকার সদ্‌গুণই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান, তবে করুণা সকলের অপেক্ষা একটু যেন বিশেষ ভাবে প্রকাশ। এইরূপ মহাত্মার কৃপালাভে ইচ্ছুক হইতে হইলে আমাদের কুসুম অপেক্ষা মৃদু (মৃদুনি কুসুমাদপি) হইতে হইবে,সঙ্গে সঙ্গে লোকালয়ে থাকিতে হইবে বলিয়া ও অধর্ম্ম নাশ করার কাল আসিতেছে বলিয়া বজ্রাদপি কঠোরাণি হইয়া তৃণাদপি সুনীচেন, অর্থাৎ সকল কার্য্যই অতি দীন ভাবে নিজের আমিত্ব বা আত্মম্ভরিতা ত্যাগ পূর্ব্বক করিতে হইবে। ইংরাজিতে এই অবস্থা তিনটিকে Gentleness, Steadfastness and Devotion এই তিন গুণ বলা হইয়াছে।

মহাপুরুষের আশ্রয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদের নূতন কর্ম্মফল সঞ্চয় করা বন্ধ করিয়া পূর্ব্ব কর্ম্ম সকল যাহাতে ক্ষয় হইতে থাকে তাহার চেষ্টা করিতে থাকা উচিত। সংসারে থাকিয়া কর্ম্মও করিতে হইবে অথচ কর্ম্মের ফলের জন্য দায়ী হইব না. এ কি করিয়া সম্ভব, তাহার উত্তরে আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, কর্ম্মফলের ইচ্ছা না করিয়া কর্ম্ম করিলেই সে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। অতএব আমরা যখন জগদ্‌গুরুর কৃপালাভ ইচ্ছা করিতেছি তখন আমরা যে কর্ম্ম করিব তাহা তাঁহার কর্ম্ম করিতেছি, তুমি যেমন করিয়া দৈহিক কর্ম্ম করাইবে সেইরূপেই করিব, আমার কর্ম্ম করা লোকে তোমার হইতে করিতেছি বুঝিবে, এইভাবে যাহাতে আমরা কর্ম্ম করিতে পারি—তাহার জন্য প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিব। এখন হইতে আমাদের অভ্যাস করিতে হইবে যেখানে একটু মহত্ত্ব দেখিব সেইখানেই মাথা নোয়াইব। নচেৎ সেই অতি বড় মহাপুরুষের নিকট মাথা নোয়াইবার সুযোগ নাও ঘটিতে পারে। শুধু মাথা নোয়াইলে হইবে না। তাঁহাদের কার্য্যাদির সহ যতটা পারি মিশিয়া নিজ কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব। পরম দয়ালের, অর্থাৎ যাঁহাতে দয়া-গুণের পূর্ণত্ব প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার শিষ্য হইবার উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইলে কাহারও সহিত মতভেদ লইয়া বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহাকে কষ্ট দিলে চলিবে না, সেস্থলে তাঁহার মহত্ত্বটুকুর নিকট আমার ঠিক মাথা নোয়ান হইবে না।

উপরের দুইটী প্যারাতে যে ছয়টী গুণ অভ্যাস করা আমাদের প্রয়োজন বলিয়া এই ছয়টী গুণ দৈনিক জীবনে সাধ্যমত প্রকাশ হইবার সুযোগ দিয়া জীবন যাপন করিবে, অর্থাৎ সাদা কথায় আমি এই ছয়টী নিয়ম পালন করিতে প্রস্তুত আছি বলিয়া নিজের নাম ঠিকানা লিখিয়া সভার হেড্ আফিস আডিয়ার মান্দ্রাজে পাঠাইলেই তাহাকে সভ্য গণ্য করা হইবে ও নিয়োগ-পত্র পাইবেন ও জগদ্‌গুরু সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির বিবরণ তিনি জানিতে পারিবেন। কলিকাতায় ৭নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট, এস্, কে, দত্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন।

এই সমিতির নাম প্রাচ্যতারা সমিতি দিবার অর্থ এই যে, পঞ্চকোণবিশিষ্ট নক্ষত্র

এই সমিতির চিহ্ন হইতেছে। প্রায় এক কোটী আশী লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের এই মানব-জাতির অতি হীন অবস্থা ছিল, তখন শুক্র-লোকস্থিত মানবগণ অতি উচ্চে উঠিয়াছেন, সেখানকার অনেক সিদ্ধমুক্ত পুরুষগণ স্বেচ্ছা-ক্রমে সৌরমণ্ডলের যাবতীয় গ্রহলোকে অবাধে যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই শুক্র-লোকের সিদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে চারিজন মহাপুরুষ আপনাদের অপেক্ষা অল্প উন্নত পাঁচশ জন মুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া এই সময়ে পৃথিবীতে আসেন। এই চারি জনকে শাস্ত্রে চারি কুমার বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় (ইহাদের মধ্যে নেতার নাম মহারাজ শনৎকুমার। ইহারা আসিয়াই যোগবলে নিজ নিজ শরীর ধারণ করিয়া আমাদের উন্নতির জন্য খাটিতে লাগি-লেন। ইহাদের কার্য্য অনেকদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন সিদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভ্রাতা অর্থাৎ পৃথিবীবাসী মানবদের জন্য খাটিতেছেন। কাজেই ইহারা সকলে অন্য লোকে কার্য্য করি-বার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ শনৎকুমার এখনও এই পৃথিবীতেই রহিয়াছেন। ইনি মৌলিক ধাতুর তিন শ্রেণী, যৌগিক ধাতুর দানাবদ্ধ অবস্থার এক শ্রেণী, উদ্ভিদ শ্রেণী, জন্তু শ্রেণী ও মানব শ্রেণীর ক্রমশঃ উন্নতির কার্য্য পরিচালনা করিবার সর্ব্বোপরিস্থিত কর্ম্মচারী। ইহার অধীনে উক্ত সপ্তশ্রেণী দেবযোনি দেব-জাতিরও উন্নতি করিবার ভার রহিয়াছে। এখনও সমুদয় দীক্ষা মহারাজ শনৎকুমারের নামে দেওয়া হয়। মহারাজ শনৎকুমারের অধীনে মনু ও জগদ্‌গুরু কাজ করিতেছেন। পাঁচকোণ তারা মহারাজ শনৎকুমারের চিহ্ন।

এই সমিতি ভারতবর্ষে ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হইবার পর ১৯১২ সালের ২৮শে ডিসেম্বরের এক অধিবেশনে ভয়ানক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। গত ২৮শে জুনের কলিকাতার বেঙ্গল থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর ঘরে এক অধিবেশনে জগদ্‌গুরুর প্রতিমূর্ত্তি আমাদের দেখান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি-এল্, মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রতিমূর্ত্তিখানি ফটো মাত্র। ইটালি দেশের সমিতির জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক জগদ্‌গুরুর তৈল চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এই চিত্র আঁকিবার পূর্ব্বে জগদ্‌গুরুর প্রতিমূর্ত্তি মানস অঙ্কিত করিয়া, ঐ সভ্যটির (যিনি চিত্র-বিদ্যায় নিপুণ হয়েন) মানসপটে প্রতিবিম্বিত করিয়া তাঁহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা জগদ্‌গুরুকে হিমালয়ে যাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন চিত্রটি অবিকল আসলের অনু-রূপ হইয়াছে তবে আসল মুখে যেমন একটা করুণার ভাব, একটা মিষ্টতা ফুটিয়া উঠিতেছে দেখা যায়, সে ভাব এ চিত্রে দেখা যায় না। এই তৈল-চিত্রের ফটো আমরা দেখিয়া ধন্য হইলাম।

সমিতির শাখায় জগৎ জুড়িয়া গিয়াছে, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপের সকল দেশ, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলাণ্ড সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রধান স্থানেই সমিতির শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টিয়ানদের

মধ্যে সভ্য সংখ্যা বারহাজার হইবে। শ্রীমতী আনিবেশান্ত এই সমিতির রক্ষক বা প্রোটেক্টর। জে, কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক একজন মান্দ্রাজি ব্রাহ্মণ ইহার হেড্ বা সভাপতি। ইহাদের হেড্ আফিস দি থিয়জফিক্যাল সোসাইটী, আ'ডিয়ার, মান্দ্রাজ।

বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি চতুর্থ বুদ্ধ, আমার পূর্ব্বে তিন জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। আমার পরে যিনি বুদ্ধ হইবেন, তাঁহার নাম মৈত্রেয় বুদ্ধ, আমার যেমন শত শত শিষ্য, তাঁহার এইরূপ সহস্র সহস্র শিষ্য হইবেন। তিনি আদিতে মধু, মধ্যে মধু ও অন্তে মধু এইরূপ মধুময় উপদেশ প্রচার করিবেন।"

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন "এরপর একজন আসিবেন, তাঁহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জন্ম হইবে, তাঁহার দয়া আমা অপেক্ষা বেশী প্রকাশ হইবে; তিনি খুঁড়ো, বুড়ো বাদ রাখিবেন না; তবে তাঁহাব কাছে যাহারা বাদ পাড়বে, তাহাদের বহুজন্ম আর হইবে না, বুঝিতে হইবে।"

শ্রীকাত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্।

আমিত্বের বিসর্জ্জন।

যখন রঞ্জিত করে পূর্ব্ব আকাশ
আভা রক্তিমার,
যখন সন্ধ্যায় হয় সংমিশ্রিত
আলোক আঁধার,
যখন উদ্ভাসিত করে বিশ্ব সারা
ইন্দু পূর্ণিমার,
যখন অমানিশার আঁধার করে
ভীতির সঞ্চার,
যখন আকাশ ঘিরে ঘনিয়ে আসে
মেঘ বরষার,
যখন মেদুর মলয় করে তৃপ্ত
হৃদয় সবার,
যখন কুসুম নিকর বিতরয়
সৌগন্ধ সম্ভার,
যখন দিগন্ত ধ্বনে পঞ্চম তানে
বসন্ত সখার,
যখন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় পূর্ণ
হৃদয় মাঝার,
যখন নীলাম্বরে ব্যক্ত হয় কা'র
মহিমা অপার,
যখন পর্ব্বতমূলে দণ্ডায়মান
হই একবার,
যখন অনন্ত সিন্ধুর কর্ণে পশে
কল্লোল ঝঙ্কার,
তখন স্বতঃই যেন মুছে যায়
আমিত্ব আমার,
তখন ক্ষণেকের তরে যাই ভুলি
সব আপনার।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সুধা।

হৃদি-বনে যাঁর,   ফুটে অনিবার,
ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-ফুল ;
এ-মর জগতে,   তুলনা দিতে—
কে আছে তাঁহার তুল ?
সেইজন হেথা   প্রত্যক্ষ দেবতা,
স্বর্গ তাঁহার হৃদয়।
তাঁর কাছে গেলে,   সদা সুধা মিলে,
সে যে সুধার নিলয়।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

কোথা তুমি ?

নিবিড় তিমিরাবৃত বারিধি ভীষণ
সংক্ষুব্ধ ঝটিকাঘাতে কল্লোল আকুল
ফেনিল উচ্ছ্বাসে ছুটে করিয়া গর্জ্জন
প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণি, বালুময় কূল।
সে গহন ধ্বান্ত মাঝে আমি দৃষ্টিহীন
পথহারা, লক্ষ্যহারা, জ্ঞানবুদ্ধি হারা,
যুঝিতেছি প্রাণপণে শুধু নিশিদিন
উন্মত্ত তরঙ্গ সনে হয়ে আত্মহারা।
ঘাত-প্রতিঘাতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত
জীবন যন্ত্রণাভরা শরীর বিকল
নয়ন নিষ্প্রভ-জ্যোতিঃ—তপ্ত অশ্রুপ্লুত
বদন নৈরাশ্য-ম্লান—উদ্দেশ্য বিফল।
অশান্তির বাড়বাগ্নি হইছে সতত
বিস্তারিয়া শত জিহ্বা অনন্ত দাহনে
তারকার মত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা শত
উঠিতেছে নিবিতেছে হৃদয়-গগনে।
পললাশী হিংস্র প্রাণী কুম্ভীরের প্রায়
আসিছে গ্রাসিতে সদা দুষ্ট রিপুগণ
উন্মত্ত পরাণ ডুবিছে অতলে হায়,
যশ-মান-রত্ন শুধু করিতে অর্জ্জন।
নিষ্ঠুর ব্যাধির বিষে তনু জর্জ্জরিত
রুগ্ন, ক্লিষ্ট শীর্ণ চির অর্দ্ধমৃত প্রায়
শোক তীব্র তুষানলে হৃদয় নিয়ত
জ্বলিয়া পুড়িয়া যে গো ছারখারে যায়।
দারা পুত্র ভগিনী ভ্রাতা জনক-জননী
প্রসারিয়ে শত বাহু মোহিনী মায়ার
বাঁধিয়া ফেলেছে মোরে মায়াবী অবনী
ভ্রমিতেছি করি শুধু আমার আমার।
এক দিন দিয়ে দেখা এত দীর্ঘ দিন
কোথায় রহিলে প্রভু ত্যজি অভাগায়
কতই দিবস হল বরষেতে লীন
তথাপি আমার কিগো হল না উপায় ?
সকাতরে ডাকি আমি মরণ আতুর
আর না বহিতে পারি যাতনার ভার
রেখনা কবলে আর সংসার-রাহুর
দেহ স্থান পদছায়ে তনয়ে তোমার।
ডাকিতেছি দীন স্বরে কোথা তুমি বলে
যায় নাকি তব কাছে এ দীন ক্রন্দন
বুঝিবা ডাকার মত ডাকি নাই বলে'
ভুলিয়া রয়েছ তুমি সন্তানে আপন ?
পিতার আদরে দুষ্ট কৃতঘ্ন সন্তান
যদিও ভুলিয়া থাকে পিতারে আপন
স্নেহময় শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার পরাণ
সন্তানে ভুলিয়া স্থির থাকে কি কখন ?

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়।

স্বপ্ন পথে।

(বিদ্যাপতি পদাঙ্কানুসরণে)

রাতকো মন্দিরে একলা আছনু
শুতিয়া নিন্দ কি কোর।
চকিতহি জনু কামিনী রোদন
পশিল শ্রবণে মোর॥
হামারি পরাণ আকুল ভেল।
চমকি উঠয়ে খিড়কী সকাশ
পেখইতে হাম গেল॥
অম্বর উপরি চান্দ কি উজোরি
নিঝুম নিঝুম ধরা।
বিমল প্রকৃতি ধেয়ানে মগনা
ধূর্জ্জটি শঙ্কর পারা॥
সহসা অদূরে হেরনু যাইতে
অপরূপ বর নারী।
যাহুঁক গতিমে অপরূপ ছন্দ,
ভাববে গীত বিথারি॥
নতমুখা-বদনী বিজমলি থোরি,
যাবহি হেবন মোয়।
হরিণী হীন হিম ধাম সে জনু
সুধা বরিখণ হোয়॥
নয়ন পলব মুদিয়া যায়ল
দেখলু যব সে হাম।
পুন জৈ চাহনু পেখনু পূরবে
ভানু ভেল পরকাশ॥

শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায়,
এম-এ (প্রিভ) বিদ্যার্ণব।

অবস্থান।

বিশ্ব আছে স্তব্ধ হ'য়ে শুনি তব মুরলির তান।
মোহেতে আচ্ছন্ন জীব শুনি তব মোহময় গান॥
সকলেতে সমভাবে আছ তুমি বর্ত্তমান প্রভু,
অন্ধ মোরা তাই তোমা হেরিয়াও হের্‌বনাক কভু।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কাব্যনিধি।

ব্রজেশ্বরীর উদ্দেশে।

(ব্রজেশ্বরের উক্তি)

করুণ বড় মুখখানি তার
আমার পানে চেয়ে থাকে।
বল্‌লে দুটো হাসির কথা
লাজে বদন ঢেকে রাখে॥
শ্রান্ত ওষ্ঠে বিলায় তার
পাগল করা চকিত হাসি।
সলিল বুকে ফোটায় তার
কুসুম-ভরা জ্যোৎস্না রাশি॥
ব্যথিত হ'লে আমার দুখে
(তারে) বিষাদ-রেণু ছায় সে ক্ষণে।
ডাকলে তারে, বাঁশীর গানে
লুকিয়ে হাসে ফুলের প্রাণে॥
কাঁদলে পরে তাহার তরে
ভুলায় মোরে মৃদুল-গানে।
সে যে আঁচলে লুকিয়ে রাখে
জগতের এই মাঝখানে॥

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

মালিক খুস্‌রু।

হিন্দুদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এরূপ মুসলমান নরপতির নাম করিতে হইলে, মোগল সম্রাট আকবর শাহেরই নাম করিতে হয়। কিন্তু আকবর শাহ ব্যতীত আরও একজন মুসলমান রাজা ছিলেন, যিনি হিন্দু-ধর্ম্মের বলবিধানকল্পে এমন কতকগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহা আকবর শাহের সহানুভূতিকেও কিয়দংশে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। এই হিন্দু-বন্ধু মুসলমান রাজের নাম মালিক খুস্রু।* ইনি খিলিজি বংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এত অল্প দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে তাঁহাকে রাজপর্য্যায়ের মধ্যেই গণ্য করা হয় না।

মালিক খুস্রুর প্রকৃত নাম হাসন। ইঁনি কুতব-উদ্দীন খিলিজির এক জন পরোয়ারী বংশীয় ক্রীতদাস ছিলেন। নিজের বুদ্ধিবলে, ইঁনি সুলতান কুতব-উদ্দীনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও তাঁহার সমস্ত দুষ্কার্য্যের সহায়ক হইয়া উঠেন; এবং ক্রমে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া শেষে সুলতানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। বিপুলবাহিনীর আধিপত্য লাভ করিয়া, ইঁনি এরূপ পরাক্রমশালী ও রাজ্যমধ্যে এরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন যে, তাঁহার অঙ্গুলীহেলন মাত্রে শাসন-সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

খুস্রু যেমন সুচতুর তেমনি সাহসী যোদ্ধাও ছিলেন। ১৩১৯ খৃঃ অঃ তিনি সমৃদ্ধিশালী মালব প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং তথায় এক বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক সমগ্র দেশ লুণ্ঠন করিয়া, বিপুল ধনরত্ন সমভিব্যাহারে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। কথিত আছে, "যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমুযত্র চতুষ্টয়ম্॥" যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকিতা, ইহাদের প্রত্যেকটীই অনর্থের মূল, একাধারে ইহাদের সকলগুলির একত্র সমাবেশ হইলে ত কোনও কথাই নাই। খুস্রুর ইতিপূর্ব্বে যৌবন ও প্রভুত্ব ছিল, এখন তৎসঙ্গে মালব-লুণ্ঠন করিয়া ধনসম্পত্তিরও সংযোগ ঘটিল। সুতরাং তিনি আর তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; রাজ্যলাভ আশায় লুব্ধ হইয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার মানসে, নানারূপ চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে তিনি কতিপয় প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই সকল সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষী আত্ম-সম্মান-জ্ঞানী আমীর ওমরাহগণ স্বেচ্ছায় রাজ-দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরদেশে গমন করিয়া স্ব স্ব মানরক্ষা করিতে লাগিলেন। খুস্রুরও সুবিধা হইল। তিনি স্বীয় আত্মীয় স্বজনগণকে প্রধান প্রধান

* পর্য্যটক ইবন বতুতা ইঁহাকে খুস্রু খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দরবারগৃহ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে রাজ দরবার নিষ্কণ্টক হইলে, খুসরু রাজহত্যায় মনোনিবেশ করিলেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া সুলতানকে জানাইলেন যে, বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তখনকার সময়ে এইরূপ রীতি ছিল যে, কোনও হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, সুলতান তাঁহাদিগকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। খুসরুর কথা শুনিয়া সুলতান কুতব-উদ্দীন এই সকল মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু হিন্দুগণকে দরবার-গৃহে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। চক্রী খুসরু বলিলেন যে, ইহাঁরা লজ্জায় দিবাভাগে দরবার-গৃহে আগমন করিতে অনিচ্ছুক; ইহাঁদিগকে রাত্রে দরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ করা হউক। খুসরুর উপর সুলতানের অগাধ বিশ্বাস; সুতরাং তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া খুসরুর কথানুরূপই আদেশ প্রদান করিলেন। (১)

খুসরুর দুরভিসন্ধি অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার প্রভুত্ব ও তাঁহার উপর সুলতানের অগাধ বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়া কেহই কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা করিতে সাহসী হন নাই। সুলতান কুতব-উদ্দীনের শিক্ষাগুরু কাজি জিয়াউদ্দীন কুতবকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কুতবের পতন সন্নিকট দেখিয়া তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; সুলতানের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। সকল ব্যাপার খুলিয়া প্রকাশ করিলে কি হইবে, শাস্ত্রে কথিত আছে,—

"দীপনির্ব্বাণগন্ধং চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥"

অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে লোকে সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করে না। সুলতান প্রথমতঃ গুরু জিয়াউদ্দীনের কথা বিশ্বাসই করিলেন না; পরে অনেক অনুরোধের পর এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইলেন মাত্র।

সুচতুর খুসরু সকল দিকে নজর রাখিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের মনে সন্দেহ শিথিল করিয়া দিবার মানসে, স্ত্রীবেশে রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া বারাঙ্গনার ন্যায় অঙ্গভঙ্গি করতঃ সুলতানের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হইলেন। সুলতান হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। খুসরুর কৌতুকে প্রীত হইয়া "প্রিয়ে, তোমার শত অপরাধ থাকিলেও তোমার ঐ মৃদু হাসিতে আমি সকলই বিস্মৃত হইতে পারি" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সাদরে খুসরুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজির সমস্ত উপদেশ বাক্য মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিলেন।

সুলতানের এই সরল ব্যবহারেও খুসরু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; বিলম্বে কার্য্য-

(১) ইহা বিখ্যাত পর্যটক ইবন-বতুতা লিখিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইল। তারিখি ফিরোজশাহি ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে,—খুসরু তাঁহার কতিপয় আত্মীয়কে তোজ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, প্রাসাদের বহিঃপ্রকোষ্ঠে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

হানির আশঙ্কা করিয়া, তিনি সেই রাত্রেই হত্যাকাণ্ড সমাধা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

খুসরু তাঁহার ভারতীয় সৈন্যগণের মধ্য হইতে কয়েকটী শৌর্য্য ও বীর্য্যসম্পন্ন সৈন্য বাছাই করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু হিন্দু বলিয়া রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই সৈন্যগণের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা খাঁ-ই-খাঁমানও বর্ত্তমান ছিলেন।

গ্রীষ্মকাল, সুলতান সামান্য দুই একজন রক্ষী পরিবৃত হইয়া ছাদের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময় খুসরুর সৈন্যগণ সশস্ত্রে ছদ্মবেশে প্রাসাদের চতুর্থ দ্বার অতিক্রম করিয়া পঞ্চম দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজি খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই পঞ্চম দ্বারের রক্ষী ছিলেন। ইনি সন্দেহবশে এই সকল সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। সৈন্য-গণ সহসা তাহাদের গতি প্রতিহত হইতে দেখিয়া, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়াই দ্বার-রক্ষী কাজি খাঁর শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে একটা কোলাহলও উত্থিত হইল। (২)

কোলাহল সুলতানের কর্ণগোচর হইলে, তিনি খুসরুকে উহার কারণ জানিতে আদেশ করেন। খুসরু অনুসন্ধানের ভান করিয়া বাহিরের দ্বারদেশে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন এবং সুলতানকে বলিলেন যে, যে সকল মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু হিন্দুর আজ রাজ প্রাসাদে আসিবার অনুমতি ছিল, কাজি খাঁ তাহাদের গতিরোধ করায় গোলমাল উত্থিত হইয়াছে। সুলতানের কিন্তু কেমন সন্দেহ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, ভয়-ব্যাকুল চিত্তে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইতে উদ্যত হইলে খুসরু খাঁ ক্ষিপ্র গতিতে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া গতিরোধ করেন। ইহার পর মুহূর্ত্তেই খুসরুর সৈন্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সুলতানের শিরশ্ছেদ করে।

রাজহত্যা করিয়াই খুসরু ক্ষান্ত হইলেন না, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দীনের বিধবা মহিষী ও অল্প বয়স্ক রাজকুমারগণকে একে একে নিধন করিলেন। পুরাঙ্গনাগণের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেও ত্রুটি করিলেন না। কুতবউদ্দীনের বিধবা মহিষীকে তিনি নিজের অঙ্কশায়িনী করিয়া লইলেন এবং অপর পুরনারীগণকে পরোয়ারীদিগের অন্তঃ-পুরভুক্ত করিয়া দিলেন।

সেই রাত্রেই খুসরু রাজ্যের আমির ও ওমরাহগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কেহই এ ব্যাপার অবগত ছিল না। সকলে দরবার-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, মালিক খুসরু সিংহাসনারূঢ় হইয়া অবস্থিতি

---

(২) পর্য্যটক ইবন-বতুতা এইরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 'তারিখ-ফিরোজ সাহি' ইতিহাস গ্রন্থের বিবরণ ভিন্নরূপ। ইহাতে কথিত আছে,—সুলতান কুতব-উদ্দীনের শিক্ষাগুরু কাজি জিয়াউদ্দীন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া উহার প্রতিকার কামনায় প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হন। দ্বারে খুসরুর পিতৃব্য মন্দুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মন্দুলের সহিত তিনি সবে মাত্র কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় পশ্চাদ্ভাগ হইতে জাহরয়া নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে পুরী মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়।

করিতেছেন। তখন ঘটনা তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। কাহারও আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও, ভয়ে সকলে খুসরুরে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে অঙ্গীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

খুসরু পরদিন প্রাতঃকালে নাসিরউদ্দীন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (খৃঃ অঃ ১৩২১); এবং আমির ওমরাহ প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রেরণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। তিনি নিজের নামে 'কুতবা' পাঠ করান এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে প্রয়াস পান। *

সিংহাসনারোহণ করিয়াই তিনি দিল্লীর মসজিদের যাবতীয় কোরাণ পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া আসনরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যমধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মোল্লাগণ একত্রে রাজসকাশে বহু অনুনয়-বিনয় সহকারে আবেদন-পত্র পেশ করিতে লাগিল। খুসরু এ সকল ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, উপরন্তু প্রতি মসজিদে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিলেন। ঐ আদেশ প্রতিপালিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য মধ্যে ভীষণ বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রতি মসজিদে যথোপযুক্ত সৈন্যের সাহায্যে দেবমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেও, প্রধান জুম্মা মসজিদে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে এরূপ ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল যে, খুসরুকে অনেক বলক্ষয় করিতে হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে চারি দিন দাঙ্গা করিবার পর তিনি স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

খুসরুর একটী প্রধান গুণ ছিল, তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইতেন, সহজে সে কার্য্য হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। দিল্লী সহরে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এ কার্য্যে যে তাঁহার পতন অবশ্য-ম্ভাবী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন, তথাপি কোনও প্রতিবন্ধকই তাঁহাকে স্বকার্য্য-সাধনে বিরত করিতে পারে নাই। তিনি দেশবিদেশ হইতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া রাজ-তত্ত্বাবধানে মসজিদে মসজিদে শাস্ত্রালোচনার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গোহত্যা নিবারণার্থ রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। সিংহাসনারোহণের পর এক মাসের মধ্যে দিল্লী হইতে মুসলমান প্রাধান্য প্রায় তিরোহিত হইয়া আসিল।

অনেকে অনুমান করেন, খুসরু হিন্দু ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইতি-হাসে লিখিত আছে—খুসরু গুজরাটের অধি-বাসী পরোয়ারী বংশ-সম্ভূত। পরোয়ারীরা হিন্দু কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত

* তারিখি-ফিরোজশাহি পুস্তকে লিখিত আছে যে, কাজি জিয়াউদ্দীনের পরিবারবর্গ পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। খুসরু তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহ ও ধনরত্নাদি তাঁহার মাতুলকে প্রদান করেন। ভ্রাতা খাঁ খানান ও মাতুল রায় রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করিবার জন্য আইন-উল মুল্ক মুলতানীকে আলাম খাঁ উপাধি, তাজ-উল-মুল্ককে দেওয়ানী ও জনা খাঁকে অশ্ব-শালার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। রাজ হত্যাকারী জাহর খাঁকে খুসরু আপাদমস্তক মণি মুক্তায় ভূষিত করিয়াছিলেন।

করেন বটে, কিন্তু ইহারা যে গো-মাংস ভক্ষণ করিতেন, এরূপ বিবরণও পাওয়া যায়। গো-মাংস ভক্ষণকারীদিগকে হিন্দুনামে অভিহিত করা কখনই সমীচীন নহে ; উপরন্তু পবোয়ারী-গণকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, খুস্রু কুতব-উদ্দীনের ক্রীতদাস হইয়া যে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়েরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। * কেবল তাহাই নহে, তিনি নিজেকে যে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন, কোনও কোনও ইতিহাস গ্রন্থে এরূপও দেখা গিয়াছে। † জাতিতেই হউক, অথবা দীক্ষিত হইয়াই হউক, মুসলমান হইয়া, মুসলমান প্রাধান্য সময়ে হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, কেবল সহানুভূতি নহে, দিল্লীর ন্যায় রাজধানীতে মস্‌জিদে মস্‌জিদে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা কম সাহসের পরিচায়ক নহে। এই অসমসাহসিক কার্য্যই খুস্রুর পতনের একমাত্র কারণ।

খুস্রু সর্ব্বসমেত চারি মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই চারি মাসের মধ্যেই দিল্লী মুসলমানগণ এতদূর শঙ্কাকুল হইয়া উঠেন যে, খুস্রুর কবল হইতে সাম্রাজ্য উদ্ধারকল্পে তাঁহারা পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াস-উদ্দীন তোগলকের শরণাপন্ন হন। এতদনুসরণে গিয়াস-উদ্দীন দিল্লী আক্রমণ করেন। খুস্রু পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে এক সমাধি-মন্দিরে লুক্কায়িত হয়েন এবং সে স্থানে তিন দিন অনাহারে থাকিয়া, চতুর্থ দিবসে ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্বীয় অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিবা মানসে তথা হইতে বহির্গত হইলে, গিয়াস উদ্দীনের পুত্র ফকীর উদ্দীন জুনা খাঁর হস্তে বন্দী হন। গিয়াস-উদ্দীন তাহার প্রতি বাজার ন্যায় ব্যবহার করেন এবং কুতবের হত্যাস্থলেই তাহার শিরচ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। গিয়াস-উদ্দীনের পুত্র ফকীর উদ্দীন এই হত্যাকার্য্য সমাধা করেন।*

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খুস্রুকে অতি নৃশংস ও অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য খুস্রু সিংহাসন অধিকারকালে কতকগুলি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত করিয়া কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ কৃতঘ্নতার নিদর্শন পাঠান রাজত্বে বিরল নহে। পাঠান রাজগণের মধ্যে অধিকাংশ নৃপতি এরূপ কৃতঘ্নতার পরিচয়-প্রদানে সিংহাসন অধিকার করেন। সুতরাং খুস্রুর অপরাধ সে সকল নৃপতিগণের তুলনায় এমন কিছু বেশী হয় নাই যে, তাহাকে অতি নৃশংস বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। খুস্রু মুসলমান হইয়াও কেন যে এরূপ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কোন ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। কোনও কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক

---

* "Mubarak had a great farourite named Malik Khusru, a low caste Hindu who had embraced Mahammadanism.

Hara Prasad Sastri.

"* * * allowed a low-born Hindu *conrert* Khusru Khán, to mismanage state-affairs"

Vincent A. Smith.

† "While outwardly professing Islam, Khusru desecrated Kuram by using it as a seat. * * *"—*(W. W. Hunter).*

বলেন,—আলাউদ্দীন খিলিজি হিন্দুগণের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, খুসরুর অত্যাচার তাহারই প্রতিফল মাত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্নেহের জয়।

হেতমপুরের বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্যের একমাত্র সন্তান গোপালচন্দ্র যখন পিতার নিকট ব্যাকরণ শেষ করিয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করিল, সেই সময় একদিন তাহার প্রতিবেশী-পুত্র নন্দলাল ঘোষ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া একখানি সুন্দর পুস্তক হস্তে করিয়া গোপালকে বলিল "গোপাল দাদা, দেখ আমি এবার স্কুলে পড়িয়া কেমন সুন্দর বইখানি উপহার পাইয়াছি।

নন্দলালের সৌভাগ্য গোপালচন্দ্রের প্রাণে সহ্য হইল না। সে পিতাকে রোদন-স্বরে বলিল "বা[illegible]তামার কাছে আমি আর পড়্‌ব না। আমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও।"

বিপ্রদাসের ধারণা ছিল, ইংরাজী পড়িলে মানুষ সাহেব হইয়া যায়, এবং পরে সাহেবদের মত পিতামাতাকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী দয়াময়ীর একান্ত অনুরোধে এবং পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গোপালকে গ্রামস্থ স্কুলে ভর্ত্তি করিতে হইল।

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, গ্রামস্থ এবং ভিন্ন গ্রামের কয়েক ঘর শিষ্যের বাড়ী নিত্য-সেবা ও ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া, এবং কয়েক বিঘা জমী নিজে চাষ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটি চলিয়া যাইত। সংসারে স্ত্রী ও সপ্তম বর্ষীয় পুত্র গোপাল ব্যতীত অন্য কোন লোক ছিল না। দয়াময়ী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বৃদ্ধ বয়সে দয়াময়ী তাঁহাকে পুত্র-মুখ দর্শন করাইয়া স্বামীর বড়ই সুনজরে পড়িয়াছিলেন। একে ত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাহার উপর পুত্র-রত্ন প্রসব করিয়া অবধি ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেকাজেই তাঁহার পুত্রকে স্কুলে দিবার অনুরোধ, ব্রাহ্মণ উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কিন্তু তথাপি তিনি স্ত্রীকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "গোপালকে ত স্কুলে দিলাম। কিন্তু শেষে না পস্তাইতে হয়।"

গোপাল মেধাবী বালক, একে একে ছাত্রবৃত্তি, মাইনর, প্রবেশিকা পরীক্ষা উচ্চ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাসের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। এই কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহার জমী জায়গা সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত তাঁহার বাস্তুভিটাটী মাত্র সম্বল। কলিকাতা বড়বাজারের বিখ্যাত আড়ৎদার ননীলাল ঘোষ তাঁহার প্রধান শিষ্য, তাঁহারই সাহায্যে গোপালকে এতদূর পড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন। গোপাল তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দেশে আসিয়াছে।

(২)

বৈশাখ মাস, দারুণ গ্রীষ্মে লোকের প্রাণ অস্থির; বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। রৌদ্রে চারিদিক ঝম্‌ঝম্ করিতেছে। প্রাণিমাত্রেই শীতল স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করিতেছে। গোপাল আজ প্রাতে তাহার

কোন সহপাঠীর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। বিপ্রদাস প্রাতে কোন দূর গ্রামে পূজা করিতে গিয়াছেন। তিনি এখনও ফিরেন নাই। দয়াময়ী একাকিনী আহারাদি প্রস্তুতের পর গৃহের মধ্যে একখানি মাদুর বিছাইয়া শায়িতা। এমন সময় তিনি দ্বার খুলিতেই ডাক পিয়ন তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি পুনর্ব্বার শয্যা গ্রহণ করিলেন।

প্রায় বেলা তিনটার সময় পূজাদি সারিয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে বিপ্রদাস বাড়ী প্রবেশ করিলেন। দয়াময়ী তাহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিলেন। একটী থালায় অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া আহার শেষ করিয়া আঁচমন পূর্ব্বক বলিলেন,—"গোপালকে আর পড়াইতে পারিলাম না। সবই ত গেল, ভরসা মাত্র ননী ঘোষ, সে যদি ভরসা দেয় তবেই।"

বিপ্রদাস একখানি জল-চৌকিতে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। দয়াময়ী তামাক প্রস্তুত করিয়া কলিকায় "ফু" দিতে দিতে একখানি পত্র হাতে লইয়া বলিলেন,—"দেখ এই চিঠিখানি আজ ডাকে এসেছে। ব্রাহ্মণ পত্রখানি হস্তে লইয়া পাঠ করিতে করিতে যেন কেমন হইয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখখানিতে কে যেন খানিকটা কালী মাখাইয়া দিল। দুই হস্তে আপন মস্তকটী চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"সর্ব্বনাশ, ননী ঘোষ মারা গিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের আশার ক্ষীণ বর্ত্তিকাটি হঠাৎ নির্ব্বাণ হইল। গোপাল সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিয়া এ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। অর্দ্ধপথে বাধা পাইয়া এই মেধাবী বালক বড়ই মর্ম্মাহত হইল।

কলিকাতার ২নং বৈটকখানা রোডে একটি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীতে আজ মহা সমারোহ, একটি প্রশস্ত দালানে শ্রাদ্ধোপযোগী নানান বস্তু থরে থরে সজ্জিত। বহুদূর হইতে অনেক আত্মীয় স্বজন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধোপলক্ষে আগমন করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যদিগের শাস্ত্রীয় তর্ক, লোকজনের বাক্-বিতণ্ডা, বালকবালিকার আনন্দ কোলাহলে বাড়ীটি যেন মুখরিত।

অদ্য ননীলাল ঘোষের শ্রাদ্ধ। বিপ্রদাস দুই দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। শ্রাদ্ধবাড়ী আসিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণের মত যথেষ্ট প্রাপ্তি সত্ত্বেও তিনি তেমন সুখী হইতে পারেন নাই। একমাত্র আশ্রয় ও প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে তিনি বিশেষভাবে দুঃখিতই হইয়াছেন।

একদিন প্রাতঃকালে, একটি নাতিদীর্ঘ সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া বিপ্রদাস তাঁহার কলিকাতার একটি বন্ধুর নিকট ননীঘোষের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, গোপালের পাঠ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এমন সময় ননী ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কপী ঘোষ আসিয়া বসিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপাল বাবুকে আর পড়াইবেন না কি? ভটচায্যের ছেলের আর বেশিপড়ার দরকারই বা কি? আর আমাদের ত এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে যে আর আপনাকে

কোন সাহায্য করিতে পারিব—সে আশাও নাই।”

ফণী ঘোষ যাহা বলিবে, বিপ্রদাস পূর্ব্বেই তাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ননীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সকল আশা নির্ম্মূল হইবে। তিনি ফণিকে ভালরূপ জানিতেন; তাহাকে আর কোন কথা বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। যে বন্ধুটির সহিত ইতিপূর্ব্বে তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“শুন্‌লেন ত? ছেলেটা আমার বড় ভাল বলে তাকে পড়াবার আমার এত আকিঞ্চন।”

বন্ধুটি কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—“আপনি এক কাজ করুন। গোপালের বিবাহ দিন। আমি সবজজ রমেশবাবুর ছেলেকে পড়াইয়া থাকি, তাঁহার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে, কন্যাটী আমি দেখিয়াছি—কন্যা শিক্ষিতা এবং সুন্দরী। রমেশবাবু একদিন আমার নিকট কন্যা কল্যাণীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন—“একটি গরীবঘরের ভাল ছেলে পাইলে, তিনি তাহাকে মানুষ করিয়া লইতে পারেন। আমার বোধ হয় তিনি আপনার শ্বশুর হইবেন।

(৩)

সবজজ কন্যা কল্যাণীর সহিত গোপালচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গোপালের আর সে দিন নাই। রমেশবাবুর কৃপায় তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন আর গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান নহে। এখন সে, “গোপাল বাবু”—সবজজ জামাতা। গোপালের প্রতিভা দেখিয়া রমেশবাবু বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শ্বশুরালয়ে থাকিয়া সে কলেজে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। গোপালচন্দ্র একে একে আই এ, বি এ, ও এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর মহাশয়ের স্নেহ-যত্ন অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিপ্রদাস মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া যাইতেন এবং দয়াময়ীকে সে সংবাদ দিয়া সুখী করিতেন।

বিবাহের পর মাত্র সাতদিনের জন্য নববধূ কল্যাণী শ্বশুরালয় হেতমপুরের বাটীতে আসিয়াছিল। কিন্তু ঐ সাতদিনের মধ্যে, সবজজ কন্যার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে গিয়া বৃদ্ধ বিপ্রদাসের প্রাণান্ত পরিশ্রম হইয়াছে। এবং যথাবিহিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে তাঁহার শেষ সম্বল বাস্তুভিটাটি পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছে। যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তিনি কল্যাণীকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া আসিয়াছে “সে আর কখনও এ জঙ্গলী দেশে আসিবে না।”

সে দিন পূর্ণিমা রজনী। আকাশ মেঘশূন্য নির্ম্মল। চন্দ্রদেব নীল আকাশে সকাল সকাল উঠিয়া নিজে হাসিতেছেন এবং জগৎ শুদ্ধ সকলকেই হাসাইতেছেন। বৃক্ষ লতা, পশু, পক্ষী, সকলেই যেন সেই নির্ম্মল হাসিতে আজ যোগদান করিয়া, চন্দ্রমা-কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সকলে হাসিতেছে, আজ বিপ্রদাস বড়ই বিষণ্ণ; অর্থাভাবে এবৎসর তাঁহার দুর্গোৎসব হয় নাই, বিজয়ার প্রীতি

অবস্থাতেই তিনি তাঁহার ভগ্ন ঘরের ছিদ্রপথ হইতে চাঁদের আলো আজ তাঁহার পক্ষে সুখের বদলে দুঃখই ঢালিয়া দিতেছে। পুত্র গোপাল অনেক দিন দেশে আসেন নাই। ব্রাহ্মণী বড়ই কাতরা হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্রের পাঠের খরচ নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। শেষ সম্বল বাস্তুভিটাটীও নববধূ কল্যাণীর সম্বর্দ্ধনায় হস্তচ্যুত প্রায়। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ সুখী হইবেন কি করিয়া? বড় ঘরে আত্মীয়তা করিয়া তিনি যে বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহা এখন তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। এখন ভরসা মাত্র গোপাল, সে যদি মানুষ হইয়া পিতামাতাকে সুখী করে তবেই।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর গত হইল। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের স্বভাব-চরিত্র ও মনোবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে এখন জনসমাজে দরিদ্র পিতার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। অধিক সময় এবং অনেক স্থানে সে পিতার পরিবর্ত্তে শ্বশুর মহাশয়েরই পরিচয় দিয়া সুখী হয়। গোপাল এখন বহু বড়লোকের সহিত পরিচিত।

ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, একদিন বিপ্রদাস পুত্র-দর্শনাভিলাষে কলিকাতায় আসিলেন। সে দিন্ কোন বড় লোকের বাড়ীতে গোপালের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি যখন রমেশবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তখন গোপালচন্দ্র সাহেবী বেশে সজ্জিত হইয়া একখানি "ফিটনে" আসিয়া উঠিল। ঘোড়া যোতা হইলেই গাড়ী বাহির হইয়া যাইবে। বিপ্রদাস গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অনিমিষ-লোচনে পুত্রের সৌভাগ্য-দর্শনে পুলকিতচিত্তে মনে মনে ভগবানের নিকট গোপালের দীর্ঘ জীবন কামনা করিলেন এবং প্রকাশ্যে বলিলেন "বাবা বেশ ভাল ছিলে ত? এবার আমার সঙ্গে তোমায় বাড়ী যেতে হবে, কারণ তোমার জননী বড়ই কাতরা হইয়াছেন।" পিতার দর্শনে বা তাঁহার কথা কয়টীতে পুত্রের কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। গোপাল অবিচলিত স্বরে কোচম্যানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "জলদি করো, দেরি হোতা হ্যায়।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন পুত্র বোধ হয় তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই? একটু উচ্চঃস্বরে বলিলেন—"বাবা কখন ফিরবে? একবার পিতার দিকে বক্রনয়নে চাহিয়া, বিরক্তিস্বরে গোপাল বলিলেন—"আপনি রোজ রোজ কেন এখানে আসেন? এরকম বেশে এখানে আসিতে আপনার লজ্জা বোধ হয় না? আপনার যাহা দরকার হইবে পত্রের দ্বারা জানাইতে পারেন।"

এতদিন পুত্রের ভাবগতিক ব্রাহ্মণের নিকট ভাল বোধ হইতেছিল না। কিন্তু স্নেহ অন্ধ পিতা পুত্রের উপর সন্দেহ করিতেও সাহস করেন নাই। তাঁহার গোপালই একমাত্র ভরসা। গোপালকে সন্দেহ করিলে চলিবে কেন? কিন্তু অদ্য পুত্রের এই নিদারুণ বাক্যগুলি তাঁহার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইল। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, চক্ষে জগৎ অন্ধকার

দেখিলেন, পৃথিবী যেন তাঁহার পদতল হইতে নিমেষে সরিয়া গেল, তিনি পড়িয়া গেলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাবুক পড়িল, গোপাল সমেত ফিটন সশব্দে ফটক পার হইয়া গেল।

(৪)

রমেশবাবু গোপালের কোন অভাব না রাখিলেও, তিনি গোপালকে যে পকেট খরচ দিতেন, তাহাতে গোপালের অভাব মিটিত না। সবজজ কন্যা কল্যাণীর সময়োচিত প্রার্থনাগুলি অনেক সময় পূর্ণ করিতে না পারিয়া সে বিশেষ লজ্জিত হইত। অগত্যা গোপাল এখন অর্থ উপার্জ্জনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং সত্বরই রমেশ বাবুর সুপারিশে কোন রেল কোম্পানীর আফিসে সে একটী বড় পদ পাইল, শীঘ্রই সে ২০০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা বেতন পাইতে লাগিল। গোপাল শিক্ষিত যুবক, সে কি পিতামাতাকে একেবারে ভুলিতে পারে? চাকুরি হইবার দুই মাস পর হইতে সে পিতাকে মাসে কুড়িটী মুদ্রা পাঠাইয়া থাকে।

বিপ্রদাস আর কলিকাতায় আসেন না, কারণ এখনও তিনি তাঁহার পোষাকের কোনরূপ উন্নতি করিতে পারেন নাই। পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে উভয়েই তাঁহারা বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পুত্র প্রেরিত কুড়িটী মুদ্রায় কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ব্রাহ্মণী পুত্রের অভাবে অনেক কাঁদিয়া শেষে পাষাণ হইয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পরে তিনি শুনিলেন গোপাল ঐ রেলের ম্যানেজার হইয়াছে। তাহার বেতন সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত টাকা হইয়াছে। পুত্রের সৌভাগ্যে তি এখনত সুখী হইলেন। এবং আশা হইল শীঘ্র পুত্র দেশের দিকে নজর দিবে।

বিপ্রদাসের বাস্তুভিটাটী যে লোকের নিকট দুই বৎসর মেয়াদে বন্ধক ছিল, তাহার সময় উত্তীর্ণপ্রায়, মহাজন অনেক তাগাদা করিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পুত্রের দোহাই দিয়া এতদিন তাহাকে শান্ত করিয়া আসিয়াছেন। অদ্য সে আসিয়া বলিয়া গেল, "আর সাতদিনের মধ্যে যদি তিনি কর্জ্জ পরিশোধ না করেন, তবে বাটী নিলামে চড়িবে।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপ্রদাস গোপালকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে যদি সাতদিনের মধ্যে টাকা না আসে, তবে তাঁহাকে ভিটা ছাড়া হইতে হইবে।

যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল, গোপাল লিখিয়াছে—"আপনার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলাম। উপস্থিত আমার অনেক খরচ, এ মাসে অনেক টাকার দরকার কারণ, আমার স্ত্রীর কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে উপঢৌকন স্বরূপ একছড়া নেক্‌লেস তৈয়ারি করাইতে হইবে। আমার স্ত্রীর দেহও খুব খারাপ, ডাক্তারদের মতে তাঁহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাইতে পাঠান বিশেষ আবশ্যক। আগামী দুই মাস আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্য হইবে না, পরে বিবেচনা করা যাইবে।"

(৫)

অদ্য দুই মাস বিপ্রদাস ভিটা ছাড়া হইয়াছেন। তিনি অনেক স্থানে মাথা রাখিবার

একটু স্থান প্রার্থনা করিয়া হতাশ হইয়াছেন। কেহই তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে—"যার রাজার মত ছেলে তার আবার অভাব কিসের? লক্ষ্মীর মা কি কখনও ভিক্ষা মাগে?"

ক্ষোভে, দুঃখে অবসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ লোকালয় ত্যাগ করিয়া গাছতলা আশ্রয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণীও অবস্থার বিপর্য্যয়ে অকালে বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন! এত দুঃখেও কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার স্বামী-ভক্তি শতগুণে বর্দ্ধিতই হইয়াছে। তাঁহার সেবা ও যত্নে ব্রাহ্মণ এখনও দাঁড়াইয়া আছেন, নতুবা অনেকদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে পাগল হইতে হইত।

ভিক্ষাই যখন বৃত্তি এবং গাছতলাই যখন সম্বল হইল, তখন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়া উচিৎ বিবেচনা করিয়া, ব্রাহ্মণ বহুস্থান ঘুরিলেন এবং অবশেষে একদিন কোন রেলের একটী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এষ্টেশনের বাবুরা দয়া পরবশ হইয়া, চাঁদা করিয়া, কিছুদিন এই ব্রাহ্মণ দম্পতীকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহারা বোধ হয় এই ভিক্ষুক দম্পতীকে সাধারণ পেশাদার ভিক্ষুক বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। একদিন কথায় কথায় ব্রাহ্মণ সকলের সাক্ষাতে নিজ পরিচয় অনিচ্ছাসত্বেও প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণের ভাগ্যচক্রের গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল। সন্ধ্যার সময় বড় বাবু সাদরে তাঁহা-দিগকে আপন বাসায় লইয়া গেলেন। নিরা-শ্রয় ব্রাহ্মণ আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মণ কিন্তু ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

একদিন সংবাদ আসিল, রেলের নূতন ম্যানেজার সাহেব লাইন পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন। তাঁহার আগমন সংবাদে এষ্টেশনটীতে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। হঠাৎ একটা ব্যস্ততার সাড়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই প্রাণপণ যত্নে কাজ করি-তেছেন। সকলেই ব্যস্ত। সেইদিন বড় বাবু বাসায় আসিয়া বিপ্রদাসের সহিত অন্যান্য কথাবর্ত্তার পর বলিলেন "দেখুন আপনি একটা কাজ করুন, কাল সকালে আমাদের নূতন সাহেব এখানে আসিতেছেন, শুনেছি তিনি নাকি খুব দয়ালু ব্যক্তি, আমাদের ইচ্ছে আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আপনার সম্বন্ধে যা কিছু বল্‌বার আমি বল্‌ব। দেখি যদি কোন উপায় হয়।

ষ্টেশনটী আজ সুন্দররূপে সজ্জিত। প্রত্যেক কর্ম্মচারী আপনাপন পোষাক পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। এমন সময় ঘড়ীতে সশব্দে একে একে ১০টা বাজিল। হঠাৎ স্থানটী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলেরই মুখে উৎসুক ভাব বর্ত্তমান। দূরে ঐ সময়ে ইঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ধীর মন্থর গতিতে একখানি "স্পেসল" ট্রেণ আসিয়া থামিয়া গেল।

একখানি সাদা রংয়ের সেলুনের ভিতর একটী সাহেব ও ব্রাহ্মিকা ধরণের পোষাক পরিহিতা একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক বসিয়া

আছে। উর্দ্দিধারী একটী চাপ্‌রাশী নামিয়া সেলুনের দরজা খুলিয়া সেলাম করিল। সাহেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেই উপস্থিত সকলে সেলাম বাজাইল। সাহেব বড় বাবুকে সঙ্গে লইয়া কার্য্য পরিদর্শনে চলিয়া গেলেন। মেম সাহেব গাড়ীতে রহিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার পর সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। এবং গাড়ীতে উঠিয়াই বেহারাকে "চা" দিতে হুকুম করিয়া মেম সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কোন্‌ কষ্ট হয় নি ত?" মেমসাহেব মস্তক আন্দোলন করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এমন সময় বড় বাবু এক ভিক্ষুক দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর একবার সেলাম ঠুকিয়া সাহেবকে ভিক্ষুক সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুক দেখিয়াই মেম সাহেব চটিয়া উঠিলেন এবং নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তিক্তস্বরে সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমার লাইনের বন্দোবস্ত খুব ভালই দেখছি! ভিখারীরা অবাধে এসে ভদ্রলোককে বিরক্ত কর্‌তে পায়, বেশ বন্দোবস্ত, বেশ, বেশ।"

সাহেব ভিখারীদ্বয়ের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষে বিরক্তিভাব যেন ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু এ কি তিনি আর চক্ষু ফিরাইতেছেন না কেন? একদৃষ্টে কি দেখিতেছেন? তাঁহার চক্ষে পলক নাই! তিনি কি হইয়া গেলেন? ওকি সাহেব কাঁদিতেছেন? চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায় যে! ঠিক সেই সময় ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া সাহেবের দিকে চাহিলেন, চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—বাবা গোপাল। তুমি! ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি পড়িয়া গেলেন। পার্শ্ব হইতে ব্রাহ্মণী ঠিক সেই মুহূর্ত্তে "বাবা গো" বলিয়াই স্বামীর পার্শ্বে পতিত হইলেন।

সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একবারে সহস্র বৃশ্চিক দংশন যাতনা অনুভব করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। তাঁহার নয়নের অবাধ্য অশ্রুরাশী আজ ফোঁটায় ফোঁটায় করিয়া ব্রাহ্মণের তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছে।

সাহেবের ক্রোড়ে ভিখারীদ্বয়, নয়নে অশ্রুধারা, এবং বদনে পিতৃ সম্বোধন শুনিয়া দর্শকগণের অশ্রুরোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। এই অপূর্ব্ব মিলনে সকলেই আত্মহারা হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"স্নেহের জয়।"

মেমসাহেব কিছু বুঝিতে না পারিয়া উদাস-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীললিতমোহন মজুমদার।

সাধন সঙ্গীত।

রবিবাবুর একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এ গানটির ভিতরে যে সাধনার কথা লেখা আছে, তাহার ভিতর কিছু বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না!

কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না!
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে!
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে!
আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ;
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন!

এই গানটী পড়ে এবং সুর করে গানটী গেয়ে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহা প্রকাশ করিতেছি। রবিবাবু শুধু কবি নন—তিনি কবিতা রচনা করিতে পারেন, গান রচনা করিতে পারেন এবং মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত করিতে পারেন। একাধারে রবিবাবু কবি, গায়ক, ভক্ত ও প্রেমিক। প্রেমিক কবি গান করিয়া জগতকে প্রেমভক্তি শিখাইতেছেন, সাধনার উপদেশ দিতেছেন। তিনি শিখাইতেছেন—মানব হৃদয় অতীব ক্ষুদ্র। এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটী বৈ দুটীর স্থান হয় না। শ্রীভগবানের ও বিষয় লালসার একত্রে সমাবেশ হইতে পারে না। তুমি হয় শ্রীভগবানকে লইয়া থাক, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ কর, অথবা বিষয়-বাসনা লইয়া থাক, শ্রীভগবানকে পরিত্যাগ কর। যিনি ভক্ত তিনি বলিবেন—আমি শ্রীভগবানকেই চাই, বিষয় সুখ চাহি না। তাই প্রেমিক কবি শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন।"

বিষয় বাসনা বিদূরিত না হইলে হৃদয়ে কভু প্রেমের সঞ্চার হয় না; প্রেমের সঞ্চার না হইলে ভাগ্যে ভগবদ্দর্শন ঘটে না। সাধক একথাও বল্লেন সে প্রেম যেমন তেমন হলে চল্‌বে না; সে প্রেম অহেতুকী হওয়া চাই, আবার অগাধ ও অসীম হওয়া চাই অর্থাৎ একটু আধটু প্রেমের কর্ম্ম নয়। কবি বলিতেছেন—শ্রীভগবানকে হৃদয়ে রাখিতে হইলে অগাধ প্রেমের প্রয়োজন। বিনয়ে তৃণ অপেক্ষা নীচ হইয়া সাধক বলিতেছেন—আমি প্রেমের ভিখারী; আমি অত প্রেম কোথায় পাব—

"এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।"

জানিলাম বিষয় বাসনা ত্যাগ না হইলে, প্রেম আসে না। প্রেম না এলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না।

ভক্ত চায় তার প্রিয়দর্শনকে চখে চ'খে রাখিতে, তাই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"কি করিলে বল পাইব তোমারে
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।"

ভক্তের একান্ত আকিঞ্চন ভগবানকে চিরদিন দেখে এবং অনুক্ষণ দেখে। কপালক্রমে তাকে চিরদিন দেখা ঘটে না, আর অনুক্ষণ দেখাও ঘটে না। ভক্ত সেই ক্লেশকর বিয়ের কথা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।"

সাধক! তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে তোমার প্রিয়দর্শনকে চিরদিন দেখিতে পাইবে না, মাঝে মাঝেই দেখিতে পাইবে। দেখ, তুমি ত মাঝে মাঝে দর্শন পাও; কিন্তু আমার মত পাষণ্ড যে আদৌ তাঁর দর্শন পায় না! আমি আমার মনকে বুঝাতে পারি, তুমি তোমার মনকে বুঝাতে পার না? সরল সাধন পথে চলে যাও, সব পাবে কিছুরই অভাব হবে না—শ্রীগুরুর এই ত উপদেশ। গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস থাকা চাই; ফল কামনা রহিত হয়ে কাজ করা চাই—এই ত সার কথা। হরি লুকাচুরী খেলিতে ভালবাসেন। চাঁদ যেমন লুকাচুরী খেলে, একবার মেঘের আড়ালে লুকায় আবার বাহির হয়, হরির লুকাচুরী খেলাও তদ্রূপ। হরি ভক্তকে দর্শন দিতেছেন, দর্শন দিতে দিতে অদৃশ্য হইয়া যান। এই তাঁকে চখের সামনে দেখচ আর পরক্ষণে অদৃশ্য, আর নেই। যাঁরা সাধনা করেন, তারা একথা বেশ জানেন। নিশীথ রজনীতে অন্ধকার গৃহে একাকী আপন জপাসনে বসিয়া নিমিলিত নেত্রে যখন ধ্যানে নিমগ্ন থাক, আর যখন তোমার অন্তর্দৃষ্টি আজ্ঞাচক্রের দিকে সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন তোমার চিত্তপট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কিঞ্চিৎ পরে দেখ সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী উজ্জ্বল বিন্দু তোমার চিত্তপটে উদিত হইয়াছে এবং তারার ন্যায় ঝিকমিক্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই আলোক বিন্দু বড় হয়, বড় হইয়া ফাটিয়া যায়। তারপর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তোমার মানস চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে আর তুমি দেখ—

"সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীনারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ কেয়ুরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ।"

ইনিই তোমার ইষ্টদেবতা, তোমার প্রিয়দর্শন শ্রীভগবান। এ দর্শনলাভ সুকৃতি সাপেক্ষ, সাধনার ফল। চিত্তপটে আর সে ঘন অন্ধকার নাই, কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের সুশীতল আলোকে চিত্তপট উদ্ভাসিত। তোমার প্রাণমন আনন্দে বিগলিত। ক্ষণিকের তরে তুমি আর তোমাতে নেই—আনন্দে মাতয়ারা, বিভোর, সহসা তুলার ন্যায় শুভ্রবর্ণ মেঘ উদয় হইয়া তোমার হৃদয়াকাশকে ঢাকিয়া ফেলে আর অমনি তোমার ইষ্টদেবতার চিন্ময়ী মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্রমশঃ চিত্তপট আবার পূর্ব্বের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সাধক কবি তাঁর প্রিয়দর্শনকে হারাইয়া খেদ করিয়া বলিতেছেন—

"কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

আলোচনা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২১ সাল।

সেটি কি ?

সুখ ও শান্তি একবৃন্তজাত স্বর্গীয় পুষ্প; সুতরাং তাহাদের সৌবভলাভ সামান্য জনের সৌভাগ্য-প্রণোদিত। জীবনের এক এক অঙ্ক পরিসমাপ্তির সহিত, কত খেলা, কত আশা শেষ হইয়া গেল। কতবার এক একটী যবনিকার উত্থান-পতন ঘটিল, কিন্তু আশ্চর্য্য প্রহেলিকা,—প্রহসনের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গোক্তি যেন বাড়িতেছে। আশার উদ্বোধনী শক্তি যেন নিত্য শক্তি লাভ করিতেছে। বিজলীর খেলার মত চৈতন্যের উদয় ও বিলয় ঘন ঘন হইতেছে, সে ঘন উজ্জ্বল ও ঘন স্তিমিত আলোকে মন দুরু দুরু করিতেছে, আতঙ্কে দেহ শিহরিতেছে—কিন্তু কই আমি ত ছাড়ি না। আমি না ছাড়িলে সে ছাড়িবে কেন? এত ভয়, এত যাতনা,—কিন্তু আমি যা' তাই; ইহার মূল "আমি", এই 'আমিত্বই' আমার সর্ব্বনাশ করিল। ছাই ভস্ম, কি ধূলাখেলা পাইয়াছি, তাহাতে যে কি মধুরতা আছে—খেলায় এত হারিতেছি—নেশার ঝোঁকে তথাপি ছাড়িতে পারিতেছি না, কেবল ধূলা মাখাই সার হইতেছে—কখন নাকে চোখে বালি ঢুকিতেছে—কত কাঁদিতেছি,—যাতনায় অস্থির হইতেছি,—তবুও ছাড়িতেছি না—পরন্তু অপর খেলুড়ে হইয়া, দু'জনের খেলা একাই করিতেছি, ক্ষুধা তৃষ্ণা বলিয়া মনে নাই, অস্তাচলগামী সূর্য্য, তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই। দূর হগ্‌গে ছাই,—খালিই হারিতেছি,—এইবার জিতিবই—অই যা' ঘুঁটি হারাইয়া গেল—সন্ধ্যা হইল;—এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! অন্ধকারে কেহই নাই;—একি, নিজে যে নিজেকেই দেখিতে পাই না,—কেবল মশক মক্ষিকার ভোঁ ভোঁ শব্দ, দংশন আর গাত্রদাহ! একা দিশাহারা! এ অবস্থায় গোধূলি ফলকে একটী মাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র—তাহাই ভরসা—'সেটি কি?'—কে বলিবে সেটি কি? 'সেটি কি?' কথাটা সহজ,—কিন্তু তাহার ভিতরে ঢুকিয়া, তাহার মূল তত্ত্ব জানা,—তবে ত উত্তর দেওয়া, তাহা বড় শক্ত। সেটির বাহিরে

কিছুই নাই—রং ঢং গঠন থাকিলেও জানা যায় না,ভিতর—সেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতম, আবার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃহত্তম,সেটির ভিতর অনন্ত,—অনন্ত আকাশ ও অনন্ত জলধির সহিত অনন্ত কোটি বিশ্ব তাহার মধ্যে –মুষ্টিমেয় বালুকারাশির ন্যায় খেলা করিতেছে। সব আছে আবার কিছুই নাই—কেবল ধূ ধূ ধূ! অনন্ত প্রহেলিকা! তবে সেটি ক্ষুদ্র না বৃহৎ—অণু না অনন্ত? বল্‌তে পারে কে 'সেটি কি?' সীমান্ত জীবন, সংসার মায়াদৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধ মানব হইয়া আমি ত জানিতে বা বলিতে পারিলাম না 'সেটী কি?'

আমি সীমান্ত জীবন,—সংসারাবদ্ধ ও মায়াদৃষ্টিসম্পন্ন—সেটি আগন্ত পরিশূন্য অনন্ত—সংসারের বাহিরেও মায়াশূন্য,—তবে আমি কিরূপে তাহাকে জানিব? আমি মানব, মানব জীবন এমনি ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত—সজ্জিত, এমনি নৈসর্গিক মহাপ্রাণতায় বিভোর, একবার পুণ্য-পরিমলে এমনি সুরভিত—আবার আবিলতায় সমাকীর্ণ! তাহার নিজের হৃদয়ের সুখ ছায়ার প্রতিকৃতি মুহূর্তের মধ্যে, নিমিষের মধ্যে তাহার মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। অনিবার্য বিগলিত আনন্দ বা দুঃখাশ্রু গণ্ডস্থলে প্রবাহিত হয়। সেই জন্যই মানব আপনার ভাবে আপনি বিভোর, সেই আনন্দ ও বিষাদে মানব সেই বিভোরতার সহিত নীরব নিশ্চল নিথর। সেইজন্য জ্যোৎস্নাময়ী রজনীকে সুখপ্রদ,বসন্ত বায়ুকে পীযূষবর্ষী,পিক কাকলীকে সে কখন চায়, আবার চায়ও না! তাহার মুখমণ্ডলের আবক্তিম ভাবে এই দুইটী ভাব কখন একা একা—কখন যুগপৎ প্রতিফলিত হয়ই। আনন্দের ভাবে মানব দেবশক্তি লাভে প্রকৃত ভালবাসার শীতল ছায়ায় বাস করে, কিন্তু সে ভালবাসা কই? সে যে স্বার্থান্ধ হইয়া তাহার প্রতিদান চায়—তাইত 'সেটি কি'—বুঝিতে না পারিয়া পৃথিবীকে জলস্থলশূন্য, জীবশূন্য, তরুলতাশূন্য রবীন্দু তারকাশূন্য দেখে—সে দেখে আবার ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়া এক রঙে নানা রঙের প্রতিফলন। তবে কেমন করিয়া বুঝি যে 'সেটি কি!'

মানব লৌকিক ব্যবহার ও লোক-প্রাণতায় বিশুদ্ধভাবে যাহা করিতে চায়—সে তাহাকে অন্যভাবে সাজাইয়া বিসদৃশ করিয়া সব হারাইয়া ফেলে। সে জ্ঞান-কর্ম্মকে খেলার জিনিস মনে করিয়া তাহাদের দ্বারা বন্ধনটি আনিয়া মুক্তির পথ কণ্টকিত করিয়া, বাহিরে 'সেটি কি' খুঁজিতে থাকে, কাঁটা ভাঙ্গিয়া ভিতরে যাইতে চাহিলেও পারে না,—কাজেই আসলে নকল উঠিয়া তাহাকে আমার মত 'সেটি কি' জানিতে দেয় না—ভুলাইয়া দেয়। সেই আনন্দের পরিবর্তে তখন কেবল তাহার বিষাদ—হাসির স্থানে কেবল কান্না। সেই আত্মগ্লানিজনিত বিষাদপূর্ণ মুখ তাহার হতাশের প্রতিপাদক ও প্রথম অঙ্ক। এই অঙ্কের অভিনয়—প্রথম আনন্দ পরে দুঃখ—ইহাতেই এ অঙ্কের পরিসমাপ্তি—ঐক্যতান বাদ্যের পর পটোত্তোলন ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয়—এইরূপে পঞ্চাঙ্ক নাটকখানির অভিনয় শেষ হইয়া যায়। কত কে কি কি সাজিয়া এল—আমিও 'আমিত্ব' মাখিয়া সেগুলির মধ্যে 'সেটি'কে ধরিতে

গেলাম, যা—আপন হারা হইয়া সব ভুল। সকলেই সাজঘরে গিয়া সাজ খুলিয়া ফেলিয়াছে, কাহাকেও আর চিনিতে পারিলাম না—আমি এখন যে একা—সেই একা। সেই পঞ্চাঙ্ক নাটকের পরিচয় পত্রিকা (programme) খানি দেখিলাম—দেখি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতেই পঞ্চাঙ্ক নাটক—সকলে নাম রাখিয়াছে। কিন্তু কেহ প্রত্যক্ষ নাই, শেষে পঞ্চভূত তাহাদের উৎপত্তির কোলেই নিবৃত্তি লাভ—শেষে মাটী পর্য্যন্ত নাই—শূন্য। তাহ'লে কেমন করিয়া জানিব 'সেটী কি ?'

তাই ত, আমারই ত ভুল! মৃগরূপী আমি, আমার নাভি মধ্যে কস্তুরিকা, তাহার গন্ধ 'সেটি' আমি কিন্তু সেই গন্ধে আত্মহারা হইয়া 'সেটি' কোথায় বলিয়া ছুটাছুটি করিতেছি, এখন দেখিতেছি 'সেটি কি'—সেটি কি মৃগ-নাভি—যার গন্ধে বহুদিন গৃহ সুরভিত রহিয়াছে। কি যে দেখিলাম সেটি ?—ভক্তিতে পাঁচ বৎসরের ছেলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ কিসে, 'সেটি কি' জানিয়াছিল ? ভক্তিতে—বা বা, তাহাকে জানা বা ধরা এত সহজ ? সে এত নিকটে আছে! আমি ত্রিলোক ঘুরিতেছি—এ ও তা কত পড়িতেছি—কত লোকের কত বক্তৃতা শুনিতেছি—তাই ত বিবেকের কোলে ভক্তি—ভক্তিতেই ভক্তির ধন ভক্তাধীন সেটি! হলামই বা আমি সীমান্তজীবন, সংসারাবদ্ধ ও মায়াদৃষ্টি-সম্পন্ন—থাকুক সব আমাতেই থাকুক। আমি আমার মনের মত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেই তখন আমি অনন্ত জীবন সংসারমুক্ত, মায়াশূন্য হইব। তখন সেটি আমার হৃদয়ে 'সেটি কি' প্রকাশিত হইবে—আপনার নাভিকুণ্ডে মৃগমদ পাইয়া মৃগ আর কোথা কোথা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে না। সনকাদি ঋষিগণ, নারদাদি ভক্তবৃন্দ, বাসব, পাণ্ডব, ভীষ্মাদি কর্ম্মিগণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ শিশুপ্রাণ সেই ভক্তিকে ধরিয়া সংসারে থাকিয়াও আপনহারা হন নাই, হৃদয়স্থ 'সেটি কি' জানিতে পারিয়া, মর হইয়া অমরত্ব লাভে অনন্ত জীবন পাইয়াছেন। এখন কুহেলিকা-তিমিরের মধ্য দিয়া সূর্য্যের আভা দেখিয়া বুঝিনু—'সেটি কি' ? মানব চক্ষে এ তিমির কাটে না; আবছায়ার ন্যায় একটু থাকিয়া যায়, ইহার মধ্য দিয়া পূর্ণদর্শন না হইলেও, জানা যায়—'সেটি কি'। পূর্ণদর্শন মৃত্যুর পর সালোক্যাদি মুক্তির পূর্ব্বে অথবা ভক্তির পর-পারে যাওয়ার পর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন বুঝিনু 'সেটি কি'। সেটি অনন্ত মহাপুরুষ—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বকালস্থ জীবের হৃদয়স্থ সচ্চিদানন্দ ভূমাপুরুষ। তাহা এই সান্ত-জীবনের অনুরূপই সান্তরূপ। অনন্ত হইয়াও সান্ত-রূপে পরিদৃষ্ট; কেন না, সান্ত-জীবনে অনন্তের জ্যোতিঃ দেখা বা সহ্য করা যায় না। তাই আমরা চণ্ডীমণ্ডপ বা দেবগৃহে যাইয়া তাঁহার সান্তরূপ দর্শনে আত্মহারা হইয়া উঠি; তখন সেইগুলির মধ্যে একটীকে হৃদয়ে ধরিতে পারিলে, ঠিক বুঝিতে পারি—'সেটি কি'; কিন্তু পাঁচটীকে ধরিতে যাই বলিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা—'সেটি কি', তাহা জানিবার পূর্ণ অভাব। এখন বুঝিলে—'সেটি কি'। জ্ঞান-কর্ম্মযোগে ঐরূপ সাত্ত্বিক ভক্তি মাথ—জ্ঞানকর্ম্ম দূরে যাইবে; জান না—যে অগ্নিতে অগ্নি জ্বলে

নূতনটি প্রজ্জ্বলিত হইলেই পূর্ব্বের অর্থাৎ আদি-টির আর প্রয়োজন হয় না, ক্রমে তাহার সত্ত্বাও থাকে না। তবেই পুরাতন জ্ঞান-কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন সাত্ত্বিক ভক্তির বলে দেখিতে পাইবে—'সেটি কি'? তখন শুনিতে পাইবে—তোমার 'সেটি' বলিতেছে—

"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥"
(গীতা—১২শ অঃ, ২০ শ্লোঃ)

কিন্তু তাহা শুনা, বুঝা, ধরা বড় সহজ, আবার বড় শক্ত, আবার বড় কঠোর। এক দেহে সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস, সত্ত্ব-রজঃ তমঃ—তাহতেই সেই ভক্তি, সেই শান্তি। ঐ শুন 'সেটি' বলিতেছে—

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥"
(গীতা—১২।১২)

এখন বল দেখি 'সেটি কি' এবং সুখ ও শান্তি কেমন জিনিস।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মাতুল। কি ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে?

বৈদ্য। (আর্ত্তের পার্শ্বের আসনেই বৈদান্তিক পণ্ডিত উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি আবার উত্তর দাতা হইলেন) শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া স্নানাদি সমাপন করতঃ শ্রাদ্ধ করিতে বসিবেন। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ সংযম এবং পবিত্রতার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কার্য্যে ব্রতী হইবেন। শুদ্ধাচারে না থাকিলে মন উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত থাকিলে মন্ত্র ঠিক উচ্চারিত হইবে না, মৃত ব্যক্তির চিন্তার বল রহিবে না। শ্রাদ্ধ সময়ে অন্য কথা কহিতে নাই, অশ্রুপাত করিতে নিষেধ আছে। শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা যদি শ্রাদ্ধকালে অশ্রুপাত করেন, তবে প্রেত ব্যক্তিকে অবশ হইয়া তাহাকে ভোজন করিতে হয়। মুণ্ডিত-শিরঃ পবিত্র বসন-পরিধায়ী যজমান একমনে পিতৃগণের আবাহন মন্ত্র পড়িবেন যথা—

আয়ান্তু নঃ পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পার্থদে৺বযানৈঃ।
অস্মিন্‌ যজ্ঞে স্বধা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেবেস্থায়ান্‌॥

অনন্যমনে সমন্তক চিন্তার ফলে দেহে একটী শান্ত কোমল তড়িতের সঞ্চার হয়। যাহাতে তড়িতের কার্য্য সত্বর হয়, তাহার যথা-যোগ্য ব্যবস্থাও আছে। কুশ তড়িৎ-আকর্ষণের পক্ষে অব্যর্থ উপায়। শ্রাদ্ধে কুশাঙ্গুরী ব্যবহার, কুশ-ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করণ, কুশ দ্বারা জলসেচন, কুশোপরি পিণ্ডদান ব্যবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। মৃৎপাত্র তড়িৎ উৎপত্তির নিবারক বলিয়া শ্রাদ্ধে একেবারে অব্যবহার্য্য। কলার খোলার পরিবর্ত্তে কদলী পত্র ব্যবহার প্রশস্ত নহে। তিল, দুগ্ধ, পায়স, রম্ভা, তণ্ডুল, গব্যঘৃত, দধি, মধু, স্থলবিশেষে মৎস্য ও মাংস শ্রাদ্ধের উপকরণ। ফল মূল বিশুদ্ধ মিষ্টান্নাদিও শ্রাদ্ধে দেয়। যাহাদের প্রকৃতই শক্তি নাই তাহারা, ব্যতীত অপরের পক্ষে বস্ত্রের অভাবে গামছা দান দোষের। বস্ত্রের কার্য্য গামছা দ্বারা হয়

না। পিতৃগণ গামছা পরিয়া আছেন—ইহা কি সন্তান চাহিবেন? আপনাকে গামছা পরাইয়া লোকসমাজে বাহির করান যায় কি? পুরোহিতকে ফাঁকি দিতে যাইয়া আপনারই পিতৃপুরুষকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয় না কি?

কাহাকে আবাহন করিতে হইলে নাম ধরিয়া আহ্বান করাই বিধেয়। রাশি নক্ষত্র ধরিয়া যে রাশি নাম সেই নামই শ্রাদ্ধের নাম। পিতা, মাতা, পিতামহাদির পবিত্র নামোচ্চারণ সেই নামেই করিতে হয়। এ নাম লওয়ায়, নাম ধরিয়া খাদ্যাদি নিবেদন করায় কতই সুখ জন্মে, সন্তানোচিত ভক্তির ভাব ইহাতে বেশ পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

মাতুল। শ্রাদ্ধে প্রতিনিধি দেওয়া কি উচিৎ?

বৈদান্তিক। শ্রাদ্ধে প্রতিনিধি দেওয়া বিধেয় নহে। বৃদ্ধি-শাস্ত্রে প্রতিনিধি দেওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়। আর শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রকৃত অক্ষম হইলে প্রতিনিধির ব্যবস্থা চলিতে পারে, কোন কোন স্থানে একেবারেই চলে না। এ সম্বন্ধে স্থানীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়গণের ব্যবস্থানুসারে চলিতে হইবে। উপবাসাদি তুচ্ছ কষ্টের জন্য বা সামান্য দুই একটী বৃথা কার্য্যের ছলে অনেকে পুরোহিতের উপরই শ্রাদ্ধের ভার দিয়া দেন; ইহা লজ্জাকর নয় কি? সন্তান স্বহস্তে পিতৃপুরুষকে আহ্বান করিবে, অন্ন দিবে—ইহা কি ভাল কার্য্য নহে? ইহা কি আনন্দের, তৃপ্তির নহে?

মাতুল। শ্রাদ্ধকর্ত্তার বেশভূষায় বৈচিত্র্য কেন?

বৈদান্তিক। পিতৃপুরুষগণকে অন্ন দিবার সময় বিলাসী সাজিয়া ত দেওয়া চলে না বা অপবিত্র মলিন বস্ত্র পরিয়া দেওয়া উচিৎ নহে। আদ্যশ্রাদ্ধেই বেশভূষার বিশেষ বৈচিত্র্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তার মুণ্ডিতশির, তৈলহীন রুক্ষ অঙ্গ, অনাবৃত চরণ, আর কচ্ছশোভিত গলদেশ যেরূপ শোক, দৈন্য ও সন্তানোচিত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি করে, পাশ্চাত্যদেশে ব্যবস্থিত কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ সেরূপ করে কি? পতিহীনা বিধবা যখন চিকুরজাল কাটিয়া অলঙ্কারগুলি খুলিয়া, হাত খালি করিয়া শুভ্রবস্ত্রে বাহির হন, তখন সে মূর্ত্তিতে দেবীভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে না কি? পুরুষের কামনা-পঙ্কিল দৃষ্টি সে পবিত্র তপস্বিনী সাজ দেখিয়া ভক্তিতে নত, লজ্জায় কুণ্ঠিত, দৈন্যে ব্যথিত ও গৌরবে বিনীত হইয়া পড়ে না কি?

মাতুল। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কেন?

বৈদান্তিক। গয়াসুর ভগবানের নিকট বর লাভ করে, তাই গয়ায় শ্রাদ্ধ প্রশস্ত—স্থান মাহাত্ম্যে! আমাদের শ্রাদ্ধ যখন শাস্ত্রে প্রশস্ত বলিয়া লিখিত আছে, তখন আমরা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে না পারিলেও বুঝিতে হইবে প্রশস্ত। শ্রাদ্ধ গঙ্গার তীরেই সাধারণতঃ প্রশস্ত। গঙ্গার বারি যে সকল প্রকার বারি অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ ইহা এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, গঙ্গামৃত্তিকার গুণ যে অসামান্য তাহা এক্ষণে জনসমাজে স্বীকৃত হইতেছে। শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান জন্য গয়াক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠতা। "এষ্টব্যাবহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ" বহুপুত্র প্রার্থনীয়—যদি তাহাদিগের মধ্যে একজনও গয়াক্ষেত্রে

গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তখন ত আর বাষ্পীয়-যান ছিল না যে, মনে করিলেই দিনে দিনে যাওয়া হইবে। গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে মৃত ব্যক্তি প্রেতাবস্থা হইতে উদ্ধার পায়, ভুতযোনি হইতে অব্যাহতি লাভ করে, যতটা সত্বর তাহার উপকার সাধিত হয়। কর্ম্ম-ফল সহজে খণ্ডনীয় নহে বলিয়া একেবারেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ ঘটে, কিংবা অনন্তকালের জন্য শ্রীভগবৎ সাযুজ্য লাভ হয়—ইহা আমরা বলিতে পারি না। তবে একের শক্তি যখন অপরে সঞ্চারিত হয়, মাতার প্রাণ-ভরা ডাক যখন ভগবানের চরণে পৌঁছিয়া সন্তানের রোগ আরোগ্য করে, তখন সন্তানের শ্রদ্ধা-ভক্তির গুণে, মনঃ-শক্তির বলে, পুণ্যের জোরে পিতৃগণের উদ্ধার হইতে না পারার কারণ নাই। অপঘাতে মৃত্যু হইলে প্রেত-শিলায় পিণ্ড দিতে হয়। আত্মহত্যাকারীরও কেহ কেহ প্রেতশিলায় পিণ্ডও দিয়া আসেন।

মাতুল। আত্মঘাতীর পক্ষে ব্যবস্থা কি?

বৈদান্তিক। আমাদের প্রাচীন কোন কোন সংহিতাগ্রন্থে আত্মহত্যাকারীর জন্য নারায়ণ বলি ও বর্ব্বিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। তাহা না করিলে সন্তানের প্রত্যবায় নাই, তবে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ শাস্ত্রকারেরা আত্মঘাতীর দাহ, শ্রাদ্ধ নিষেধই করিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থাপক রঘুনন্দন ত আত্মঘাতীর দাহ ও শ্রাদ্ধের একেবারেই ব্যবস্থা দেন নাই। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আত্মঘাতীর জন্য যদি কেহ অনুতাপ করে, রোদন করে, তবে সেও প্রায়শ্চিত্তার্হ। আত্মঘাতীকে আত্মীয় স্বজনে কেহ স্পর্শ করিবে না, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মুদ্দোফরাসে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া, রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। উঃ কি ভীষণ দণ্ড! যে জোর করিয়া নিজের প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, বর্ত্তমান আইনে তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বলপূর্ব্বক নিজের প্রাণ যে নষ্ট করে, সেই পাপী ব্যক্তি সেই ঝোঁকেই মৃত্যুর পর অবস্থিতি করিয়া থাকে, তবে বহুকাল পরে অবশ্য একদিন না একদিন কল্পান্তরে পুন-রায় জন্মগ্রহণ করিবে। পরের মঙ্গলেচ্ছায়, ধর্ম্মের জন্য যে প্রাণ দেয়, সে আত্মঘাতী নহে। শাস্ত্রীয় হোমানলে প্রাণ-বিসর্জ্জন, তুষানল প্রায়শ্চিত্ত কিংবা সহমরণ প্রভৃতি আত্মবলিও আত্ম-বিসর্জ্জন। ইহা আত্মহত্যা ত নহেই, উপরন্তু পুণ্যকার্য্য।

মাতুল। প্রেতগণ শ্রাদ্ধস্থলে কি আগমন করেন?

বৈদান্তিক। যাহারা "কোথায় দেহ, কোথায় দেহ" করিয়া ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করে, তাহারা আসুন বা না আসুন শ্রাদ্ধান্ন দ্বারা তাঁহাদের ত সংস্কারমূলক ভোজন সমাপন ঘটে আর শাস্ত্রে বলে "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" সকাম শাস্ত্রীয় পুণ্যকার্য্যকারী ব্যক্তিগণ ধূমযান মার্গে যাইয়া পিতৃলোকে বাস করেন, আবার যথাসময়ে মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্ম লন। এই পিতৃ-লোকে যাহারা যুগ পরিমিত কাল অবস্থানে অধিকারী হন, তাঁহারা পিতৃদেবতা। পিতৃগণের দেহও বায়বীয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে সঙ্কল্প-মূলক দেহ ধারণ কতকটা আয়ত্তের মধ্যে।

আধ্যাত্মিক শক্তিতে অন্তরীক্ষস্থ লিঙ্গদেহীকে আনয়ন করা অসম্ভব নহে। যোগসাধনা ব্যতিরেকে বিনা মন্ত্র সাহায্যে কেবলমাত্র ইচ্ছা-শক্তির বলে পাশ্চাত্য মনীষিগণ অনর্থক কষ্ট দিয়া মৃত ব্যক্তিকে আনয়ন করিতে পারিতেছেন, আর আমরা ভক্তিপূর্ব্বক মন্ত্রশক্তি সহকৃত ইচ্ছাশক্তির বলে সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া আনিতে পারিব না—ইহা কি সম্ভব? মাত্র কৌতূহল তৃপ্তির জন্য মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া আনয়ন করা অবশ্য অন্যায়। শ্রাদ্ধে দ্রব্য দিতেছি, পিতৃগণ পাইতেছেন—ইহা ভাবিয়া কি সন্তানের কম তৃপ্তি? ভক্তির টানে ভগবান নামেন আর পিতৃপুরুষগণ নামিবেন আশ্চর্য্য কি? সংস্কারের মাহাত্ম্য এমনই যে, শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই পিতৃপুরুষগণ সন্তানপ্রদত্ত অন্ন-জলের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকেন, ইচ্ছাশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও তড়িৎ শক্তির বলে অন্তরীক্ষস্থ লিঙ্গ দেহীগণ বায়ুভূত হইয়া মনোগতিতে শ্রাদ্ধস্থলে আসেন কিনা, শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্টি করিয়া সংস্কারমূলক ভোজন সমাধা করিয়া তৃপ্ত হইলেন কি না—আমাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবে আমরা যদি সেরূপ পূত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তিযুত হই, তবে হয়ত বুঝিতে পারিতাম। কেহ যেন ভাবিবেন না যে, শ্রাদ্ধান্ন গিলিয়া খাইবার জন্য আমরা ভূতযোনিকে আহ্বান করি।

মাতুল। শ্রাদ্ধ ত বৈদিক কার্য্য। উহা কি যজ্ঞ?

বৈদান্তিক। যজ্ঞ অনেক প্রকার। একণে বড় বড় যজ্ঞ হয় না, হওয়ার সুবিধাও নাই। আর সম্ভবও নহে। শ্রাদ্ধ পিতৃযজ্ঞ। সন্তানের পক্ষে সকল যজ্ঞ অপেক্ষা পিতৃযজ্ঞই বড়। শ্রাদ্ধ তর্পণ পিতৃযজ্ঞ। দেবকার্য্য হইতে সন্তানের নিকট পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ।

"দেবকার্য্যাৎ পিতৃকার্য্যং বিশেষ্যতে"

তাহা হইলে আপনারা সকলে দেখুন, শ্রাদ্ধ উপকারক কি না? কষ্টকর রোগ-যাতনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য লোকে চিকিৎসকের শরণ লয়। রোগ সারুক, আর না সারুক, তথাপি চিকিৎসা ত বিধেয়। এই শ্রাদ্ধাদিও তদ্রূপ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। নরকস্থ জীবের নরক যন্ত্রণার যদি কিছু উপসম পায়, লিঙ্গদেহীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জনিত কষ্ট যদি কিছু দূর হয়, কষ্টকর ভূতযোনি হইতে যদি অব্যাহতি লাভ ঘটে, মৃত আত্মার পারলৌকিক কোন প্রকার উপকার যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ কতই না উপকারক হইল?

মাতুল। শ্রাদ্ধে গবীদান খুবই প্রশস্ত কেমন?

বৈদান্তিক। গবীদান ব্যতীত বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ত হয়ই না। উপরন্তু গবীদানের প্রশংসা আর কি করিব? পূর্ব্বে এক বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের জন্যই ভারতে গোজাতি রক্ষা পাইত। বৃষোৎসর্গে চিহ্নিত করিয়া বৃষ ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই চিহ্নিত বৃষকে ধর্ম্মের ষাঁড় বলিত। ধর্ম্মের ষাঁড় সাধারণ সম্পত্তি। সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ তাহাকে হলকার্য্যে লাগাইবে, দামড়া করিয়া লইবে, কিংবা হত্যা করিবে তাহার যো

ছিল না। তাহার উপর বড় বড় ষাঁট আছে—উহারা সাধারণ সম্পত্তি। তাহা বলিয়া কেহ যদি উহা নষ্ট করে, উহার কোন ক্ষতি করে, রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন না? কিন্তু আমাদের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সাধারণ সম্পত্তিকে কেহ যদি দামড়া করে, হত্যা করে, তাহার দণ্ড হইবে না। বলা বাহুল্য, বিচারক এদেশীয় নন। গবী ও ভূমিই ভারতের প্রধান সম্পত্তি। শ্রাদ্ধে গবী ও ভূমি দান আবশ্যক। লোকে এক্ষণে চারি আনা দিয়া ভূমিদানের কর্ত্তব্য শেষ করেন। ভাড়া করিয়া কোথাও কোথাও গবীদান নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ষাঁড়ই আমাদের গোজাতির রক্ষক। এক্ষণে ধর্ম্মের ষাঁড় যাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্য দুই এক জন মহাত্মা শুনিয়াছি চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সভা এজন্য এক আবেদন নাকি মহামান্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু ফলে কি হইল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

পিতৃগণ-উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের সার্ব্বভৌমিক অর্থে শ্রদ্ধাদত্ত যে কোন দ্রব্যই শ্রাদ্ধ। বালির পিণ্ডও শ্রাদ্ধান্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের দিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনাও এক প্রকার শ্রাদ্ধ।

এমন সময়ে শ্রাদ্ধকর্ত্তা করযোড়ে পণ্ডিতগণ সকাশে নিবেদন জানাইলেন যে, সকলকে গাত্রোত্থান করিতে হইবে। তখন একে একে সকলেই উঠিলেন। বলা বাহুল্য, বহুক্ষণ বিচারের ফলে সকলের ক্ষুধা বোধও বিলক্ষণ হইয়াছিল। বিচার-সভা শেষ হইল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

বসন্ত-চিন্তা।

শীত ঋতুর অবসানে অনেক বৃক্ষকে মৃতপ্রায় নির্জ্জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের পত্র সকল স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়, তখন তাহাদের শাখা-প্রশাখা সকলকে সহজেই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে আর সুন্দর পুষ্প ফুটে না, সুমিষ্ট ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়া পাখীসকল তথায় আসিয়া তখন আর মধুর সঙ্গীত করে না, আতপতাপে ক্লিষ্ট হইয়া পথিকগণ বিশ্রামাশায় আর তাহাদের ছায়ায় উপবেশন করে না, তখন তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে কোনও আনন্দের উদয় হয় না, কিন্তু কিছুদিন পরে সুমধুর বসন্তকাল আসিল, অমনি শুষ্ক কাষ্ঠবৎ সেই শাখা-প্রশাখা ভেদ করিয়া সুকোমল নবীন পল্লব সকল বিকসিত হইল। সুগন্ধপূর্ণ মধুর সৌরভ চারিদিকে বহিতে লাগিল, পাখীসকল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিয়া সেই সকল শাখায় আবার উপবেশন করিল এবং সুপক্ক ফলাহার করিয়া আনন্দে মনোহর গান গাহিতে লাগিল, পথিকগণ দলে দলে আসিয়া সেই সুশীতল ছায়ায় উপনীত হইল এবং গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ নিবারণ করিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে লাগিল। শুষ্ক মনে করিয়া যে সকল বৃক্ষদিগের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করে নাই, এখন তাহার কেমন সুন্দর

শোভা হইয়াছে, এখন সে নব পল্লব-বসনে স্বীয় শরীর আবৃত করিয়া উজ্জ্বল কুসুমের মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছে। কে এই শুষ্ককে সরস করিল, কে এই মৃতকে সঞ্জীবিত করিল? কাহার প্রসাদে এই মধুর বসন্তকাল আসিয়া সুকোমল বায়ুস্পর্শে এই বৃক্ষসকলকে বাঁচাইয়া নব জীবন দান করিল?

যাঁহার কৃপায় শুষ্ক তরুসকল মুঞ্জরিত হইতেছে, পক্ষীর পাখা হইতে পালক খসিয়া পড়িলে যাঁহার করুণা আসিয়া তাহাকে আবার নবীন উজ্জ্বল পক্ষ-ভূষণে অলঙ্কৃত করিতেছে, সেই করুণাময় কি তাহার সৃষ্ট অভিনব মানব সন্তানদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছেন—ইহা কি কখনও সম্ভব? পাপের গর্ত্তে পড়িয়া তাহারা চিরদিন হাহাকার করিবে, কুসংস্কার-জালে জড়িত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে বাস করিবে, তিনি তাহাদের দুঃখ দেখিবেন না, তাঁহার করুণা আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে না—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই মানব জীবনের মধ্যে প্রতিনিয়তই তাঁহার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়।

সংসারাসক্তির দাস হইয়া মানুষ যখন ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করে, হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি সকলকে স্বার্থপরতার ও পাপ প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তখন তাহার জীবন গলিতপত্র বৃক্ষের ন্যায় শুষ্ক ও নির্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন সে জীবনের কোন শোভা কেহ দেখিতে পায় না, তাহার সদ্গুণরাশির সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া কাহারও চিত্ত হরণ করে না, তাহার প্রেমের মধুরতা আস্বাদন করিয়া কাহারও প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া পাপের উত্তাপ নিবারণ করিতে পারিবে—এ আশায় তাহার নিকট কেহই শীতল হইতে আসে না, সে জীবনে কোনও বিশেষত্ব কেহ দেখিতে পায় না। আহার নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তির অনুগত হইয়া যে পশুবৎ জীবনযাপন করে, তাহার কোনও উচ্চ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে তাহা দেখিয়া কেহই সেরূপ বোধ করিতে পারে না, সংসারের মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবন দৃষ্ট হইবে—যাহা দেখিয়া মানব-জীবনের কোনও মহত্ত্ব আছে, ইহা অনুভব করিতে পারা যায় না। সংসারের বাতাসে তাহা ভয়ানক ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নিস্তেজ শুষ্কপ্রায় মানব জীবন যদি একবার ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসে, সত্যের একটু আভাস যদি তাহার উপর অঙ্কিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম বা পবিত্রতার অতি অল্প মাত্রাও যদি তাহার উপর পতিত হয়, তবে বসন্ত-সমীরণ স্পর্শে যেমন শুষ্ক বৃক্ষ সকল নবদেহ ধারণ করে, সেই মানবজীবনও সেইরূপ নবভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পুরাতন পাপ-তাপ-মলিনতা কোথায় চলিয়া যায়, স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ভাব সকল শিথিল হইয়া পড়ে, অহঙ্কার-আত্মাভিমান, ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা, দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলের কঠোরতা কোথায় পলায়ন করে। তখন সে জীবন কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়, যেখানে জ্ঞান ছিল না—সেখানে জ্ঞানরাশি প্রকাশিত হয়, পাপের অন্ধকার যথায়

রাজত্ব করিতেছিল, পুণ্য-পবিত্রতার জ্যোতি আসিয়া সেই স্থান আলোকিত করিতে থাকে, ঘোর স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি যাহার সর্ব্বস্ব ছিল, তাহার মধ্য দিয়া প্রবল প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়,পূর্ব্বে যাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিত না, এখন জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলের চক্ষু সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। সেই ব্যক্তির জীবনে কে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিল, এই নিস্তেজ মৃত-প্রায়কে কে নবজীবন প্রদান করিল? কাহার প্রভাবে এই অসার,কদর্য্য জীবন এইরূপ সজীব সুন্দর ভাব ধারণ করিল? সম্ভবতঃ সেই সত্য স্বরূপের—সত্য ভাবের বাতাস একবার মাত্র এই জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাই এই শুষ্ক জীবন মুকুলিত, মুঞ্জরিত হইল। সেই প্রেমময়ের প্রেমের ক্ষুদ্র এক কণিকা শিশিরবিন্দুর ন্যায় এই জীবনের উপর পতিত হইয়াছিল, তাই অমন হঠাৎ হইতে কত সদ্‌গুণ রাশি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস চিরকালই ইহার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে, এখন যাঁহা-দিগকে সাধু মহাজন বলিয়া সংসারের লোক সকল শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছেন, যাঁহাদের জীবনের সদ্‌গুণ সকল আলোচনা করিয়া কত লোকের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইতেছে, তাঁহাদের পূর্ব্ব জীবনের বিষয় যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তাহারা অনেকেই তখন সাধারণ লোকের মত সামান্য সংসারিক :কার্য্যেই লিপ্ত থাকিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনই জীবনের সার সুখ বলিয়া মনে করিতেন, কেহ বা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ঘোর পশ্বাচারীর ন্যায় পাপের গভীর পঙ্কে একেবারে হৃদয় মন ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। জীবনের কোন উচ্চতর লক্ষ্য যে আছে তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেন না, জগতের লোকে তখন তাহাদিগকে কতই ঘৃণা করিতেন কিন্তু যখনি একটু ধর্ম্মভাব তাহাদিগের প্রাণকে স্পর্শ করিল, স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেরূপ স্বর্ণ হইয়া যায়, সেই ভাবে তাহাদের শুষ্ক মলিন জীবন তখনি সুন্দর পবিত্র হইয়া পড়িল, লোকে দেখিয়া মনে করিল—এ ব্যক্তি বুঝিবা সে ব্যক্তি নয়, জীবনে যেন যুগান্ত প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। যিনি ঘোর কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন, এখন তাহার নিকটে বসিয়া কত লোক ধর্ম্মশিক্ষা করি-তেছে, তাহার উপদেশে কত লোকের ঘোর সংশয় ভঞ্জন হইয়া যাইতেছে। যিনি স্বার্থপর অবিশ্বাসপরায়ণছিলেন, প্রেমের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় এখন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন আত্মীয় পরিবারের মধ্যে যাহার প্রাণ আবদ্ধ ছিল, এখন তিনি সকলকেই আপনার মনে করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, যাহার জীবনের কলঙ্কে গৃহ পরিবার কলঙ্কিত হইয়াছিল,পাপের পূতি গন্ধে সমাজের নৈতিক বায়ু দূষিত হইয়া-ছিল,এখন তাঁহার পুণ্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া কত লোক দেবতুল্য জ্ঞানে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে, তাঁহার পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া কত ব্যক্তির ঘৃণিত চরিত্রের পরি-বর্ত্তন হইয়া যাইতেছে।

তখন তাহাদিগের পূর্ব্ব জীবনের পাপ, মলিনতা, স্বার্থের ভাব সংসারাসক্তি চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বৃক্ষ সকল নব-পল্লব ও সুন্দর পুষ্পে শোভিত হইয়া যেমন উদ্যানকে আলোকিত করে, সেইরূপ তাঁহাদেরও জ্ঞান, প্রেম,পবিত্রতার সৌন্দর্য্য সংসারীর অন্ধকারময় জীবনকে আলোকিত করিল। লোকে যখন তাঁহাদের জীবনের এই সকল আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে পাইল, তখন তাহারা সেই জীবনকে কোন দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না, এইরূপে মানব যখন ঈশ্বর প্রেমকে আশ্রয় করে, তখনই তাহার জীবনের প্রভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় কোন না কোন রূপে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিলে, পরমেশ্বরকে,সত্য বলিয়া আশ্রয় করিতে না পারিলে মানুষের পশুত্ব ঘুচিবে না। তাহার জীবনের কোনও মহত্ত্ব লক্ষিত হইবে না, আর জগতের লোকেও সে জীবনের কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পাইবে না। সাধুগণও আমাদের মত সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাঁহারা সেই বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন, যাহা ছুঁইলে মানবের পশুত্ব ঘুচিয়া যায়, পাপ চলিয়া যায়, বাসনার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, রিপু কুলের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহা পাইলে হৃদয়ে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, প্রাণের ভিতর মধুর প্রেম পবিত্রতা—জাগ্রত হয়, শাশ্বত সুখ, আনন্দের প্রস্রবণ খুলিয়া যায় এবং জীবনের সম্মুখে এক অনন্ত উন্নতির ক্ষেত্র প্রকাশিত হয়, তাই তাহাদিগকে দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া পড়ে। যিনি সেই সত্য পুরুষকে সামান্য পরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি চিরতরে ধন্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সদ্দৃষ্টান্তের এবং নানা প্রকার হিতকর কার্য্যের দ্বারা জনসমাজ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার জীবন কি এমন সুন্দর ছিল? যে কার্য্যকারিণী শক্তির দ্বারা তিনি সমাজের এত হিতসাধন করিতেছেন, তখন কি তাহার এ শক্তি ছিল? তিনি যে কোন বিশেষ শক্তির অধীন, তখন কি তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন—কখনই না; স্পর্শমণির স্পর্শে তাহার জীবনে এ সকল বিচিত্র ভাব—অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম শক্তিতে মানবকে কত দূর অগ্রসর করিয়া দেয়, সত্যের বলে জীবনের উন্নতির পথ কেমন পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তাহা আমরা অনেক সাধুর জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াও ঘোর অবিশ্বাসী রহিয়াছি এবং সেই শক্তির উপর ভাল করিয়া নির্ভর করিতে পারিতেছি না। একমাত্র সত্যস্বরূপ ধর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া জীবনের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল সাধুর জীবনে তাহা জানিতে পারিলাম কিন্তু সেই সত্যের আধারকে আমরা কায়মনে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারিলাম না, যদি তাহার উপর জীবনের মূল ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি, তবে না জানি আমাদের জীবনে কি অপূর্ব্ব শক্তি,কি বিচিত্র ভাব আসিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না, সেই প্রেম পবিত্রতার উৎসকে স্পর্শ করিলে

নিশ্চয় আমরা নবজীবন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে জীবনের পাপ, তাপ, মলিনতা, কুপ্রবৃত্তি থাকে না; অহঙ্কার, আত্মাভিমান, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা চূর্ণ হইয়া যায়; পবিত্র তত্ত্বজ্ঞান আসিয়া জীবন-পথকে পরিষ্কৃত ও আলোকিত করে, প্রেম আসিয়া সকল কার্য্যকে মিষ্ট ও সরল করে, যে দুর্জ্জয় রিপুকুলকে সহস্র চেষ্টায় জয় করিতে পারা যায় নাই, তখন দেখি যে, তাহারা আপনা আপনি বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সেই সত্য স্বরূপকে ভাল করিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, তাঁহাদের উপর একান্ত মনে নির্ভর করিতে হইবে, তবে তাঁহার দুর্জ্জয় শক্তি আবির্ভূত হইবে। পরমেশ্বর করুন এইরূপ বিশ্বাসের সহিত যেন আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসন্ত-কালের নিরস তরুর মত সরস হইতে পারি।

শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রণয়-চিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২। তিলোত্তমা—আমরা প্রথমে যখন তিলোত্তমার সাক্ষাৎলাভ করি তখন তাঁহার প্রণয় প্রস্ফুটোন্মুখী। তখনও ইহা প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাঁহার প্রণয়ের প্রথম উন্মেষ-ক্ষেত্র সেই এক শিব-মন্দির। তিনি সহচরী সমভিব্যাহারে সেই শিব-মন্দিরে পূজার জন্য গিয়াছেন, এমন সময়, ঘোরা নিশিথিনী আরও বিঘোরা হইয়া আসিল, ভীমা ঝটিকা আরও ভীমা হইয়া বহিতে লাগিল, ক্রমশঃ বৃষ্টি-ধারা তীরবেগে ভূপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিল, আর মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ নীরদমালা ভীষণ অশনিপাতে সমস্ত ভূমিখণ্ড কাঁপাইতে লাগিল। তিনি সঙ্গিনী মধ্য-বর্ত্তিনী হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে ভয়াকুল চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, উপায় কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় বিধাতৃ-বিধানে উপায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে উপায় আর কেহ নয় বীর-যুবক জগৎসিংহ। তিনি তিলোত্তমার ভয় দূর করিলেন, বিপদে সহায় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্কুচিতা প্রণয়-কলিকাকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিতা করিলেন।

তিলোত্তমার প্রণয়ে চিন্তা আছে—সে চিন্তার গভীরতা আছে। বাহ্য জগতের কোলাহল সেখানে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি নিজের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া প্রণয়ীর কথা ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে নিমেষের মধ্যে চিন্তার অতলস্পর্শ গর্ভে নিমগ্ন হইলেন। বাহ্য জগতে কি হইতেছে, কে কি করিতেছে তিনি নিজেই কি করিতেছেন তাহার সংবাদ আর তাঁহার কাছে পৌঁছায় না। এইটা তিলোত্তমার প্রণয়ের নিজস্ব না হইলেও বিশিষ্টভাব বটে।

আয়েষার প্রণয়ে আশা নাই; কিন্তু তিলোত্তমার প্রণয়ে আশা আছে—সেই আশাই তাঁহার জীবনী-শক্তি। সেই আশার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত তাঁহার জীবনী-শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন তিলোত্তমা

বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গে, ততদিন তাঁহার প্রণয় পাত্র জগৎসিংহকে পাইবার তাঁহার আশা আছে, আর সেই আশাই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তারপর পাঠান সৈন্য সেই দুর্গ অধিকার করিল। তিলোত্তমা তাহাদিগের হস্তে বন্দিনী হইলেন। জগৎসিংহ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। জগৎসিংহকে পাইবার আশা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবনী-শক্তিরও ক্রমশঃই অভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, বহুদিন পরে তিনি একরূপ মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিলেন। পশ্চাৎ যখন অভিরাম স্বামীর পত্রের সাহায্যে জগৎসিংহ তিলোত্তমার সেই মৃত্যু-শয্যার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন জগৎসিংকে পাইবার আশাও তাঁহার ফিরিয়া আসিল। তিনি ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিতা হইয়া উঠিলেন।

তিলোত্তমার এরূপ প্রণয়ে ত্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা আত্ম-ত্যাগ নহে—দেহ-ত্যাগ, তাই মনে হয় বুঝি, স্বার্থের সহিত মহারণে তিনি আয়েষার মত জয়যুক্তা হইতে পারেন নাই। এ পরাভবের কারণ তাঁহার হৃদয় দৌর্ব্বল্য। তিলোত্তমার এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আদরণীয় না হইলেও দূষনীয় নহে, যেহেতু ইহা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। যুদ্ধ-বারিধির বিশাল তরঙ্গাভিঘাতে অদৃঢ়নির্ম্মিতা তরণী ত ভঙ্গোন্মুখ হইবেই। গভীর নৈরাশ্যের ভীষণ তাড়নে জগচ্চরিত্রানভিজ্ঞা অতএব কোমলহৃদয়া তিলোত্তমা ত জর্জ্জরিতা হইবেনই!

৩। জগৎসিংহ—জগৎসিংহের প্রণয়—স্থির-ধীর। এ প্রণয়ে চাঞ্চল্য নাই—লক্ষ্য বস্তুর পরিবর্ত্তন নাই। এ গুণে তিনি সহস্র কিরণ। অপূর্ব্ব রাগরঞ্জিত প্রভাত ভানু যখন গগনপটে উদিত হইলেন, স্বচ্ছ সরোবর মধ্যবর্ত্তিনী কমলিনী তখন হাসিল। অংশুমালী সেই হাস্যে বিমোহিত হইয়া কমলিনীকেই প্রণয়-পাত্রী নির্দ্ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। নিম্নে ঝটিকা বেগে বহিতে লাগিল। অংশুমালী মেঘ-প্রভাবে অস্তমিত হইলেন। কমলিনীও ঝটিকাঘাতে সলিলশায়িনী হইল। দিবাকর আর কমলিনীকে দেখিতে পান না; কিন্তু তাই বলিয়া, কই, পার্শ্বস্থিতা চপলার চিত্ত-বিমোহন রূপে ত কমলিনীকে ভুলিলেন না! যখন আকাশ মেঘ বিনির্ম্মুক্ত হইল—ঝটিকা থামিয়া গেল—তখন আবার সেই ভানু পূর্ব্বরাগ ধারিলেন এবং কমলিনীকে পূর্ব্ব প্রেম-ধারা ঢালিয়া দিলেন। কমলিনীও পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া পুনরায় হাসিল। জগৎসিংহও ঠিক ঐ প্রভাত ভানুর মত প্রথমে তিলোত্তমাকে দেখিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয়া সৌন্দর্য্য সম্পত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই নিজের প্রণয় পাত্রী নিরূপণ করিলেন। পরে তাঁহাদিগের ভাগ্য-গগন মেঘাচ্ছন্ন হইল, তাঁহারা উভয়েই কতলুর দুর্গে বন্দী হইলেন। জগৎসিংহ সেই ঘনতমোময় কতলু-গৃহে চপলাস্বরূপিনী আয়েষাকে দেখিলেন। কিন্তু, কই, নবাবনন্দিনী আয়েষার সে প্রাণোন্মাদিনী সৌন্দর্য্য-ধারায় মুগ্ধ হইয়া তিনি ত তিলো-

ত্তমাকে ভুলিলেন না। যখন তাঁহাদিগের ভাগ্য-গগন মেঘ বিনির্মুক্ত হইল, তখন আবার তিনি তিলোত্তমাকেই প্রণয়-সুধাদান করিলেন। মৃতকল্পা তিলোত্তমা সঞ্জীবিতা হইয়া উঠিলেন। জগৎসিংহ কর্ত্তৃক আয়েষার প্রণয প্রত্যাখান তাঁহার চরিত্রের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জগৎসিংহ জানিতেন যে, রূপে-গুণে, ঐশ্বর্য্যে, ক্ষমতায় নবাব-নন্দিনী আয়েষা অতুলনীযা—তিনি জানিতেন যে, আয়েষাই তাঁহাকে কঠোর মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—তিনি আরও জানিতেন যে, এই আয়েষাই অযাচিত ভাবে তাঁহাকে প্রণয দান করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি আয়েষার প্রণয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার এরূপ ক্ষেত্রে এ প্রণয়-তুচ্ছতা এই কলুষ-পূর্ণ মানব-সংসারে অদৃশ্য না হইলেও বিরল দৃশ্য!

আয়েষার নিরাশ প্রণয়ে জ্বালা নাই, কিন্তু জগৎসিংহের হতাশ প্রণযে নির্ম্মম দহনগুণ, আছে। জগৎসিংহ কতলু-দুর্গে বন্দী। তিনি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহের পরিবারের কোনও সংবাদ পান নাই, তিলোত্তমারও কোন সংবাদ পান নাই। সেজন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল। হঠাৎ এক দিন মুসলমান বেশধারী গজপতিকে দেখিতে পাইলেন। ওসমানের দ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, শত্রুকর্ত্তৃক বীরেন্দ্রের দুর্গাধিকারের পর হইতে বীরেন্দ্রসিংহের পরিবারবর্গের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই বিশালহৃদয় দহ্যমান হইয়া উঠিল। তিনি শুনিলেন তিলোত্তমা ও বিমলা কতলুখাঁর বাঁদী হইয়াছে। জগৎসিংহ এতদিন হৃদয় মধ্যে এক পবিত্র মন্দিরে তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা প্রণয়িনী তিলোত্তমার একটী স্বর্ণ প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাহা সহসা ঘৃণা-ক্ষোভ-হতাশের অনলরাশিতে গলিয়া যাইয়া সমস্ত হৃদয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অন্তর্জ্জালায় জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে ইচ্ছা করিলেন যে, এই স্নিগ্ধোজ্জ্বলা, মলয়-শীতলা বসুন্ধরার বক্ষে ঐ অনলময়ী তিলোত্তমা আর না থাকে, তাই তিনি বলিলেন,—"তিলোত্তমা আর না বাঁচিয়া থাকে।"

জগৎসিংহের এই প্রণয়-জ্বালা তাঁহার চরিত্র-গরিমা হ্রাস করিতে পারে না। তিনি রাজপুত, তাঁহার শিরায় শিরায় রাজপুত-শোণিতের সহিত রাজপুতকুলোচিত জাতি-গর্ব্ব প্রবাহিত। যখন তিনি শুনিলেন যে, রাজপুতকুলভূষণা তিলোত্তমা স্বেচ্ছায় জগৎসিংহের অযাচিত প্রণয় দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিজাতি বিধর্ম্মী কতলুখাঁর প্রণযের জন্য তাহার পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়া স্বচ্ছ রাজপুত রক্ত কলুষিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে ত ঐ জ্বালা উপস্থিত হইবেই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম·এ, বি-এল্।

অভাগিনী।

শান্তিপুর গ্রামখানি বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন। গ্রামের প্রান্তভাগ দিয়া বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃতা পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কলনাদে

বহিয়া যাইতেছে। এই ভাগীরথী-উপকূলে অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। তিনি দয়াধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! পরের দুঃখমোচনে, পরোপকার-ব্রতে তিনি সদাই তৎপর। পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না; কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির ছলনায় শেষদশায় বড় কষ্টে পড়িয়াছেন! সংসারে গৃহিণী—পুণ্যবতী, আর একমাত্র আদরের কন্যা—সুধা।

সুধা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সুন্দরী কিশোরী! যৌবনোন্মুখী কিশোরীর ললিত কমনীয় দেহে অনুপম লাবণ্যের কনকোজ্জ্বল স্নিগ্ধজ্যোতিঃ ধীরে ধীরে ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

হিন্দু-ঘরের মেয়ে, -এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। বাপের টাকা নাই; সুতরাং ভাল ঘরে, ভাল বরে সুধাকে দান করা পিতার অসাধ্য হইলেও, তিনি স্নেহের কন্যাকে জলে ফেলিয়া দিতে পারেন না!—অবশেষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যথাসর্ব্বস্ব বিনিময়ে এক স্থানে সম্বন্ধ ঠিক হইল! পাত্রের নাম—শিশিরকুমার—বয়স বিশ বৎসর! বিশেষ গুণ কিছুই নাই,তবে গৃহে সঞ্চিত টাকা কিছু আছে।

সুধার বিবাহ হইল। বিবাহের পরদিন শ্বশুরগৃহে যাত্রা করিবার সময় সুধা মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রু-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল—"মা! সেখানে কে আমায় আদর করবে?" স্নেহময়ী অশ্রু মুছাইয়া কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।—সুধা যখন পিতাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন পিতার অশ্রুও আর বাধা মানিল না।—তথাপি তাহাকে যাইতে হইল! সঙ্গিনী-দিগকে ছাড়িয়া, পিতৃগৃহের ধূলাখেলা ফেলিয়া সুধা আজ জীবনের পরীক্ষা দিতে শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল।

(২)

"রেখে দাও তোমার ও-মায়া-কান্না! কিছুতেই তোমার আর সে বাড়ীতে যাওয়া হবে না!"

"মা ও বাবার জন্য মন কেমন করে!"

"অমন অদাতা বাপের মুখ দেখতে নাই। ফাঁকি দিয়ে এতগুলি টাকা ঠকাইল। অমন ছোট লোকের সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি?" এই বলিয়া সুধার শাশুড়ী তথা হইতে চলিয়া গেল। অভাগিনী সুধা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুধার পিতার যেরূপ বরসজ্জা দিবার কথা ছিল, তদনুরূপ নাকি জিনিষ-পত্র দিতে পারে নাই। তাহাতে বরের পিতামাতা রাগিয়া লাল হইয়াছেন। এতগুলি অর্থ যে ঠকাইল, তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা কিসের? এমন ছোট লোক কুটুম্বের সঙ্গে তাঁহারা কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে চান না! সুতরাং পুত্রবধূকে আর পিত্রালয়ে পাঠাইলেন না। অভাগিনী বালিকা চিরতরে শ্বশুর-গৃহে বন্দিনী হইল!—সুধার পিতামাতা এ সংবাদে হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। সে গরীব ব্রাহ্মণ গিয়া বৈবাহিককে কত অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। অঘোরনাথ অশ্রু মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিলেন।

সুধা আর কি করিবে? সে শুধু কাঁদিতে

জানে—পরাধীনা বালিকার অশ্রুজল ভিন্ন আর কি সম্বল আছে? কয়দিন সে কাঁদিয়াই কাটাইল;—স্নানাহার করিল না। তাহাতে শ্বশুর-শাশুড়ী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অগত্যা সুধা শান্ত হইয়া গৃহকাজে মনোযোগ করিল।—সে স্বহস্তে ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর ধোয়া, বিছানা করা, জল তোলা, বাটনা বাটা, রাঁধা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ করিতে লাগিল। তথাপি তাহার নিস্তার নাই; সে সর্ব্বদাই শ্বশুর-শাশুড়ীর বিষমাখা-বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। হায় রে, অবোধ বালিকার কোমল হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক ব্যথা কে বুঝিবে? সে নীরবে সব সহ্য করে—বিরলে বসিয়া কাঁদে।

ক্রমে ক্রমে দিন যাইতে লাগিল।—হায়, সুধার দুঃখের অবধি নাই! পিতামাতার এত আদরের কন্যা—এত স্নেহের ধন—ননীর পুতলী সুধার আজ কি দশা!—দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়! তাঁহার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবধি নাই—হৃদয়ে কেবল অহর্নিশ তুষের অনল জ্বলিতেছে! মনের দুঃখে সে ক্ষণকাল বসিয়া কাঁদিবে এমন অবসরটুকু নাই; সমস্ত দিন তাহাকে গৃহকাজে খাটিতে হয়। এত করিয়াও শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর মন পায় না। উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা! নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সে সকল সুখে বঞ্চিতা; দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই যেন সে পৃথিবীতে আসিয়াছে। স্বামী তাহার সঙ্গে কোনদিন দু'টা ভালবাসার কথা বলেন না। উপেক্ষিতা অনাদৃতা অভাগিনী সুধার কপালে কি এই ছিল?

(৩)

সেদিন বৈকালে সুধা উঠান ঝাঁট দিতেছিল! এমন সময়ে সুধার পিস্তুত ভাই শশিভূষণ আসিয়া বলিল—"সুধা! ভাল আছিস্ ত?"

সুধা।—"হাঁ দাদা! বাবা মা ভাল আছেন?"

শশী।—"মামার বড় শক্ত ব্যারাম, জীবনের আশা খুব কম! তোকে একবার দেখ্তে চেয়েছেন,—তাই নিতে এসেছি!"

সুধা।—"চিকিৎসা হচ্চে না?"

শশী।—"কি দিয়ে হবে? মহাজনেরা নালিশ করে বিষয়-সম্পত্তি সব নিয়েছে। বাস্তুভিটে পর্য্যন্ত উচ্ছন্ন গিয়েছে! অর্থাভাবে চিকিৎসা হচ্চে না।"

সুধার চোখে জল আসিল, বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মুছিয়া বলিল—"বাবা এখন কোথায় আছেন?"

শশী।—"আমাদের বাড়ীতে।"

সুধা।—"এত টাকা কর্জ্জ করে বাবা কি করেছেন?"

শশী।—"তা জান না? তোমার বিয়ে দিয়েছেন!"

সুধার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। অশ্রু-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে সে বলিল,—"দাদা! আমার জন্যই বাবা এমন দশায় পড়েছেন! আমি বাবার ধন-প্রাণ নাশ করতে জন্মে ছিলেম! যদি ছোট বেলায় আমায় নুন খাইয়ে মেরে ফেল্তেন, তা হলে তা'—"

শশী।—"ছিঃ! সুধা কাঁদ্‌ছিস্। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, যা তোর শাশুড়ীকে বল্‌গে যা', কি বলে?"

"এঁরা কি আমায় ছেড়ে দেবেন ? আচ্ছা, বলে দেখি।"

সুধা শাশুড়ীকে বলিল—"মা! বাবার বড় শক্ত ব্যারাম, দাদা নিতে এসেছেন, একবার বাবাকে দেখতে ইচ্ছা করে!"

শাশুড়ী ঝঙ্কার দেয়া বলিয়া উঠিল—"যাবে যাও, আর আসবার নামটি করো না।"

সুধা কাঁদিয়া ফেলিল, শাশুড়ী পূর্ববৎ বলিল—"কাঁদতে লজ্জা করে না—কোন্ মুখে কান্না আসে ? তোমার বাপ মরুক আর বাঁচুক, আমার কি ?

"আমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। মা! আপনার পায়ে পড়ি।"

"আঃ জ্বালালে।" বলিয়া শাশুড়ী সজোরে পা ছাড়াইতে গিয়া পুত্র-বধূকে এক পদাঘাত করিল।

সুধার যাওয়া হইল না। শশিভূষণ বাটী রওনা হইবে, এমন সময় সুধা আসিয়া শশীকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুধা হাত হইতে 'সোণার বালা' জোড়া খুলিয়া বলিল—"দাদা ইহা বিক্রী করে বাবার চিকিৎসা করো!—আর বলো, সুধা মরে গেছে।"

'এ-যে—"

"কোন কথা বলো না! যাও—"

"এঁরা যে তোকে—"

"লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিবে ? সহ্য করতে পারব, বাবা আমার জন্য এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করলেন, আমি তাঁর জন্য এ তুচ্ছ লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারব না ? যাও—দেরী করো না।"

শশী আর কিছু বলিল না, ত্রস্তে বালাজোড়া উড়ানীর আড়ালে ঢাকিয়া চলিয়া গেল। সুধার চোক দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কথা চাপা রহিল না, এমন কথা কি চাপা থাকতে পারে ?

চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই শ্বশুর-শাশুড়ী জানিতে পারিলেন, বৌ "বালাজোড়া" পিতার চিকিৎসার্থ পাঠাইয়া দিয়াছে। কথা প্রকাশ হইল, সুধার কপালে আগুন জ্বলিল। শ্বশুর-শাশুড়ী বৌকে নানা অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াও নিরস্ত হইলেন না। কর্ত্তা বলিলেন—"এখন বৌকে জন্মের মত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।" গিন্নী—"তা আবার বলতে ? এমন অলক্ষ্মীকে আর ঘরে জায়গা দিতে আছে গা ? চোরের জাত, এখন এ বাড়ী হতে দূর হও।"

সুধা গৃহমধ্যে কপাটের আড়ালে দাড়াইয়া সব শুনিতেছিল। আর নীরবে নয়ন-জলে অভিষিক্ত হইতেছিল!

কর্ত্তা—"এখনও দাঁড়িয়ে রৈলে ? যাও এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না—বাপের বাড়ী যাও।"

বধূ মৃদুস্বরে বলিল—"না, আমি যাব না।"

গিন্নী—"যাবিনে ? হারামজাদির বেটী, যাবিনে।"

কর্ত্তা—"এখনও ভালভাবে বলছি—যাও।"

সুধা—"আমি ঘরের বৌ, ঘর ছেড়ে কোথা যাব ? আপনারা গুরুজন দোষ করে থাকি, শাস্তি দেন!"

গিন্নী—"রেখে দে তোর আহ্লাদের কথা, এখন যাবি কি না বল ? ভালয় ভালয় যাস্ ত

মঙ্গল, নইলে ঝাঁটা পেটা করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিব।"

বধূ—"মা! বাপ-মা আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, এখন আপনারাই আমার মা-বাপ!"

গিন্নী—"এত দেখছি কম বদমায়েসী জানে না গা? বের হবি না কি? এখনি বেবহ বল্‌ছি!"—এই বলিয়া বধূর হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল!

বধূ সকাতরে বলিল—"মা আপনার পায়ে পড়ি,—এমন করে"—

গিন্নী—'যা এখনি দূর হয়ে যা!" বলিয়া গৃহিণী বধূর গলা ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারিল। বধূ চৌকাঠে পড়িয়া গেল,—মস্তক আহত হইল। সুধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল—গৃহে শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইল। শিশির ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"মা! একবারে মেরে ফেল্লে?"

শিশির সুধাকে ধরিয়া উঠাইল।—সুধার চোখে মুখে জল দিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা করিল; কিন্তু চৈতন্য হইল না। তার পর তিন জনে ধরাধরি করিয়া মৃতবৎ সুধাকে শয্যায় শোয়াইল। আঘাত বড় সাংঘাতিক হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া সুধার মাতা সুধাকে দেখিতে আসিলেন। মেয়েকে দেখিয়া মাতা কাঁদিতে লাগিলেন।—সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুধার একবার মাত্র চেতনা সঞ্চার হইল। মাতা ডাকিলেন—"সুধা! মা আমার!"

"কি মা?"

"তুমি পড়ে গেলে কি করে?"

এই বুঝি বলিয়া ফেলে? কর্ত্তা গিন্নীর ভীতি-বিহ্বল-বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হইল!

"মা! হঠাৎ আমি পড়ে গিয়েছিলেম! এঁদের কোন দোষ নাই।" সুধা কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"মা! বাবা কেমন আছেন?"

"একটু ভাল হয়েছেন! তিনি তোমার "বালা" গ্রহণ করেন নাই। আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়েছেন!"

"মা!"

'কি মা!"

"জীবনের খেলা ত ফুরাল, মরণকালে একবার বাবাকে দেখতে পেলাম না। তাঁরে আমি বড় কষ্ট দিলাম। উঃ, বড় যাতনা—"

এই সময় সুধার শ্বশুর বলিলেন—"বৌমা! তুমি ভাল হয়ে উঠ, এইবার তোমায় পাঠিযে দিব।"

সুধার চোখে আবার দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। এই অশ্রুই শেষ—

প্রভাতের নির্ম্মল বায়ুর সহিত সুধার প্রাণ-বায়ু মিশিয়া গেল! আজ উপেক্ষিতা অনাদৃতা সুধা নিষ্কৃতি পাইল!—তারপর চিতার পবিত্র ধূম স্বর্গে উঠিয়া দেবতা-পদে বিলীন হইয়া গেল—শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর অনুতাপ-অশ্রু শ্মশান-ভস্ম সিক্ত করিল।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

* এই গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু ইহার সহিত কোন ভদ্র পরিবার সংশ্লিষ্ট থাকায় নাম ধাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি। লেখক।

হরিনাম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর)

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"

অর্থাৎ আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) সর্ব্বভূতস্থিত আত্মা। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম; তিনিই এ বিরাট বিশ্বের নিয়ন্তা—তিনিই সর্ব্ব-পূজ্য জগদীশ্বর।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগৎ" যিনি সমগ্র ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই আমি। যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সকল বস্তু যাঁহাতে অবস্থিত, সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা ব্রহ্মই আমি। যথাঃ—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চঃ মে ন প্রণশ্যতি॥"

আবার—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

তিনিই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ; তাঁহার হস্ত, পদ, নেত্র, শির, মুখ ও শ্রুতি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে।

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামাচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মাত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥"

সকল পদার্থের ভিতরেও তিনি, আবার বাহিরেও তিনি; স্থাবর জঙ্গম সবই তিনি। সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি দূর হইতেও দূর এবং নিকট হইতেও নিকট।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥"

তিনি এক অখণ্ড আত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া বোধগম্য হইয়া থাকেন। তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা।

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্টিতম্॥"

তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ; তিনিই অবিদ্যারূপে অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত। জ্ঞান ও জ্ঞেয় সবই তিনি। তিনি সর্ব্বহৃদয়ে সর্ব্বনিয়ন্তারূপে অবস্থিত।

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ সবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

যাহা সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত, সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও যাঁহার বিনাশ হয় না, সেই ব্রহ্ম পদার্থই আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। যিনি আমাকে এরূপভাবে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শী।

"সর্ব্ব বীজং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

সর্ব্ববীজস্বরূপ পরম ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

"কৃষ্ণ ব্রহ্মে করে ভেদ, নর বুঝে নারে,
অভেদ কহে সর্ব্ব বেদ।
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপ ক্লেদ॥"

কৃষ্ণ ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নাই; যেই কৃষ্ণ, সেই ব্রহ্ম। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের অভিমত ও ভক্তের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস বলেই ভক্ত কবি গাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ পূজ দিন যায় বঞ্চা।

অবহেলে নাশ পাপ কৃষ্ণ কথা কণ॥
ধন জন পুত্র দেখ সকলি অসার।
পরিণামে সংহতি দেখ কেহ নহে আর॥
পথের পরিচয় দেয় সকল বন্ধুগণ।
এতেক জানিযা ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥"

(যম-সংহিতা।)

হরিভক্ত যবন হরিদাস ঠাকুর গাইয়াছেন,—

"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন!
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥'

আবার—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন॥
তোমা সবাকার লাগি কৃষ্ণ অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত।)

কলির অবতার পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে গাইয়াছেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাং।

(৩)

অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পরই কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হরিবোল' বলিয়া প্রেম-ভক্তি বিতরণ পূর্ব্বক কলির জীবোদ্ধারের জন্য পাতকী পাষণ্ডদিগকে মধুর হরিনামে পুণ্য পবিত্রতাময় করিবার জন্যই শ্রীভগবানের এ বারের এ অবতারত্ব গ্রহণের—এ মনুষ্য-জন্মধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

শুষ্ক জ্ঞানের তর্ক লয়ে মত্ত যবে ছিল পণ্ডিতদল,
জ্ঞানযোগী যত জ্ঞানের গরবে ভক্তিরে দিলা
রসাতল।
নদীয়ায় প্রভু জন্মিলে তখন বাণী-বরপুত্র-স্থান,
উঠিল গগনে 'হরিবোল' ধ্বনি, বহিল ভক্তির
বাণ।
শচীর নন্দন হ'য়ে চৈতন্য রূপেতে মোহিলে
সংসার,
পাপী তাপী তরে হরিপ্রেমভরে হ'লে চৈতন্য
অবতার।
গাহিল এ বিশ্ব মত্ত প্রেমভরে জগতে উঠিল
রোল,
ভকতির স্রোতে ভাসিল ধরা বিশ্ব-কণ্ঠে সদা
হরিবোল!

বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম জগতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্ত সংখ্যাও বড় কম নহে। এমন দিন নাই, যে দিন রজনীতে বঙ্গীয় বৈষ্ণব ভবন—গৌর-ভক্তের পূত নিকেতন, গৌর সঙ্গীতের পবিত্র-মধুর ধ্বনিতে—"প্রাণগৌর নিত্যানন্দ" রবে মুখরিত না হয়, এমন যামিনী নাই, যে রাত্রিতে—

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর,
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥"

এবং ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম" প্রভৃতি গৌর-সঙ্গীতের সুরসাল পদাবলীতে—খোল, করতাল ও মৃদঙ্গের মধুর রবে গৌর-ভক্তগণের পবিত্র গৃহ প্রতিধ্বনিত

না হয়, এমন দিন নাই, যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পবিত্র-মধুর নামে মহোৎসবের পুণ্য-যজ্ঞের অমৃতোপম মহাপ্রসাদে শত সহস্র দীন দরিদ্র ভক্ত বৈষ্ণবের পরিতৃপ্তি ভোজন না হয়, এমন দিন নাই, যেদিন ভক্ত তাঁহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে পূজা করিয়া প্রাণে বিপুল প্রীতি অনুভব না করেন। তিনি ভগবান, তিনি বিষ্ণুর অবতার, তাই প্রত্যহ বহু ভাগ্যবান ভক্ত তাঁহাকে ধূপ, দীপ, গন্ধ-পুষ্পাদি বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া—তাঁহার স্তব-স্তুতি ও নাম-গানে উন্মত্ত হইয়া প্রেমাশ্রুপাত করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গাধীন এখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থ ''চৈতন্যচরিতামৃত'' হইতে দুইটী গৌরাঙ্গ-স্তব উদ্ধৃত হইল, যথা—

''বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নব ঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার॥
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নব গুঞ্জ শিখি-পুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
বনমালা করে, দধি ওদন যাঁহার।
জগন্নাথ-পুত্র পায়ে মোর নমস্কার॥
শৃঙ্গ-বেত্র-বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকী-জীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগৎ-জীবন।
তুমি নীল-চন্দ্র সবার কারণ।''

আবার,—

''জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর॥
জয় জয় সিন্ধুসুত রূপ মনোহর।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ-বিভূষণ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি যে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন।
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যাঁর॥
সংকীর্ত্তনারম্ভে পুনঃ তব অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাই আর॥''

ফলতঃ যে মহাপুরুষ নবদ্বীপ হইতে নীলাচল, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কন্যা কুমারীকা পর্য্যন্ত হরিনাম-প্লাবনে পবিত্র করিয়াছিলেন, যে মহাপুরুষ পতিত পাষণ্ডের প্রাণে হরিনামের পূত প্রবাহ সঞ্চালনে পাপীর হৃদয়-কন্দর পুণ্য-পবিত্রতাময় করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ং অপার স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর মায়া-পাশ, অসামান্য রূপ-গুণশালিনী পতিব্রতা তরুণী ভার্য্যার অনাবিল প্রেম এবং অসাধারণ প্রতিভা, বিশ্ববিজয়ী বিদ্যা-গৌরব ও প্রভূত যশ-সম্পদের মমতা

পরিত্যাগ করিয়া যৌবনে যোগী সাজিয়া বিশ্ব-বাসীকে সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য, ত্যাগের মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, যিনি পতিতের উদ্ধার সাধন করিয়া, নীচকে উচ্চ করিয়া, অমানীকে মান্য প্রদান করিয়া এবং গলিত কুষ্ঠীকে প্রেম ভরে কোল দান করিয়া জগতে মহান্ উদা-রতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যাহার হরিনাম কীর্ত্তনে নদে ডুবু ডুবু, শান্তিপুর প্লাবিত, প্রয়াগ নিমজ্জিত, নিলাচল অভিষিক্ত এবং সমস্ত গৌড়দেশ মুখরিত হইয়াছিল, যিনি লোক শিক্ষার্থ হরিনামের "হ" উচ্চারণ করি-তেই ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যাইতেন,—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ধরাতলে লুটাইতেন, পবিত্র প্রেমাশ্রুতে ধরিত্রী-বক্ষ শীতল করিতেন, সেই প্রেমের ঠাকুর, প্রেম-ভক্তির অবতার নির্ব্বিকার মহা-পুরুষকে—সেই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা না করিলে,নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার পদে প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলে, তাঁহার চরণ তলে মস্তক না লুটাইলে মানুষের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে কেন ?

মহাপ্রভুর হরিনাম প্রচার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

"যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভোলা ;
সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন খেলা।"

প্রেমের রাজত্ব, দৈন্যের দেবত্ব, আদর্শ চরিত্র-মাধুর্য্যের অসাধারণ মহত্ত্ব ও হরিনামের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রচার এবং পতিতের উদ্ধার সাধন করাই যেন এবার শ্রীভগবানের নররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত লোক শিক্ষার্থ তিনি আজীবন দেশে দেশে ঘুরিয়া কেবলই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া অশ্রুপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র প্রেমাশ্রু-পাতে সত্য সত্যই বসুমতী সিক্ত হইয়াছিল— বিশ্বাসীর প্রাণে হরিভক্তির অমৃতনির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়াছিল।

"পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখা আর॥"
(চৈতন্য ভাগবত)

গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥
(চৈতন্য চরিতামৃত)

অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক ও হুঙ্কার প্রভৃতি কৃষ্ণ ভক্তির নয়টি লক্ষণ। প্রভু স্বয়ং ভক্ত সাজিয়া জগৎবাসীকে ভক্তির এই নব লক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন। হরি বলিতেই তাঁহার অশ্রুপাত হইত, 'কৃষ্ণ' বলিতেই তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন—কাঁদিতেন, নাচিতেন ও হুঙ্কারধ্বনি করিয়া উঠিতেন। ভক্তকবি গাইয়াছেন—

'-কাঁপে অঙ্গ, ভাসে বক্ষ প্রেমাশ্রুধারায়,
মুখে তব জয় ধ্বনি—হরি হরি বোল,
পাপ তাপ দুঃখ দৈন্য লোটে এসে পায়,
চিদানন্দে ভেবে ভক্ত—দাও তারে কোল"
(বর্ণণ)।

ক্রমশঃ

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

মাতৃনামের জয়।

রিপুরাজ কাম সহাস্য বদনে
যুবকের প্রতি কয়—
"বিফল বাসনা জিনিতে আমারে
কহি তোমা' সুনিশ্চয়।
মম শরাশনে অলক্ষ্যে গোপনে
জুড়িয়া কুসুম শর,
প্রেমের পিয়াসা বাড়ায়ে তুলিব
বিঁধি তব কলেবর।"
জয় মা স্মরিয়া গরবে নাচিয়া
যুবক হাসিয়া কয়,
"তোমার কোমল কুসুম শায়কে
নাহি করি আমি ভয়,
রসনা ধনুকে জয় মা শায়ক
থাকে যদি চির গাঁথা,
আমার চরণে চির অবনত
রহিবে তোমার মাথা।"
বাধিল সমর। মদন ইঙ্গিতে
ষোড়শী রূপসী নারী—
এল রণভূমে কাম অনুকূলে
মোহিনী সুবেশ ধরি;
প্রেমেতে মাতিয়া প্রেম উন্মাদিনী—
যুবকের প্রতি ধায়,
মা মা বলিয়া যুবক সরল
লুটা'ল তাহার পায়।
হারিয়া অনঙ্গ বলিয়া উঠিল
বিষাদ বেহাগ তানে,
"নাইকো শকতি করিতে প্রবেশ
মাতৃ-নাম যেই স্থানে।"

শ্রীবঙ্কচন্দ্র নাথ।

ক্ষমা।

(গল্প)

পত্নীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনিয়া নরেন বাবু সেদিন হন্ হন্ করিয়া শুইবার ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "বলি রোজ রোজ এমনি ঝগড়া করা কি ভাল?"

নরেন বাবুর অভিমানিনী পত্নী বীণাপাণি ধব্‌ধবে শান্তিপুরে কাপড় পরিয়া সাচ্চা লেস্ বসান সেমিজ গায় দিয়া জানালার ফাঁকের কিরণটুকু গায়ে মাখিয়া বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়াছিল, অভিমানের মাত্রা একটু চড়াইয়া বলিল "কে ঝগড়া ক'ত্তে বলে?"

—"বলবে আর কে তুমিই কর! মা যা বলেন, তা শুনলেই তো হয়।"

—"কথার মত কথা বল্লেই শুনতে ইচ্ছে হয়।"

—"দ্যাখো, তিনি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতী, একজন পাকা গৃহিনী, তোমার চেয়ে তাঁর সংসারিক অভিজ্ঞতা ঢের বেশী, তোমাকে বুঝতে হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে বেশী বোঝেন। বাক্‌বিতণ্ডা না করে যা বলেন, করলেই তো সব চুকে যায়। তাঁর হুকুম মাথায় পেতে লওয়াই তোমার উচিত। আরও দেখ, দিন ৩।৪ বার করে চা খাওয়া, রোজ রোজ সাবান মাখা, নভেল পড়া, এ সব শুনে পাড়াশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দে করে, মাকে অনেক কথা শুন্‌তে হয়, তাই তিনি ওগুলো কর্‌তে নিষেধ করেন। যাতে পাঁচ-

জনে নিন্দে করে সে কাজ না করাই ভাল।”

—“আমি কারো নিন্দের ধার ধারি না, চা খাব, তার আবার নিন্দে কি? ছোট বেলা থেকে চা খাওয়া অভ্যাস। একদিন না খেলে গায় হাতে ব্যথা ধরে, শরীর খারাপ হয়, নভেল না পড়লে সমস্ত দিনটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, সাবান না মাখলে গা ঘ্যান ঘ্যান করে। ওসব আমার চিরকেলে অভ্যাস, এখন আমি ছাড়তে পার্ব্বো না।”

—“মাঝে মাঝে না হয় চা খেলে, কালে-ভদ্রে না হয় এক-আধটু বই পড়লে, গায়ে সাবানও মাখলে। রোজ রোজ সাবান মাখলে যদি কথা উঠে, সাবান না মাখ্‌লেই পার। সাবান না মাখলে বুঝি সুন্দরী হওয়া যায় না?”

—“তোমরা পাড়াগেঁয়ে জংলী—ধূলো-কাদায় থাক্‌তে ভালবাস তোমাদের সাবান না হলে চলে, আমার তা চলে না।”

—“দ্যাখো পাড়াগেঁয়ে জংলী বলে যত দোষ আমার ঘাড়েই ফেলো না। পাড়া-গেঁয়েই হই, আর জংলীই হই, ধর্ম্মতঃ আমি তোমার স্বামী, যদি পাড়াগেঁয়েদের উপর এতখানি অশ্রদ্ধা, তবে তোমার বাবা এমন জংলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন?”

—“তিনি কি আর জেনেছিলেন যে, চির-কাল তোমার পড়াই শেষ হবে না, পাড়াগেঁয়েই থাক্‌বে। বাবা মনে করেছিলেন, জামাই বাবু আমার শীগ্‌গীর একটা হোমড়া চোমড়া বাবু হবে, সহরে থাক্‌বে বেশ একটু সভ্যভব্যও হবে। তুমি যে আমাকে এমনি করে' পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখবে, তা তো তিনি জানতেন না।”

—“কে পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারে ডুবে থাক্‌তে বলে? বাপের বাড়ীর সভ্যতার আলোতে হাবুডুবু খাওগে, কেউ নিষেধ করবে না।”

বীণাপাণি এবার কি ভাবিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পত্নীকে নীরব দেখিয়া নরেন বাবু মনে করিলেন, বলিবার পালাটা বুঝি তাঁর। তাই তিনি জোর গলায় বলিলেন “যদি স্বামী বলে অন্তরে একটুও ভক্তি-ভালবাসা থাকে, তবে যা বলি শোন। তুমি এই কু-অভ্যাস গুলো ত্যাগ কর, মা যা বলেন, তা শোন, তাঁর উপর ভক্তি হারিও না।”

—“বই পড়া, চা খাওয়া, সাবান মাখা, এসব বুঝি কুঅভ্যাস? পাড়াগেঁয়েদের কাছে এ গুলো কু-অভ্যাস মনে হ'তে পারে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। ও গুলা কু-অভ্যাসই হোক্‌, আর সু-অভ্যাসই হোক্‌, আমি ছাড়তে পার্ব্বো না। তোমাদের এ পাড়াগাঁ ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্বো, তথাপি আমার ছোটবেলার অভ্যাস আমি কিছুতেই ছাড়তে পার্ব্বো না।”

—“ওঃ এত বড় স্পর্দ্ধা! তুমি কি না ছার সাবান মাখা, চা খাওয়া ও নভেল পড়বার জন্য আমার দেবীস্বরূপিণী মাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পার! ধিক্‌ তোমার নারী জন্মে! দূর হও পাপিয়সী—এই মুহূর্তেই তুমি আমার চোকের আড়াল হও। আজ হতে তুমি আমার পত্নী নও—দুচোকের বিষ।”

অভিমানিনী বীণাপাণির অভিমানের মাত্রা এবার উনপঞ্চাশে উঠিয়া গেল। তাহার এত

খানি অপমান সহ্য হইল না। সে অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। তাহার পর রান্না ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া একখানা ছিন্ন মাদুরে শুইয়া পড়িল।

নরেনবাবু পত্নীকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া পালঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ হইল না, এ পাশ ও পাশ করিয়া কোন রকমে রাত্রিটা কাটাইলেন। প্রভাত হইল, কোকিল গাহিল, ফুলও ফুটিল, রাঙা রবি আকাশে হাসিমুখে দেখা দিল, নরেনবাবু কিন্তু আজ হাসিলেন না, অন্যদিনের মত সকালে জল খাবারও খাইলেন না, একখানা শার্ট গায়ে দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাটীর বাহির হইলেন। সকালে উঠিয়া রান্নাঘরের দোর বন্ধ দেখিয়া নরেন বাবুর মা ব্যাপারটা মোটামুটী বুঝিয়া লইলেন! বৌমা যে একগুঁয়ে তাহাও তিনি জানিতেন, তবু ডাক দিতে হয় তাই ডাকিলেন "ও বৌ-মা বৌ-মা! এতখানি বেলা হয়েছে ওঠ, এখনও কি এমনি করে পড়ে থাকতে হয় মা!"

সুশীলা শাশুড়ী ঠাকুরাণী কত ডাকাডাকি করিলেন, দোরে ধাক্কা দিলেন, কিন্তু বৌ-মার সে দিকে গ্রাহ্য নাই, সে নীরব নির্ব্বাক, এ কি? তবে কি নরুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিষ টিস্ খেলে নাকি? তিনি আবার ডাকিলেন, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। তাঁহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন "ওমা হেমু, আমার গা ছুর ছুর করচে মা, একবার যা মা ভট্‌চাজ্জিদের বড় বৌমাকে শীগ্‌গীর ডেকে আন্। ও বৌ-মা! বৌ-মা! বৌমার যে সাড়াশব্দ নেই গো! কি হবে গো! নরু কোথা গেলরে।"

ভট্‌চাজ্জিদের বড় বৌ সম্পর্কে বীণার দিদি, তার মাসিমার মেয়ে, নাম সুহাসিনী। সুহাসিনীর সঙ্গে বীণার খুব আলাপ খুব ভালবাসা, ডাক শুনিয়া সুহাসিনী তাড়াতাড়ি আসিল এবং চেঁচাইয়া বলিল "এখনও এমন করে শুয়ে কেন বীণা? কি হয়েছে কি? দোর খোল্ না!

—"একটু শুয়ে আছি তার জন্য পাড়াশুদ্ধ লোক ডাকাডাকি কেন? সবাই মনে করেচে আমি বুঝি বেঁচে নাই। তা আমাদের কি আর মরণ আছে দিদি! তবে শরীরটা যে রকম খারাপ হয়ে আসচে তাতে আর বেশী দিন নয়। রাত্রি থেকে বুকে ব্যথা আর জ্বর; কথাটী কহিতেও কষ্ট হচ্ছে, এখন দোর খুলতে পার্ব্বে না, শরীর টা মোটেই ভাল নয় বিরক্ত করো না দিদি, তুমি এখন যাও, খানিক পরে এসো।"

বীণার মুখ হইতে যাহা একবার বাহির হইয়াছে, তাহার আর নড় চড় হইবে না। বীণা চিরকালই একগুঁয়ে, কাজেই সুহাসিনী কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। প্রতিবেসিনীদের মধ্যে যাহারা চীৎকার শুনিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারাও কেহ বা 'ছুঁড়িটার আচরণ দেখে গা জ্বালা করে' কেহ বা 'বৌ-টা কি দস্যি গো' ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজের নিজের গৃহে ফিরিলেন।

নরেন বাবু যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন বেলা প্রায় ১২টা, তখনও পর্য্যন্ত তিনি জলস্পর্শ

করেন নাই, রোদের তাপে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। ঘরে পা দিতে না দিতেই তাঁহার মা বলিলেন "সকাল থেকে কিছু খাস্‌নি এতখানি বেলা হয়ে গেছে, তারপর বৌমারও রাত্রি থেকে অসুখ, তারই বা হবে কি? ডাক্তার ডেকে আন, এমন করে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে কেন?"

—"ডাক্তার কেন? অসুখ না ছাই, ও অসুখ ডাক্তারের বাবাও সারাতে পারবে না। মরুক, চুলোয় যাক! অমন পরিবার ম'রলেই কি আর বাঁচলেই কি?"

"সে কি রে? মরবে কি? বালাই অমন কথা কি বলতে আছে বাবা! তোরা আমার জন্ম জন্ম বেঁচে থাক, সুখে ঘরকন্না কর, আমি যেন তোদের কোলে চ'লে যেতে পারি।"

নরেন বাবু বীণার পানে ফিরিয়া চাহিলেন না, ডাক্তারও ডাকিলেন না! মধ্যাহ্ন অতীত হইলেই চারিটী ভাত মুখে দিয়া মামার বাড়ী যাইবার ছুতো করিয়া মায়ের পদধূলি লইলেন। মা বলিলেন—"এমন সময় যাবি কি? বৌমার অসুখ দেখে যাবি কোথা? আমি একা কি করি বাবা?"

—"তোমাকে কিছুই কর্ত্তে হবে না—চুপ ক'রে বসে থাক। রোগ বালাই কিছু নয় তুমি ভেবো না। আমি শীগ্‌গীর ফিরব।"

—"যা খুসী তাই কর। তোদের সব ব্যাভার দেখে, মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয়।"

নরেন বাবু মা'র কথা শুনিলেন না। তিনি মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। স্বামী চলিয়া গেলে বীণাপাণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া শুইবার ঘরে গেল ও ট্রাঙ্ক হইতে তাড়াতাড়ি একখানা চিঠির কাগজ ও খাম বাহির করিয়া আনিল, পত্রে সে লিখিল :—

সরোজপুর, শনিবার,

"শ্রীচরণেষু—

বাবা! আপনার পত্র পেয়েছি। কয়দিন শরীরটা বড় খারাপ। বুকে ব্যথা হ'য়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি। এ জন্যে চিঠি লিখতে পারি নাই। বুকের বেদনা ক্রমশঃ বাড়চে। পাড়াগাঁ, ডাক্তার ভাল পাওয়া যায় না—খাবারও বিশেষ অসুবিধা, কোন জিনিষ মিলে না। এদেরও আমার উপর তেমন যত্ন দেখি না, এ অবস্থায় বেশী দিন এখানে থাকলে মারা যাবো। সত্বর একখানা পাল্কী পাঠাবেন, সুধা যেন সঙ্গে আসে ইতি। আপনাদের স্নেহের

"বীণা"

বীণাপাণির পত্র পাইয়া অবনীবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। বড় লোক, এক বই মেয়ে নয়, তাও আবার এমন হ'ল। আহা না জানি বীণা আমার সেখানে কত কষ্টই পাচ্চে! কত লাঞ্ছনাই ভোগ কচ্চে!

পত্র শুনিয়া অবনীবাবুর পত্নী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন "ওমা এমন অসুখ হয়েছে তা একটু যত্ন নেয় না গা। চার পাঁচ দিন ব্যারাম তা একখানা চিঠি দিয়ে খবর নেই! ছি ছি কেমন ধারা শাশুড়ী গো!"

অবনী বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পাল্কী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সুধার জ্বর হওয়ায় যাইতে পারিল না। অগত্যা সঙ্গে চলিল শক্ত, মিরচা জোন্সী ভৃত্য সিউরাম সিং।

(২)

বীণা এবার কারো কথা শুনবে না, বাপের বাড়ী যাবেই য'বে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাল্কী আসিয়া পঁহুছিয়াছে। সহসা পাল্কীর আবির্ভাবে সরলা শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রথমে একটু হতভম্ব হইয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই সিউরাম সিংহের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। বৌমার কি অসুখ, কেন বাপের বাড়ী যাচ্চে, ক্রমে তিনি সব বুঝিলেন, সব জানিলেন। বৌমা যে নিষেধ মানিবে না তাহাও তিনি জানিতেন। তবুও বলিলেন "আমি আর কখন কিছু ব'লবো না মা, তুমি ঘরের লক্ষ্মী ঘরেই থাকো। যাবে কেন মা? আর যদি নিতান্তই যেতে চাও তো নক ফিরে এলে—"

বীণাপাণি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কোন কথা কাণে তুলিল না, যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতিও লইল না। প্রভাত হইতে না হইতেই বীণাপাণি পাল্কী হাঁকাইয়া আজ পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

বীণাপাণি বর্দ্ধমানে আসিল। সহরের বড় বড় ডাক্তার ডাকাইয়া রোগ পরীক্ষা করান হইল। ফলে রোগটা (Heart-disease) বুকের ব্যারাম সাব্যস্ত হইল। রীতিমত চিকিৎসা চলিল। তিন মাস গেল, চার মাস গেল, কিন্তু রোগ উপশম হইল না। বীণার শরীর দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিল। বীণার আহারে রুচি নাই, রাত্রে ঘুম নাই, কারো সঙ্গে কথাটী অবধি কইতে বিরক্ত। সে কেবলই নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদে, হা হুতাশ করিতে থাকে। কি দোষে আজ সে স্বামীর আদর সোহাগ হইতে বঞ্চিত, সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে এমন কঠোর জীবন যাপন করিবে" ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন তাহার বিরহ-উদ্বেলিত হৃদয়কে অধিকতর আকুল করিয়া তুলিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই, শান্তি নাই। মুখে চিন্তার ঘোর কালিমা, মনে শুধু অশান্তি।

* * * *

সে দিন রবিবার। সকাল সকাল কাজ সারিয়া গৃহিনী ঠাকুরাণী পূজার উদ্যোগ করিবেন এমন সময় শান্ত আসিয়া তাঁহার পায়ে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। বীণার মা শান্তকে হঠাৎ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "শান্ত না কি? কখন আসা হ'ল মা? ও ঝি! ব'সতে একটা আসন দে তো!"

"কাল সন্ধ্যার ট্রেণে এসেচি মা।"

"তা বেশ হয়েছে। বোস্ মা বোস্। দিদির মুখে শুনি বড় কাজের ঠেলা, একবার নিশ্বাস ফেল্‌তে সময় পাসনি। যা হোক বাপের বাড়ীতে এখন দিন কতক সোয়াস্তিতে কাটা।"

—"সোয়াস্তি পাবার কি যো আছে মা! সংসারের যে ঝঞ্ঝাট, তাতে কোথাও পা-টী বাড়াতে পাই না। আসতে কি পারতুম, বাবার অসুখ, না এলে নয়, তাই দু দিনের জন্যে এসেচি। আসবার সময় শ্বশুর মশায় ব'লেছেন, যাচ্চো কিন্তু শীগ্‌গীর যেন এসো। লোক জন নেই মা, সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হ'লে এবার ঠিক মারা যাবো। জান তো তোমার যত্নেই বেঁচে আছি।"

—"তোর শ্বশুরের আবার হয়েছে কি ?"

—"সেই অ্যাজমা—হাঁপানীর ব্যারাম ত এখনও সারে নাই।"

—"জামাই বাবাজী বেশ ভাল তো ?"

—"কেউ ভাল নয়, সব ব্যারাম মা সব ব্যারাম। আজ সর্দ্দি, কাল জ্বর, পরশু পেটের অসুখ, একটা না একটা লেগে আছেই। মোটের মাঝে বড় দিদির শরীর ভাল ছিল তাও আবার ক'দিন মাথার ব্যারাম হয়েছে, সর্ব্বদা মাথা টিপ টিপ ক'চ্চে, আগুনের তাতে ঘেঁসবার যো নাই, কোন কাজ করবার যো নাই। গৃহস্থালীর ঝঞ্ঝাট যা কিছু আমাকেই পোয়াতে হয়। রান্না বান্না সেবা যত্ন সব আমাকেই কত্তে হয়।"

বড় দিদির ২।৩টী ছেলে মেয়ে, তাদের খাওযান, পরান, শোয়ান সব ভার আমার উপর। আমি ছেলেদের খুব ভালবাসি বড় দিদিও আমাকে নিজের বোনের মত ভাল-বাসেন—"

"তোর গুণে সকলেই যে তোকে ভাল বাসবে মা ? তুই যে লক্ষ্মী—সোণার শান্ত। আহা এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি হয় ? নারায়ণ করুন বেঁচে থাক্, পেটে দুটো হোক, সুখে সংসার কর, আমাদের তো মা মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই, বীণার অসুখ নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। চিকিৎসা হচ্ছে, ঔষধও খাচ্ছে অথচ ব্যরাম এক তিলও কমছে না। জিজ্ঞাসা করলেও কোন উত্তর নাই। কি যে হবে। রাত্রিদিন কাঁদছে কাটছে।' যদি পারিস্ মা না হয় একটা বিহিত কর্। এমনি করলে কোন্ দিন মারা যাবে যে ?'

"হঁ। মার মুখে অসুখের খবর পেয়েই ছুটে এলুম। কোথায় সে ?"

গৃহিণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে বীণার শয়ন-কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। শান্ত বীণার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—"ইস্ তেমন যে চেহারাখানা একেবারে কালী হ'য়ে গেছে! কি অসুখ হয়েছে ভাই—অমন মন ভারী ক'রে রয়েছ যে ?"

শৈশবকাল হইতে যাহার সঙ্গে অত ভাব অত ভালবাসা সে শান্তর সঙ্গে বীণা আজ ভাল করিয়া কথা কহিল না, শুধু বলিল "মনটা বেশ ভাল নাই।"

"ভাল নাই কেন ? জামাই বাবুর পত্রটত্র পাও না ? মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে মন কষাকষি চলে কি ?'

বীণা মনোভাব গোপন করিয়া ঘাড় নাড়া দিল।

"তবে এমন কেন ? শুন্লুম কিছু খাও না দাওনা, কেবল কাঁদ্ছ কাট্ছ, কি অসুখ হয়েছে খুলেই বল না ভাই! রোগের মত ঔষধও তো আছে!"

বীণার কি অসুখ সে কি বলিবে—কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, শুধু মুখ নীচু করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শান্তর বুঝিতে বাকি রহিল না, বেদনাব্যঞ্জক আকুল নিশ্বাসই বীণার গভীর মর্ম্মভাব ব্যক্ত করিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল "শ্বশুর-বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে নয় ? সেখানে থাক্লে তুমি সুখী হও ?"

বীণার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে কিছুই বলিল না, কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ডদেশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"তার জন্যে কান্না কেন বোন্? তুমি যাতে সুখী হও তাই করা যাবে। এর জন্য এত মন খারাপ করতে হয়? উঠ আমার সঙ্গে এস, উনি এবার পূজার উপহারে খুব ভাল ভাল বই দিয়েছেন পড়া যাবে চল।" এই বলিয়া শান্ত বীণার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। বীণার চিরদিনই পড়াশুনায় ঝোঁক, সুতরাং বইয়ের নামে সে কোন আপত্তি করিল না।

শান্তদের ঘরে বীণা অনেকক্ষণ কাটাইল। শান্ত তাহাকে তাহার নিজের সম্বন্ধে, স্বামীর শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে কত কথা বলিল, কত প্রশ্ন করিল কিন্তু শান্ত সকল কথার উত্তর পাইল না, বীণা মন খুলিয়া আলাপ করিল না, তাহার কিছুই ভাল লাগিল না, বিরক্তির সহিত দু,চারিটী কথার জবাব দিয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় সে একখানা বই সঙ্গে আনিল। সে বইখানা "লক্ষ্মী-বৌ।" বেশ ঝক্‌ঝকে তকতকে বাঁধা, বইটার ২।১টা জায়গা বীণার বড় ভাল লাগিল, তাই সে পড়িল.........স্বামী মূর্খই হউক আর বিদ্বানই হইন, ধনীই হউন আর নির্ধনই হউন, কন্দর্পের মত সুন্দরই হউন আর কুৎসিৎই হউন, তিনি তো তোমার স্বামী, তোমার পূজনীয়। তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করা কি তোমার উচিত? তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার পরিণাম জান তো?—অনন্ত নরক। শত কাজ ফেলিয়াও তাঁহার সেবা করাই তোমার কর্ত্তব্য, পতির চরণই তোমার একমাত্র সাধনার ধন। স্বামীই তোমার আরাধ্য দেবতা, তুমি তাঁহার চিরদাসী।

শুধু স্বামীভক্তি করিলে, স্বামীর সেবা করিলেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইল না। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে না শিখিলে বুঝিবে তোমার স্বামী-ভক্তির সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। তাঁহাদের সেবা করা, তাঁহাদের আদেশ স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত মাথায় পাতিয়া লওয়াই তোমার উচিত। যৌবনের অহঙ্কারে, ধনের গৌরবে মনে করিও না যে আমি বড়। ভাল কাপড় পরিয়া, গহনা পরিয়া পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইলেই তোমাকে কেহ বড় বলিবে না। বড় হইবার অধিকার তোমার নেই। তুমি চিরকাল ছোট—ছোটই থাকিবে।'

বইখানা পড়িয়া বীণাপাণির বুকের ভিতর কি যেন করিয়া উঠিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। দুঃখে পড়িলে মানুষ যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার প্রাণের সকল বেদনা দেবতার চরণে নিবেদন করে, বীণাও আজ তেমনি করিয়া করযোড়ে স্বামীকে নিবেদন করিল:—স্বামী! নাথ! তুমিই আমার প্রাণের একমাত্র দেবতা। এ জীবন যৌবন সব তোমারই। আমি তোমার—চিরদিন তোমারই। রূপ-গরিমায়, যৌবন সুলভ উন্মত্ততাবশে তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি—তোমাকে ভক্তি করিতে শিখি নাই, আমি ঘোর অপরাধিনী—পাপীয়সী। হৃদয়েশ্বর!

একবার দেখা দাও, আমি যতদিন বাঁচিব তোমার পদপূজা করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

লজ্জায়, ক্ষোভে, অনুতাপে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সে চলিতে পারিল না, সুন্দর মুখখানি বহিয়া দরদর ধারে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইল। তখন তাহার মনে হইতেছিল, স্বামীর সহিত দেখা হইলে তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব "প্রভু! আমায় ক্ষমা কর—আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

* * * *

বীণপাণি দিনে দিনে শুকাইয়া আধখানি হইয়া গেল। কত ঔষধ, কত চিকিৎসা কিছুতেই কিছু হইল না। সেই শুধু কান্না—সেই শুধু হা-হুতাশ। সে কান্নার আর শেষ নাই, সীমা নাই। ব্যাপার দেখিয়া পাড়ার লোক, বাড়ীর লোক সব অবাক। বীণা কেন এমন করে, কেহ তার কুলকিনারা পায় না। সকলেই বলে বীণাকে এবার একবার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে দেখ, সেখানে থাকলে যদি সারে। অবনীবাবুও নানাদিক ভাবিয়া আগামী বৈশাখের প্রথমেই বীণাকে শ্বশুরালয় পাঠাইবেন স্থির করিলেন।

এদিকে বীণা নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া কতবার কত কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিয়া স্বামীকে পত্র লিখিল কিন্তু তাহার সে কাতর নিবেদন অগ্রাহ্য হইল, নরেনবাবু পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দিলেন না। বৌমার কাতর আবেদনে নরেন বাবুর মা'র কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বৌমার দুর্ব্যবহার বা অবাধ্যতার কথা সব ভুলিয়া গেলেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলে বৌমাকে আনাইবেন ঠিক করিলেন।

(৩)

চৈত্র মাস শেষ হইতে না হইতে, ঢাকে কাটি পড়িতে না পড়িতে নরেন বাবুদের কলেজ বন্ধ হইল। গ্রীষ্মাবকাশে নরেন বাবু বাড়ী আসিলেন। ছুটির লম্বা দিনগুলো নরেন বাবু কেবল বই পড়িয়াই কাটাইতে লাগিলেন, বীণাপাণির কোন খবর লইলেন না, খবর লওয়াটা কর্ত্তব্যের মধ্যেও গণিলেন না। রকম সকম দেখিয়া নরেন বাবুর মা একদিন বলিলেন—বৌমাকে আন্‌বার কথা তো মুখেও একবার আনিস্ নি, এবার একটা দিনটিন ঠিক ক'রে বৌমাকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর। তোর শ্বশুর পাঠিয়ে দিবেন লিখেচেন। বৌমাও কত দুঃখ ক'রে পত্র লিখেচে। বোকা মেয়ে যদি দোষই করে ফেলেচে তা ব'লে কি আর তার ক্ষমা নেই? আর কি চুপ্ ক'রে থাকা ভাল?"

"খুব ভাল। আমি সে পাপকে প্রশ্রয় দিতে পার্‌ব না, এখানে তার স্থান নাই।"

"পাপ কিরে! সে যে বৌ—ঘরের লক্ষ্মী যে রে? তার আবার স্থান নেই কি? আহা ঘর আলো বৌ, চিরকাল ঘর আলো করেই থাক্‌বে।"

'তোমার ঘর আলো বৌ তোমাকে আলো ক'রে থাকবে, আমার সঙ্গে কিন্তু নিশ্চয় জেনো তার কোন সম্পর্ক নাই, থাকবেও না।"

—'একেই বলে পণ্ডিত মূর্খ। এতদিন লেখাপড়া শিখে বুঝি তোর এই বিদ্যে হল,

আহাম্মুক কোথাকার! তুই না আনিস্, আমার কর্ত্তব্য আমাকে কত্তে হবে, বৌমাকে আনতেই হবে!'

চিরব্যথিতা বীণাপাণি বহু আশা বুকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিল। সে কত কাঁদিল, স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল; বলিল, এ অধিনী আপনার চিরদাসী, আমি অপরাধিনী, আমাকে ক্ষমা করুন। কত কাতরোক্তি, কত কান্নাকাটি কিন্তু কোন কথাই খাটিল না, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নরেন বাবু পত্নীর উপর কড়া হইয়া মাতৃভক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিতা বীণাপাণী নির্ব্বাসিতার মতই রহিল।

সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। নরেন বাবুর কলিকাতা যাত্রার দিনও নিকট হইয়া আসিল। কলেজ খুলিতে আর বার দিন মাত্র বাকী। মনের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া ছুটির শেষ কয়টা দিন মামার বাড়ীতে কাটাইবেন ঠিক করিয়া সে দিন মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে নরেন বাবু রায়গড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছুটির দিন অতিবাহিত হইল অথচ নরেন বাবু বাড়ী ফিরিলেন না, বীণা সবই বুঝিল, সে ভাবিল স্বামীর চক্ষে আমি ঘৃণিত অপদার্থ; আমার জন্যই তিনি আজ গৃহত্যাগী, এমন ঘৃণিত জীবন সে আর রাখিবে না, মরিবেই। মরণই তার সুখ। মেয়েমানুষ মরণে ভয় কি?

প্রায় পক্ষাধিক কাল মাতুলালয়ে অবস্থিতির পর নরেন বাবু বাড়ী ফিরিলেন। আজ তাঁর কলিকাতা যাত্রার দিন। রাত্রের ট্রেণে তিনি কলিকাতা রওনা হইবেন। বহুদূর পথ হাটিয়া তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাই তিনি যথাসম্ভব সত্বর স্নানাহার শেষ করিয়া বিশ্রামলাভের আশায় স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শুইতে যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন বালিশের নীচে একখানি চিঠির একটু অংশ দেখা যাইতেছে। পত্রখানা বোধ হয় ডাকে দিবার জন্য বীণা বাহিরে রাখিয়াছিল, পত্রখানা বীণার বাল্যসঙ্গিনী শান্তর উদ্দেশে লেখা। চিঠির উপর আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—"শ্রীমতী শান্তলতা দেবী।" নরেন বাবু পত্রখানি বাহির করিয়া সোৎসুকে পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

"ভাই 'মনের মতন'! তুমি আমার বাল্য-সঙ্গিনী; বাল্যকালের সেই একসঙ্গে ধূলাখেলা, বেড়ান, সেই মালাগাঁথা, আজ একে একে সব মনে পড়্‌চে। আমাদের সোণার শৈশব কি সুখেই কেটেছে ভাই! সব ছিল, সব গিয়েছে, আমার সে সুখের দিন আর নাই। দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে সংসারে এখনও বেঁচে আছি, ইহাই আশ্চর্য্য! আমার মনোকষ্টের কারণ এতদিন বলি নাই, আজ তোমাকে বল্‌ব। না বুঝে আমি সোণার স্বামীকে অবজ্ঞা করেছিলেম,তাই আজ আমি তাঁহার বিষ-নয়নে পতিতা, সোহাগ, আদর, ভালবাসা হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিতা হয়েছি। সংসারে আর বাঁচিয়া কি সুখ ভাই? যাকে নিয়ে সুখশান্তি তিনি যখন বিরূপ, তখন বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই মনে ভাবিয়াছি—এ জীবন আর রাখব না। বিষ খাব। তুমি হয়ত বল্‌বে—

আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু এ দগ্ধ-জীবনের আর পাপ-পুণ্য কি ভাই? স্বামীকে অবজ্ঞা করে যে পাপার্জ্জন করেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আজ এ জীবন আহুতি দিব। এ জন্মে স্বামীসুখে বঞ্চিতা হয়েছি, কিন্তু আমার অন্তরে যদি তিলমাত্র স্বামীভক্তি থাকে, তবে যেন পরজন্মে স্বামীসুখে সুখী হই—এই আশীর্ব্বাদ করো ভাই। মনে বড় দুঃখ রইল, এ জনমে তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হইল না। ইতি—তোমার হতভাগিনী 'মনের মতন'।

ওঃ কি নিদারুণ কাহিনী! পত্র পাঠে নরেন বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—আমি যদি আজ মামার বাড়ী থেকে ফিরে না আস্‌তুম্‌, তা হলে না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘট্‌তো। তিনি তাড়াতাড়ি বিষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত ঘরখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও বিষাক্ত কোন জিনিস্‌ দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হৃদয়ে চাবির তোড়াটা হাতে করিয়া বীণাপাণির অজ্ঞাতসারে তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখিতে পাইলেন,—ট্রাঙ্কের ভিতর একটা কৌটায় আফিং রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই নরেন বাবু থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে আফিংএর কৌটাটী ট্রাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—এখনই বীণাকে ডাকিয়া তাহার সকল দোষ মার্জ্জনা করেন, তাহার শূন্য হৃদয় আবার পূর্ণ করেন; কিন্তু তখনই লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিল।

* * * *

রাত্রি ১২টা বাজিয়াছে। পল্লিবাসী সকলেই সুপ্ত। এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে নরেন বাবু তাহার শয়নাগারে চোখ মুঁদিয়া ঘুমের ভান করতঃ বিছানায় শুইয়া আছেন—এমন সময় বীণাপাণি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া অতি সন্তর্পণে ট্রাঙ্কের ডালা খুলিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল। তখন নরেন বাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"এত রাত্রে ট্রাঙ্কের ভিতর কি খুঁজছ বীণা?"

বীণার মুখে আর বাক্য সরিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নরেন বাবু বিছানা হইতে উঠিয়া বীণার হাত ধরিয়া বলিল—"কেঁদো না বীণা! সে দিনও তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলে, আমি ক্ষমা করি নাই, কিন্তু আজ আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বেচ্ছায় তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর্‌লেম।"

বীণা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। নরেনবাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বীণার মুখ মুছাইয়া দিয়া বীণাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"বীণা! আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি তোমায় অনেক কাঁদিয়েছি। বীণা! তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

বীণার মুখে এবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল—"ছিঃ! ও কথা কি বল্‌তে আছে? আমি তোমার চিরদাসী, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

শ্রীভূতনাথ পত্রনবীশ।

মুক্তি।

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥
সর্ব্বধী-সাক্ষী জ্ঞান-মূর্ত্তি শ্রীগুরুচরণে নমস্কার॥
বহুরূপিণী চিণ্ময়ী বিশ্বমূর্ত্তিকে নমস্কার॥
পরমাত্মরূপী নিজবোধরূপ আপনাকে নমস্কার॥

আজ আমরা তোমার চরণতলে নতজানু-শিরে কৃতাঞ্জলিকরে সমবেত হইয়া "মুক্তি"র কথা কহিতেছি। তোমার অচল বিমল ধ্রুব ভূমাসুখ সম্বেদনময় জ্ঞানচক্ষুর নগ্নদৃষ্টি আমাদিগের শিরে বর্ষিত হউক। তোমার যে মহামহিম দৃষ্টির নিত্যবিকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ সঞ্জীবিত—সচেতন, যে দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া অপৌরুষেয় শ্রুতি "স ঐক্ষত" এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছেন, তোমার যে ঈক্ষণকে এ ব্রহ্মাণ্ডচক্রের একমাত্র প্রাণ বলিয়া ব্রহ্মসূত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বভেদি ঈক্ষণ আমাদিগের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করুক; আমাদিগের সংশয় ছিন্ন হউক; কর্ম্মক্ষয় হউক; আমরা অমৃত লাভ করি, তোমায় প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা বলিয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরি। তোমার সিদ্ধারাধ্য চরণে মহাকাল দর্শন করিয়া কালত্রয়ের অতীত হই। তোমার ক্ষেম-পুণ্যবপুতে ত্রিগুণের লীলানর্ত্তন দেখিয়া গুণত্রয়ের বাহিরে যাই। তোমার ত্রিনয়নে অবস্থাত্রয় দর্শন করিয়া আমরা অবস্থাত্রয় অতিক্রম করি। তোমার অরূপ সাগরে রূপতরঙ্গের স্নেহোচ্ছ্বাসময় অভিঘাতে নাচিতে নাচিতে আজ নিস্তরঙ্গ "ত্রিপাৎ অমৃত" লক্ষ্য করিয়া কোটি প্রণাম করিতেছি, আমাদিগের ত্রিতাপ দূর হউক। প্রণাম গ্রহণ কর মা।

জানি—আমরা অনধিকার চর্চ্চা করিতেছি, অনধিকার প্রার্থনা করিতেছি। মুক্তি দূরের কথা—"মুমুক্ষু" বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার এখনও আমাদের আসে নাই—মুমুক্ষু হইবার ইচ্ছাও এখন প্রাণে জাগে নাই; জন্ম-মৃত্যু নিয়মিত খণ্ড বোধাত্মক জীবভাবকে এখনও জ্বালা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; জাগতিক সুখে এখনও পরম সুখ বোধ আছে, তুচ্ছবোধ আসে

নাই; তোমাকে পাইবার মত্ততা আনিবার জন্য যে প্রপঞ্চ সুধার সমুদ্র হইয়া তুমিই বিরাজ করিতেছ, আমরা এখনও তাহা দেখিতে না পাইয়া মাত্র প্রপঞ্চের জন্য প্রপঞ্চ সেবা করিতেছি—প্রপঞ্চের মত্ততাতেই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি; তোমার মহতী সত্তায় শ্রদ্ধা এখনও জাগে নাই; তোমার স্বাধীনতার আভাসই এখনও পাই নাই; কেমন করিয়া জীবনকে বন্ধন বোধ করিব? বন্ধন বোধ না করিলে কেমন করিয়া মুক্তির জন্য লালায়িত হইব? মুমুক্ষু না হইলে কেমন করিয়া মুক্তির চর্চা করিব? "জীব বন্ধনময়" ইহা যতক্ষণ মুখের কথা মাত্র থাকিবে, গ্রন্থির মধ্যস্থ সংকীর্ণতায় যতক্ষণ আপনাকে মৃতপ্রায় বলিয়া বোধ না করিব, ততক্ষণ "মুক্তি" জীবের পক্ষে একটী শব্দ মাত্র। মৃণ্ময়ী পুতলী এখনও প্রাণটুকু অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, চিণ্ময়ী পুতলী কেমন করিয়া বুকে ধরিব?

তথাপি• তোমার চরণে কোটি নমস্কার; আমরা মুক্তির কথাই কহিব। তোমার দিকে নিমেষের জন্যও যখন চক্ষু ফেরে, তখন যে বড় যন্ত্রণা অনুভব করি। তোমায় যে প্রাণ ভরিয়া অদ্যাবধি দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে পাওয়া দূরের কথা—প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিতে চাহিতে পারিলাম না।

যখনই তোমায় মনে পড়ে, যখনই মনে পড়ে—তোমা হইতে আমাদিগের উৎপত্তি, তোমাতে আমাদের অবস্থান, তোমার ইচ্ছায় আমরা ইচ্ছাময়, তোমার প্রতিবিম্বে আমরা দেহময়, ইন্দ্রিয়ময়, শক্তিময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, চৈতন্যময়; যখন মনে পড়ে—তোমার লীলায় অনন্ত এ চেতনাচেতনাত্মক সৃষ্টি বিস্তার বিস্ফুরিত—তোমারই স্নেহে পরিবৃত, তোমারই শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তোমারই ভাতিতে অনুভাত; যখনই মনে পড়ে—এ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন, তুমি আপন সত্তায় আমাদিগকে সত্তাবান্ করিয়াছ, আপন শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়াছ, আপন প্রাণ দিয়া আমাদিগকে প্রাণময় করিয়াছ, আত্মদানে আমাদিগের আত্মা গড়িয়াছ; যখন ঋষিবাক্য মনে পড়ে, "ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।" যখন মনে পড়ে—তুমি আমাদিগের গতি প্রভু ভর্ত্তা সাক্ষী শরণ সুহৃৎ প্রভব ও প্রলয়ের একমাত্র স্থান, তখন—তখন যে মর্ম্মের মর্ম্মে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করি; এমন যে প্রিয়তম তুমি—এমন যে প্রাণের প্রাণ—আত্মীয়ের আত্মীয় তুমি—সেই তোমাকেই একবার দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে চাহিলাম না। তোমার আত্মদানের বিনিময়ে হৃদয়ের একটা প্রাণভরা ভাবের উচ্ছ্বাস দিয়া (ভালবাসা দূরের কথা) কোটি জীবনেও একবার—বেশী নয়, একবার মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না!

জগতে কাহারও দ্বারা তিলমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলে, আজীবন তাহা ভুলিতে পারি না, তাহার নিকট আজীবন হৃদয় কেমন স্বতঃই নত হইয়া পড়ে! আর এত ভালবাসা, এত স্নেহের বিনিময়ে—তোমার মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া, মুক্তপ্রাণে একবার তোমার চরণে আত্মবোধটা ঢালিয়া দিব!—ইহা পারিলাম না?

আত্মহারা হইয়া জীবনে "কই তুমি" বলিতে পারিলাম না? এ দুঃখ—এ যন্ত্রণা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদিগের সমস্ত সুখ সম্বেদনকে ভুলাইয়া দেয়। যাহার জন্য এমন, যে মোহ বন্ধনের জন্য প্রাণ, সাময়িক ইচ্ছা সত্ত্বেও একবার মাত্র মুক্তভাবে দাঁড়াইয়া তোমার দিকে চাহিতে পারে না, তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না, সে বন্ধনের কবল হইতে মুক্তি চাহিব না? জানি—এ পরিণামময় সংসার অনিত্য, জানি—অনিত্য বস্তু লইয়া শরীর গঠিত করিয়াছি, সুতরাং ইহার কবল হইতে মুক্তিলাভই শ্রেয়ঃ। জানি ঋষিবৃন্দ গুরুরূপে—তোমার তুলনায় তুচ্ছ এ জগৎকে বা দেহাত্মবোধকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আত্মসংস্থিত হইবার বা তোমায় লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। জানি, পরিণামশীলা প্রকৃতির ভাবরঞ্জনায় ত্রিতাপভারে আমি আক্রান্ত, তীব্র বৈরাগ্যের অনুশীলনে বিবেক-খ্যাতির সাহায্যে এ তাপ হইতে উদ্ধার হওয়াই পুরুষকার। জানি—মায়া-বিভ্রান্তিতে মুহ্যমান হইয়া না থাকিয়া ব্রহ্মস্বরূপে তোমার ভূমাসুখে অদ্বৈততত্ত্বে আপনাকে মগ্ন করিয়া অহংতত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্বে মিলাইয়া দেওয়াই মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম।

বদ্ধভাবে অবস্থানে যে যন্ত্রণা, যে ক্ষুদ্রত্ব, যে দাসত্ব ভোগ করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে না জানিলেও, প্রতি পদক্ষেপে অনুভব না করিলেও জন্ম-মৃত্যুময় সংসারপথে সময়ে সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি. তাই সময়ে সময়ে মুমুক্ষু হই; সুতরাং তোমার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া মুক্তির কথাই আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু, শুধু সেজন্য নহে, জানি—কর্ম্মাবর্ত্তনে, সদসৎ ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্বুদ্ধ হইতে হইতে একদিন না একদিন, মুক্তি না চাহিয়া জীবের থাকিবার উপায় নাই, জগৎ তুচ্ছ হইবেই হইবে, স্বরূপসঙ্গ প্রিয় হইবেই হইবে, জীব, আত্মাকে চাহিবেই চাহিবে। কিন্তু শুধু সেজন্য নহে, তুমি অদ্বৈতবাদ মতে স্বীয় স্বরূপে মিলাইয়া লইবে, অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর ভাষায় তোমার নিত্য আনন্দলীলার সাহচর্য্যে অধিকার দিবে, অথবা সাংখ্যবচনে আমি স্বাধীন আপ্তকাম বিভু হইব, মুমুক্ষু হইবার ইহাই কারণ হইলেও, আমরা শুধু সেজন্য তোমার সন্নিধানে মুক্তিপ্রসঙ্গ করিব না।

আমরা বুঝি—তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধ সে মহাদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, সে সত্যসম্বন্ধ যথাযথভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া তোমার সহিত ব্যবহার করিতে যদি না পারি, তবে মুক্তিস্বপ্ন দূরীভূত হউক। আমরা যদি এইখানেই মুক্তপ্রাণে আমাদিগের প্রাণ বলিয়া তোমায় হৃদয়ে ধরিতে পারিতাম, যদি আত্মার আত্মা বলিয়া বারেকের তরেও মুক্ত-হৃদয় তোমার চরণ-রজোদ্বারা চর্চ্চিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ ত্রিতাপের জ্বালায় কাতর হইতাম না, এ প্রকৃতির অঞ্চলে আবদ্ধ থাকিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। মায়ার মদিরায় মুগ্ধ থাকিতে, অজ্ঞানে অচেতন থাকিতে ক্ষুব্ধ হইতাম না, যে আত্মার ভাবের ঈষৎ সংস্পর্শে জগতের ধূলি প্রাণের প্রতিমা হয়, সাক্ষাৎ সেই আত্মারূপে অবস্থিত তোমাকে প্রাণ দিয়া পূজা করিতে পারিলাম না, মুক্তি না পাইলে, মুক্ত-

প্রাণ, মুক্ত-হৃদয়, মুক্ত-চিত্ত না হইলে, মুক্তি-মন্দিরের মুক্ত প্রাঙ্গনে না দাঁড়াইলে, তোমার সঙ্গে আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন হয় না। দেহের ব্যবধান—দেহাত্মবোধের ব্যবধান, তোমার আমার নিগূঢ় আলিঙ্গনের মাঝে খণ্ডবোধের বিচ্ছেদ-শূল পাতিয়া রাখে। শুধু সেইজন্য—সেই জন্য শুধু—পরমাত্মন্! আমরা মুক্তি চাহি। আমরা মুক্তির কাঙ্গাল, তাই আমরা মুক্তির আলোচনাই তোমার চরণে করিতে ইচ্ছুক।

আর মুক্তি চাহি—তুমি মুক্ত বলিয়া। এ জগতে দেখিতে পাই—যে আমাদের মতন, যে আমাদিগের মনের মত, তাহাকেই আমরা ভাল বাসি। মনের মতন না হইলে কাহাকেও হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করিয়া প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায় না, তাই যে আমাদের মত তাহাকেই আমরা আত্মদান করি অর্থাৎ আত্মীয় বলি। সুতরাং তোমার মত না হইলে কেমন করিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিব? সবই তোমার স্বরূপ হইলেও তোমার মুক্ত-স্বরূপই সর্ব্বত্র অব্যাহত। তোমার মত হইলে, তবে তোমার অব্যাহত প্রেমে অভিসিঞ্চিত হইব। তোমার অব্যাহত অঙ্গে লগ্নীভূত হইব সেই জন্য মুক্তি চাহি।

আত্মাতেই আত্ম-লাভ হয়, আত্মাতেই আত্ম-মিলন হয়, আত্মাতেই আত্ম-দর্শন হয়, সব না খুলিলে আত্মময় হওয়া যায় না, তাই পরাত্মন্! তাই সব খুলিতে চাহি, মুক্ত হইতে চাহি। মাত্র তাপত্রয় নিবারণের জন্য আমরা তোমায় চাহি না, আত্মধর্ম্মে যাহার দ্রবময়ী ভাব-গঙ্গাকে আত্মীয়তা-বলে, সেই আত্ম-ধর্ম্মে তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতে চাহি—মুক্তি চাহি। আত্মার সম্বন্ধকে আত্মীয়তা বলে। আত্মার ঈষৎ সম্বন্ধে জগতে যাহাদিগের সঙ্গে আবদ্ধ হই, অনায়াসে অকাতরে নিজ নিজ প্রাণ দিয়া তাহাদিগের তুষ্টি বিধানে কুণ্ঠিত হই না—কত আদরে—কত প্রাণ দিয়া কত কুসুমস্তর বিন্যাস করিয়া তাহাদিগের জন্য হৃদয়ে আসন প্রস্তুত করি, আর তুমি—তুমি সেই আত্মা স্বয়ং, আত্মীয়তা সে চন্দ্রের কৌমুদী, তুমি সেই চন্দ্র স্বয়ং, তোমার দিকে প্রাণ! একটা উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতে পারি না। সহস্র বাসুকীর দুর্ব্বহ ভার শিরে বহন করিতাম, প্রকৃতির সহস্র তাণ্ডব নৃত্য নিত্য এই বক্ষ বিমর্দ্দিত হইতে দিতাম, মায়ার সহস্র শৃঙ্খল ফুলহার করিয়া গলদেশে পরিধান করিতাম, অজ্ঞানের অনন্ত মূর্চ্ছায় অকাতরে ঘুমাইয়া থাকিতাম—যদি তোমাকে পাইতাম। তাই হে আমার পরমাত্মন্! তাই মুক্তি চাহি।

মুক্তি কেন চাহিব, এবং মুক্তি কি, ইহা ভাল করিয়া না বুঝিলে মুক্তিকামী বা মুমুক্ষু হওয়া যায় না, তাই তোমার চরণে প্রথম মুমুক্ষু হইবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলাম। প্রাণকে ঘণীভূত করিয়া যে জ্ঞানের জমাট, সত্যদর্শী ঋষিরা অচল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, মেধাজীবী খণ্ডদর্শী ভাষ্যকার ও পণ্ডিতগণ মেধার সাহায্যে তাহা খণ্ডন করিয়া তর্কের রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড প্রস্তুত করিয়া পরস্পর শিশুর মত ক্ষেপ প্রতিক্ষেপ করিয়াছেন ও করেন, আমরা দূর হইতে তাহাদিগকে নমস্কার

করিয়া, সে লোষ্ট্রাঘাত হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে চাই। আমরা তাঁহাদিগের ছন্দে, তাঁহাদিগের ভাষায় মুক্তি কি তাহা বুঝিতে যাইব না। তোমাকে পাওয়াই মুক্তির ফল। সে পাওয়ায় সাযুজ্যই হৌক, সারূপ্যই হৌক, সামীপ্যই হৌক, কিংবা সালোক্যই হৌক। সে পাওয়ার নাম—আত্মদর্শন ই হৌক, কৈবল্যই হৌক, নির্ব্বাণই হৌক, তত্ত্বমস্যাদি-লক্ষ্য ব্রহ্মত্বই হউক, অথবা স্বগত ভেদমাত্রদর্শী অলৌকিক জীবত্বই হৌক।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সেই তোমাকে লাভ, অথবা পরমার্থতঃ যাহা আমি, সেই আমাকে লাভ, ইহাই মুক্তির ফল। সুতরাং ঐ রূপে তোমাকে বা পরমার্থতঃ আমাকে অথবা আত্মবোধ পাওয়ার পথে যাহা কিছু অন্তরায় সেই গুলির কবল হইতে ঐকান্তিক পরিত্রাণের নামই মুক্তি।

এই যে তোমাকে লাভের কথা বলিলাম ইহা বিষয় লাভের মত লাভ নহে। বিষয় বিশেষ আমাদের অধিকারভুক্ত হওয়াকে আমরা লাভ বলি ; কিন্তু তোমাকে লাভের সময়—তুমি আমাদের অধিকারভুক্ত হও না—আমরাই তোমার ঐকান্তিক অধিকারভুক্ত হই। আমাদিগের নিজেদের উপর যে জীব ভাবীয় ঐকান্তিক অধিকার আছে—একান্ত ভাবে তাহা অপসৃত হইয়া তোমার ভাবের বা নির্ব্বিশেষ আত্মবোধের যে অধিকার বিস্তার, তাহারই নাম তোমার অধিকারভুক্ত হওয়া—তোমার হওয়া বা তোমাকে লাভ করা। এইরূপ তোমাকে (বা পরমার্থতঃ আমাকে) লাভ করিতে যতক্ষণ অন্তরায় থাকিবে, যতক্ষণ ঈষৎ মাত্র অসম্পূর্ণতা থাকিবে ততক্ষণ আমরা মুক্ত হইতে পারিব না।

তোমার হওয়া—তোমাকে পাওয়া বা তোমাময় হওয়া, অথবা তুমিই আত্মা সুতরাং আত্মময় হওয়া, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ করা ইহাই মুক্তি, এবং ইহার অন্তরায়কে প্রকৃতি-সংযোগ, অনাদি সংস্কার গ্রন্থি, অবিদ্যা ইত্যাদি বহুবিধ আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। নাম যাহাই হৌক তাহাতে বড় একটা আসে যায় না, অন্তরায়ের আবরণ বা সংযোগ হইতে কোন প্রকারে যদি উদ্ধার পাই, তবেই আমাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে—তোমাকে প্রাণ ভরিয়া পাইব—আমাদিগের সেই আশা পূর্ণ কর—অন্তরায় ঘুচাইয়া দেও—আবরণ উড়াইয়া দেও। চক্ষু দাও—তোমায় দেখি, প্রাণ দাও—তোমায় অর্পণ করি, আত্মদান কর—তোমায় আত্মার আত্মা বলিয়া, একবার আত্মভরা পরমাত্ম-স্পর্শ সুখে আত্মহারা হই। শ্রুতি, দর্শন-শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিবর্গ এবং ভাষ্যকার পণ্ডিতগণ এ অন্তরায়কে অনেক প্রকার নাম বা উপনামে উল্লেখ করিয়াছেন—অনেক প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে অনেক প্রকারে ইহার শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার মর্ম্ম, শিরা, প্রশিরা, ধমনী, নাড়ী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এইরূপে অনেক বাদ ও বাদীর সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বাদ বিসম্বাদে নারাজ। তবে প্রধানতঃ এই দেখিতে পাই যে—এ অন্তরায় তোমার শক্তি বিশেষই হৌক, অথবা "প্রধান" নামে কোন স্বাধীন তত্ত্ব

বিশেষই হোক, কিংবা "মায়া" নামে কোন সুবর্ণনির্ম্মিত প্রস্তরাধারই হোক, অথবা "অচিৎ" বলিয়া কোন আলোকরচিত অন্ধকারই হোক, ইহা আমাদিগের অন্তরে। আমরা কাহাকেও ভ্রান্তদর্শী বলি না, দেখিবার বা বলিবার তারতম্যে কতক বিসদৃশ বোধ হইলেও, সকলের দর্শনই প্রধানতঃ সত্যদর্শন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি; কেন না—যেমন করিয়াই দেখুক তোমাকেই দেখিয়াছে। তোমাকেই দেখিবার জন্য সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। অন্তরস্থ চৈতন্যরূপী স্বপ্রকাশ তোমার ই আলোকে, তোমায় দেখিতে গিয়া "অন্তরায়" নামীয় সে অন্তরালকে বহুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে। অনন্ত দিকে অনন্তরূপে বিকসিত সে অন্তরায়ের স্বরূপ, তোমারই স্বরূপের মত নির্দ্দেশ্য হইয়াও অনির্দ্দেশ্য, বচনীয় হইয়াও অনির্ব্বচনীয়, নিত্য হইলেও অনিত্য তরঙ্গময়, জ্ঞান-বৈচিত্র্য হইলেও স্বল্পতার জ্ঞান বা অজ্ঞান, বিদ্যা হইলেও অপরা বা অবিদ্যা। উহা সত্য হইলেও সত্যে অবস্থিত, মিথ্যা হইলেও আমাদের চক্ষুতে সত্যরূপে প্রতিভাত। শুধু এইটুকু আমরা দেখিতেছি যে, সে অন্তরাল আমাদিগেরই অন্তরে, আর সে আমাদিগের অন্তরে থাকিয়াই, আমাদিগকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছে—তরঙ্গ চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে, নানা প্রকারে নানারূপে তোমার দিকে আমার অন্তঃকরণকে ফিরিতে দেয় না। তোমায় প্রাণ ভরিয়া চিরকাল দেখিতে দেয় না, আমাকে তোমাময় হইতে দেয় না।

পরমাত্মন্! প্রিয়তম আমার! যথার্থ ই কি এগুলি অন্তরায়? অন্তরায় ঘটাইবার জন্যই কি এ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছ? অন্তরায় ঘটাইবার জন্যই তুমি অন্তরে অনাদি-সংস্কার-পুঞ্জরূপে বিম্বিত হইতেছ? আত্মা দিয়া যাহাকে গড়িয়াছ, আত্মবিস্মৃতির অতল গর্ভে তাহাকেই নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্যই কি, আবার অন্তরায় রচিত করিয়া তাহাকে ত্রিতাপে দগ্ধ করিতেছ? প্রচ্ছন্নভাবে তাহারই অন্তরে সাক্ষীরূপে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিয়া সে দহন-যন্ত্রণা দর্শন করিতেছ? ক্ষুদ্র পতঙ্গকে একদিকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছ, "অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে—দগ্ধ করে" এ জ্ঞান তাহাকে দৃঢ় করিয়া দাও নাই; অথচ অন্যদিকে রূপের মোহে—অনল-শিখার সৌন্দর্য্য-মোহে তাহাকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছ; অনলশিখা দর্শনে নিরীহ পতঙ্গ উল্লাসে তাহাতে পতিত হইয়া বিদগ্ধ হইতেছে। ইহাই কি তোমার আনন্দ-লীলা? দহন দর্শনই কি তোমার আনন্দ-প্রাচুর্য্য? আনন্দময় যাঁহার নাম ইহাই কি তাঁহার ব্যবহার-পরিচয়? আত্মীয়তারূপ ঈষৎ আত্মধর্ম্ম, যাহাতে ব্যথিত হয়! স্বয়ং আত্মা তুমি—তোমার কি তাহাই আনন্দ-ক্রীড়া? অন্তরায় কি অন্তরায়তা-সাধনের জন্যই রচিত। স্থূল-দৃষ্টিতে যে অন্তরায়ের এই ফল, যে বিচ্ছেদের এই দহন সে বিচ্ছেদের—সে অন্তরায়ে আবৃত করিবার কি অন্য উদ্দেশ্য নাই? বুঝিয়াছি পরমাত্মন্! উপস্থিত অন্তরায় বলিয়া পরিচিত হইলেও, উহা অন্তরায় নহে; উহাই মাতার ন্যায় আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে,

গুণ হইতে গুণান্তরে,শক্তি হইতে শক্ত্যন্তরে,জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে বহন করিয়া তোমার অব্যয় চরণতলের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দেয়। তাই শ্রুতি কর্ম্মকে "অমৃত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শস্যের পক্ষে যেমন তৃণ,ফলের পক্ষে যেমন কুসুম,গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে যেমন উল্বন, এই অনাদি কর্ম্মসংস্কার বা প্রকৃতি বা অবিদ্যা-রূপ শক্তির সাহায্যে ঠিক তেমনি করিয়া তুমি আমাদিগের পরিবর্দ্ধণ পরিপোষণ ও চৈতন্য বিকাশ করিয়া দেও। তোমার বেদন-গ্রহণোপযোগী ভাবে আমাদিগকে স্বচ্ছ করিয়া দাও। যখন হইতে আমরা স্বচ্ছ হইতে থাকি তখন হইতে ইহা অন্তরায়রূপে প্রতীয়মান হয়, তৎপূর্ব্বে ইহা পরিপালিনী। দ্রুত শরীর পোষণের জন্যই যেমন শিশুর অঙ্গচাঞ্চল্য, আমাদিগের জ্ঞান বেদনময় আধ্যাত্মিক শরীর পোষণকারী কর্ম্ম-চাঞ্চল্য জন্মাইবার জন্যই তদ্রূপ এ প্রকৃতি বা অবিদ্যা। যৌবনে শারীরিক চাঞ্চল্য শ্লথ হয়, মনশ্চাঞ্চল্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মনের পুষ্টি স্ফুটতর হয়, তখন বালকোচিত অঙ্গচাঞ্চল্য তাহার অন্তরায়। তদ্রূপ আমাদিগের জ্ঞান-বেদন-চাঞ্চল্য বা পুষ্টি আরম্ভ হইলে এ কর্ম্মাশয় চাঞ্চল্য অন্তরায় হয়। তাই প্রকৃতিকে আমরা অন্তরায় বলিয়া দেখি। হে স্থির ধ্রুব বটপত্রশায়ী সনাতন-আশ্রয়! আমাদিগের এ অন্তরায় কিসে দূর হইবে? তোমায় কেমন করিয়া পাইব? কেমন করিয়া মুক্ত হইব?

তুমিও অন্তরে এ অন্তরায়ও অন্তরে, তুমিও বাহিরে এ অন্তরায়ও বাহিরে। হে অন্তর্বাহ্যব্যাপী অনাদি অনন্ত অচ্যুত! এ অন্তর্বাহ্যব্যাপী অন্তরায় ঘুচাইয়া দাও। "মহেরণায় চক্ষসে" তোমার মহতী রমণীয় মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অন্তরায়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া যাউক।

শ্রুতি সহস্র মুখে সহস্র বার বলিয়াছেন ও বলেন—তোমাকে দেখিলে—তোমাকে জানিলে—তবে এ অন্তরায় দূর হয়। তবে কি অন্তরায় থাকিতেও তোমায় দেখা যায়—তোমায় জানা যায়?

যাঁহারা তুমি ব্যতীত অন্য এক প্রধান বা প্রকৃতি নামে তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন—ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে আত্মবিবেক উৎপন্নে প্রযত্ন করিতে করিতে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়, নেতি নেতি ভাবে প্রকৃতি বর্জ্জন করিতে করিতে আত্মার বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায়। তখন প্রকৃতি লাঞ্ছিতা হইয়া প্রস্থান করে, আর আসে না। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীরা কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া বিচার যুক্তিসাহায্যে "ব্রহ্মাতীত অন্য কিছু নাই" ইহা জানিতে অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে লাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের অদ্বৈতবাদ আর একটু বিশেষ করিয়া বলেন—জ্ঞানের দ্বারাই জানা যায় বা পাওয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু সে জ্ঞান—মাত্র বাচনিক জ্ঞান অথবা যুক্তি-বিচার-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান নহে,সে জ্ঞান বেদনাকারে উপচিত করিতে হয়। ভক্তির আকারে তাহা ধ্রুবানুস্মৃতিরূপে প্রবাহিত করিয়া তোমার চরণ বিধৌত করিতে হয়, তবে অন্তরায় যায়, তুমি আস। যাঁহারা মাত্র জ্ঞানানুশীলনের কথা বলিয়াছেন—তাঁহারা এত খুলিয়া না বলিলেও—সে জ্ঞানের এত

অন্তর্গতি এত প্রাণ-পরিপ্লাবিনী শক্তির কথা উল্লেখ না করিলেও বস্তুতঃ জ্ঞান যতক্ষণ উক্ত প্রকার প্রাণময় চৈতন্যময় প্রেমময় না হয় ততক্ষণ উহা মৃত জ্ঞান মাত্র। সাধনা সম্বন্ধে যাহারা ঈষৎ আলোচনাও করিয়াছেন, তাহারাই ইহা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিবেন।

যাহা অপৌরুষেয় বেদ, তাহা সত্যবেদন সাধক ঋষিদিগের আবিষ্কৃত বেদনপুঞ্জ। তোমার নাম বা মন্ত্রাদির অন্তর্গত যে জ্ঞান, সে জ্ঞান যদি বেদনময় না হয়, যদি তাহা প্রাণকে তোমাময় না করে, যদি আমাদিগকে তৎজ্ঞানময় করিয়া দিয়া, আমাদিগের আত্মাকে সেই সেই নাম বা মন্ত্রাদি লক্ষিত তোমার স্বরূপে পরিণত না করে, যদি তোমার নাম-কীর্ত্তন, অনুস্মরণ, চিন্তা বা আলোচনা করিতে গিয়া আত্মা তোমার স্বারূপ্য লাভ না করে, তবে সে নামোচ্চারণ, সে চিন্তা সে আলোচনা যথা-প্রয়োজন কার্য্যকারী হইল না। ইহাই আমরা বুঝিতে বাধ্য এবং ইহাই সত্য। তুমি বলিতে তোমাময় হওয়া চাই। ইহাই ধ্রুবানুস্মৃতি বা ভক্তির ফল। এ দুই মতে পূর্ব্বোক্ত "অন্তরায়টী" বিদূরিত করিবার জন্য সাম্প্রদায়িকতা আনিয়া, একদল ইহাকে অনির্ব্বচনীয়া মায়া বলিয়া, কার্য্যতঃ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছেন। অন্য দল অভিনব "অচিৎ" নামে এক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সত্য অদ্বৈতবাদের সার্থকতা সম্যক্ সাধিত করিতে গিয়া কার্য্যতঃ তোমার ও আমাদিগের এক অভেদ্য মধুময় অন্তরায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

যাহাই হোক ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। কার্য্যতঃ প্রধানবাদ, মায়াবাদ, বা অচিৎতত্ত্ববাদ মুক্তি-সাধন সম্বন্ধে সকলেই প্রধানতঃ একটী কথা বলিয়াছেন। সে কথা তোমা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া, যাহা বিবেচনা হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া, অস্বীকার করিয়া, অথবা তোমারই অঙ্গ বলিয়া ধারণা করিয়া, যে কোন প্রকারেই হউক, মাত্র পরমাত্ম-স্বরূপ বোধে বোধময় হওয়া, তোমার জ্ঞানে জ্ঞানময় হওয়া, তোমার বেদনে সম্বেদিত হওয়া, ইহাই তোমায় পাইবার বা মুক্ত হইবার স্থূলতঃ সর্ব্বানুমোদিত উপায়। সেই তুমি আনন্দময় বিভু সাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বাত্মা সকলেরই একান্ত আশ্রয়। ব্যষ্টিভাবে হউক বা সমষ্টিভাবে হউক, হে পরমাত্মন্! "অহং" ভাবে হউক বা "ত্বম্" ভাবেই হউক, এইরূপ দেখিতে দেখিতে যখন আমরা তুমি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না, তুমি ছাড়া আর কিছু আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না—প্রকৃতি থাকিলে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে—মায়া থাকিলে উড়িয়া যাইবে, অচিৎ থাকিলে তোমারই অঙ্গে বিজড়িত হইয়া যাইবে—সব তোমাময় হইবে। কিছু থাকিবে না—কিছু দেখিতে পাইব না—কিছু বুঝিতে পারিব না—শুধু তুমি—তুমি শুধু পরমাত্মন্ তুমি থাকিবে, যখন কিছু থাকিলেও থাকিবে না, না থাকিলেও থাকিবে না, তখন স্বতঃই বেদ ধ্বনিত হইবে "স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যং সনাতনম্"। তখন স্বতঃই অপৌরুষেয় ঝঙ্কার শ্রুত হইবে "ন ভূমি রাপো ন চ বহ্নিরস্তি ন চানি লো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ"। তখন স্বতঃই শ্রুত হইবে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,

নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো"। তখন সর্ব্বতঃ প্রসৃত তোমাকে আমারই পরমাত্মাকে দেখিয়া স্বতঃই কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইবে—"আত্মৈবাধস্তাৎ আত্মোপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বং।

(ছান্দোগ্য)

কিন্তু এই ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান, অথবা জ্ঞানাত্মক ভক্তি, এই যে বিবেকাত্মক কর্ম্ম অথবা কর্ম্মাত্মক বিবেক, ইহা লাভের উপায় কি? জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম, ইহা একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। কিন্তু যে প্রাণধর্ম্ম ইহাদিগের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট থাকিলে, তবেই ইহা কার্য্যকরী হয়—তোমাকে হৃদয়ে আনিতে সক্ষম হয়, যে শক্তিতে প্রাণময় হইলে, তবে ইহারা তোমার চরণ বিধৌত করিবার উপযুক্ত হয়, সে শক্তি কি? যে শক্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত হইলে—কর্ম্মকে জ্ঞানময় করে, জ্ঞানকে ভক্তিময় করে, ভক্তিকে প্রাণরূপী তোমার প্রাণকে আবির্ভূত করিতে সমর্থ হয়, সে শক্তি কি? যে শক্তির অভাবে আমাদিগের মত ক্ষুদ্র জীবের, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ভক্তি, সমস্ত কর্ম্ম, কত কাল—অহো! কতকাল ধরিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে—হায়! তোমাকে আনিতে সমর্থ হয় নাই, আমাদিগের সমস্ত পরিশ্রম, যাহার অভাব পণ্ড করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগের সমস্ত গবেষণাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগের সমস্ত যুক্তি ও বিচারকে বিতণ্ডায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগের সমস্ত ভক্তিকে স্ত্রীজনোচিত দুর্ব্বলতাসূচক অশ্রুধারায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, সে শক্তি শ্রদ্ধা। তোমাতে একান্ত বিশ্বাস। তোমার সর্ব্বব্যাপী সত্তায় "সত্য-প্রতিষ্ঠা" বুদ্ধিযোগের সাহায্যে "তুমি রহিয়াছ" "সাক্ষিরূপে জীবন্তরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ" অচল ধ্রুব দ্রষ্টারূপে বিরাজ করিতেছ, এই মহাসত্য বোধে প্রতিষ্ঠা কর। এই মাটিতে, এই জলে, এই অগ্নিতে, এই বায়ুতে, এই আকাশে, এই নয়নের সম্মুখে, এই অন্তরের প্রাঙ্গনে তুমি লীলাময়রূপে আনন্দময়রূপে অবস্থান করিতেছ, এই বিশ্বাসে প্রাণকে বলবান কর। ইহাই সাধনার প্রাণ, ইহাই তোমাকে আমাদিগের প্রাণ-সাগরে অনন্ত-শয্যায় শায়িত করাইবার বটপত্র। এই মহাসত্যের উপর আস্থা স্থাপিত করিয়াই মহাসত্য শ্রুতি ঋষি আবিষ্কার করিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" প্রবচনের দ্বারা নহে মেধার দ্বারা নহে, জ্ঞানের দ্বারা নহে—শুধু বরণের দ্বারা, যে তোমাকে বরণ করে—সেই তোমাকে পায়, যাহাকে তুমি বরণ কর সেই তোমাকে পায়। বুঝি তুমি জ্ঞান চাহ না, বুঝি তুমি ভক্তির কাঙ্গাল নহ? কর্ম্মের ডোরে বি[illegible]া বুঝি তুমি আস না, বুঝি জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের ভিতর "তুমি রহিয়াছ" এই মহা সত্য কতটুকু মানিয়াছি, কত জীবন্ত ভাবে এ সত্যে আস্থাবান্ হইয়াছি, জীবন-গতির প্রতি পদক্ষেপনে, এই সত্যকে প্রত্যক্ষবৎ মানিয়া কতটুকু চলিতে সক্ষম হইয়াছি, সেই টুকু দেখ। অন্তরায় দূর করিবার একমাত্র

শক্তি বিশ্বাস। এই জন্যই তোমার অপৌরুষেয় বাণী জগতে পুরুষ-রূপে আসিয়া ধ্বনিত করিয়া গিয়াছে—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" তাই আজ এইখানে আমার চক্ষুঃসমীপস্থ ধরণীর ধূলির উপর সর্ব্বত পাণিপাদ তুমি, তোমার চরণে শির লুটাইয়া নিবেদন করিতেছি—আগে জ্ঞান চাহি না, আগে কর্ম্ম চাহি না, আগে তোমার ভাল বাসিবার অধিকারও চাহি না, শুধু মানিতে দাও শুধু বিশ্বাস করিতে দাও—"তুমি রহিয়াছ।" শুধু তোমার চক্ষুতে চক্ষু রাখিয়া আমায় চলিতে দাও, শুধু তোমার দ্বাপরীয় অভয় ঘোষণা আমার হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ ঘোষিত কর—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ," ইহাতেই যেন তোমায় পাই, ইহাতেই যেন মুক্তিলাভ করি, ইহাতেই যেন জগৎ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি—আমি তোমাকে শুধু বিশ্বাসের দ্বারা লাভ করিয়াছি। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব অনন্ত বীর্য্যা মিত বিক্রম স্তুং সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্ব॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

বঙ্গসৈন্য-সম্বর্দ্ধনা।

নিবিড়-নীরদময় ভারত-গগন-
প্রান্তে, দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ভয়ঙ্কর
অপসরি' দূরে, মনোরম অনুপম
অপূর্ব্ব প্রভায় দিগন্ত উজলি, হের
উদিত অরুণ-ছটা নয়ন-রঞ্জন;
অভিশপ্ত ভারতের চির অমানিশা
প্রভাহীনা বিভীষণা বিকট-দশনা
আঁধার-অঞ্চল-মাঝে আবরিয়া নিজ
কবাল বদন, ক্ষিপ্রপদে অধোমুখে
পলাইছে পশ্চিম-অচলে মনোদুঃখে।

এস বঙ্গবীরগণ বীর-অবতার,
আর্য্যবংশ অবতংস আর্য্যকুলোদ্ভব,
স্বদেশের যশোভাতি, স্বজাতি-গৌরব,
জননীর বুকভরা আশার আশ্রয়,
ভারতের সুসন্তান কীর্ত্তির কেতন!
জেগেছ যখন বীর, ঘুমা'ও না আর,—
বাজাও বিজয়-ভেরী দম্ভোলি-নির্ঘোষে
বিকম্পিয়া দশদিশি কাঁপায়ে মেদিনী,
জাগাও স্বজনগণে বীরত্ব উল্লাসে,
কাঁপাও অরাতিহৃদি ভীষণ তরাসে।

কত দিন, কত মাস, সুদীর্ঘ বরষ,
কত যুগযুগান্তর ভবিষ্যের গর্ভ
হ'তে আশাপূর্ণ-প্রাণে আসি' ক্ষিপ্রপদে,
প্রাণপণে অভ্রভেদী দারুণ চীৎকারে
জাগা'তে নারিয়ে হায়, অলস নিদ্রায়
সুপ্ত ভারতসন্তানগণে, মর্ম্মভেদী
হাহাকারে দিগন্ত মথিয়া, ভগ্নহৃদে
ঝাঁপ দেছে অতীতের উত্তাল তরঙ্গে!—
কি কাল-নিদ্রার ঘোরে ছিলে অচেতন,
আঁধারে আবরি' হায় বীরত্ব-জীবন!

মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডসম জ্বলন্ত বিক্রমে
উজলিয়া দশদিশি স্তম্ভিয়া ভূলোক,
অচল অটল সমুন্নত অভ্রভেদী
হিমাদ্রির মত শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রান্ত-

উন্নতকিরীট যেই আর্য্যকুল ভুজ-
বলে অবহেলে রত্নপ্রসূ সুবিশাল
ভূস্বর্গ ভারতভূমি করিত শাসন,—
সসাগরা বসুন্ধরা তর্জ্জনী হেলনে
যা'র হইত কম্পিত,—আততায়ীদল
ত্রাসিত শঙ্কিত চিত্ত, হইত বিকল।

বীরত্ব-আধার সেই আর্য্যবংশধর
কালচক্র-দুর্ব্বিপাক আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত
রহি', অনন্ত কালের তরে, অতিক্ষুদ্র
পরিত্যক্ত তৃণখণ্ডপ্রায় স্রোতমধ্যে
রবে ঘূর্ণ্যমান ?—দুর্ভাগ্যের সম্মোহন
কঠোর শাসকে পরাভূত বিপর্য্যস্ত
বিধ্বস্ত হইয়ে, দু'দিনের তরে কর্ম্ম-
ক্ষেত্রে হতবীর্য্য অচেতন ছিল বলি',
চিরদিন রহিবে কি বিগত-চেতন
পদাঘাতে নিপীড়িত জড়ের মতন ?

অসম্ভব।—অসম্ভব প্রলাপ কল্পনা।
কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে সুপ্ত সিংহ
জেগেছে এবার। প্রভাহীন দীপ্তিহীন
বিস্মিত স্তম্ভিত নেত্রে হেরিবে জগৎ—
সিংহবংশে নাহি জন্মে কভু কাপুরুষ
বীর্য্যহীন শশক-সন্ততি।—ঘোর ঘন-
ঘটা-আবরণে আবরিলে প্রভাকর,
প্রভাহীন নাহি হয় সহস্র-কিরণ!—
মোহঘোরে ছিল বলী নিদ্রায় মগন,—
মরে নাহি শূরশ্রেষ্ঠ আর্য্যসুতগণ।

বঙ্গমাতা-অঞ্চলের অমূল্য-রতন-
রাজী বঙ্গবীরগণ! সুবিশাল কর্ম্ম-
ক্ষেত্র নেহার সম্মুখে;—প্রদীপ্ত বীরত্ব-
তেজে দিগন্ত উজলি, এবে বীরদম্ভে
বীরপদভরে বিকম্পিয়া বসুন্ধরা
হও অগ্রসর অরাতির ভাগ্যাকাশে
উদর্ব্বুদ, উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু সম!—
প্রতীচ্য অর্পিত অতি ঘৃণ্য কাপুরুষ-
কলঙ্কপসরা পদাঘাতে ফেলি' দূরে,
শৌর্য্য বীর্য্য-কীর্ত্তি ধ্বজা উড়াও অম্বরে।

কি ভয় জর্ম্মাণে? দুঃশাস দুর্দ্ধর্ষ অরি—
সে তো বীরগণ-বাঞ্ছনীয় ধন;—শক্তি-
মান শত্রু তরে আর্য্যবীর দেবপদে
করেত কামনা,—প্রার্থনীয় শুভযোগ
পেয়েছ হেলায়,—সাজহ সমর-সাজে;—
বৈরীবধে প্রমত্ত হইয়ে ছাড় ভীম-
বজ্র সিংহনাদ,—প্রলয়-হুঙ্কারসম
প্রতিধ্বনি হোক তা'র শত্রুর পরাণে;—
সমগ্র জর্ম্মাণী ত্রাসে উঠুক কাঁপিয়া,
কৈসারের রাজদণ্ড পড়ুক খসিয়া!

বঙ্গবীর! এই তো সুযোগ; বীরদাপে
দিগন্ত কাঁপায়ে, অক্ষয় অমিত বলে
উন্মত্ত হইয়ে, জীবন্ত-প্রলয়-সম
ধ্বংস কর বিপক্ষ-বাহিনী,—অত্যাচারী
অরাতির উত্তপ্তশোণিতসিক্ত হৃদ-
পিণ্ড ল'য়ে গেণ্ডুয়া খেলহ রণাঙ্গনে;
প্রতীচ্যের সুবিশাল বক্ষঃস্থল হ'তে
ভুজবলে উপাড়ি জর্ম্মাণী, পদাঘাতে
বিচূর্ণ করিয়ে, অনন্ত কালের তরে
ডুবাও অতলস্পর্শি-জলধি-মাঝারে।

অসুরমর্দ্দিনী মাগো দানবঘাতিনী!
রণাঙ্গনা রণচণ্ডী নৃমুণ্ডমালিনি!
দশভুজে দশ প্রহরণ ধরি', রণে
মেতে' আয় গো মা শক্তিস্বরূপিনী! দে গো

মা অভয়বাণী চাণ্ডকে, অভয়ে। মৃত্যু
যদি হয়, মরি যেন বীরের মতন ;—
বাঙ্গালীর প্রতি বিন্দু শোণিত-সম্পাতে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ লভিয়া জনম,
অক্ষয় কীর্ত্তির স্তম্ভ স্থাপি' বণস্থলে
দোলায় বিজয়মালা বটনের গলে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস্ সি।

শ্রাদ্ধকৃত্য।

পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ চিরকালই বিদ্যমান আছে। কঠোপনিষৎ গ্রন্থে যমের প্রতি নচিকেতার উক্তিতে (১) বেশ প্রতীয়মান হয় যে, বহু পুরাকালেও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বিদ্যমান ছিল, এবং এখনও যে এই সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহা বর্ত্তমানকালের প্রবন্ধাদি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই সন্দেহ সত্ত্বেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রাদ্ধকৃত্যাদি পিতৃপূজা বৈদিক সময় হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। শ্রদ্ধার সহিত যে দান করা হয় (অবশ্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশে), তাহার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরলোক থাকুক বা নাই থাকুক, শ্রাদ্ধকৃত্যে তাহাতে কিছু আসে যায় না। শ্রাদ্ধের মূল ভিত্তি বিশ্বাস। যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি শ্রাদ্ধের অধিকারী। যাঁহার বিশ্বাস নাই, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই।

নির্ব্বিবাদে যদি পরলোকের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া যায়, পরক্ষণেই প্রশ্ন উঠিবে,—সেটা কি প্রকার অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীব কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়েও আর্য্যঋষিগণ এক মত হইতে পারেন নাই, এবং এই কারণেই, আমার বোধ হয়, পরলোকের অস্তিত্ব সন্দেহ-পূর্ণ। হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিষয়েই মতদ্বৈধ। কিন্তু এই বিভিন্ন মতের মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য আছে, একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য নিহিত আছে। বেদ ও পুরাণাদিতে মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হইলেও, সর্ব্বত্র প্রেতলোক, পিতৃলোক ও জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রাদ্ধকৃত্য সম্বন্ধে কোনও বিবাদ বিসম্বাদ করিবার হেতু নাই।

জীবের দেহ দুইটি, একটি স্থূল ও একটি সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং জীবের আত্মা সূক্ষ্ম অতি-বাহিক দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। বৈদিক সময়েও এইরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদে কথিত আছেঃ—

সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ
পৃথিবীং চ ধর্ম্মনা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু
প্রতিষ্ঠা শরীরৈঃ
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে
শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।

---

(১) যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে—
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।
(কঠো ১ম বল্লী ২০ শ্লোক)

বাস্তে শিবাস্তম্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং

সুকৃতামু লোকং ॥

(১০ম মণ্ডল ১৬ সূক্ত ৩।৪ ঋক)

হে মৃত, তোমার চক্ষু সূর্য্যের সহিত মিশিয়া যাউক, তোমার শ্বাস বায়ুতে লয় পাউক, তুমি তোমার কর্ম্মফলে আকাশে (স্বর্গে) ও পৃথিবীতে (মর্ত্তে) যাও। জলে যাওয়াটা যদি তোমার হিতকর বিবেচনা কর, তবে জলে যাও; তোমার শরীর ওষধির সহিত অবস্থান করুক ॥ হে অগ্নি এই মৃতের যে অংশ জন্ম-রহিত, তোমার তেজদ্বারা সেই অংশকে উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য ও তোমার শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা, তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহা দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।

কথিত আছে—এই সূক্ষ্ম অতিবাহিক দেহ ধারণ অতি কষ্টকর। একারণ শাস্ত্রকারগণ অশৌচকাল মধ্যে দাহকারী দ্বারা দশ-পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দশপিণ্ড দ্বারা কষ্টকর অতিবাহিক দেহ পূরণ হইয়া প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহ পূরণ হয় বলিয়া দশপিণ্ডের অপর নাম পূরকপিণ্ড। অতিবাহিক দেহে মৃত আত্মা কিরূপ ভাবে অবস্থান করে, তাহা দশপিণ্ডদানান্তর যে মন্ত্র-পাঠ করা হয় তাহা হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ভূতো নিরাশ্রয়ঃ।
ইদংনীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব ॥

হে মৃত, তুমি আকাশে বায়ুভূত হইয়া আছ; তোমার কোনও অবলম্বন বা আশ্রয় নাই। তুমি এই জলে স্নান করিয়া এবং এই ক্ষীর পান করিয়া সুখী হও।

অতিবাহিক দেহত্যাগ করিয়া দশদিনের পর জীব যে প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে একশ্রেণীর ভোগ-দেহ বলা যাইতে পারে। এই প্রেত শব্দটি কোনও কোনও পুরাণে অতি হেয় ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে প্রেতের আকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

বিকরালমুখং দীনং পিঙ্গনয়নং ভৃশম্।
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজকৃষ্ণাঙ্গং যমদূতমিবাপরং ॥
চলজ্জিহ্বঞ্চ নাস্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘশিরাকুলম্।
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরম্ ॥

অর্থাৎ প্রেতের আকৃতি দ্বিতীয় যমদূতের ন্যায় করাল বদন, দীন ভাবাপন্ন, চক্ষু অত্যন্ত পিঙ্গলবর্ণ, মাথার চুলগুলি সব খাড়া, কৃষ্ণবর্ণ, জিহ্বা লকলকে, ঠোঁট লম্বা, জঙ্ঘা দীর্ঘ ও শিরাকুল, দীর্ঘ চরণ, মুখ শুষ্ক, চক্ষু কোটরস্থ এবং পঞ্জর শুষ্ক।

অগ্নিপুরাণেও প্রেতকে অতি অস্পৃশ্য পাপিষ্ঠ নরকস্থ জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে প্রেত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন —"যথানিয়মে ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন না হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রেত নামে কথিত হয়।" স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রেত কিন্তু এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকল-কেই প্রেতলোকে গমন করিতে হয়।

সকলেই কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য

শ্রাদ্ধাদিতে প্রেত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগতে জীবসকল যেমন সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল অনুসারে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হয়, প্রেতলোকেও সেইরূপ সকল গুলাত্মা একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, পাপপুণ্য অনুসারে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ ভূত বা evil spirit বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি —পুরাণে সেই সকল প্রেতদেহ বর্ণিত হইয়াছে, উহা সাধারণ প্রেতাকৃতি নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সে সকল জীব অতি পাপী অর্থাৎ যাহারা নরকে যাইবার উপযুক্ত এবং যাহারা আত্মঘাতী বা অন্য কোনও রূপে পতিত তাহারাই এই পুরাণ-বর্ণিত প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পুণ্যাত্মা বা সাধারণে যে ইহাদের সহিত সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সাধারণ প্রেতদেহ নরকের ন্যায় জঘন্য না হইলেও, ইহা অশুচি প্রাপ্ত; এবং এই কারণেই মৃত পিতৃককে, (যাহার পিতা বা মাতা মৃত হইয়াছে) তাহার পিতামাতার প্রেতদেহ ধারণ কালে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। এই অশৌচের নাম কালাশৌচ।

শাস্ত্রে প্রেতলোকের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রের একবার পৃথিবী পরিবেষ্টন করিতে প্রায় এক মাস সময় লাগে বলিয়া, এক মাসে প্রেতলোকের একদিন হইয়া থাকে। প্রতি প্রেতলোকের দিনে অর্থাৎ প্রতি চান্দ্রমাসে একবার করিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। এই প্রেতশ্রাদ্ধকে মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হয়। ইহা "নিত্য" অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য এবং না করিলে প্রেতত্বের উদ্ধার হয় না।

আত্মার প্রেতলোকে অবস্থান কাল এক বৎসর। বৎসর পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ মৃত তিথি হইতে গণনায় দ্বাদশ চান্দ্রমাসের মৃত তিথিতে) সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃতের প্রেতদেহ বিমোচন হইয়া পিতৃলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধও নিত্য অর্থাৎ না করিলে পিত্রাদির প্রেতত্ব নাশ হয় না। পুত্রের বিবাহাদি কর্ম্মে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধানুরোধে অনেক সময় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অপকর্ষ করিয়া পিত্রাদির সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলেন,—

যথাহপকৃষ্ট সপিণ্ডনজন্যাপূর্ব্বং পূর্ণসংবৎসরকালং প্রাপ্য পিতৃত্বপ্রাপকং। "কৃতে সপিণ্ডীকরণে নবঃ সংবৎসরাৎ পরং। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে।"

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়াৎ [তিথিতত্ত্ব ৩০]

অর্থাৎ অপকৃষ্ট সপিণ্ডীকরণ করার জন্য যে অদৃষ্ট, তাহা বৎসর পূর্ণ হইবার পর পিতৃত্বের প্রাপক হইয়া থাকে। কেননা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়ে কথিত আছে, বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলেও, মনুষ্য এক বৎসরের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, উহা প্রেতত্ব বিমোচনের হেতু নহে, কালই গতাত্মার প্রেতত্ব নাশ করিয়া থাকে। পাপাত্মাই হউক

আর পুণ্যাত্মাই হউক, সকলকেই পূর্ণ এক বৎসর কাল প্রেতলোকে বাস করিয়া পিতৃলোকে গমন করিতে হয়।

পিতৃলোকের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের উপরে। চন্দ্র এক বৎসরে (পৃথিবী বেষ্টন করিতে করিতে) একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। একারণ এক চান্দ্র বৎসরে পিতৃলোকের একদিন হইয়া থাকে। প্রতি পিতৃদিনে অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র বৎসরে একবার করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধকে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বলা হইয়া থাকে।

পিতৃলোক স্বর্গ-সদৃশ অতি পবিত্র স্থান। পিতৃপুরুষগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন ও মনুষ্যের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদে কথিত আছে ;—

বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্বাগিমা বো হব্যা
চকৃমা জুষধ্বং।
ত আ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ
শংযোররপো দধাত॥
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ
দেবৈঃ সরথং দধানাঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববংদৈঃ পরৈঃ
পূর্ব্বৈঃ পিতৃভিৰ্ম্মসদ্ভিঃ॥

[ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৫ সূক্ত ৪।১০ ঋক]

অর্থাৎ—হে কুশোপবিষ্ট পিতৃগণ, আমাদিগকে আশ্রয় দাও, তোমাদের জন্ম যাহা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা এখন ভোগ কর। আমাদিগকে রক্ষা ও আমাদের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদান করিবার জন্ম আইস, আমাদিগকে একণে কল্যাণভাগী, অকল্যাণরহিত ও নিষ্পাপ করিয়া দাও। যে সকল সত্যবান পিতৃলোক দেবগণের সহিত একত্রে হবি গ্রহণ করিয়া থাকেন ও ইন্দ্রের সহিত এক রথে গমনাগমন করিয়া থাকেন; হে অগ্নি, সেই সকল দেবারাধনাকারী, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত আইস।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পিতৃপূজা দেবপূজার ন্যায় সমান লোকহিতকর এবং আদরণীয়। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কেবল যে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে—তাহা নহে, ইহাতে নিজ হিতসাধনও যথেষ্ট পরিমাণে হয়। দেবগণের নিকট হইতে আমরা যেমন পুত্র, আয়ু, যশ, ধন ও সৌভাগ্যাদি কামনা করিয়া থাকি, বৈদিক সময়ে আর্য্যঋষিগণ পিতৃপুরুষগণের নিকটেও সেইরূপ কামনা করিতেন। ঋগ্বেদ হইতে এরূপ বহু ঋক্ দেখান যাইতে পারে; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে বিরত হইলাম।

পিতৃলোক হইতে জীব পুনরায় জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কতকাল পরে এই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, উহা জীবের কর্ম্মফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পিতৃপুরুষ পিতৃলোকেই বাস করুন, অথবা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীলোকেই পুনঃ প্রত্যাগমন করুন, শ্রাদ্ধকৃত্যে ইহাতে কিছু আসে যায় না। পিতৃপুরুষগণ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদের পূজনীয়, তাঁহাদের লোকান্তরিত আত্মার তৃপ্তি সাধনের

জন্য শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। বৈদিক সময়েও পৃথিবী-লোকগত পিতৃপুরুষের পূজা করা হইত। বেদে কথিত আছে,—

ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্তু য পূর্ব্বাসো
য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং
সুবৃজনাসু বিক্ষু॥

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৫ সূক্ত ২ ঋক্]

অর্থাৎ যে সকল পিতৃপুরুষ পূর্ব্বে অথবা পরে মৃত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীলোকে আছেন (অর্থাৎ জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন) অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে আছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি অদ্য নমস্কার করিতেছি।

শ্রাদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য মৃত পিতৃপুরুষগণকে খাদ্যদ্রব্যাদি ভোজনদান করা। এখন কথা হইতেছে যে, পিতৃ বা প্রেতলোকগত আত্মার শ্রাদ্ধক্ষেত্রে কব্য (অর্থাৎ শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি দেয় খাদ্যদ্রব্য) ভোজন করিতে আগমন করা কতকটা সম্ভবপর হইলেও, যে আত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার শ্রাদ্ধে কব্য ভোজন করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? কোনও মৃত আত্মা কব্য ভোজন করিতে শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আসেন না, ব্রাহ্মণাদি প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি-সাধন করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে বা কিছু দান করিলে যে মৃত পিতৃ-পুরুষগণের তাহা ভোজন করা বা পাওয়া হইবে, এ বিশ্বাসটি সহজসাধ্য নয় ; এবং এ বিশ্বাস না থাকিলে শ্রাদ্ধ করাও একপ্রকার নিষ্ফল। "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" এই সমষ্টিজ্ঞান আর্য্যশাস্ত্রের অস্থিভূত। আমরা আবহমান কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ঘটাকাশ ও মাঠাকাশ যেমন এক, সর্ব্বভূতে আত্মাও সেইরূপ এক ; ইহার বিনাশ নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু কথাটা কি আমরা অন্তরের সহিত অনুভব করি, অথবা সেরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা আমাদের সকলের আছে। সুতরাং শাস্ত্র বাক্যের উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হয়। সকল আত্মাই যখন এক, তখন একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, প্রেত বা পিতৃলোক গত আত্মারও তৃপ্তি সাধন হইবে—এই ধারণাটা শ্রাদ্ধতত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এ বিশ্বাস তর্কলব্ধ, এই তত্ত্বটি এত উচ্চ আদর্শের যে, ইহা কেবল শ্রাদ্ধ কেন, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মেরও একটা মূল ভিত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বটির উপর অনেকে কটূক্তি পর্য্যন্ত করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই। কোন বাঙ্গালী নাট্যকার তাঁহার নাটকের একস্থানে লিখিয়াছেন "মরা গরুতে কি ঘাস খায়।" বর্ত্তমান আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী, তাঁহার "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থে, এই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এরূপ হীন কটাক্ষপাত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতার উল্লেখ করিয়া, আর্য্যঋষিগণকে এরূপ জঘন্য কটূক্তি করিয়াছেন, যে তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মাত্রেরই অপাঠ্য। আমি অতি কষ্টে পুস্তক খানির

কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া ঘৃণায় উহা দূরে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অবশ্য স্বীকার করি, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অনেক স্বার্থপর পুরোহিত আছেন, যাঁহাদের কার্য্যে অনেক সময় ধর্ম্মকর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সেজন্য হিন্দুশাস্ত্র বা আর্য্য ঋষগণ দায়ী নহে, সে দোষ আমাদেরই, সে দোষ আমাদের সমাজের নেতৃবর্গের।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সকল আত্মাই যখন এক, তখন পিতৃ-পুরুষগণের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ না হইয়া একজন দরিদ্র চণ্ডালও ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, পূর্ব্বে কি উপায়ে পিতৃপূজা করা হইত।

বৈদিক সময়ে অগ্নিকে পিতৃপূজার প্রতিনিধি করিয়া কব্যাদি আহুতি দেওয়া হইত। অগ্নি শ্রাদ্ধের কব্য (অর্থাৎ পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে দেয় খাদ্যদ্রব্য) বহন করিতেন বলিয়া, অগ্নির অপর নাম কব্যবহ (কব্য+বহ্+অ)। বেদে কথিত আছে,—

যো অগ্নিঃ ক্রব্যবহানঃ পিতৄন্ যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ॥
উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে॥

[ঋগ্বেদ ১০ম ১৬ সূক্ত ১১।১২ ঋক্]

অগ্নি শ্রাদ্ধের কব্য বহন করেন ও দেবগণকে এবং পিতৃগণকে আরাধনা করেন। তিনি হোমের দ্রব্য দেবগণের ও পিতৃগণের নিকট প্রেরণ করেন। হে অগ্নি, যত্নপূর্ব্বক তোমায় স্থাপন ও প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। তুমিও যজ্ঞকামনাকারী দেবগণ ও পিতৃগণের নিকট তাঁহাদের ভোজনার্থ হোমের দ্রব্য (হব্য ও কব্য) বহন কর।

আজ পর্যন্তও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশীয় আর্য্যব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্নিকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন্ সময়ে যে শ্রাদ্ধে অগ্নিকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা লোপ পায়, তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে মনুসংহিতা ও পুরাণাদিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিভিরুচ্যতে॥

[মনু ৩য় অধ্যায় ২১২শ শ্লোক।]

অর্থাৎ অগ্নির প্রভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই (পিণ্ডাদি) প্রদান করিবে। কেন না বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলেন, যিনি অগ্নি তিনিই ব্রাহ্মণ,—ইঁহাদের কোনও প্রভেদ নাই।

ইহা হইতেই বুঝা যায় পৌরাণিক যুগেই শ্রাদ্ধে অগ্নির পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

অধুনা আমরা উপযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অভাবে কুশের ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি এবং শ্রাদ্ধ শেষে দ্রব্যাদি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দান করি ও কয়েকটি (ইচ্ছানুরূপ সংখ্যক) ব্রাহ্মণ ভোজন করাই। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আচার প্রবন্ধান্তর্গত শ্রাদ্ধকৃত্য প্রবন্ধে বলেন যে, "আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার শ্রাদ্ধে এবং সকল স্থানে

এবং সকল অবস্থাতে দর্ভবস্তুর নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ খুব ভাল ছিলেন, এখন তেমন ভাল নাই, একথা স্বীকার করিলেও এখন যে কেবল দর্ভময় ব্রাহ্মণেরই নিয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ স্বীকার করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিয়া যখন অনেকানেক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতেছে, তখন যে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এমত মনে করা যাইতে পারে না।" তিনি এ সম্বন্ধে আরও অনেক যুক্তির অবতারণা করেন। এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মনু বলেন,—

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ॥
জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃ স্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।
হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্ব্বেষ্বেব চতুর্ষ্বপি॥

[মনু ৩য় অধ্যায় ১৩২।১৩৪।১৩৫]

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে হব্য ও কব্য প্রদান করা উচিত। কেন না রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালন করা যায় না। কোন দ্বিজ জ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ তপোনিষ্ঠ, কেহ তপঃ ও অধ্যয়ননিষ্ঠ আবার কেহ বা কর্ম্মনিষ্ঠ। ইঁহাদের মধ্যে মাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে কব্য যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিতে হয়। দেবোদ্দেশে হব্য অন্য চারি প্রকার ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাইতে পারে।

মনু এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে যত্নের সহিত ব্রাহ্মণগণকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। যাঁহারা চুরি করে, পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য, ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজনশীল, চিকিৎসক, প্রতিমাপরিচারক, মাংসবিক্রয়ী, গ্রামের বা রাজার ভৃত্য, কুসীদজীবী, পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত ব্রাহ্মণদ্বেষী, মদ্যপায়ী, আচারহীন, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহ ইত্যাদি দোষযুক্ত তাঁহারা দৈব ও পিতৃ উভয় কার্য্যেই পরিত্যাজ্য। শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু এরূপ অতি বিস্তার ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশ সমস্তই উদ্ধৃত করিতে হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, মনুর নির্দ্দেশানুসারে অধুনা শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। যদি কচিৎ কোথাও একটি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, তিনি যে সর্ব্বদোষরহিত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা যখন কেবল কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হই না, সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণও ভোজন করাইয়া থাকি, তখন কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা যে দোষযুক্ত, এরূপও মনে হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অনুতাপ।

(গল্প)

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে—নরেন্দ্রনাথ কলেজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—এমন সময় স্ত্রী বিমলা আসিয়া বলিল—"বলি কলেজ যে যাওয়া হচ্ছে—এদিকে যে সব ব্যাপার ঘটেচে তার কি কিছু সংবাদ রেখেচো ?"

"না দরকার করে না—কলেজ যাবার সময় আর বিরক্ত ক'রো না। রাতদিন আর ওসব ভাল লাগে না" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখ প্রতি চাহিলেন।

বিমলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"যদি ভাল না লাগে তবে আমায় এ বাড়ীতে রাখা কেন ? আমার বাপ, ভাই কি দু মুঠো ভাতের কাঙ্গাল যে, তারা আমাকে পুষ্‌তে পারবে না ? আজ ব'লে দিচ্ছি যদি এর একটা হেস্ত-নেস্ত না কর তবে কালই আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাব।"

"বিমলা, তুমি নেহাত অবুঝের মত কথা ব'লো না।"

"বেশ আমি অবুঝ আছি,—আমিই আছি—তাতে লোকের কি ?"

"রাগ কর কেন বিমলা—আর দুটো বচ্ছর সবুর কর। যদি ভগবান মুখ তুলে চান তবে কিছুরই ভাব না হ'বে না।"

"আমার সুখ—তা আর এ জীবনে হয়েচে ?"

"হবে না কেন বিমলা! আমি যদি আর বচ্ছর বি-এ পাশ কর্‌তে পারি তবে নিশ্চয়ই একটা চাকরি জুট্‌বে—তখন বিদেশে তোমায় নিয়ে গিয়ে সুখে রাখ্‌বো।"

"তা যাই বল—আমি আর তোমার মা ব'নের মুখ নাড়া সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।"

"ওসব কথা মুখে আন্‌তে নেই, পাগ্‌লী" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সস্নেহে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"যাও আর আদরে কাজ নেই।" বলিয়া বিমলা রাগে গরগর করিতে করিতে গৃহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

নরেন্দ্রনাথ অগত্যা কলেজ অভিমুখে অগ্র-সর হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ বহরমপুর কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাঁহার পিতা হরিহর দত্ত আজ দুই বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার মাতা ও দুই বিধবা ভগ্নী। নরেন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময় কৃষ্ণ নগরের এক ধনবান উকীলের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রথম বিবাহিত জীবন তাঁহাদের বেশ সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু বিমলার স্বামী-গৃহে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তাঁহাদের সংসারে অশান্তির রেখা দেখা যায়। বিমলা ধনীর কন্যা। সে আত্ম-সুখেই ব্যতিব্যস্ত— সংসারের কাজে বড় একটা সে মনোযোগ দিত না। প্রথম প্রথম নরেন্দ্রের মাতা তাহাকে কিছু বলিতেন না ; কিন্তু দিন দিন বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া মধ্যে মধ্যে দু' একটা শক্ত কথা শুনাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে বিমলার অভিমানের

সীমা থাকিত না। সে স্বামীকে শশ্রুঠাকুরাণীর বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনাইয়া দিত। নরেন্দ্রনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন—তিনি স্ত্রীর এতাবৎ কার্য্যকলাপ স্বচক্ষেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং স্ত্রীর অভিযোগ বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। অধিকন্তু স্ত্রীকেই মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দিতেন। সেই হইতেই স্বামী স্ত্রীতে সামান্য মনোমালিন্য ঘটিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বিমলা বাড়ীর ভৃত্য রাম সেবককে দিয়া গাড়ী ডাকাইল। তৎপরে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট গিয়া বলিল—"তবে আমি চল্লাম।"

নরেন্দ্রনাথের মাতা স্বামীর মৃত্যুতে বড়ই কাতর ছিলেন—তিনি পুত্র-বধূর এ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইলেন। ছল ছল নেত্রে কহিলেন—"বৌমা, এটা কি তোমার ভাল হচ্ছে?"

"না হ'লে আর আমি কি কোর্‌ব বল?"

"কোর্‌বে আবার কি? তোমারই ঘরকন্না—তোমারই সব। আজ আমি চোখ বুজ্‌লে সবই তোমাকে দেখ্‌তে হবে।"

"তা বলে কি আমি সকলের মুখ নাড়া সহ্য কোর্‌বো?"

"সে কি কথা বৌমা! ঐ নরেন আমার সবেমাত্র একটী ছেলে—তার বৌ তুমি—তোমাকে কি আমরা মুখনাড়া দিতে পারি?"

"যাক্ অত কথায় কাজ নেই—আমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌বো না" এই বলিয়া বিমলা গাড়ীতে উঠিল।

নরেন্দ্রের মাতা তখন চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে পুত্রের নিকট গিয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ গৃহ মধ্য হইতে সমস্তই শুনিতেছিলেন। মাতার বাক্যে বিমলার গাড়ীর নিকট গিয়া "বিমলা" এই কথাটী উচ্চারণ করিয়াই আর কিছু বলিতে পারিলেন না—দুই গণ্ড বহিয়া তাঁহার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিমলা তখন মুখ ফিরিয়া বসিল। নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে বলিলেন—"বিমলা এটা কি ভাল দেখায়? তোমায় এতদিন প্রাণভরে ভালবেসে তারই কি এই প্রতিদান! যাক্—আমি তার কিছুই চাইনে—তুমি ভাল থাক, সুখে থাক এই চাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।" এই বলিয়া তিনি দ্রুত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন। বিমলাও ভৃত্যকে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিল। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে গোশকট অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বিমলা প্রথমে পিতৃগৃহে বড়ই সুখে কাল যাপন করিয়াছে। মাতাপিতার আদরে সে এতদিন সংসারে কিছুরই অভাব অনুভব করে নাই। হাসিয়া খেলিয়া বেশ সুখেই কাটাইতেছিল কিন্তু মানুষের চিরদিন সমান যায় না। সুখ-দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং বিমলার সুখের দিন ফুরাইয়া দুঃখের দিন আসিল। চতুর্থ বৎসরে তাহার মাতার মৃত্যু হইল। সংসারে একটা ক্রন্দনের রোল উঠিল। চারিদিকে হাহাকার

পড়িয়া গেল। পিতা আর তেমন ভাবে কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। ভ্রাতৃবধূ সুযোগ বুঝিয়া ননদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যখন তখন বিমলা বাক্য-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। গোপনে কত নয়ন-জল ফেলিল—কিন্তু তাহার প্রতি কেহ আর দৃক্‌পাতও করিল না। হায় বিমলা! তুমি হিন্দুর কন্যা—আজ যদি তুমি স্বামীর গৃহে থাকিয়া শাকান্ন ভোজন পূর্ব্বক স্বামীপদে মতি রাখিতে পারিতে তাহা হইলে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বিমলার তখন পর্য্যন্ত জ্ঞান হইল না। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও তাহাদের সংসারে পড়িয়া রহিল। কিছু দিন পরে পিতা উপযুক্ত পুত্র সুরেশ-চন্দ্রের হস্তে সংসারের ভারার্পণ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। বিমলাও পিতার সহিত যাইতে চাহিল; কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর গৃহ-ত্যাগের পর হইতেই কলেজ ত্যাগ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রামে শিক্ষকতা করিতে লাগিয়া-ছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের কাশী-যাত্রার সংবাদ পাইয়া একবার বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখনও তাঁহার প্রতি বিমলার ক্রোধ প্রসমিত হয় নাই। রাত্রে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বিমলা আসিয়া অর্গলবদ্ধ করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে শয্যা গ্রহণ করিল। হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। অগত্যা তাহার একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন। কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। মস্তিষ্কের অধিক উত্তেজনা বশতঃ সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। গাও একটু গরম বোধ হইল। কি করিবেন—পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটু তন্দ্রাবেশ হইল—অল্পক্ষণ পরেই কম্প দিয়া জ্বর দেখা দিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিমলা, একবার উঠে দেখ ত—আমার বোধ হয় জ্বর এল।"

"যাও আর বিরক্ত ক'রো না। সারাদিন খেটেখুটে এসে একটু শান্ত হয়ে শুতে এলাম—তাও প্রাণে সহ্য হবে না। যম! তুমি আমাকে লও।"

"বিমলা, একবার দেখ—শরীরটা বড় খারাপ কচ্চে। বোধ হয় তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না।"

"তা আমি কি কর্‌ব?" বলিয়াই বিমলা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ একখানি গোগাড়ি ডাকাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাতে উঠি-লেন। গাড়ী তাঁহাদের গৃহাভিমুখে রওনা হইল। বিমলা এ পর্য্যন্ত একবারও স্বামীর অনুসন্ধান লইল না। ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁরে—নরেন হঠাৎ অমন করে কেন চ'লে গেল বল্‌তে পারিস্?

তদুত্তরে বিমলা বলিল—"তা দাদা, আমি

কি ক'রে বল্‌ব—ওদের ঝাড়ই অম্‌নি।"

"তা মিথ্যে নয়" বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া হাজির হইল। সেও নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা গালি বর্ষণ করিতে ছাড়িল না। এইরূপে দৈনিক স্বামীর নিন্দায় যোগদান করিয়া বিমলা আরও কিছুদিন পিতৃগৃহে বেশ শান্তিতেই কালযাপন করিল। তৎপরে একদিন সে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা আছে এমন সময় সুরেশ বাবুর পঞ্চম বর্ষীয় এক পুত্র আসিয়া তাহাকে বড় বিরক্ত করিতে লাগিল বিমলা তাহাকে সামান্য প্রহার করিল। পুত্র ক্রন্দন করিতে করিতে মাতাকে আসিয়া বলিল। সুরেশ-পত্নী ত শুনিয়াই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। দ্রুত রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া মুখনাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"বলি ঠাকুর ঝি, ব্যাপারখানা কি? আমার ছেলের গায়ে হাত তোলা কেন?"

বিমলা বিনীতভাবে বলিল—"কই, তেমন ত মারি নি?"

"কি—তবে কি আমি মিথ্যে বল্‌ছি? আমারই খাবি, আবার আমাকেই চোখ-রাঙাবি! আজ ও বাড়ী আসুক—তারপর দেখাচ্ছি—তোর একদিন কি আমার একদিন।"

বিমলা বেগতিক দেখিয়া চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। যথাসময়ে সুরেশবাবু আসিয়া সমস্ত শুনিয়া ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিমলা, আজ বলে দিচ্ছি যদি আর কখন খোকার গায়ে হাত তোলা শুন্‌তে পাই তবে তখনই তোকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বাহির করে দিব। সাবধান!"

বিমলা আর কি বলিবে! চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহকার্য্যে মনঃসংযোগ করিল। সে দিন তাহার আর কিছুই আহার হইল না। রাত্রে শয্যায় শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অনুতাপ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। স্বামীকে মনে পড়িল—স্বামীগৃহ মনে পড়িল—স্বামীর প্রাণ-ভরা ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন ভাবিতে লাগিল—"হায়! কেন আমি তাঁকে ছেড়ে এখানে এলাম!—তিনি আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাস্‌তেন। আমার একটু অসুখ হ'লে পাগলের মত ছুটে বেড়াতেন। আমি হতভাগী—তাই তাঁর ঘরে থাক্‌তে পার্‌লাম না। হায়। এতদিন যদি সেই ঘরে থাক্‌তাম তা হ'লে কি দাদা আমাকে এমন শেয়াল কুকুরের মত দেখ্‌তে পার্‌তো! তখন বুঝি নাই যে, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। প্রভো, আমায় ক্ষমা ক'রো। হায়! তাঁর অসুখ হ'লে কেন আমি দেখ্‌লাম না! কেন তাঁকে তাড়িয়ে দিলাম! যখন তিনি চোখ ছলছল করে বল্লেন,—"বিমল, আমায় একবার দেখ।" আমি হতভাগী কেন তখন বুক দিয়ে তাঁর সেবা কর্‌লেম্ না? আজ সাত আট দিন তিনি অসুখ নিয়ে বাড়ী গিয়েছেন—কেমন আছেন জানি না!" বিমলা আর ভাবিতে পারিল না—তাহার চতুর্দ্দিক অন্ধকার বোধ হইল। চক্ষু মুদিয়া প্রাণভরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। এইরূপ সমস্ত রাত্রি চিন্তাতেই তাহার অতি-

বাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উদাস মনে গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার ভ্রাতা সুরেশ-চন্দ্র একখানি টেলিগ্রাম হস্তে বাটী প্রবেশ করিলেন ও ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন—"বিমলা, নরেনের অসুখ বেশী, তোর শাশুড়ী টেলিগ্রাম কচ্ছে।"

ভ্রাতৃবাক্যে বিমলার মাথা ঘুরিয়া গেল। পৃথিবী তাহার নিকট হইতে অল্পে অল্পে সরিয়া যাইতে লাগিল। "দাদা, দাদা" বলিতে বলিতে সুরেশ বাবুর পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক কষ্টে বিমলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে সুরেশ বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা যখন উপস্থিত হইলেন তখন নরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন। পার্শ্বে মাতা ও ভগ্নীদ্বয় বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। ডাক্তার বাবু মধ্যে মধ্যে নাড়ী টিপিয়া দেখি-তেছেন। অবস্থা বড় ভাল নয়—সকলেরই নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। এমন সময় বিমলা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ—কেশরাশী আলুলায়িত—বস্ত্র অবিন্যস্ত। এই সময় নরেন্দ্রনাথ এক-বার চক্ষু মেলিয়া বিমলার প্রতি চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণেই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বিমলা তাঁহার পদতলে পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বলিল,—"হৃদয়-দেবতা, বল—বল—তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লে!" নরেন্দ্রনাথের নয়ন প্রান্তে পুনরায় একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। বিমলা বলিতে লাগিল,—"একবার কথা কও—এই দেখ, আমি এসেছি। আমার জ্ঞান হয়েছে, তুমি একবার ভাল করে দেখ। আর আমি অজ্ঞা-নের ন্যায় তোমায় অবহেলা কর্‌ব না। একবার তুমি আমায় আদর করে "বিমল" বলে ডাক। আমি আর কিছু চাইনে—কেবল একবার তোমার প্রাণভরা ডাকটী শুন্‌বো। ডাক্‌বে না—তবে এই আমি চল্লাম।" বলিয়া বিমলা স্বামীর বক্ষোপরি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এদিকে নরেন্দ্রনাথেরও জীবন প্রদীপ নির্ব্বা-পিত হইল।

শ্রীনলিনাক্ষ হোড়।

অপেক্ষায়।

আজি, বসে আছি নাথ। বিরহ নিদাঘে
আশা-পথ পানে চেয়ে,
তোমার পবিত্র প্রণয়-মূরতি,
পূজিতে আকুল হিয়ে
রেখেছি যতনে, ভক্তি-প্রেম প্রীতি—
সোহাগ-কুসুম-রাজি,
সিক্ত করিয়া অশ্রুর চন্দনে,
সাজায়ে হৃদয়-সাজি।
এস হে আরাধ্য। এস হে বাঞ্ছিত!
বাসনা করিতে পূর্ণ,
এস হে কিশোর। এস হে দয়িত!
মানস-মন্দির শূন্য।

অধরে মধুর হাসিটি টিপিয়া,

এস ওগো কালশশি!

নবজলধর বিলাম্বিত তব—

শ্যামল সৌন্দর্য্যে ভাসি।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

তুমিই।

তুমিই সখা, তুমিই প্রিয়, তুমিই আমার প্রাণ,
তুমিই আমার বিশ্ব-মরুতে নির্ম্মল-বারি দান।
তুমিই আমার আঁধার ঘরের স্বর্ণ-প্রদীপ খানি,
তুমিই আমার সাধনার ধন হৃদয়-রাজ্যের রাণী।
তুমিই আমার শক্তিরূপিনী, ভয়ে অভয়দাতা,
তুমিই আমার ভজন-সাধন, তুমিই দেবতা।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

বঙ্গের ভিক্ষুক।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজ-সেবায়াং ভিক্ষায়াম্ নৈবচ নৈবচ॥

অপাত্রে দান শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। অযোগ্য পাত্রে দান করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়, কারণ তদ্দ্বারা পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পাপ প্রশ্রয় পাইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আমরা সামাজিক জীব। সমাজ লইয়াই আমাদের অবস্থিতি, সমাজের যাহাতে রক্ষা হয় ও পুষ্টিবিধান হয় এবং যাহাতে তন্মধ্যে কোনরূপ দুর্নীতি বা অনাচার প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। তাই সমাজরক্ষার্থ পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দয়া প্রদর্শন করা প্রয়োজন "দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত, সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত, তাহাকেই দান করিবে -অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ মোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। যাহার দারিদ্র্য-দুঃখ নাই, তাহাকে ধন দান বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য. অনুচিত দানে অনেক সময় পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়।"—ধর্ম্মতত্ত্ব।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন আছে। রামায়ণে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এই ভিক্ষারছলেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, এই প্রথা বহুকাল হইতে এ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। এক্ষণে উহা সমাজ-শরীরে বদ্ধমূল হইয়াছে। অতি দরিদ্র হিন্দুগৃহস্থও দ্বারদেশ হইতে ভিক্ষুককে রিক্তহস্তে বিদায় দেওয়া পাপজনক মনে করেন। ইহা হিন্দুগিণের আজন্মপুষ্ট সংস্কার। এই মুষ্টি-অন্ন ইঁহারা উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই মুষ্টি মুষ্টি অন্নের সমবায়ের শক্তি অসীম। ইহার দ্বারা একদিকে যেমন ভাল কাজ হইতে পারে, অপর দিকে তেমনি সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে। এই মুষ্টি-ভিক্ষার অন্নগুলি কেবলই যে সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকে এরূপ বলা

শ্রম। ইহার দ্বারা দেশের অনেক প্রকৃত গরীব, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ব্যক্তির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহারা দয়ার উপযুক্ত পাত্রও বটে। কিন্তু "বঙ্গের ভিক্ষুক" এই কথা আমাদের কর্ণগোচর হইবামাত্র এই দীন-দরিদ্র বিকলাঙ্গগণের পার্শ্বে অনেক হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ নর-নারীর মূর্ত্তিও আমাদের মানস-পটে প্রতিফলিত হয়। ইহারা দয়া লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই দয়ার অপাত্র, সামর্থ্য বিশিষ্ট, পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ হীন ব্যক্তিরা কোনরূপ কাজকর্ম্ম না করিয়া দলে দলে এই অল্পায়াস-সাধ্য ভিক্ষুকের জীবন অবলম্বন করিয়া দেশটা উৎসন্নে দিতেছে; এমন সুখের, সহজ, সরল পন্থা বিদ্যমান থাকিতে শ্রম-ভীরু বাঙ্গালী কঠোর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে যাইবে কেন? তাই আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে "হরি বল্‌লে কাঁড়া চাল মিলে।"

রবিবার ভিক্ষুকদের পক্ষে পরম শুভদিন—মহা উপার্জ্জনের দিন। এই দিন ধনী ব্যক্তিরা কেহ এক মণ কেহ দুই মণ চাউল দান করিয়া থাকেন। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ছুটীর দিন তাঁহারা এই দিন কিছু পয়সা দান করিয়া থাকেন। রবিবার দিন রাস্তায় বাহির হইলে ভিক্ষুকদলের ভিড় ঠেলিয়া যাইতে হয়, এত ভিক্ষুক সেদিন আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় শিশু, বালক, বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সমর্থ-অসমর্থ সকল রকমই আছে। তবে অসমর্থ অপেক্ষা সমর্থ ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশী। ইহাদিগকে খাটিয়া খাইতে বলিলে ইহারা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—"তোমার ইচ্ছা হয়, বাপু! তুমি ভিক্ষা দাও, না হয়, না দাও তোমার অত 'কথার' দরকার কি?" এসব কথা শুনিয়া অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশে যতদিন না আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের উদয় হইবে, ততদিন এ অবস্থা কাটিবে না। কবি বলিয়াছেন "ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান।" কিন্তু একথা এদেশের লোক বুঝিল কি? কবি শুধুই আক্ষেপ করিয়া গেলেন!

হিন্দুগণ অতি ভাবপ্রবণ ও ধর্ম্মোন্মত্ত জাতি। হরিকথা শুনিতে পাইলে তাহারা সব ভুলিয়া যায়, অতি কৃপণও মুক্তহস্ত হয়; পাত্রাপাত্র তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না। লম্পট বাবাজী ভিক্ষুকের চরণে অনেক অশিক্ষিতা অপরিণামদর্শী গৃহস্থ কামিনীগণ ভাবে বিভোর হইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া কুলে কালিমা লেপন করে। পল্লীগ্রামে সরল কুলবধূগণের মধ্যে তথাকথিত বাবাজী ভিক্ষুকগণের (ইহাদের মধ্যে অলস, ধূর্ত্ত ও পরিশ্রম-কাতর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়) হরিনাম" ও গায়ে হরিনামের ছাপ সম্বল করিয়া দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে।

'প্রাচীন গ্রামে গ্রামে যে সব বৈষ্ণব দেখিতে পাই, তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলকমালা ধারণ করে' (হিমালয়) ইহাদের হরিনামকীর্ত্তন কতখানি হরির জন্য, আর কতখানি ভিক্ষার জন্য তা বলা শক্ত নয়।

'আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময় ভুলে যাই, সুতরাং আমরা পাপী। কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করতে পারে না; তাই তারা তাদের উনকুটি চৌষট্টি ঝুলির ভিতর পুরে দিনরাত কাঁধে ক'রে, পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম করবে। ইহাদের প্রাণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সংসার।

অনেক সময় একজন বাবাজীকে দুই বা ততোধিক বৈষ্ণবী সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখ যায়। ইহারা খঞ্জনি ও ও মন্দিরা বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। বৈষ্ণবীরা অনেক সময় গানে শ্রোতাদের চিত্ত এরূপভাবে আকর্ষণ করে যে তাহারা "বক্‌শিশ" দিতে বাধ্য হয়। ইহারা পল্লীগ্রামে নৌকা করিয়া

এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এই নেড়ানেড়ীর দল, হরিনাম করিয়া হরিনামের অপমান করে। উহাদিগকে দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে ভিক্ষা দেয় তাহারও পাপ হয়। তথাকথিত বৈষ্ণববৈষ্ণবীগণ সমাজের কলঙ্ক, দেশের ভার স্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ মহাশয়ের "ধ্রুবতারা"তে এ সম্বন্ধে উত্তর প্রত্যুত্তরচ্ছলে বেশ একটা আলোচনা আছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

১ম ব্যক্তি —তথাকথিত বৈষ্ণবগণ সমাজের কলঙ্ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু ও তাহারা সমাজের অঙ্গ।

২য় ব্যক্তি।—অঙ্গ বটে, সমাজরূপ অট্টালিকার নর্দ্দামা।

১ম ব্যক্তি।—নর্দ্দামার দরকার আছে, অতএব উহার রক্ষার প্রয়োজন।

২য় ব্যক্তি।—রক্ষা করা আবশ্যক, আবার পরিষ্কারও করা উচিত। ইহারা রাত্রে বদমাইসি করিবে, আর দিনের বেলা অলসভাবে হরিনামের ছল করিয়া অন্যের ঘাড়ে চাপিয়া নিজেদের অন্নের সংস্থান করিবে, ইহাও ভাল নহে। ইহাদিগকে নিজ নিজ উদর পোষণের যদি রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইত তবে বোধ হয় ইহাদের স্বভাব এত খারাপ হইত না। তাহা হইলে একজন বৈরাগীর পক্ষে একটা বৈষ্ণবী রাখাই কঠিন হইত—সে চারি পাঁচটা কোন ক্রমেই রাখিতে পারিত না।"

এখন এই ভিক্ষুক-দমনের উপায় কি? ইউরোপে কেহ ভিক্ষা করিলে বা কাহারও নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইলে তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও যখন সে দেশের ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস হইল না, তখন সে দেশের লোক "আদর্শ ভিক্ষুক সংশোধনাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভিয়েনা নগরের কয়েক মাইল দূরে কোর্ণাবুর্গ নামক একটী গ্রামে এইরূপে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ভিক্ষুকদিগকে শাস্তি দেওয়া নহে—তাহাদিগকে সংশোধন করা, কার্য্যক্ষম করা। 'এখানে সমস্ত কার্য্য ভিক্ষুকদের দ্বারা করান হইবে, কাজ করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, এবং কাজের প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়া হইবে,—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) আমাদের বাঙ্গালাদেশে কি এরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না? *

শ্রীরাধাচরণ দাস।

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা।

অন্ধ তামস চ্ছন্ন হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে, অল্পবুদ্ধি ক্ষমতাহীন মানবকে মার্জ্জিত বুদ্ধিশালী করিয়া অসীম ক্ষমতাশালী করিতে শিক্ষার তুল্য আর কিছু নাই—একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। মানুষ জন্মগ্রহণ অবধি প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হইয়া কতকগুলি সাধারণ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তারপর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গুণের উপর যদি শিক্ষাবারি সিঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইলে মানব তরু বিচিত্র ফলফুল ভারে শোভিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিতরণ করিতে সমর্থ হয়। অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরিত করিতে হইলে মানবকে শিক্ষিত করা চাই। শিক্ষার দ্বারা যত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকিবে, মানবের শক্তিও তদনুপাতে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এজন্য ইংরাজীতে বলিয়া থাকে knowledge is power অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে এই জ্ঞানকে বৰ্দ্ধিত করিয়া মানব এতদূর শক্তিশালী হইতে পারে যে, কালে ঈশ্বরের সমতুল্য হওয়া অসম্ভব হয় না। কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দ্বারা সুপ্ত শক্তিকে এতদূর জাগরিত করিতে পারা যে,

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে কোন সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পরিবর্দ্ধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। লেখক।

তখন মানবকে পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন বলা যাইতে পারে; ইহা সেই অবস্থা যে অবস্থায় মানব আপনাকে "সোঽহং" অর্থাৎ আমিই সেই—আমিই ঈশ্বর—আমিই সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞানের অধীশ্বর,—ভগবান বলিয়া নিজেকে উন্নীত অবস্থায় পরিণত করিতে পারে। বাস্তবিক, এই সকল কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, মানব-জীবন অতিশয় অমূল্য। যাহারা এই অমূল্য মানবজীবনকে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত রাখিয়া কালাতিপাত করেন, তাঁহারা ভগবান-প্রদত্ত এই মহৎ দানের অপব্যবহার করিয়া থাকেন। মহামতি ইমার্সন সাহেব বলেন, "A man is the prisoner of his power"—অর্থাৎ মানব নিজের ক্ষমতাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখে। এই কারাবদ্ধ শক্তিকে উন্মুক্ত করিবার একমাত্র উপায়—মানবকে শিক্ষিত করা তাহার জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করা।

শিক্ষা যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির নিয়ামক তাহা নহে, জাতীয় জীবন স্ফুরণের ইহা একটী প্রধান সহায়। এই উন্নতির যুগে চারিদিকে শিক্ষার আলোক পরিব্যাপ্ত হইতেছে, জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সময়ে যদি কোন জাতি বা সমাজ কূপমণ্ডুকের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহার যে পতন অবশ্যম্ভাবী তাহা কে না স্বীকার করিবেন? এই সংসারে যোগ্যতারই জয়; জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে সময়ের গতি অনুসারে চলিয়া নিজ সমাজকে অন্যান্য সমাজের তুল্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যে বিভাগেই দেখা যায় তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশ অনেক নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই যে মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ কৃষি-কার্য্যের প্রণালী, যেরূপ শিল্প-বাণিজ্যাদির প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার কি কিছুমাত্র আমরা উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছি? বরং পাশ্চাত্য প্রণালীর সংঘর্ষে আসিয়া প্রতিযোগিতার স্থলে আমরা অসমর্থ হইয়া জীবন সংগ্রামে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছি। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কথা মনে হইলে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। এমন একদিন ছিল যখন তাহারা সমগ্র মহাদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে জ্ঞানালোকের যুগে তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়িয়া এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে মহাদেশে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অনেক মনীষী ব্যক্তি আশঙ্কা করেন যে, অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা যদি অবাধ প্রচলিত না হয়, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে আমরাও ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া আমাদের জাতীয়ত্ব হারাইয়া বসিব।

জন-সাধারণের জন্য অবাধ প্রাথমিক শিক্ষার যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। অন্যান্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। জন-সাধারণের উন্নতিতে দেশের উন্নতি, রাজ্যের উন্নতি,—রাজার উন্নতি, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে, অজ্ঞানলোককে শাসন করা সহজ তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। বস্তুতঃ, শিক্ষার জন্য আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সেই সময় সংস্কৃত টোল ও মুসলমান মক্তবের জন্য যে সকল লাখরাজ জমী ছিল, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকের সময় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সাধারণের শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছিল; মিঃ এ্যাডামের উপর এই অনুসন্ধানের ভার পড়ে। এই সময় তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বঙ্গে একলক্ষ পাঠশালা ছিল, এবং সাধারণের মধ্যে আরও শিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা এখন প্রাথমিক শিক্ষা যে বিস্তার লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৭০।৭১ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে,মাত্র ৬৮৫০০জন ছাত্র তখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৮৮১।৮২ সালে প্রায় ৯০০,০০০ ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৯১৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, ১১২৪১০৯ গুলি ছাত্র বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, তন্মধ্যে ৫৫০৮০৬ গুলি হিন্দু এবং ৫১২৫৮৯ গুলি মুসলমান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৩২·৭ হিন্দু ছাত্র এবং শতকরা ২৮·৯ মুসলমান ছাত্র বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং বক্রী বালকগণ একেবারে নিরক্ষর থাকিয়া যাইতেছে। ইহাদের শিক্ষার জন্য যে একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহা ব্যবস্থাপক সভায় বহুবার আলোচিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে যে অচিরে আমাদের আশা ফলবতী হইবে তাহা অনুমান করা যায়।

তবে কথা হইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ ভাবে প্রদান করা আবশ্যক তাহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পুঁথিগত বিদ্যা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা হয় বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে কৃষকের ছেলে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া আর লাঙ্গল ধরিতে পারে না, কামারের ছেলে লোহা পিটিতে লজ্জা বোধ করে, ছুঁতারের ছেলে বাটালি ধরা ভুলিয়া যায়, বণিকের ছেলে ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী শ্রেয় মনে করে। যে শিক্ষায় বালকগণের কার্য্যকরী বিদ্যা বর্দ্ধিত হয় সেরূপ কোন শিক্ষা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে নাই। কৃষকের ছেলেকে আধুনিক প্রণালীমতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, শিল্পীর ছেলেকে শিল্প শিক্ষা দেওয়া, বণিককে বাণিজ্যের রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইলে দেশের গরীব দুঃখীর ছেলেদের অনেক উপকার হয়, তাহা না হইলে কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যা বালকের কোমল মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার স্বরূত্তির অনুপযুক্ত করিয়া দিলে তাহাকে ভাববাৎ জীবনে বাধ্য হইয়া অন্নের জন্য লালায়িত হইবার পথে বসাইয়া দেওয়া হয়। কি প্রণালীতে চাষ করিলে অল্প ব্যয়ে অধিক শষ্য উৎপন্ন হইতে পারে, কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায়, কি প্রকারে সার প্রস্তুত করিতে হয়, কলের লাঙ্গল কি প্রকারে চালাইতে হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় কি এরূপ শিক্ষা প্রচলন করা অসম্ভব? এই বঙ্গের ভিতর নানা স্থানে নানা প্রকারের শিল্প কার্য্য হইয়া থাকে, সেগুলির বিশেষ বিবরণ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত নয় কি? বহির্বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গের অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ খবর আমরা কয়জন রাখিয়া থাকি বা সে সম্বন্ধে কি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি? যতদিন না আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা গরীব দুঃখীর ছেলেদের কার্য্যকরী শিক্ষার উপযোগী হয় ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা দেশের উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। আজ যে শত শত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র উপার্জ্জনাক্ষম হইয়া চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে তাহার প্রধান কারণ কার্য্যকরী শিক্ষা তাহাদের কিছু মাত্র হয় নাই, কেবলমাত্র অল্পশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কতকটা আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া কতকটা সামর্থ্যাভাবে স্বর্বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হয় না; এই জন্য সে সকল দেশের শিল্প, বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে আমাদিগকে টিকিয়া থাকিতে হইলে, আমাদেরও তাহাদের ন্যায় অবাধ প্রাথমিক শিক্ষা ও তৎসহ কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া চাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্।

আগমনী।

(১)

এস গো জননি বঙ্গে, ঢালি শান্তি সুধা রাশি,
তব আগমনে মাগো পুলকিত বঙ্গবাসী,
বিপুল পুলক-রঙ্গে,
এস মা শিবানি বঙ্গে,
উজল তরল বিভা ছড়া'যে অম্বর-পথে,
করুণা-ভকতি-প্রীতি লয়ে এস তব সাথে।

(২)

এস মা হৃদয়-বীণে তুলিয়া পূরবী তান,
আশীষের ঝারি হাতে, পুলকে নাচায়ে প্রাণ,
এস মা করুণা-রাণী,
পূজিব ও পা দু'খানি,
অশ্রুজল মিশাইয়ে ভকতি-কুসুম সাথে,
পূজিত তোমারে মাতা আজি এ শরৎ-প্রাতে।

(৩)

যুড়িয়া দুইটি কর তোমার চরণ-তলে,
দাঁড়াব আজি মা শিবে!—জীবনের জ্বালা ভুলে,
খুলিয়া অশান্ত প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
সাজা'ব চরণ-চারু ভকতি-কুসুম-হারে,
আয় মা, বাঙ্গালী তোরে ডাকে আজ সকাতরে।

(৪)

চরণ পরশে তব হাসিয়া উঠুক ধরা,
শোক-তাপ দূর করি মুছা মা' নয়ন-ধারা,
দৈন্য সব নাশ পা'ক,
অভাব ঘুচিয়া যা'ক,
হাহাকার ডুবে যা'ক আনন্দের কোলাহলে,
নাচুক সারাটি বঙ্গ আজি নব কুতুহলে।

(৫)

বরণ করিতে আজি তোমারে মা গীরিবালা,
বঙ্গবধূ সাজায়েছে যতনে বরণ-ডালা,
মণিময় কণ্ঠহার,
শোভে গলে অঙ্গনার,
শিমন্তে শোভিছে সিঁথি, শোভে দু'টি কানে দুল,
পূজিতে তোমারে তারা এনেছে ভকতি-ফুল।

(৬)

হৃদয়ে হৃদয়ে আজ কি পবিত্র সম্মিলন,
প্রীতি, ভক্তি, স্নেহে স্বর্গে পরিণত এ ভুবন,
অতীত ঘুচিয়া সবে,
কি আনন্দ কলরবে,
প্রবাসী-বাঙ্গালী আজ আবার ফিরিছে ঘরে,
আয় গো জননি বঙ্গে তিনটি দিনের তরে।

(৭)

মরম-মন্দার হ'তে তুলি পুষ্প ভকতির,
লয়ে এস বঙ্গবাসী দিতে পদে জননীর
পূত অশ্রুরাশি দিয়ে,
শ্রীচরণ ধোয়াইয়ে,
বসা'ব মায়েরে আজ হৃদয়-কুসুমাসনে
পুষ্পাঞ্জলী দিব সবে জননীর শ্রীচরণে,

(৮)

এস মা অপর্ণা দেবী হর্য্যক্ষ-বাহনে বসি,
প্রভায় উজলি বঙ্গ অমা তমিস্র নাশি,
পূত-ধান্য-দূর্ব্বাভারে,
শেফালি-কুসুম-হারে,
সাজা'ব জননী তব চরণ-কমল আজি,
পুষ্পাঞ্জলি দিব মাগো ভকতি-প্রসূন-রাজি।

(৯)

মিলন-রাগিণী মাগো হৃদয়ে উঠিছে বাজি,
দূরে গেছে আজি শত-ভীতি বাধা-বিঘ্নরাজি,
রজনী হয়েছে ভোর,
ভেঙ্গে গেছে ঘুম ঘোর,
জেগেছে বাঙ্গালী আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে,
পূজিতে মায়েরে তা'র সারাটি বরষ পরে।

(১০)

শরৎ-প্রভাতে আজ বিহগ বেহাগ গায়,
পরিমল-গন্ধ লয়ে বহিছে মলয় বায়,
এস মা হৃদয়-বৃন্তে,
একটি বরষ অন্তে,
আবার পূজিব তারা চরণ দু'খানি তোর,
আয় গো শঙ্করী বক্ষে মুছা মা নয়ন-লোর।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

ভাবের পূজা।

বাঙ্গালী কবি—বাঙ্গালী ভাবুক। ভাব-সাগরে অবগাহন করিয়া সে পূজায় বসিল—ব্রহ্মভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে আপনহারা হইয়া সমাধিস্থ হইল, ব্রহ্মময় হইয়া ভাব-সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কূল পাইল, সমাধি একটু একটু অপসারিত হইল, মনোবুদ্ধি আবার বিষয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিল কিন্তু তৃষা মিটে নাই, নেশা ছুটে নাই। প্রাণ যে সেই বস্তুকে মনোবুদ্ধির সাহায্যে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে চায়। তখন সাধক ভাবে বিভোর, সে ভাব গাঢ় হইয়া একটা অনুভূতি তখনও ভাবেতে মেশামিশি হইয়া পড়িয়াছে; সেই অনুভূতির সাহায্যে কল্পনা-সুন্দরী ভাবুকের প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সেই অনুভূতিকে লইয়া কল্পনা ভাবের উপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া একটী আদর্শ খাড়া করিতে লাগিল। ধ্যান-সমাধিতে যাহা, যে মাতৃভাবের অনুভূতি জাগিয়াছিল। সমাধিভঙ্গে সাধক কল্পনার সাহায্যে সেই মাতৃরূপ গড়িয়া তাঁহাকে মনের মত সাজাইয়া ফেলিল। পরের জন্য, পরকে দেখাইবার জন্য নয়, তখন প্রাণ যে প্রাণময়ী ছাড়া থাকিতে পারে না—তাই প্রাণের দায়ে, প্রাণে পরিতৃপ্তির জন্য, সেই ব্রহ্মময়ীর রূপ মাতৃভাবে গড়িতে লাগিল। ভাবুক বাঙ্গালীর ভাবসমাধি ভঙ্গের পর ভাবের ঘোরে এইভাবে মাতৃ-প্রতিমার উৎপত্তি হইল—ইহাই তাহার প্রতিমা-পূজা, এই প্রতিমা-পূজাই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব,—বাঙ্গালী হিন্দুর হিন্দুত্ব,—তাহাদের

পূজা-পার্ব্বণের মহা-মহত্ত্ব। আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশস্থিত ব্রহ্মবস্তু অনুভূতি-সাহায্যে চক্ষের সম্মুখে দেখিবার জন্য; সর্ব্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে অবলোকন করিবার জন্য, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য তখন তাঁহার মানস-মূর্ত্তির কল্পনা করা হইল। যিনি যথার্থ ভাবরাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছেন—ভক্তিভাব যাঁহার নিতান্ত প্রগাঢ়, সেইরূপ একনিষ্ঠ নিরাকারবাদীও ভক্তি-প্রাবল্যে তাঁহার প্রাণের দেবতার পদকল্পনা করিয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া ফেলেন, তাহার মধুর অধরে মৃদু হাসির রেখা দেখিয়া প্রাণে আনন্দলাভ করেন, ব্রহ্মের মানসমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কখন মা বলিয়া, কখন পিতা বলিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেন। এ সকল ভাব মানসকল্পনা সমুদ্ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাতৃত্ব, পিতৃত্ব বা সখীত্ব সাকার পিতামাতা বা সখাকে বাদ দিয়া কখন নিরাকারে প্রকাশ পায় না। এইজন্য নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে গেলেও কেহ কখন এই মানসকল্পনার হাত এড়াইতে পারেন না—এড়াইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে তত আনন্দ বা তৃপ্তি উপলব্ধি হয় না।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী এই ভাবে ব্রহ্মময়ীর রূপ কল্পনা করিয়া থাকে। ভাব-ভক্তি ও রসের দ্বারা বাঙ্গালী প্রতিমাপূজা করে, কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার সৃষ্টি হয় নাই। এইভাবে প্রতিমাপূজা করিয়াই বাঙ্গালী সাধনমার্গে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু যে সকল মূর্ত্তি বহুকাল হইতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাহাই পূজা করেন; প্রতিমা গড়েন না, ভাব ও সমাধি রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা প্রতিমাপূজা করিতে অনভ্যস্ত—ইহা বাঙ্গালীরই নিজস্ব। বেদান্তাদি শাস্ত্রে ত্রিবিধ উপাসনার ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে—স্বরূপ সম্পৎ ও প্রতীক। আত্মার উপাসনা—অর্থাৎ নিজের স্বরূপেতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করাকে স্বরূপ উপাসনা বলে। এই উপাসনা উচ্চ অধিকারীর জন্য নির্দ্ধারিত। একটীকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা অর্থাৎ কমলালেবুর আকার ভাবিয়া পৃথিবীর গোলত্ব চিন্তা অথবা সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভাবের ধারণা করাকে সম্পদুপাসনা কহে। আর ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব অন্য প্রকারে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে সেই ভাব ঘটপটাদিতে উপলব্ধি করার নাম প্রতীকোপাসনা। মূর্ত্তি কল্পনা করা এই সাধনার প্রাণস্বরূপ, যেমন সর্পে রজ্জুভ্রম।

আমাদের এই প্রতিমাপূজায় উক্ত তিন প্রকার উপাসনার মধ্যে একটীও ঠিকভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। তিনটী যেন একত্র মিশ্রিত হইয়া আমাদের এই পূজার ভাবে বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পরিস্ফুটনে বাঙ্গালী কৃতবিদ্য বলিয়াই, বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী ভাবুক, ভাবের ভাবে বিভোর হইয়া তাহারা যাহা করে, তাহারা যাহা গড়ে—তাহার তুলনা এ জগতে নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমরা যে সকল মূর্ত্তি পূজা করি, তৎসমস্তই ভাবের পরি-

স্ফুরণ, সাধকও এ বিষয়ের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন "সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।" ব্রহ্মবস্তু লাভ করিতে হইলে ভাবের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে কারণ তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। তিনি সকল রূপ বা সকল গুণের আধার। এই জন্য যে ভাব আমাদের ভাল লাগে, যে ভাবে আমরা বিভোর হই,মন যে ভাবে মজিতে ভাল বাসে, আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে গড়িয়া হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি।

দেহাত্মবুদ্ধি বা সংসার-ভাব আমাদের মধ্যে জড়িত, সংসারের যেটী ভাল, যে ভাবের আভাস পাইলে আমরা গলিয়া যাই, ঠিক সেই ভাবেই আমরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করি এবং তাহাতে সফলকামও হইয়া থাকি। পিতা-মাতা, কন্যা প্রভৃতির ভাব আমাদের নিকট বড় মধুর, বড় প্রীতিপ্রদ, হৃদয়ের বড় সন্তোষজনক, তাই আমরা ব্রহ্মকে উহার এক-রূপ না একরূপ ভাবে ধারণা করিয়া তাহার সহিত খেলা করি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে বৃন্দাবনে একদিন ভগবানের লীলামাধুরী প্রকাশিত হইয়া ব্রজবাসীকে ধন্য করিয়াছিল। আর এখন সাধক তাঁহাকে যে ভাবে আহ্বান করেন, ভক্তপ্রাণ ভগবান তাহাকে সেইভাবেই দর্শন দেন। জাগতিক বিপদাপদে পিতামাতার মত, শোকে দুঃখে বন্ধু-বান্ধবের মত, আমোদ-আহ্লাদে আত্মীয়-স্বজনের মত দর্শন দানে আমাদিগকে চরিতার্থ করেন। এই জন্য তিনি কন্যারূপে আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া-ছিলেন। পুত্ররূপে আসিয়া বসুদেব দেবকীর কারা-যন্ত্রণা মোচন করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তপস্যার পর সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে, বরপ্রদানে অভয় দিতে ও তিনি সাকার রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

ভগবান এক, অদ্বিতীয়; তবে সাধকের ভাব অনুসারে তাহাকে পৃথক্ পৃথক রূপে সংপূজিত হইতে হয়। এক ব্যক্তি যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সময়ে নানাপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করে, ভগবানও সেইভাবে কখনও সৃষ্টিশক্তি, কখনও পালনী-শক্তি, কখনও সংহারশক্তির দ্বারা আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। একই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম এইভাবে লীলাবিস্তার করেন। উপাদান কারণে তিনি মাতৃরূপা, নিমিত্ত কারণে তিনি পিতৃস্বরূপ। ব্রহ্ম—পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক; পুরুষ অংশটী নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি অংশটী যাবতীয় ক্রিয়া এবং গুণসম্পন্ন। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাংশের বক্ষে থাকিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী শক্তি জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন—ইহাই শিবের উপর শ্যামামূর্ত্তির অধিষ্ঠান।

মা কথাটী নাকি আমাদের বড় মধুর, শোকের দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদাপদের সহায়—এইজন্য ব্রহ্মে মাতৃভাব আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করি, আজ আমাদের সেই দিন, মা বিশ্ব-জননী কন্যাভাবে মাতৃভাবে বাঙ্গালীর চিত্তপটে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, এতদিন এ চিত্তভূমি কত প্রকার মালিন্য রেখায় বিচিত্রিত ছিল—এখন ভাবের বন্যায় তাহা ধুইয়া মুছিয়া এক প্রকার

পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজ্‌ হা হইতে মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ এত উজ্জ্বল, এত শোভাময়! এস ভাই! শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তগণ আজ ভাবের ঘোরে অন্তরের অন্তস্থল হইতে ভাবকূপের উৎস তুলিয়া ভাবময়ী ভব-ভবানীর পূজায় ব্রতী হই। মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভাদি দৈত্য বিনাশের জন্য একদিন দেবতাবৃন্দ নিজ নিজ শক্তি প্রদানে ভাবের প্রভাবে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে রাবণ-বধের জন্য যেকালে দেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

আজ শরৎকালের সেই শুভ বাসর সম্মুখে সমুপস্থিত, কর, বাঙ্গালী, মহামায়ার উদ্বোধন কর, বঙ্গ-বরাঙ্গণা অঙ্গনে আলিপনা প্রদান করিয়াছেন, মঙ্গলঘট সম্মুখে সুসজ্জিত, আজ মঙ্গলময়ী মাকে কাতরে আবাহন করিয়া মণ্ডপে অধিষ্ঠিত কর। চির চৈতন্যময়ী মা—তোমাদের ভাবে অচৈতন্য ছিলেন—তোমরা চৈতন্য লাভ করিয়াছ—তোমাদের চির প্রসন্নময়ী মাও আজ অনুকূল হইয়াছেন, হৃদয়-গৃহদ্বারে আসিয়াছেন—ভক্তি-অর্ঘ্য দানে, স্বাগত সম্ভাষণে—মণ্ডপে বসাও, পূজা কর, ধন্য হও, তাপত্রয় হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়া বল—প্রপন্নার্ত্তি হরে দেবি—প্রসীদ প্রসীদ পরমেশ্বরি।

সম্পাদক।

দেবতত্ত্ব।

(শেষাংশ)

দেবগণ নিত্যভাবে, ভূলোক ব্যতীত আর সকল লোকেই থাকেন। আমাদের যেমন যতবার মানবজন্ম হইবে প্রত্যেকবারেই এই পৃথিবীতে জন্ম লইতে হইবে, দেবতাদের পক্ষে সেরূপ বিধি নাই। তাঁহাদের পক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ পৃথিবী ব্যতীত চন্দ্রলোক, মঙ্গললোক, বুধলোক, বৃহস্পতিলোক, শুক্রলোক, শনিলোক ও সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বত্রই তাহাদের অবাধগতি ও বাসস্থান আছে এবং কার্য্যবশতঃ যাতায়াতও করিতে হয়। আমাদের পক্ষে অর্থাৎ মানবজাতির পক্ষে পৃথিবী মাত্র মানবদেহে অর্থাৎ স্থূলদেহে বাস করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থল, দেবজাতির পক্ষে সপ্তগ্রহ সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড নির্দ্দিষ্ট বাসস্থল বলিতে হইবে।

যে সকল দেবতাগণ সৃষ্টিকার্য্যে ও পৃথিবীর পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি, ইহারা ব্যতীত আরও অসংখ্য দেবতা আছেন, তাঁহাদের সংবাদ আমরা পাইতে পারি না, কচিৎ কখনও কোন সাধক এরূপ কোন দেবতার দর্শন পাইয়া থাকিবেন, ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের উপায় নাই, ইহারা এত উচ্চলোকে থাকেন যে, মানবজাতির কেহই এখন সেইস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যোগ্য হয় না।

চলিত কথায় দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটী বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সংখ্যা আরও বেশী হইবে। সৃষ্ট-পদার্থ মধ্যে পশুজাতি যেমন অসংখ্য, মানবজাতির যেমন গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, সেইরূপ দেবজাতির সংখ্যা পাওয়া দুষ্কর, তবে তাঁহারা যে তেত্রিশ কোটীরও বেশী হইবেন, একথা যাঁহারা সাধন-

মার্গে উন্নতি লাভ করিয়া দেবগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনজনিত জ্ঞান হইতে বলিতেছেন।

মানবজাতির ক্রমে ক্রমে কিরূপে উন্নতি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে যাইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম তিনটি অবস্থায় মানবাত্মার তিন শ্রেণীর মৌলিক ধাতুরূপে (elements) পুনঃপুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। চতুর্থ অবস্থায় এই আত্মা যৌগিক কোনরূপ দানাবদ্ধ (crystal) খনিজ পদার্থ অবস্থায় উন্নতি লাভ করে, ইহার পর এই আত্মাকে উদ্ভিদ অর্থাৎ লতা-বৃক্ষ অবস্থায় জন্ম লইতে হয়, তৎপরে বহু জন্মের পর ঐ অবস্থা ত্যাগের সময় মানব আত্মা পশুজন্ম লাভ করে। এই পশু অবস্থায় এক এক পশুর এক এক আত্মা থাকে না। অনেকগুলি এক জাতীয় পশুকে লইয়া একটী আত্মা থাকে। বহুকাল পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পশুজন্ম লাভ করিয়া শেষে গৃহ-পালিত পশু হইয়া মানবের তত্ত্বাবধানে আসিয়া কয়েক জন্ম লইবার ফলে পশুর ব্যক্তিত্ব, বা আমিত্বভাব জন্মাইলে তবে তাঁহা-দের মানবজন্মে উন্নতি হয়। তখন এক এক মানব এক এক আত্মাযোগে থাকে। আমা-দের বর্ত্তমান মানবজাতির অধিকাংশই যখন পশু জন্মে ছিল, তখন আমাদের পৃথিবীতে প্রাণস্রোত প্রবাহিত ছিল না। তখন চন্দ্র-লোকে মানবজাতির বাস ছিল অর্থাৎ প্রাণ-স্রোত তখন চন্দ্রলোকে, এবং আমরা পশু অবস্থায় চন্দ্রলোকে ছিলাম। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সময় আমরা মানবত্ব লাভ করিয়া অতি অসভ্য ও মনহীন তরল মায়াময় দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে প্রথম মানব-জাতিরূপে আমরা জন্ম লইতে থাকি। ক্রমে মানবদেহের দৃঢ়ত্ব হইতে লাগিল, গঠনের সৌষ্ঠব বাড়িতে লাগিল। মানসপুত্রগণ ও চন্দ্রলোক, শুক্র-লোক প্রভৃতি স্থানের উন্নত মুক্ত মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিবার জন্য কৃপা করিয়া, নিজেদের সাধন-ফলের অক্লান্ত সুখ ভোগ অনায়াসে ছাড়িয়া দিয়া মানবজাতির মধ্যে জন্ম লইলেন।

কেহ নির্মাণকায় গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিতে লাগিলেন, মানসপুত্রগণ মানবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানবের মন হইয়া রহিলেন। এইরূপে আমরা মানবজাতি ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উঠিলাম, আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিলাভ করিয়া ঐরূপে নিজের সুখভোগের সুযোগ ত্যাগ করিয়া মানব-জাতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

কল্পান্তকালে আমাদের মানবজাতি হইতে অনেক মুক্ত ঋষি প্রভৃতি উন্নত অবস্থার মানব হইয়া উঠিবেন। ইহাদের মধ্যে অনেককে অপর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্যে ও পালনকার্য্যে সহায়তা জন্য নিযুক্ত করা হইবে। ব্রহ্মাণ্ড অধিপতিত্ব, পৃথিবী অধিপতিত্ব, সৃষ্টি সহায়তা-কারী ও জগৎব্যাপার পরিচালনে নিযুক্ত দেবত্ব, ঋষিত্ব, এই সকল পদ আমাদের মানবজাতির মধ্যে অনেকেই তখন সেই নূতন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাইয়া লাভ করিবেন। মানব-

জাতির মধ্যে যাঁহারা মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গতি হইতে থাকিবে। মানবজাতির উন্নতিমার্গে এইরূপ এতদূর পর্য্যন্ত অধিকার।

দেবজাতির সম্বন্ধে এইরূপ উন্নতির ক্রম আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা নিজেদের হীনাবস্থা বশতঃ বড় বেশী তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই, উচ্চ উচ্চ লোকের দেবগণ ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জানা মানবের পক্ষে দুরাশা মাত্র। তবে যতদূর জানিবার উপায় আছে—তদনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, দেবগণ সৌরমণ্ডলের পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য লোকের মানবজাতি হইতে দেবতা-শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন। এই সকল মানবজাতির মধ্যে কোনটীর উন্নতি আমাদের অপেক্ষা কম কোনটীর বা আমাদের অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই দেবত্বলাভের উপযোগী অবস্থায় উঠিয়াছেন। আবার ইহাও সত্য যে, অনেক দেবতা কখনও মানব জন্ম দেবতা হইবার পূর্ব্বে লাভ করেন না, তাহাদের ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে তাঁহারা ধাতু হইতে মানব পর্য্যন্ত এই সাত শ্রেণীর মধ্য দিয়া দেবত্ব লাভ করেন না। মানবের উন্নতির সীমা অনেকটা জানা গিয়াছে, কিন্তু দেবগণ আরও বেশী উচ্চে উঠিবেন অনুমান করা যায়, কিন্তু সে সকল উচ্চ অবস্থা যে কি তাহা ধারণায় আনা যায় না! দেবযোনি হইতেও সময় সময় দেবত্ব লাভ হয়। মানবদের মধ্যেও কেহ কেহ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবযোনি দেবত্ব লাভ করিয়া কামদেব শ্রেণীতে থাকেন। কিন্তু মানবগণ মুক্তিলাভের অধিকারী হইলে তাঁহার পক্ষে সাতটী পথ মুক্ত থাকে, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোনটি লইতে পারেন। যিনি দেবত্ব ইচ্ছা করেন, তিনি দেবগণের নিম্ন শ্রেণীর উপর চতুর্থ শ্রেণীর দেবত্ব একবারে প্রাপ্ত হয়েন।

দেবগণ যেমন ভূলোক ব্যতীত অন্য সকল লোকে বাস করেন তদনুসারে তাহাদের সেই লোক সংক্রান্ত পদার্থ গঠিত দেহও থাকে। ভুবলোকে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের ভুবর্লোকীয় জলতত্ত্ব-ঘটিত পদার্থ নির্ম্মিত দেহ। ভুবলোককে কামলোক কহে, একারণ এই লোকবাসী দেবতাদের কামদেব-শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গলোকের নিম্নস্তরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের রূপদেব কহে, স্বর্গলোকের উচ্চস্তরে এবং মহ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি লোকের দেবতাদের অরূপদেব আখ্যা, ইহাদের উপর দিকপাল নামক দেবগণ আছেন কামদেবগণের মধ্যে সকলেই মানবজাতির অপেক্ষা অধিক উন্নত নহেন। তবে গড় হিসাবে ধরিলে ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মানবজাতির অপেক্ষা অধিক উন্নত। অনেক মানবেও ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন। কামদেবগণ পৃথিবীতে বড় একটা প্রকাশ হন না, তাঁহারা আমাদের পৃথিবীর ব্যাপার বড় একটা খবরে আনেন না। দৈবাৎ কোন বিপন্ন ব্যক্তির বিপদে তাঁহারা দয়ার্দ্র হইয়া পড়িয়া কোন কোন কামদেব

কাহারও কাহারও উপকার করিয়াছেন। আমরা যেমন কোন পশুকে বিপন্ন দেখিলে কোন সময় তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকি, সেইরূপ ভাবে কামদেব কর্ত্তৃক কচিৎ আমরা উপকৃত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে অবস্থায় উঠিয়াছি তাহাতে কামদেবগণ কর্ত্তৃক আমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ হইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না, এইজন্যই উক্তরূপ বিধান। সদ্‌গুরুগণ কামদেবগণের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন, ইন্দ্রজাল ও ভেল্কি ইত্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ইঁহাদের আকর্ষণ করা যায়। দিকপালগণের উপর আরও তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে, তাঁহাদের উপর আমাদের পূর্ব্বকথিত অধিপতি দেবতাসমূহ।

দিকপালগণকে শাস্ত্রে দেবরাজ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা দেবতাদের উপর রাজত্ব করেন বলিয়া ইহাদের দেবরাজ নাম নহে। ইহারা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের এবং এই পঞ্চভূতঘটিত লোকসমূহের উপর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

দিকপালগণের অধীনে এক এক শ্রেণীর দেবযোনি রহিয়াছেন। পূর্ব্বদিকের দিকপাল তাঁহার নাম ধৃতরাষ্ট্র—তাঁহার দেবযোনি গন্ধর্ব্বগণ, তাঁহার বর্ণ শ্বেত। লিপিকা নামক দেবগণ মৃত ব্যক্তির ভুবর্লোক বাস শেষ হইবার পর তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম সকল ওজন করিয়া ভবিষ্যৎ লিঙ্গদেহের ছাঁচ প্রস্তুত করেন। দেবরাজগণ অর্থাৎ দিকপালগণ পঞ্চভূতের অধিপতি সুতরাং আবশ্যক মত পঞ্চভূত দিয়া ভাবিজন্মে মানবের লিঙ্গদেহ যেরূপ হইবে সেইরূপ গঠন করেন। ইহারা ইচ্ছামত মানবদেহ ধারণ করিতে পারেন ও অনেক সময় এইরূপ দেহ ধরিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে যে সকল দেবগণ জগৎ ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন বলিয়াছি, অগ্নিপ্রজ্বলন হইতে নদীবহন, শস্য উৎপাদন, জীবজন্তুর বর্ণবৈচিত্র্য করণ প্রভৃতি কার্য্য যে সকল দেবগণ করিয়া থাকেন তাঁহারা এই দিক্‌পালগণের আদেশে ও অধীনস্থ কর্ম্মচারী ভাবে করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য দায়িত্ব এই দিক্‌পালগণের হইতেছে।

লোকপাল বলিয়া আর এক শ্রেণীর দেবতাগণ আছেন। ইহারা এক এক লোকের শাসনকর্ত্তা। ভুবর্লোকের কর্ত্তার নাম বিশ্বদেব। ইনি ভুবর্লোকে জীবগণকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধে এই বিশ্বদেবের পূজা হয়, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ পর্ব্বদিনে করিতে হয়। পর্ব্বদিনে বিশ্বদেব মানবদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য দিন ধার্য্য করিয়াছেন। এইজন্য এইদিনে শ্রাদ্ধ করিয়া বিশ্বদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, আপনি আমার অমুককে কৃপা করিয়া ভুবর্লোকের কষ্টদায়ক প্রেতলোক হইতে ভুবর্লোকের সুখদায়ক অংশ পিতৃলোকে পাঠাইয়া দিন, অথবা উহাকে ভুবর্লোক হইতে স্বর্গলোকে মুক্ত করিয়া দিন। পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের এই উদ্দেশ্য, এইজন্যই এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে জানিতেছি যে,দেবগণ ভূলোকে থাকেন

না। ভূলোকে থাকিতে হইলে ভূলোকবাসীদের মত দেবগণের স্থূলদেহ থাকা চাই, স্থূলদেহ-ধারী দেবদেহ নাই, কাজেই ভূলোকে দেব-গণের বাসস্থান হইতে পারে না। তবে স্থানে স্থানে মন্দির আদিতে দেবতাদের পূজাদি হইয়া থাকে ও তাঁহাদের মূর্ত্তি গঠিত থাকে দেখা যায়,এসকল কাহার স্থান,এই সকল স্থানে কি কোন দেবতা থাকেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দেবগণ মন্দিরাদি মধ্যে ও তীর্থাদি স্থলে লীলারূপে রহিয়াছেন। তাঁহাবা উচ্চলোকস্থিত তাঁহাদের স্বরূপ লইয়া উচ্চ-লোকেও রহিয়াছেন, সেই স্বরূপটী তাঁহার নিত্যরূপ, আবার ভূলোকে মন্দিরাদি মধ্যে একটী লীলারূপ ধরিয়া এখানে চিরবিরাজ করিতেছেন। এক সময় একের অধিক স্থানে থাকিবার শক্তি দেবগণের আছে—এক সময়ে নানা মূর্ত্তি ধরিয়া নানা স্থানে তাঁহারা প্রকাশ হইতে পারেন। থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর মধ্যে কোন কোন মহাত্মাদের শিষ্যগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সময় সময় এমন ঘটিয়াছে যে তিনি ঘরের ভিতর চেয়ারে বসিয়া লিখিতে-ছেন, অথচ দেখিতেছেন যে তিনিই আবার নিজমূর্ত্তিতে বাটীর সংলগ্ন বাগানে দাঁড়াইয়া একটী ফুলগাছের ফুল দেখিতেছেন, তিনি কি তবে দুইটী হইলেন? অথচ বাগানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিতেছেন তাহা চেয়ারে বসিয়া তিনি নিজে দেখিতেছেন মনে হইতেছে। এইরূপে একই সময়ে একাধিক স্থানে থাকিবার ও দৃশ্য দেখিবার ও কার্য্য করিবার শক্তি উচ্চ অবস্থায় উঠিলে সাধকদেরও হইয়া থাকে। এইরূপেই জ্ঞানশক্তির প্রসার হইয়া থাকে।

দেবতাগণ নিত্যরূপে অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিকরূপে, অর্থাৎ কোথায় কোনরূপ ধরিয়া না থাকার সময় যেরূপে তাঁহারা থাকেন সেইরূপে তাঁহারা আমাদের পৃথিবীতে আসেন না ও থাকেন না। পৃথিবীতে কোন একটি মূর্ত্তি নিজে সৃষ্টি করিয়া তাহা দেহরূপে ধারণ করিয়া তন্মধ্যে থাকেন। মানুষে কাষ্ঠ প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা যে মূর্ত্তি গঠন করে তাহার মধ্যেও থাকেন, অথবা কেবল তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহের কণামাত্র অংশে অলক্ষিতে দেবগৃহ-মধ্যে থাকিয়া যান, সেইস্থলে শিলা, ঘট প্রভৃতিকে সেই শক্তির আধার বলিয়া পূজা করা হয়, তাঁহারাও পূজা গ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতে পারে তাঁহারা কেন উচ্চলোক ছাড়িয়া এই স্থূল পৃথিবীমধ্যে এক প্রকার আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যাইতে ইচ্ছুক হন, এ তাঁহাদের কিরূপ ইচ্ছা, কিরূপ লীলাখেলা? যে স্থানে মন্দিরাদিতে লীলাভাবে দেবশক্তি রহিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে বহুপূর্ব্বে কোন না কোন সাধক তথায় উগ্র সাধনার দ্বারা সেই দেবতার শক্তি ও সেই দেবতাকে সেইস্থানে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে আবির্ভাব কালে সাধক বর প্রার্থনা করিয়া দেবতাকে উক্ত স্থানে নিত্য থাকিবার জন্য প্রতিশ্রুতি করিয়া লইয়া থাকিবেন, সেই প্রতিশ্রুতি জন্য অনেক অনেক স্থানে দেবতা-গণকে এক অংশে ভূলোকে থাকিয়া যাইতে হইয়াছে, এইরূপ আংশিক থাকায় তিনি

পূর্ণরূপে উচ্চলোকে যেমন ছিলেন তথায় কিছু শক্তির কম পড়ে নাই, কাজেই এরূপে থাকায় দেবতাদের ক্ষতি কিছুই হয় না।

কোন দেবতার দেহ বা তাহার অংশ কোন স্থানে থাকার জন্য সেই স্থানে দেবশক্তি সর্ব্বদাই প্রকাশ থাকে। সতীদেহের অংশ সকল নানাস্থানে পড়িয়া যাহার স্থানে পীঠস্থান হইয়াছে। স্থান বিশেষের অবস্থা ভাল বলিয়া তথায় অতি অল্প চেষ্টায় দেবশক্তির প্রকাশ করা যায়। এই সকল স্থানে সাধক-মণ্ডলী ক্রমাগত সাধন করিয়া দেবশক্তি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া এই সকল স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। নিয়ত সাধু, মহাত্মা গৃহস্থ সকলেই ঐস্থানে সাধন ভজন করা জন্য ঐস্থানের শক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে। কোন কোন দেবতা দয়ার্দ্র হইয়া জীবের উপকার জন্য ইচ্ছা করিয়া কোন স্থানে থাকিয়া যান। সিলোন দ্বীপে Adam's Peak নামক স্থানে জনৈক উচ্চ-শ্রেণীর দেবতা বহুকাল হইতে স্বইচ্ছায় রহিয়াছেন। গঙ্গানদীর জল এরূপ দেবশক্তিতে পুরিত হইয়াছে যে, হরিদ্বার হইতে সাগর পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের জল আজ পর্য্যন্ত অতি অদ্ভুত দেবশক্তিতে মিশ্রিত রহিয়াছে এবং এইভাবে কতকাল থাকিবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কালীঘাটে দেবীদর্শন করিয়া একদিন মনে ভাব আসিল এখানে আসায় কি ফল, লোকে এই কৃত্রিম মূর্ত্তি দেখিতে কেন আসে। একটা বিকট মুণ্ড বসান, তলদেশে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছে। সৌন্দর্য্য কোথায়, আর ইহাতে ফলই কি? এইরূপ ভাবিয়া মনে স্থির করিলাম এস্থানে আসা উচিত নয়, এইরূপে লোকে অর্থ উপায় জন্য সাজাইয়া যে মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে তাহাতে দেবত্ব কেন আসিবে এই ভাব লইয়া প্রায় একবৎসর থাকিলাম, কেহ কালীঘাট যাইবে শুনিলে তাহাকে উক্তরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। এমন সময় আমার ভূতপূর্ব্ব গুরুদেব আমাদের বাটীতে আসিলেন। তিনি বলিলেন আমি বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালীঘাটে কালীমাতাকে দর্শন করিয়া বরাবর আসিতেছি। পরে আহারাদি করিয়া বিশ্রামান্তে আমাকে বলিলেন, দেখ, কালীমাতাকে দর্শন করিয়া বাহিরে বারাণ্ডায় বসিয়া নাম করিতেছিলাম এমন সময়ে কালীমাতা আমাকে বলিলেন যে "তুই বলিস্ আমি এখানে আছি।" আমি বলিলাম "মা তুমি এখানে আছ একথা কি কেহ জানে না, যে আমাকে প্রচার করিতে হইবে।" মা বলিলেন "তুই বলিস।" ইনি হাকোলায় আমার বাটীতে আসিবার ইচ্ছা করিয়া কালী দর্শনে গিয়াছিলেন। তেমন সময় তিনি এই যে মার আদেশ পাইলেন তাহা আমাকে বলিবার জন্যই তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন আমি বুঝিতে পারিলাম, এবং মার নিকট এতদিন অবিশ্বাস থাকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। মার আদেশে বিশ্বাস করিতে হইল যে, কালীঘাটে তিনি আছেন। প্রত্যেক পীঠস্থানেই মা বিরাজ করিতেছেন,

একথা কাজেই বিশ্বাস করিতে হয়।

পাবনা জেলায় তড়াসের জমীদার ভক্ত বনমালীবাবুর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাদের বাটীতে রাধাবিনোদ নামে একটী পৈতৃককালের বিগ্রহ ছিলেন, এক্ষণে নাকি বনমালী বিগ্রহটীকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছেন। এই বিগ্রহটী নাকি একটী ব্রাহ্মণ নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নদীতে স্নান করিবার সময় ব্রাহ্মণটী শুনিতে পাইতেন "তুমি আমাকে তোল।" এইরূপ কয়েকদিন শুনিবার পর ব্রাহ্মণটী একটী কাষ্ঠময় বিগ্রহ নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। কোনরূপে এই বিগ্রহটী বনমালী বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ বাটীতে আনিয়া স্থাপন করেন। পরে এই বিগ্রহের পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোকের কাষ্ঠমূর্ত্তি গড়াইয়া দাঁড়-করাইয়া দিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটীকে বিগ্রহের স্ত্রীরূপে পূজা করা হইত। আমার ভূতপূর্ব্ব গুরুদেব যে সময় বনমালী বাবুর বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, তৎকালে বিগ্রহ দুইটী বেশভূষায় সজ্জিত কাষ্ঠনির্ম্মিত দুইটী স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি রাত্রে ঠাকুর বাটীর উঠানে ধূনী জালাইয়া বসিয়া আছেন, অধিক রাত্রে দেখিলেন ঠাকুর ঘরের ভিতর একটী চেলির কাপড় পরা স্ত্রীলোককে ঠাকুরটী কোলে করিয়া লইয়া শয়ন করি-লেন। পরদিন তিনি বনমালী বাবুকে দেবগৃহে উক্তরূপ দর্শন করার বিষয় বলাতে বনমালী বাবু বলিলেন আপনি ঠিকই দেখিয়া-ছেন। পূর্ব্বে আমাদের বাটীর স্ত্রীলোকগণ প্রত্যহ রাত্রে বিনোদ বিগ্রহটীকে শয্যার উপর শয়ন করাইতেন এবং পার্শ্বস্থিত রাধা মূর্ত্তিটীকে বিনোদের কোলে শয়ান করান হইত, তৎ-কালে উহাদের বেশভূষা খুলিয়া শয়ন করান হইত ও ভিতরে যে চেলী পরাণ আছে তাহাই মাত্র থাকিত। ইদানীং আর কেহ প্রত্যহ ওরূপ করিতে সময় পায় না। বোধ হয় উহারা আপনারাই শয়ন করিয়া থাকেন। এইখানে বনমালী বাবু বলিলেন বিনোদের পার্শ্বে যে রাধামূর্ত্তি রহিয়াছেন উনি আমাদের বংশেরই কন্যার মূর্ত্তি। কন্যাটী কুমারী অব-স্থায় ঠাকুর ঘরে যাইলেই ঠাকুর তাঁহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিতেন ও বলিতেন আমি তোমাকে বিবাহ করিব। এরূপ কিয়ৎকাল যাইলে একদিন দেখা গেল যে বালিকাটী মৃতা-বস্থায় ঠাকুর ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। রাত্রে স্বপ্ন হইল, বিনোদঠাকুর বলিতেছেন "আমি বালিকাটিকে বিবাহ করিয়াছি, তোমরা একটী কাষ্ঠের মূর্ত্তি গড়াইয়া আমার পার্শ্বে বসাইয়া দিও ও আমার সহিত উহার নিত্যপূজা করিও। সেই অবধি বিনোদের মূর্ত্তির পার্শ্বে এই বালিকাটীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, এবং রাধা ও বিনোদ ভাবে উভয়ের নিত্য পূজা হয় ও বাটীর মেয়েরা সন্ধ্যা আরতি ভোগের পর বিনোদকে রাধার সহিত শয়ন করাইয়া দেয়।

বুঝা গেল ঠাকুরকে বাটীর স্ত্রীলোকগণ শয়ান করাইয়া না দিলেও তাঁহারা আপনারা উপরের পোষাক খুলিয়া চেলী মাত্র দেহে রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষ ভাবে রাত্রে শয়ন করিয়া থাকেন, স্বামীজীকে দয়া করিয়া ইহা দেখাইয়া-ছিলেন। পরদিন রাত্রে রাধা এবং বিনোদ

দুইজনেই উঠানে স্বামীজীর সম্মুখে আসিয়াছিলেন ও স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিলেন, আপনারা দেবতা, আমি মানব, আমাকে আপনাদের প্রণাম করা উচিত হয় না। বিনোদ বলিলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আমরা গৃহী, এ কারণ আমাদের আপনি নমস্য। দেবতাগণ নানাস্থানে এইরূপে লীলাভাবে থাকেন। আমরা আমার গুরুদেব স্বামীজীর নিজ মুখে এই কথা শুনিয়াছি, ঘটনা সত্য।

বুদ্ধগয়ার যেস্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন তথায় সংপ্রতি আনিবেশান্ত ও একজন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ বালক গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বালকটী লিখিতেছেন, এইস্থানে একটী প্রস্তরোপরি বসিয়া স্থিরভাবে বুদ্ধদেবের বিষয় একটু চিন্তা করিতেই আমার দৃষ্টি খুলিয়া গেল, আমি দেখিলাম যে এই স্থানটী কতদূর ব্যাপিয়া এক প্রকার জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছে, এই জ্যোতিঃ উজ্জ্বল ও নানাবর্ণের। এই জ্যোতিঃতে অনেক দেবগণ স্নান করিতেছেন। সেই মহাপুরুষ এই স্থানে মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই জ্যোতির্ম্ময় শক্তি এইস্থানে তদবধি রহিয়া গিয়াছে, এই জ্যোতিঃমধ্যে কেহ সামান্য একটু মনঃস্থির করিয়া বসিতে পারিলেই অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাইবেন ও তাহার সাধনপথে অনেক উন্নতি হইবে, অনেক গুপ্তদ্বার খুলিয়া যাইতেও পারে। মহাপুরুষদের তপস্যাস্থান এইরূপে তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ও সেই স্থানের মাহাত্ম্য যাঁহার বুঝিবার চেষ্টা আছে তিনিই বুঝিতে ও দেখিতে পারেন, ইই সকল স্থানে দেবতাগণও বাস করেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্।

কবি-জীবন।

বাহ্যজগতের অসার অতুল ধনৈশ্বর্য্যের ক্ষণিক অধিপতি ধনী। সাহিত্যরূপ কাব্যরত্নের সারভূত পরমৈশ্বর্য্যের চির অধিপতি একমাত্র দীন ভিখারী। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একমাত্র ইতিহাস আমাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অতীতের জ্বলন্ত কাহিনী জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে। প্রাচীন যুগ হইতে অদ্যাবধি যত কবির আবির্ভাব হইয়াছে প্রত্যেকেই পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষান্ন-জীবী ও পরান্ন-পোষিত। কবির সহিত দরিদ্রতার যেন চির মিত্রতা, কতই যেন নৈকট্য সম্বন্ধ।

সংসারে দারিদ্রের দাবানলরূপ অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কবিগণ যেরূপ শান্তিতে অবস্থান করেন, সেরূপ শান্তি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর অনুভব করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যখন কবিগণ কল্পনারাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় ভাব-সাগরে সুখে সন্তরণ করিতে থাকেন, তখন তাহারা বাস্তবিক জড়জগতের অস্তিত্ব হারাইয়া যেন কোন এক নবীন স্বর্গ-রাজ্যের শান্তিময়-ধামে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, এইরূপ শান্তি, এপ্রকার সুখময় সৎচিন্তা কবি ভিন্ন কাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে?

সাহিত্যিক জীবনে সুখ বড় অল্প নয়। সাহিত্যিকের জীবন বড়ই মধুর আনন্দময়। রাজাধিরাজ সম্রাটের স্বর্ণ সিংহাসন অপেক্ষাও কবি ও সাহিত্যিকের আসন উচ্চে অবস্থিত। ধনিগণ অনুজীবী ও তোষামোদকারী কর্ত্তৃক পরিচর্য্যিত হইয়া থাকেন,—কিন্তু প্রকৃতি দেবী স্বয়ং যাচিয়া কবি ও সাহিত্যিকের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হয়েন। ধনী রসনা পরিতৃপ্তিকর নানা উপাদেয় ভোজনে ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি পরিধানে এবং নানা স্বর্ণলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নে সুরম্য হর্ম্মে বাস করিয়া যত না আনন্দ অনুভব করেন, কবি বা সাহিত্যিক ভিক্ষালব্ধ কদর্য্য শাকান্ন ভোজনে তরুতলে বাস করিয়া ততোধিক আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। নানা তৈজসপূর্ণ বিবিধ রত্নখচিত আসবাবে ধনীর মন যেমন আকৃষ্ট —প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সন্দর্শনে কবির প্রাণ ততোধিক উৎফুল্ল। সংসারের কৃত্রিম বস্তুতে ধনীর মন যেমন মুগ্ধ, স্বভাব জাত অকৃত্রিম দ্রব্য নিচয় দর্শনে কবি ততোধিক বিভোর। ধনী যেমন কৃত্রিমের উপাসক, কবি তদ্রূপ প্রকৃতির পূজক। যাহা হউক—অতি বৃদ্ধ দরিদ্র বাল্মিকী হইতে ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, আধুনিক হেমচন্দ্র, মধুসূদন, প্রত্যেকেই ভোগসুখবিতৃষ্ণ দীন দরিদ্র।

সংসারে যে ব্যক্তি প্রকৃত গরীব—তিনিই কবি—অথবা যে ব্যক্তি প্রকৃত কবি—তিনিই গরীব। পরন্তু কেবল লোকতঃ গরীব হইলেই কবি হওয়া সম্ভবপর নহে। কেন না সংসারে গরীবের অপ্রতুল নাই—কিন্তু প্রকৃত গরীব অথবা প্রকৃত কবির অভাব অত্যধিক। বিবিধ বিলাস-ভোগ্য-বস্তু পরিপূরিত মনোহর সংসাররূপ পণ্য-বীথিকার অধিকারী হইয়াও যে ব্যক্তি অকাতরে অম্লান বদনে ঐহিক ভোগ-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারেন, দুর্ব্বিসহ বুভুক্ষা বৃত্তির অনুমাত্র তৃপ্তি বিধান না করিয়া যিনি সহাস্য বদনে সম্মুখের অন্নগ্রাস অন্নক্ষুধাতুরের বিষণ্ণ বদনে তুলিয়া দিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত না হন, মূল কথা—এত সুখের ভোগদেহ ধারণ করিয়া যিনি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া কামভোগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে গরীব হইতে ইচ্ছা করেন, নিরন্ন নিরসনে শরীর বিশীর্ণ করিয়াও যে ব্যক্তি মধুকর সদৃশ প্রতিনিয়ত পরার্থপরতাকে জীবনের একমাত্র মহাব্রত মনে প্রাণে সঙ্কল্প করিয়া তদ্-উদ্‌যাপনে ব্যস্ত হয়েন তিনিই ত প্রকৃত গরীব—সেই ব্যক্তিই ত যথার্থ কবি। সেই ব্যক্তিই মানব-সমাজের আদর্শ-স্থানীয়। ধন্য কবি-জীবন! তোমার কল্পনা-প্রসূত কাব্য-সুধা অতি মাত্র অধমাত্মাকেও অমরত্বের অধিকারী করিয়া তুলে।

এইরূপ দরিদ্র কবি বাহ্য জগতের একান্ত অনুগত হইয়াও অন্তর্জগতের রাজাধিরাজ সম্রাট সদৃশ। মরণশীল হইয়াও চির জীবিত আরাধ্য অমর। সদ্যঃ প্রাণসংহারক হলাহল হইয়াও মৃত সঞ্জীবনী-সুধা, ঘৃণাকারজনক পুরীষ-কুণ্ডের নিকৃষ্টতম ক্রিমি-কীট হইয়াও অপার্থিব নন্দন-কাননের অমরানন্দবর্দ্ধন পরিশ্রান্ত মধুকর। যে ব্যক্তি বাহ্য জগতে

অত্যধিক সংলিপ্ত অথচ প্রত্যেক বিষয়ে উদাসীন, সেই ব্যক্তি লৌকিক কবি। আমরা তাহার নিকট চির-ঋণী। তিনি লোক-সমাজের প্রকৃত নিয়ন্তা—শিক্ষাদাতা। তাহার কাব্যরূপ নিরুপম শিল্প চাতুর্য্যময় দিব্য যন্ত্রে অক্লেশে পরিচালিত হইয়া মানব-সমাজ অব্যাহত থাকে,নচেৎ সমাজ দূরে থাক, সংসার হইতে মানবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কবিত্ব বা কল্পনা-শক্তি অতি সাধনসাপেক্ষ দুর্লভ বস্তু, কিন্তু উহা একান্ত সাধকের নিকট অতি সুলভ। দর্পণে যেমন অবাধে পরিস্ফুট-রূপে পদার্থ নিচয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিভাসিত হইয়া থাকে তদ্রূপ কবিত্বও প্রকৃত সাধকের হৃদয়-মুকুরে অবলীলাক্রমে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। কবিত্ব-সাধনার অভীষ্টসিদ্ধি স্বতঃসাধ্য, এ সাধনায় গুরুদেবের দীক্ষা নাই। উপগুরুর শিক্ষা নাই, স্বপ্ন দীক্ষিতের ন্যায় নিজেই শিক্ষিত হইতে হয়, এ সাধনার যন্ত্র মস্যাধার, জপমালা লেখনী,—মূলমন্ত্র পরার্থে আত্মোৎসর্গ। এ সাধনার আরম্ভ আছে নিবৃত্তি নাই—কিন্তু তৃপ্তি অনন্ত। বিলাস-ভোগের অশেষ প্রকার লহরী-লীলা আছে, আসক্তি নাই, উত্তপ্ত মদিরাধিক মাদকতা আছে, চিত্ত-বিকৃতি নাই। চিত্তবৃত্তি নিরোধ আছে, মুক্তি আছে কি না জানি না—কিন্তু জীবন্মুক্তি প্রকৃত কবি-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করে। ফলতঃ, বাহ্য জগতে অচিরাংশু বিলাস বিভ্রম বিষয়া-কর্ষণকে সম্যক অতিক্রম করিতে না পারিলে বিশ্ব-বিনোদন কাব্য-সাধনায় দিব্যাসনে সমাসীন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। প্রতি-পদবিক্ষেপে ভোগ-বিলাসিতার অনুসরণ করিয়া কবি হইবার কল্পনা স্বেচ্ছাকৃত অশান্তি আনয়ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যাহা হউক, দুঃখই কবিতার মূল প্রকৃতি। বোধ হয়, এই জন্যই চির কৌমার্য্যশালিনী জগন্মনোহারিনী কবিতা-সুন্দরী প্রাসাদ ভবনস্থ কনকাসনাসীন কুবেরকল্প ধনপতিকে অকা-তরে উপেক্ষা করিয়া চির-সেবিতা চিরানুগতা প্রফুল্লমুখী কামিনীর ন্যায় অবিরত পর্ণ কুটীর-বাসী নিরশন বিশীর্ণ দীন দরিদ্রজনের আশ্রয় লইয়া থাকে।

তজ্জন্যই বোধ হয় ধনবানের অমরধাম সদৃশ মনোমোহকর বিলাস ভবন পরিহার করিয়া দরিদ্রের তৃণ নির্ম্মিত অপরিচ্ছন্ন কুটীরে কবি চির-বিরাজিতা। বাস্তবিক কবিতা স্বভাবতঃই দীনভাবাপন্ন। তাই প্রাচীনকাল হইতে দীন দরিদ্রের সঙ্গেই তাহার অপার্থিব সম্বন্ধ ও চির-মিত্রতা। গরীব কবি তাহার পূর্ণ রসাস্বাদ করিয়া বৈষয়িক অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম বিদ্রুপচ্ছলে নিজের হৃদয়বেগ ঢালিয়া দেয়। বর্ত্তমান কালে বঙ্গভূমি বিলাস-সাগরে নিমজ্জ-মান। বঙ্গে ভোগ-বিলাসের অনন্ত ধারা অনন্তভাবে বিলাসিতা। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভেদে তদ্রূপ নানাবিধ সাধনা-পদ্ধতি[illegible] পরিণাম এক সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরেই পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ বঙ্গীয় শিক্ষা-দীক্ষা, দয়া-দাক্ষিণ্য,ধর্ম্মানু-ষ্ঠান ও পরার্থপরতা ইত্যাদি যাবতীয় মানবীয় বৃত্তিই যেন অব্যক্তভাবে স্বার্থকৃতে পরি-চালিত। জ্ঞান দয়া ধর্ম্ম সকলেরই একমাত্র সাধু উদ্দেশ্যে যেন ভোগ-বিলাস-মূলক স্বার্থোদ্ধার !

ইহা দ্বারা অন্য কোন বিষয়ের ক্ষতি হউক আর নাই হউক—কিন্তু বঙ্গীয় সুরুচি-কাব্য-কুঞ্জের অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়া যথেচ্ছাচারিতার পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সুশিক্ষিতা গৃহিনী ব্যতীত যেমন গৃহ-রচন ও গৃহের শ্রী সুসম্পাদিত হয় না, প্রকৃত কবি অভাবে কাব্য-কুঞ্জের স্নিগ্ধ গম্ভীর মাধুরিও দিন দিন নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। ইহা কি নিতান্ত দুঃখের বিষয় নহে? যে দেশে জাতীয় কাব্যের উৎকর্ষ নাই,—সেই দেশ বল-সমৃদ্ধিশালী হইলেও প্রাণিজনবিরহিত—ভয়ঙ্কর মরুস্থলী, অথবা শ্বাপদ সমাকীর্ণ ভীতিময় স্তিমিত বনস্থলী। যে জাতির কাব্য নাই সে জাতি অকৃতিভাজন, মৃত ব্যক্তির অসার নামের ন্যায় নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। সুতরাং তাহার অস্তিত্ব যদ্রূপ, নাস্তিত্বও তদ্রূপ। ভোগ-বিলাসিতার মাত্রা পরিমিত না হইলে কাব্যোৎকর্ষের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জাতিয় উন্নতির আশাও ভবিষ্যতের কোন নিভৃত অন্তরালে অবস্থিত আছে—কে বলিতে পারে? এই পরিদৃশ্যমান সংসারের যে কোন বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিয়া আমরা প্রতিনিয়ত দুইটি স্থায়ীভাবের উপলব্ধি করিয়া থাকি।—প্রথমটি সুখ—দ্বিতীয়টি দুঃখ। বস্তুতঃ এই দুঃখই সংসারের বৈচিত্র্য সাধনের মুখ্যতম উপাদান। সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ অনেক অধিক। অসার সুখের অনুভূতি অপেক্ষা দুঃখের অনুভূতি অত্যধিক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহ জীবনে কখন দুঃখের বেদনা অনুভব করেন না তিনি কেমন করিয়া কবিতা-ভাব ভাষাবদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন?

যে ব্যক্তি জীবনে দুঃখ-নিপীড়ন সহ্য করেন নাই, তাহার সুখময় হৃদয়ে দুঃখের ভাব স্বপ্ন-সদৃশ। বাস্তবিক অপূর্ণ জীবন লইয়া তিনি কি কৌশলে সুখ দুঃখের পূর্ণতাময়ী বিশ্ব-বিনোদিনী কবিতা দেবীর কঠোর সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন? যদি কাহারও "হওয়ার অভিলাস থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া গরীব হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সংসারে গরীব বিনা কে কোথায় কবি হইতে সমর্থ হইয়াছেন?

যদি কেহ হইয়া থাকেন তবে তিনি প্রকৃত কবি নহেন। ধনিগণ স্বার্থপর চাটুকারগণের অসার বাক্‌পটুতার হস্ত নির্ম্মিত, কবি তাহা হইতে স্বতন্ত্র—পৃথক, তাহার ধার দিয়াও যান না। সংসারে তিনি ধন্য ও নমস্য যিনি স্বার্থপরতা, চাটুকারিতা, চাটুপ্রিয়তা, অসার প্রভুত্ব বাসনা, পরশ্রীকাতরতা ও অসূয়া প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নীরব লাঞ্ছনাগুলিকে হৃদয়-পটল হইতে জ্ঞান-গঙ্গাজলে সম্যক্ প্রক্ষালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সেই ব্যক্তি ধন্য যে ব্যক্তি মরিয়াও পরকে ভুলিতে পারেন না। নিরুপম শিল্প-চাতুর্য্যময় কাব্যরূপ দিব্য লাঙ্গলে অক্লেশে কর্ষণ করিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধজনের চিরপতিত হৃদয়ক্ষেত্রে কৌশলে বীজবপন করেন তিনিই ধন্য। আর কত বলিব, তিনিই সেই দরিদ্র কবি বাল্মীকি, তিনিই সেই গরীব ব্যাস, তিনিই প্রকৃতির স্বয়ম্ভিচ্ছ গরীব ভবভূতি, কালিদাস, বাণভট্ট,

তিনিই সেই মাঘ, ভারবি, মুরারি, ভর্তৃহরি, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, তিনিই সেই দরিদ্র জয়দেব, বিদ্যাপতি,চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, তিনিই সেই গরীব ঘনরাম, ভারতচন্দ্র।

শ্রীকুটবিহারী চক্রবর্ত্তী।

প্রাণের কথা।

স্বার্থান্ধ মানব আমরা; প্রাণের কথা মনের আবেগ কিছুই যেন প্রাণে জাগে না। যখনই কোনও কিছু প্রাণে জাগে, যখনই মনে ব্যাকুলতা আসে, যখন সংসারের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে যাই, তখনই যেন কোথা হইতে শত বাধা ছুটিয়া আসে, শত বিঘ্ন যেন কোথা হইতে আসিয়া চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বলে—ও পথে যেও না, ও পথে বড় কণ্টক, ও পথে যাইলে আর আসিতে পারিবে না। ওপথে তোমার কোনও স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না। স্বার্থে ভরা—স্বার্থ দিয়া গড়া মানব। আমাদের মন তৎক্ষণাৎ সেদিক হইতে ফিরিয়া যে পথে অসার আনন্দ আছে, সে পথে প্রধাবিত হয়। ভগবানের চরণে ছুটো প্রাণের কথা বলিয়া এই দুর্ব্বহ জীবনটাকে, ততোধিক দুঃসহ মনটাকে একটু হাল্কা করিব, তাহা ত কই প্রাণে আসিল না! আমাদের সে একাগ্রতা কই! পূর্ব্বের সেই উদারভাবের কণামাত্রও কি থাকিবে না? একলব্যের একাগ্রতাব গল্প কি উদাহরণ হইয়াই থাকিবে? কার্য্যে কি কেহ তাহা করিবে না? আর কি আমরা সেদিন পাইব না? হায় সে কাল! কাল-সমুদ্রের কোলে গিয়া মিশিয়াছে—তার চিহ্নও নাই; আছে কেবল সেই সকল ঘটনা পুস্তকে বিবৃত হইয়া—যাহা আমরা পাখীর "রাধাকৃষ্ণ" বুলির ন্যায় পড়ি—পড়িবার মতন করিয়া পড়িতে পারি না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের বলে ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম কোথায়? হায় সেকাল! সে কালের মত সবই আছে, নাই কেবল প্রাণ। মানুষ মানুষই আছে নাই—কেবল মন, সেকালের ব্রাহ্মণ প্রত্যূষে উঠিয়া একমনে প্রাণ খুলিয়া বায়ু কম্পিত করত শ্যামবেদ স্তোত্র পাঠ করিতেন, পশুপক্ষী যে যেখানে থাকিত, একত্রে আসিয়া ভয়শূন্য প্রাণে বিভোর হইয়া তাহা শুনিত, বাতাস স্তব্ধ হইয়া সে শব্দ, সেই প্রাণ বিমোহনকারী শব্দ, বহন করিয়া লইয়া গিয়া ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাইয়া দিত। শব্দ ভগবানের শ্রীচরণ চুম্বন করত ফিরিয়া আসিয়া নিস্পন্দনেত্র ভক্তের মাথায় আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিত—ভক্ত ধন্য হইত। এখন আর প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের কণ্ঠে সে দিনের মত প্রাণমাতান,মনগলান সুর,বাহির হইয়া জগৎকে মাতাইয়া তোলে না; শব্দ এখনও প্রাতঃকালে হয় তবে তাহাতে একটী প্রাণীরও মন গলেনা। শব্দ এখনও হয় তবে সে শব্দ গলা হইতে মধুর স্বরে বাহির না হইয়া চায়ের পিয়ালার টুং টুং কর্কশ শব্দে মনটাকে যেন দূরদূরান্তরে ভগবানের কাছ হইতে কত নীচে নামাইয়া লইয়া যায়। শান্তকুঞ্জের মধ্যে সে আশ্রম আর নাই, এখন তাহা বিজন বনে পরিণত হইয়াছে।

পার্থিব দেবতা ভূদেব ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে সুন্দর লতাগুল্মে পরিবেষ্টিত ও অলঙ্কৃত আশ্রমে না গিয়া এখন ছড়ি হাতে লইয়া স্বাস্থ্য লাভের জন্য মাঠে হাওয়া খাইতে যায়; নদীতীরে বসিয়া ভাবুক তখন যে ভাবে মাতিয়া যাইতেন সে ভাব আর নাই। কলকল স্বরে জাহ্নবীর জল আপন সাগরের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছোট ছোট গুল্মে, বড় বড় বৃক্ষে বাধা পাইযাও তাহা অগ্রাহ্য করত ছুটিয়া চলিযাছে, নদী-নীব উল্লাসে বহিযা যাইতেছে, ভাবুক ভাবে মগ্ন হইযা তাহা দেখিতেছে—এইরূপ কত স্থানে পবিত্র ভাবের ছড়াছড়ি ছিল—এখন আর তাহা নাই—সেই নদী এখনও বহিতেছে, কিন্তু এখন আমাদের আর প্রাণে সে ভাব নাই, সে সঞ্জীবতা নাই, সব যেন নীরব হইয়াছে, সব যেন ঘুমাইয়াছে। কে জাগাইবে, কে এই সর্ব্ব বিষয়ে নিদ্রিত জীবকে আবার জাগাইবে। কে আর আমাদের প্রাণে সঞ্জীবতার একটা সাড়া আনিয়া দিবে! কবে সেই সঞ্জীবতায় প্রাণ পাইয়া প্রাণময়কে চিনিতে পারিব! তাঁকে চিনিবাব নির্দ্দিষ্ট দিন তো নাই! তবে চিনিব যে দিন, যে দিন হৃদয়ের সমস্ত ময়লা মুছিবার দ্রব্য চক্ষুজল—মনের ভিতরের ময়লা ধৌত করিয়া অবিরল ধারায় তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, কল্পনার নেত্রে তাঁহার মূরতি দেখিতে দেখিতে, বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া পড়িতে থাকিবে সেই দিন সেই চক্ষুজলের ভিতর দিয়া নিজ প্রাণের মধ্যেই তাঁকে দেখিতে পাইব। কিন্তু কখন জীবনের কোন্ সময়ে সে শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে?

"বাল-স্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণ-স্তাবৎ তরুণীরক্তঃ,
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ,
পরম ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।"

তাঁরই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া, তাঁরই বাড়ীতে বাস করিয়া, তাঁরই কাছে যাইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে সময় আসে না। সে চিন্তা মনে উদয়ও হয় না! হয় কেবল তিনি বিহীন বৃথা চিন্তা। সেই বৃথা চিন্তা হইতে নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য "সময় নাই" রূপ মিথ্যা কথা বলিয়া পাপের মাত্রা আরও এক পর্দ্দা বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁর কাছ হইতে আরও একটু দূরে সরিয়া যাই,—

"দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে—

সত্য তাই! একটুও কি সময় পাই না! সংসারটাকে সুখের আকর ভাবিয়া, তাহাতেই রত থাকিয়া সেই আকরেই যখন ডুবিয়া দম আটকাইয়া গিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কষ্টের মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া তুলি; কিন্তু অন্য রকমে কাঁদিয়া, যেরূপে কাঁদিলে প্রাণে বিমল আনন্দ, মনভরা শান্তি পাইব সে ভাবে তো কই কাঁদিতে পারি না? মন—তুমি কি কাঁদিতে জান না? যদি জান তো সব ভুলিয়া কাতর প্রাণে চেষ্টা করিয়া, মনের সব কবাট বন্ধ করিয়া একপ্রাণে কান্না শিখিবার জন্য প্রার্থনা কর। তিনি বিরূপ হইবেন না—কিছুতেই তোমার মনোবাসনা অপূর্ণ রাখিবেন না—

"অয়ি ভাবেঽপি তুষ্টায় সর্ব্বমঙ্গল কারক

ইত্থং গুণবতো গেয়ং হরের্নামৈব কেবলম্॥"

তবে আর ভয় কি! যেরূপে হউক তাঁকে ভাবনা কর—আর মুখে বল—

"পাপোঽহং পাপ কর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপো হর হরি"

আরও বল, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া বল—

"কৃতং ময়া দুষ্টাধিয়া মায়া মোহিত চেতসা।
ক্ষমস্য মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমা সারাহি সাধকঃ"

প্রভো! আমি সকল ত্যজিয়া নিরুপায় হইয়া আজ জীবনের অবেলায় তোমায় ডাকিতেছি; কোথায় প্রভো শান্ত, স্নিগ্ধ শ্যামল মূর্ত্তিতে আমার নয়নের সমক্ষে আবির্ভূত হও, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি আর কেবল কাঁদি,—আর কিছু চাই না।

শ্রীশশাঙ্কমোহন ভট্টাচার্য্য।

সুখান্বেষণে।

(গল্প)

"নাস্তি রাগ সমং দুঃখং
নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।"

(মহাঃ, মোক্ষধর্ম্ম পঃ)

(১)

সে বৎসর বিসূচিকা রোগে বৈদ্যনাথ-দেওঘর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সমস্ত লোকালয়গুলি প্রায় জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে মহা গোল পড়িয়া গিয়াছে। জলপ্রবাহের মত বহু স্বেচ্ছাসেবকের দল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। আমরাও তিন বন্ধুতে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। এক দিকে লোল-রসনা, করাল-বদনা বিসূচিকা-রাক্ষসী—আর অন্য দিকে পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। উভয়ের মধ্যে মানবজীবন লইয়া এক মহারণ বাধিয়া গেল।

সমস্ত দিন সেই জীবন-যুদ্ধে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ক্লান্তি দূর করিবার মানসে আমরা তিনজনেই বৈদ্যনাথের উপকণ্ঠস্থ ত্রিকূট নামক পর্ব্বতের পাদদেশে উপবেশন করিলাম। আমাদের মধ্যে একজন একটু তত্ত্বান্বেষী ছিল। আমরা তাহাকে রহস্য করিয়া "দার্শনিক" বলিয়া ডাকিতাম। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা বল দেখি, কেন আজ আমরা এত লোক আপনাপন সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় এতদূরে, এমন এক বিপুল কষ্টের মধ্যে এসে পড়লুম্?"

আমি তাহার এই অদ্ভুত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম—"ভাল, আমি মনে করেছিলুম, তোমার স্বভাব-সিদ্ধ Philosophyটা বাড়ীতেই রেখে আস্‌বে, কিন্তু এখন দেখছি এখানে এত গোলমালের মধ্যেও সেটাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছ।"

তৃতীয় সঙ্গিটী কেমন যেন একটু ভাবাবিষ্ট হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"না হে না, কথাটা ভাববার বটে। মানুষ সুখ খোঁজে ত সুখ ত্যাগ করে কেন? আর সুখ জিনিষটা কি?"

আমি তাহার উপর নিক্ষেপ করিব বলিয়া ক্ষিপ্রগতিতে মনের মধ্যে একটী বিদ্রূপ-বাণ যোজনা করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা সন্ধ্যার সেই ধূসর আলো ভেদ করিয়া একজন পুরুষ আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা বিস্মিত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তখন আমাদের তৃতীয় সঙ্গিটীর হস্তে একখানি তালপত্রের পুঁথি দিয়া বলিলেন—"সুখান্বেষী যুবক! সুখ কি, তা' যদি জান্‌তে চাও, তবে আমার অতীত জীবনের কাহিনী ইহাতে পাঠ কর। উঃ! সে একটা প্রলয়—মহাপ্রলয়! ভ্রান্ত মন সুখের প্রেরণায় একদিন যে বিষের আগুন জ্বেলেছিল, এখনও আমি মাঝে মাঝে সে আগুনের অসহ্য তাপ ভোগ কচ্ছি! পড়, পড়ে যাও, সব বুঝতে পার্‌বে। না, আর আমি থাক্‌তে পারি না। ঐ স্বর্গলোক হ'তে সেই দেবপত্নী ও দেবশিশু রোষ-কষায়িত-নেত্রে আমাকে তাড়না কর্চ্ছে। ঐ অন্তরীক্ষ হ'তে ভোলা ও নির্ম্মলা আমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'বার জন্য সমস্বরে বল্‌ছে—ঐ গুরুদেব সাধন-ভূমি থেকে মুহূর্ত্তের জন্য অপসারিত দেখে আমাকে অলক্ষ্যে তিরস্কার কর্চ্ছেন। আজ যে আমার ব্রত পালনের এক মহাদিন উপস্থিত।" এই বলিয়া সে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত সেই গাঢ় অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

আমরা তখন এই আকস্মিক ঘটনার বিষয় কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বিস্ময়ে অথচ ভয়-চকিত নেত্রে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রথম সঙ্গিটী বলিল—"আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই এ কোন উন্মাদের প্রলাপ অথবা কোনও দেবতার ছলনা।"

তৃতীয় সঙ্গিটী বলিল—"সে যাহাই হউক, এই পুঁথিখানা পড়ে দেখা যাক্ না, ইহাতে কি লেখা আছে।" এই বলিয়া সে সেই পুঁথিখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আমার পকেটে বৈদ্যুতিক আলো ছিল, আমি তাহা জ্বালিলাম। আলোর সাহায্যে পুঁথির অক্ষরগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তাহার আরম্ভেই লেখা আছে,—

"পাঠক! জানি না কতকাল পরে আবার আমার স্মৃতি সেই সুপ্ত অতীত জীবনের উচ্ছ্বাস কোলাহলকে জাগাইয়া তুলিল—আবার সে কোলাহলের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সবেগে আঘাত করিয়া আমার রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারকে উদ্ঘাটিত করিল। তাই—তাই আজ তোমার সমক্ষে আমার হৃদয়রক্ত দিয়া সেই পুরাতন আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

আমরা অক্ষরগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই সে গুলি রক্তে লিখিত। তখন আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পুঁথিখানি আবার পড়িতে লাগিলাম—

"সেই সবেমাত্র জীবনের প্রভাত কাল। মনে হইতেছে, তখনও যেন একখানি ক্ষীণ অন্ধকার আমার জীবনটাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় আমার মাতৃবিয়োগ হয়।"

"আমার পিতা খুব বড় একজন জমীদার। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহার সেই সুবিশাল ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধীকারী। সুতরাং মাতার মৃত্যুর পর আমি পিতার দ্বিগুণ পরিমাণ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলাম। আমার সামান্য পীড়া হইলে তিনি পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেন, আমার ক্রন্দন শুনিলে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতেন। আমি তাঁহার এক-

মাত্র নয়নের আনন্দদায়ক ছিলাম বলিয়া বোধ হয়, তিনি আমার নাম নয়নানন্দ রাখিয়াছিলেন।

"যখন আমার জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়, তখনই দেখিলাম যে, পিতার মনোচক্র কেবল আমার সুখেরই অক্ষের উপর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। তাঁহার স্মৃতি, শান্তি, ভাবনা, কামনা সবই কেবল আমার সুখ। অতএব, আমার সুখকেই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মত সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সুখ-সাগরের অন্বেষণে আকুলচিত্তে ছুটিয়া চলিলাম। হায়! কে তখন জানিত যে, অচিরাৎ সাগর ভ্রমে এক দুর্গন্ধ কর্দ্দমযুক্ত ক্ষুদ্র জলাশয়ে আপনাকে ঢালিয়া দিব।

"সুখের প্রথম অন্তরায় দেখিলাম—সাধারণ ছাত্রের মত প্রত্যহ স্কুলে যাওয়া। এ কার্য্যটা যে আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক, এই কথা একদিন রমা কাকাকে জানাইলাম। রমাকাকা পিতার কেবলমাত্র দাওয়ান ছিলেন না, একান্ত অনুগ্রহের পাত্রও ছিলেন। তিনি আমার কথাটাকে নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তিনি বাটীতে একজন সুবিজ্ঞ শিক্ষক রাখিয়া পড়িবার অনুমতি দিলেন। শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার রমাকাকার উপরই পড়িল। তিনি নিজের মনের মত বাছিয়া একটী নব্যশিক্ষিত যুবককে আমার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহার নাম বিমল বাবু।"

"বলা বাহুল্য, আচার্য্য বিমলানন্দ শিক্ষকতার ভার পাইয়া প্রথমে 'চুরুট' পরে 'তাম্রকূট' তৎপরে সুরাদেবী ও তাঁহার অনুসঙ্গিনী হাস্য-শৃঙ্গার-রসাশ্রিতা, বাদ্য-গীতির আরাধনায় আমাকে দীক্ষিত করিলেন। হৃদয় কেমন যেন এক নূতন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ভাবিলাম,—'ধন্য ধন্য বিমলানন্দ, ধন্য তুমি! এ জগতে এত আনন্দ আছে, তা আমি জানিতাম না। এই কি তবে আমার সেই সুখের সাগর!"

"সেই সময় কোথা হইতে আর একটী অপূর্ব্ব মধুর ভাব আসিয়া আমার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার প্রভাবে সমস্ত জগৎটী যেন আমার নিকট কাব্যময় হইয়া উঠিল। সেই কাব্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি যেন একটা অজ্ঞাত সুখরস পান করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে এক সুপ্ত পিপাসা ধীরে ধীরে জাগিতে লাগিল। বোধ হয় পিতা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই, অল্পদিনের মধ্যেই আমার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা একটী পাত্রীও ঠিক করিলেন। একদিন শুভমুহূর্ত্তে মহা ধূমধামের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

(২)

"আমার বিবাহে পিতা যতদূর সুখী হইলেন, আমি ততদূর সুখী হইতে পারিলাম না তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বড়লোকের মেয়ে অপেক্ষা গরীবের মেয়ে অধিকতর সরলা ও শান্তিপ্রিয়া; সুতরাং একটী গরীবের মেয়েকেই তিনি পুত্রবধূ করিলেন। পুত্রবধূটী তাঁহার একটু মনোমত

হইয়াছিল যে, লোকের কাছে প্রত্যহ তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন, 'শুধু নামে নির্ম্মলা নয় সত্য সত্যই নির্ম্মলা'।

কিন্তু হায়! আমি ত নির্ম্মলার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কোন গুণই দেখিতে পাইলাম না। তাহার মধ্যে রূপ-লাবণ্যের কিছু কম ছিল না বটে কিন্তু আমি যাহা চাই, তাহা কই? আমি চাই নাটক নাটিকার নায়িকার মত সুধাবর্ষিণী কণ্ঠ-বীণার সুললিত ঝঙ্কার, মদন মথন চরণ-যুগলের মনোহারিণী নর্ত্তন-ভঙ্গিমা আর সযত্ন-গ্রথিত বচন-মালার হৃদয়-রঞ্জিনী প্রণয় ছটা কিন্তু হায়! নির্ম্মালাতে যে সে সব কিছুই নাই! সে যে কেবলমাত্র একটী মৃত্তিকাস্তূপ! এ মৃত্তিকাস্তূপকে কি কখনও সারাজীবনের সঙ্গিনী করিতে পারা যায়?

এইরূপে কেমন যেন একটী ঘোরতর অশান্তি আসিয়া জুটিল। আমার সুখের পথে সে অশান্তি যেন একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত দাঁড়াইল। আমি দিবারাত্রি অনুবিধ আমোদ-প্রমোদে মনটীকে ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ অবরোধকে অলক্ষ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বিবাহের পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই নির্ম্মলার কাছে আসা বন্ধ করিলাম।

একদিন আমি ভাবিলাম, বাটী হইতে কিছু দূরে একটী উদ্যানের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র বাটিকা নির্ম্মাণ না করাইলে পূর্ণমাত্রায় আমোদ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। আচার্য্য বিমলানন্দ এবং অন্যান্য অনুচরবর্গও আমার এই ইচ্ছার সমর্থন করিলেন। রমা কাকা ব্যতীত ইহার আর কোন উপায় নাই। সুতরাং শীঘ্রই তাঁহাকে এ কথা জানাইলেন।

রমা কাকা বলিলেন,—"এটা আর বেশী কথা কি? যত শীঘ্র পারি তোমার এ অভাব আমি পূরণ করিবার চেষ্টা কর্ব্বো।" এই বলিয়া তিনি অনতিবিলম্বেই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পিতাকে বলিলেন যে, আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা নিতান্ত আবশ্যক; অতএব একটী উন্মুক্ত স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করান তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া রমা কাকার উপরই এ বিষয়ের ভারার্পণ করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই আমার মনোমত একখানি উদ্যান বাটীকা প্রস্তুত হইয়া গেল। মহানন্দে তাহাকে বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়া নাম দিলাম "নন্দন-কানন"।

এখন নন্দন-কাননে আমার সেই চিরাকাঙ্খিত সুখের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি তাহার রাজা হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম। সহচরগণ সে রাজ্যগঠনে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। যে যেখানে যে অভাবটী দেখিতে পায়, আমাকে জানায়,আমিও—রমাকাকার সহায়ে তার সে অভাবটী দূর করিতে সমর্থ হই। এইরূপে এক মাসের মধ্যেই নন্দন-কানন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তখন একদিন গর্ব্ব ভরে সহচরবৃন্দকে বলিলাম,—'আচ্ছা, বল দেখি এবার আমার নন্দন-কানন সত্য সত্যই সুখের রাজ্য হইয়াছে কি না?

একজন উত্তর করিল,—'হাঁ—হ'য়েছে বটে—কিন্তু নন্দন-কাননে পরিজাতেরই অভাব।'

আমি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলাম,—সে কি! বল, সে পারিজাতটী কি?

সে বলিল—'রমণী'।

যুগপৎ অন্যান্য পারিষদবর্গও তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিল। আমি তখন আগ্রহ সহকারে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বল, বল, কেমন ক'রে, কোথায় বল রমণীকে পাওয়া—যাবে? তারপর—

উঃ! আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে! না, পাঠক! আর না—আর আমার এ লেখনী পাপের সে বিভীষিকাময়ী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে সাহস করিতেছে না, দেখ আমার হৃদয়-রক্তও ভয়ে শুকইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু না—কে যেন আমাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সেই কথা বলিবার জন্য তাড়না করিতেছে। তবে আজ আমি নিজের লেখনীতে নিজের পাপের কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি। পাঠক! তুমি ধৈর্য্যের সহিত পড়িয়া যাও।

তারপর একজন সন্ধান দিল যে কিয়দ্দূরেই এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ব্রাহ্মণী আছে। তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য এ জগতে স্বামী ভিন্ন আর কেহ নাই। স্বামীও বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় প্রবাসে থাকে। কোথায় কি কাজ করে, তাহা কেহ জানে না। তবে শুনা যায় নাকি ব্রাহ্মণ খুব ধার্ম্মিক ও তপশ্চর্য্যারত, অর্থের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং দারিদ্রের দারুণ পীড়নে ব্রাহ্মণী উৎপীড়িতা। এ সময় যদি তাহাকে অর্থের প্রলোভন দেখান যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে নন্দন-কাননে দাসীবৃত্তি পর্য্যন্তও অবলম্বনে কুণ্ঠিতা হইবে না।

ঐ কুপরামর্শে আমার মন এতদূর মাতিয়া উঠিল যে, তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তিমান্ পাপ সহচরগণের সহিত ব্রাহ্মণীর কুটীরাভিমুখে চলিলাম, পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম যে, সেই ব্রাহ্মণীর স্বামী আমার পরিচিত। কিন্তু তাহাতেও পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া চলিতে লাগিলাম। কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে ব্রাহ্মণী অনুপস্থিত; ভাবিলাম, বোধ হয় বা বিধাতাই আমাদিগের ভাগ্য-যবনিকার অন্তরালে বসিয়া এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। হায়! মানবের মূঢ় মন এইরূপে স্বয়ং ধর্ম্মপতিকেও অধর্ম্মের সহায় করিতে চায় বটে!

ব্রাহ্মণী আমাদিগকে দেখিবামাত্র কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া ত্রাস্তে একখানি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই দেখিয়া আমাদিগের মধ্যে একটী নরকুলকলঙ্ক লজ্জা ও শ্লীলতাকে পাপ লালসার পঙ্কিল হ্রদে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া আরও ব্যস্ততার সহিত তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল। তখন সেই পুণ্যতেজো-গর্ব্বিতা রমণী কি যেন এক দেবশক্তিবলে দৃঢ়স্বরে তর্জ্জনী নির্দ্দেশে বলিয়া উঠিল, 'সাবধান, সয়তান! আর এক পাও অগ্রসর হ'য়ে আমার অঙ্গস্পর্শ করিস্নি।' কথাগুলি যেন সজোরে আসিয়া আমাদিগের বুকের মধ্যে আঘাত করিল—আমরা কাঁপিয়া উঠিলাম। আর কেহ তাহার কাছে যাইতে সাহস পাইলাম না।

পরক্ষণেই অপূর্ণমনোরথ হওয়ায় আমা-

দিগের সকলকার চিত্তেই কেমন যেন এক দুর্জ্জয় ক্রোধের উদ্রেক হইল। মনে করিলাম, 'কি সামান্যা নারী! তার আবার এত তেজ!' আমি একেবারেই বিবেকহীন প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। সে জন্য বেশীদূর যাইতে হইল না। দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণীর একটী তিন বৎসর বয়স্ক শিশু মাতার উপরোক্ত অবস্থার বোধ হয়—কারণ বুঝিতে না পারিয়া আপনা আপনই কাঁদিতেছে। তখন শোণিত পিয়াসী কবন্ধের মত একজন শিশুটীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া হস্তস্থিত—যষ্টির দ্বারা নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে লাগিলাম। আহা! বোধ হইতে লাগিল শিশু যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। উঃ! সে কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! পাষণ্ডের কি পাশবিক অত্যাচার!

তারপর? তারপর হৃত বৎসা ব্যাঘ্রীর মত সেই শিশু মাতা কি যেন এক বিকট চীৎকার করিয়া নক্ষত্র-বেগে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। আমরা সবকিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, যেন সমস্ত পৃথিবীকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য দ্বিসহস্র প্রবল সূর্য্য—তাহার দুই নয়নে উদিত হইয়াছে। আমরা সভয়ে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই—অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে সেই অত্যধিক—প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারায় শিশুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়—শিশুর মাতাও হটাৎ সেই দারুণ পুত্র-শোকের আঘাত পাইয়া জীবন ত্যাগ করে—আর বহু দিন পরে সেই রাত্রে—সেই ব্রাহ্মণ সহসা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত দারাপুত্রকে একই চিতায় দাহ করণান্তর আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

কতদিন চলিয়া গিয়াছে—কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—কিন্তু সেই দিনের সেই চিত্র কি আমি কখনও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিব? কখনও না। সেই অনাস্বাদিত দুঃখ পূর্ব্ব দেব শিশুর মরণ-বেদনা পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল—সেই দিব্য-জ্যোতি বিভূষিতা দেব রমণীর শোক-ক্ষিপ্তা জ্বালাময়ী 'মূর্ত্তি' যে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে খোদিত হইয়া গিয়াছে! আমি মৃত্যু 'মুহূর্ত্ত' পর্য্যন্ত সেই চিত্র—দেখিতে থাকিব, আর কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব!

"আমার বহু যত্ন সত্বেও পূর্ব্ব কথিত ঘটনাটী নন্দনকাননের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে ইহা প্রথমে পৌঁছিল রমা কাকার কাছে। তিনি যেন অন্তরে সাদরে ইহাকে অভিভাষন করিলেন। লোকে দেখিল,—তিনি যেন একটু দুঃখিত হইয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি যেন কোন একটী দূর উদ্দেশ্যের সাধনপথ কিছুটা সুগম হইতে দেখিয়া সেই দুঃখের আচ্ছাদনের মধ্যে একটু সাফল্য-সুখ অনুভব করিলেন।

তারপর পৌঁছিল পিতার কাছে। ইহাতে তিনি ম্রিয়মান হইয়া উঠিলেন। মনে হয় যেন সেই দিন তাঁহার সেই প্রশস্ত ও মসৃণ ললাট দেশে চিন্তার কুটিল রেখা প্রথম অঙ্কিত হইল—তাঁহার সেই দর্পণ-তুল্য নির্ম্মল চিত্তে বিষাদ কালিমার কালছায়া এই প্রথম পতিত হইল।

তিনি বিষণ্ণ চিত্তে রমাকাকাকে ডাকিয়া কহিলেন,—'দেখ, রমানাথ, আমার বিশ্বাস বিষয় কার্য্যে ওর মনটা বাঁধা পড়লে আর ঐ সব কুৎসিৎ কাজের ইচ্ছা ওর মনে জাগ্‌বে না। তাই বলি কি যে তুমি এখন থেকে ওকে নিয়ে বিষয় কার্য্য কর।" রমা কাকা উত্তর করিলেন,—আপনি একেবারে এতটা ওর সম্বন্ধে নিরাশ হবেন না। তরলমতী বালক একটা আধটা ভ্রষ্টাচরণ করে বৈ কি। ওই ছেলে আবার পরে এত ভাল হবে যে সকলে ওর পানে চেয়ে থাক্‌বে। আর এক কথা হ'চ্ছে যে ওর স্বাস্থ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে ভাল হয় নি সুতরাং এ সময় যদি বিষয় কাজের ভার দেওয়া যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই ওর দেহ একেবারে নষ্ট হইয়া যাবে।' রমা কাকা যাহা বলিলেন—পিতাও তাহাই বুঝিয়া নীরব রহিলেন।

সর্ব্বশেষে পৌঁছিল নির্ম্মলার কাছে। পিতার শিক্ষাধীনে থাকিয়া নির্ম্মলা কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান সুদূরদর্শিতা। এই শক্তির বলে সে দূর ভবিষ্যতের গর্ভনিহিত ঘনতিমিরাবৃত চিত্রাবলী কতকাংশে দেখিতে সক্ষম হইত। তাই আজ আমার উক্ত কাহিনী শুনিবামাত্র সে একবার নিভৃতে নির্জ্জনে বসিয়া আমার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে চেষ্টা করিল; দেখিল, সে এক কি বিভীষিকাময়ী ছবি! দয়া, মায়া, মমতা, মধুরতা এমন কি মানবতা পর্য্যন্তও আমার জীবন পথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—আছে কেবল এক ভীষণ দর্শন, কঠোর, কর্কশ মহা-শ্মশান আর সেই মহাশ্মশানের উপর আমার পৈশাচিক—উল্লাসের সহিত তাণ্ডব নৃত্য! এ ছবি আর সে দেখিতে পারিল না। ভয়ে ও কষ্টে তাহার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন সে কাতর চিত্তে—করুনাময়ের করুণা ভিক্ষা করিল আর মনে করিল একবার সে আমার কাছে ছুটিয়া আসে—একবার আমার পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া ঐ ছবি দেখাইয়া বলে ওগো! ঐ পথে যেওনা—ও যে শ্মশানের পথ ও যে প্রলয়ের পথ! ও যে ধ্বংশের পথ!"

"তারপর কিছুদিন চলিয়া গেল। আমি পূর্ব্বের মত অক্লান্তভাবে আমার কল্পিত সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীতে লাগিলাম। কিন্তু, কি মজা! সেই সুখ খুঁজিতে যাইয়া—স্বাস্থ্য লাভ করা দূরে থাকুক—স্বাস্থ্য ক্রমশই হারাইতে বসিলাম। দেখিতে দেখিতে শরীর ব্যাধি মন্দির হইয়া উঠিল। অচিরাৎ চলৎশক্তি হীন এক জড় পদার্থ হইয়া পড়িলাম। কেমন যেন একটা ঘোর অবসাদ আসিয়া মনকে জুড়িয়া বসিল। সুখাস্বাদনের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল।

পিতার দৃষ্টি আমার উপর পূর্ণ মাত্রায় আসিয়া পড়িল। তিনি সুদক্ষ চিকিৎসক আনাইয়া আমার রোগ নির্ণয় করাইলেন। চিকিৎসকগণ সকলেই বলিলেন যে নন্দন-কানন'ই আমার রোগের জন্মভূমি, অতএব সে স্থানে যাওয়া একেবারে বন্ধ না হইলে আমার রোগ-মুক্তির আশা অতি অল্প। বাধ্য হইয়া কিছুদিনের জন্য পিতার আদেশে নন্দন কাননের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

কিন্তু রোগ ক্রমশঃই বড়িতে লাগিল। এমন কি, শেষে জীবনের আশাও তিরোহিত হইল। চিকিৎসকগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের আশঙ্কা ভাবিয়া পিতা অত্যন্ত শোকাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার দুই নয়ন হইতে তপ্ত অশ্রুজল দিবারাত্রি আমার কপোলদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। নির্ম্মলা লজ্জা, ভয়, আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। আমার রোগ যতই প্রবল হইতে লাগিল, নির্ম্মলার বদনমণ্ডলও ততই যেন কেমন এক অচঞ্চল প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল কিরণে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। যাহার কিছুমাত্রও বুঝিবার শক্তি ছিল, সেই বুঝিল সে প্রতিজ্ঞার অর্থ কি। তাহার অর্থ সাবিত্রী বা বেহুলার মত পাতিব্রত্যের পবিত্র অস্ত্রের দ্বারা নারীর পরম শত্রু বৈধব্যকে জয় করা।

সহসা একদিন আমার এই জীবন-মরণের মিলন ভূমিতে দিবা-নিশার সন্ধিক্ষণে এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন বলিয়া সংবাদ পাইবামাত্র এই সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন। গললগ্নবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার রোগের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি আমার কক্ষ হইতে সকলকে নিষ্ক্রান্ত হইতে বলিলেন। সকলেই কক্ষের বাহিরে গেল, কেবল রহিলাম শয্যার উপর মৃত্যু পথযাত্রী আমি। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আমার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। দর্শনশক্তির হ্রাস হইলেও অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম যেন তাঁহার মুখচ্ছবি প্রশান্ত মহাসাগরের মত গম্ভীর অথচ পূর্ণ বিকসিত চন্দ্রালোকের মত শীতল ও শান্তিপ্রদ।

সন্ন্যাসী স্থিরনেত্রে আমার আপাদমস্তক কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী মৃদুভাবে আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিলেন। আহা! কি স্নেহময়—কি শান্তিময়—কি অমৃতময় সেই সংস্পর্শ! নিমেষের মধ্যে রোগের সেই প্রাণঘাতিনী যাতনা কোথায় দূরীভূত হইল—মনে হইল তৎক্ষণাৎ যেন আমি নিরাময় হইলাম।

সন্ন্যাসী তখন অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে বলিতে লাগিলেন,—

'সুখের কাঙ্গাল! সুখ চেননা, তাই খুঁজছ সুখ আর নিচ্ছ অসুখ। সুখের তুমি এখন বহুদূরে।'

এ কথাগুলি শুনিবামাত্র, বলিতে পারি না কেন, কেমন যেন সহসা একটা হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। আমি সভয়ে অর্দ্ধোত্থিতভাবে ভাল করিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইলাম। সেই সময় সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্বজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার দীপ্ত নয়নদ্বয় আরও দীপ্ত হইয়া আমার অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রবেশ করিল। আমার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মস্তিষ্ক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ!—এ যে সেই ব্রাহ্মণ, যার দারাপুত্রকে হত্যা করিয়া চিরদিনের জন্য সংসার-সুখ কাড়িয়া লইয়াছি! তবে কি—তবে

কি, তাহারই প্রতিশোধের জন্য আজ এ সন্ন্যাসী এখানে! আমি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলাম—'দূর হও, সন্ন্যাসী! তুমি আমার শত্রু।' প্রতিধ্বনির মত তৎক্ষণাৎ যেন কাণে আসিল,—'কাছে এস, সুধান্বেষি! আমি তোমার মিত্র।' আর কিছু শুনিতে পাইলাম না—জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। সন্ন্যাসীও তদ্দণ্ডেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(৭)

"কিছুদিন মধ্যে আরোগ্যলাভ করিলাম। কিন্তু এক মাস কাল চিকিৎসকগণ্ বাটীর বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। পিতা এবার "নন্দন-কাননের" উপর কুপিত হইয়াছিলেন। পাছে বাটীর বাহির হইলে আমি তথায় যাই সেজন্য তিনিও আমায় বাটীর মধ্যে থাকিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে "নন্দন-কাননের" সহচরগণ যেই সংবাদ পাইল যে, আমি রোগমুক্ত হইয়াছি তৎক্ষণাৎ আচার্য্য বিমলানন্দকে গুপ্তভাবে আমার নিকট পাঠাইল। তিনি আমার শিক্ষক বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইলেন না। এতদিন নন্দন-কাননের মায়া-শৃঙ্খল কোনরূপে কাটিয়া ফেলিয়া মুক্ত ছিলাম কিন্তু আজ আবার সেই শৃঙ্খল আচার্য্য বিমলানন্দ আমার গলদেশে ঝুলাইয়া দিলেন। নন্দন-কাননের দিকে আমার টান পড়িল। আমি তাঁকে বলিলাম, 'যেমন ক'রেই হোক্ আজ দুপুরবেলা আহারের পর সেখানে যাব। এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকবেন।' এই আশ্বাসবাণী পাইয়া যেন কতই আনন্দ-ভঙ্গিতে তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই রমা কাকা আমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন,—"বাহিরে বেড়াইলে যদি তোমার মন ভাল থাকে তা তুমি একটু একটু এখন বেড়াতে পার। মন ভাল থাকলেই দেহ ভাল, আর মন খারাপ থাক্‌লেই দেহ খারাপ। মনের সঙ্গে দেহের খুব নিকট সম্বন্ধ। তোমার বাপের ভয় ক'র না—আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌বো এখন।' আমি আনন্দ-ব্যঞ্জক স্বরে অতি তাড়াতাড়ি বলিলাম—'যে আজ্ঞে।' তিনিও যেন পুলকভরে মনে মনে 'কৃতার্থোঽস্মি' বলিয়া চলিয়া গেলেন। নন্দন কাননে আমার যাইবার সঙ্কল্প আরও প্রবল হইল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে তথায় যাইব বলিয়া আমার ঘর হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—'কোথা যাবে?' তাহার সেই প্রশ্নের স্বরে যেন একটা দৃঢ় সন্দেহের ভাব মিশ্রিত ছিল। বোধ হয় সে পাশের ঘর হইতে আচার্য্য বিমলানন্দ ও রমা কাকার সহিত আমার কথোপকথন শুনিয়া থাকিবে। যাই হোক্, রোগের পূর্ব্বে হইলে আমায় এরূপ প্রশ্ন করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না। রোগের পরে সে সাহসটুকু তাহার জন্মিয়াছে। কেন তাহাও বলি। রোগের সময় সে প্রাণপণে অকাতরে আমার সেবা করিয়াছিল, সেইজন্য উপকৃতের কৃতজ্ঞতার আবরণে তাহাকে সামান্য একটুকু ভালবাসা দিয়াছিলাম, ইহা সে জানিতে পারিয়াছিল; তদ্ব্যতীত প্রায় ৩।৪ মাস কাল

তাহার সন্নিধানে থাকায় আমার প্রতি তাহার পূর্ব্ব-ভয় অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

নির্ম্মলার ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমি একটু হাসিয়া বলিলাম,—"বাহিরে একটু দরকার আছে।"

নির্ম্মলা।—দরকার যা তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার সেই নন্দন-কাননে যাবে।

আ।—যদিও যাই এখনই ফিরব।

নি।—না, সেখানে কিছুতেই যাওয়া হবে না।

আমার মত্ত-মন বারণ শোনে না। নির্ম্মলাও কিছুতেই যাইতে দিবে না। তখন হঠাৎ আমার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার প্রতি আমার পূর্ব্ব-ঘৃণা পূর্ণমাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলাম,—

'আজি যা ইচ্ছা তাই করব। তুমি আমার গুরু নও যে তোমার আদেশ আমায় মাথায় তুলে নিতে হবে! আমার কাজে তোমার নিষেধ করবার কি অধিকার আছে?'

নি। স্বামীর শুভাশুভের জন্য স্ত্রী দায়ী—স্বামীর পাপ-পুণ্যের স্ত্রী অংশী, অতএব স্বামীর প্রত্যেক কাজে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার আছে। আমি কিছুতেই তোমাকে তোমার সেই পাপ-রাজ্য নন্দন-কাননে যেতে দেব না।

আ।—কি! তুমি আমায় যেতে দেবে না?

আজ সহসা নির্ম্মলার এত সাহস দেখিয়া আমি একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলাম। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সজোরে তাহাকে পদাঘাত করিলাম। উঃ—মানুষের মন ক্রোধ রিপুর বশে কি এতই পশুভাবাপন্ন হয়!

নির্ম্মলা পড়িয়া যাইয়া মাথায় দারুণ আঘাত পাইল। মাথার একস্থান কাটিয়া রক্তও বাহির হইতে লাগিল। আমি তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না। রাগের ভরে তাহার উপর কত কি গালি বর্ষণ করিতে লাগিলাম। এই নির্ম্মলা নয় কিছুদিন পূর্ব্বে আমার জন্য তাহার সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিল। সে কথা তখন আমার মনে আদৌ স্থান পাইল না।

এমন সময় পিতা হঠাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পাশের ঘরে ঝি ছিল, সেই নির্ম্মলার ঐরূপ অবস্থা অন্তরাল হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, নির্ম্মলা মেঝের উপর পড়িয়া ছটফট করিতেছে আর আমি দাঁড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছি। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আর ধীরতার সীমার মধ্যে থাকিতে না পারিয়া ক্রোধরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, নয়নানন্দ, নির্ম্মলা একটি দুর্লভ মনুষ্য-রত্ন। তাকে এক দরিদ্রের মলিন কুটীরে দেখে-ছিলুম—সেখান থেকে আমার ঘর আলো কর্ব্বার জন্য নিয়ে এনেছি। তুমি বিদ্যাবুদ্ধি-হীন, তাই মানুষ চিনবার ক্ষমতাটুকুও তোমার নেই। তা যদি থাকত তাহা হ'লে চিনতে পার্ত্তে নির্ম্মলা কে? সে পিতৃমাতৃহীনা হ'লেও আমিই তার পিতামাতা। আমার অলক্ষ্যে তুমি যে তাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতন কর্ব্বে—তা আমি কর্ত্তে দেব না। আমার যাবতীয় সম্পত্তি তার নামে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাব। আর তোমার দৈনন্দিন যে রকম অবনতি দেখছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস তোমার হাতে বিষয় পড়লেই নষ্ট হয়ে যাবে। এখনও যদি তুমি ভাল না হও, তা' হলে জেনো আমি তোমায় নিশ্চয়ই ত্যাজ্যপুত্র কর্ব্বো।" এই বলিয়া নির্ম্মলার ঔষধের ব্যবস্থার জন্য তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায় এম্-এ, বি-এল্।

বিরহ চিন্তা।

কে যেন আসি' মরমে পশি'
কহিছে ধীরে ধীরে—
এখনও সে বসি' আছে বাতায়নে
আশাহীন আঁখিনীরে।
অমল ধবল অঙ্গে এখনও
পরেনি' গোলাপী সাটী,
এলায়িত কালো কুন্তল রাশি
এখনও বাঁধেনি আঁটি।
আঁধার কুটীর দুয়ারে এখনও
জ্বালেনি' সন্ধ্যাদীপ,
শুভ্র ললাটে পরেনি' এখনও
উজল সিন্দুর টিপ।
এখনও রচেনি নিশীথ শয্যা
ক্ষুদ্র কুটীর মাঝে;
বিহ্বল দুটী সজল নয়ন
কজ্জল মাখা সাজে।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

কবির গান।

কণ্ঠে বীণা কার   উঠিল বাজিয়া
কে সে গাহিল গান?
লাজে অধোমুখ   কুসুম-শয়নে
কে সে ধরিল তান।
ইন্দু সম কার   মোঙরি সে মুখ
হতেছে অথির পরাণ।
ওঙ্কারে ভরিয়া   ধরণী কাহার
মিলায়ে দেয় গো প্রাণ॥
আবেশ আঁখি   গোলাপের মত
(সে কোন্) কাননের আশালতা।
শারদ কুসুমে   চুমিয়া রচে
অমিয় বিভুর গাঁথা॥
লজ্জিত কে সে   আসিতে মন্দিরে
পূজিতে চরণ বাঞ্ছিত।
তরল হাস্য   কাহারি অধরে
দিয়া অর্ঘ্য অভিলষিত॥

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

(১)

দিনু বিসর্জ্জন আজি স্নেহময়ী মায়।
যাও মাগো, এসো ফিরে পুনঃ এ ধরায়॥
রহিব বরষ-ব্যাপি তব প্রতীক্ষায়।
আবার এমনি দিনে এসো মা হেথায়॥

(২)

আকুল পরাণ মাগো! হারায়ে তোমায়।
বাজিছে বিষাদ-স্বর হৃদয়-বীণায়॥
বহেনা আনন্দ-ধারা, আর এ ধরায়।
এসো তুমি, হেথা মাগো! ফিরে পুনরায়॥

(৩)

ঢেকেছে ধরণী আজি গাঢ় কালিমায়।
ডুবিছে নিখিল বিশ্ব, ঘোর স্তব্ধতায়॥
ঘন বিষাদের ছায়া, পড়েছে ধরায়।
এসো তুমি হেথা মাগো, ফিরে পুনরায়॥

(৪)

করি বিসর্জ্জন মায়ে আজি বিজয়ায়।
প্রীতি, স্নেহ-সম্ভাষণ দিতেছি সবায়॥
কাঁদিছে পরাণ মাগো, হারায়ে তোমায়।
আবার এমনি দিনে, এসো মা হেথায়॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধন-সঙ্গীত।

(দ্বিতীয় লহর)

"ভক্তি পাকিলে প্রেম হয়" একথা অনেকেরই মুখে শুনা যায়। নারদ-সূত্রে ভক্তি সম্বন্ধে এই কথা লেখা আছে—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা," ইহার অর্থ ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেমকেই ভক্তি বলে। আবার শাণ্ডিল্য সূত্রে লেখা আছে—"সাপরানুরক্তি-রীশ্বরে" অর্থাৎ ভগবানে পূর্ণ অনুরাগ থাকিলেই তাহাকে ভক্তি বলে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—ভক্তির পরিণতি ভাব,ভাবের পরিণতি প্রেম। পরাভক্তি ভক্তকে ভাবরাজ্যে পঁহুছিয়া দেয়; আবার ভাবের উৎকর্ষ লাভ না হইলে প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। প্রথম থেকেই অদ্বৈত জ্ঞানের সাধনা হয় না, দ্বৈতজ্ঞানের ভিতর দিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে পঁহুছিতে হয়।

দ্বৈতজ্ঞান নিয়ে উপাসনা করিতে বসিলে উপাসক বলে থাকেন "আমি তোমার অর্থাৎ হে প্রভো! আমি তোমার শরণাগত ভক্ত বা দাস; আমাকে তুমি চরণে ঠেলিওনা।" আবার সাধক যখন তীব্র অনুরাগে প্রেমের প্রেরণাতে বলে ফেলেন "দে মা আমায় তহবিলদারী। তারা! তুই ত আমার মা, আমাকে মুক্তি দিবি না।" এখানে দুই শ্রেণীরই কথা বলা হইল, দুজনেই সাধক, তবে একজন ভক্ত আর একজন প্রেমিক। "আমি তোমার" এটা ভক্তি রাজ্যের কথা; "তুমি আমার" এটা প্রেম-রাজ্যের কথা। যিনি ভক্ত, তিনি কুণ্ঠিত; তিনি ভয়ে ভয়ে কথা কন, পাছে প্রভুর চরণে অপরাধ করে ফেলেন। আর যিনি প্রেমিক, তিনি কুণ্ঠিত হবেন কেন? তিনি যে মার আবদারে ছেলে; তাঁর মার উপর জোর আছে আর সে জোর খাটে। সাধন পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েচেন, উপাস্য দেবতার সঙ্গে বিশিষ্টরূপে পরিচিত, তাই প্রেমিকের আবদার। ভাবের আধিক্য না জন্মিলে প্রেম রাজ্যে যাওয়া যায় না, যে সে এরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমিক সাজা যায় না, হব বলিলেই প্রেমিক হওয়া যায় না; প্রেমিক হওয়া বড় সহজ কথা নয়। প্রথমতঃ উত্তম ক্ষেত্রের আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ অধিকারী হওয়া চাই, তৃতীয়তঃ গুরু করা প্রয়োজন, চতুর্থতঃ সাধনা করা আবশ্যক। কোন বিষয় না শিখিলে কি অভিজ্ঞতা লাভ হয়? সকলের ধাতে ভগবত প্রেম সয় না। প্রেমিকের মন এক স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা, তার গড়নই আলাহিদা রকমের; তাই প্রেমিক কবি গাহিতেছেন—

"প্রেম কি সকল ধাতে সয়
প্রেম জানতে হয়, শিখতে হয়,
প্রেম কথার কথা নয়।
আবার প্রেমের গড়ন মন না হলে
প্রেম কি তাতে রয়।"

প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিলে অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, ইহা বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়—এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা আসে। অর্থাৎ সাধককে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রথম উন্মাদ, দ্বিতীয় যুক্ত, তৃতীয় নৈষ্ঠীকী, চতুর্থ বশী, পঞ্চম প্রভু, ষষ্ঠ বিভু। প্রেমে লোককে মাতোয়ারা করে ফেলে, লোক হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়ে পড়ে; প্রেমিকের ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আদৌ থাকে না। এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত প্রেমে পাগল হন, সাধারণ জীবের কথা আর কি বলিব। তাহার দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায়—

"প্রেমে পাগল পশুপতি
প্রেমের দায়ে রমাপতি
গোলক ত্যজে বৃন্দাবনে
নন্দের বাধা মাথায় বয়॥"

প্রেমে পাগল করে সত্য কিন্তু প্রেমের মহা গুণ এই যে প্রেমে ভেদজ্ঞান রহিত হয়, আর সমদর্শন এনে দেয় যথা,—

সম দুঃখ সুখঃ স্বচ্ছঃ সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ।
মানাপমানয়োস্তু ল্যস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ

শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।

ভেদ জ্ঞানটা মায়ারই কাজ; মায়াতে আত্মজ্ঞানকে তিরোহিত করে,আত্মাই আত্মাকে অনাত্ম দেখে; আপন পর ভাব আনা মায়ার খেলা! প্রেমিক যিনি, তিনি মায়ার অতীত হয়েছেন; তিনি সুখ-দুঃখ, লোষ্ট্র-কাঞ্চন, প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, মিত্র-অরি, শীত-উষ্ণ সব সমান দেখেন—তিনি গুণাতীত, তিনি অনাসক্ত, তিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, তিনি ধীর। তাই কবি গাহিতেছেন—

"প্রেমে রয় না ভেদজ্ঞান, স্থান কি অস্থান
জল কি অনল, সুধা গরল হয় সমান।
প্রেমে মান অপমান জ্ঞান থাকে না
সমান ভাব তার সব সময়॥"

প্রেমের রাজ্যে তর্ক যুক্তি নাই; প্রেম তর্কের অতীত। সাধারণ লোক মুক্তি চায়, প্রেমিক মুক্তি চাহেন না। পঞ্চম পুরুষার্থ পাইলেই প্রেমিক কৃতার্থ। প্রেমিকের চক্ষে পাপ-পুণ্য নাই, সুখ-দুঃখ সমান। প্রেমিকে স্থিতপ্রাজ্ঞ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। তাই প্রেমিক কবি গাহিতেছেন—

প্রেম যুক্তি মানে না, প্রেম মুক্তি মানে না,
নিক্তি ধরে ছোট বড়র ওজন করে না,
প্রেমিক পাপ পুণ্য সমান গণ্য
করে দুখে-সুখে সমন্বয়॥"

প্রেমের স্বভাব গূঢ়রহস্য পূর্ণ, প্রেমের ধর্ম্ম বিচিত্র। প্রেমিক তাঁর প্রেমময় প্রিয়দর্শনকে সর্ব্বময় দেখেন। প্রেমিকের মুখে শুনা যায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। প্রেমিকই ভগবানের প্রিয়, তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত; তিনি ব্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে এবং ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্ম হইয়া যান। গীতা সেই কথা প্রমান করিতেছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।
জ্ঞেয়ঃ সনিত্য সন্ন্যাসী যোনদ্বেষ্টিন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।
মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"প্রেমের ধর্ম্ম চমৎকার, ও তার মর্ম্ম বুঝা ভার
প্রেম জড়েতে চৈতন্য দেখে, আলোকে আঁধার
প্রেম নিরাকারের আকার দেখে
আবার সাকার দেখে শূন্যময়॥"

"প্রেম বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখে
এই বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময়
যে প্রেমেতে সৃষ্টি স্থিতি
সেই প্রেমেতে হয় প্রলয়॥"

বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখে, কে ভাই? যাঁর কেবল দিব্য দর্শন ফুটিয়াছে, তিনিই কেবল বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখিতে পান। যিনি জ্ঞানের পরাবস্থায় উঠিয়াছেন, যিনি পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখিতে পান। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কাহার কার্য্য? এ কার্য্য গুণময়ী প্রকৃতির, সত্ব, রজ, তমোগুণের দ্বারা প্রকৃতি এই খেলা খেলিতেছেন। এই তিন গুণ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামে অভিহিত। মহামায়ার শক্তিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর শক্তিবান্। মায়ার খেলায়

ভিতরে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অথবা চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই বিশ্বশক্তি বা প্রাণশক্তি খেলিতেছে, তার ফলে সৃষ্টি হইতেছে, স্থিতি হইতেছে ও প্রলয় হইতেছে। মা তাঁর সন্তানকে বড় ভালবাসেন; সে ভালবাসার গুণে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইতেছে। যিনি প্রেমিক, তিনিই কেবল বুঝেন—সৃষ্টি প্রেমের খেলা, স্থিতিও প্রেমের খেলা, আবার প্রলয়ও প্রেমের খেলা। প্রেমিকের বোধে আসে "যে প্রেমেতে সৃষ্টি স্থিতি, আবার সেই প্রেমেতেই প্রলয়।"

নিম্নে সমস্ত সঙ্গীতটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠক পড়িয়া এই সঙ্গীতের মধুর রস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

রাগিণী হাম্বীর—তাল একতালা।

প্রেম কি সকল ধাতে সয়।
প্রেম জান্‌তে হয়, শিখ্‌তে হয়
প্রেম কথার কথা নয়।
আবার প্রেমের গড়ন মন না হ'লে
প্রেম কি তাতে রয়॥
প্রেমে পাগল পশুপতি, প্রেমের দায়ে রমাপতি
গোলক ত্যজে বৃন্দাবনে, নন্দের বাধা মাথায় বয়।
প্রেমে রয়না ভেদজ্ঞান, স্থান কি অস্থান
জল কি অনল, সুধা গরল, হয় সমান॥
প্রেমে মান অপমান জ্ঞান থাকে না
সমান ভাব তার সব সময়।
প্রেম যুক্তি মানে না, প্রেম মুক্তি মানে না
[illegible] ছোট বড়র ওজন করে না।
প্রেমে পাপপুণ্য, সমান গণ্য
করে দুঃখে সুখে সমন্বয়॥
প্রেমের ধর্ম্ম চমৎকার, কিন্তু তার মর্ম্ম বোঝা ভার
প্রেম জড়েতে চৈতন্য দেখে, আলোকে আঁধার।
প্রেম নিরাকারের আকার দেখে
আবার সাকার দেখে শূন্যময়॥
প্রেমের জন্য ধরাতে, ধরা দেয় না ধরাতে
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেখে ধূলি মুঠিতে।
প্রেম বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখে
এই বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময়॥
কারে বল্‌ব একথা, কেবা বুঝবে একথা,
ব্যথার ব্যথিত নৈলে কেবা বুঝবে এ ব্যথা।
দেখ যে প্রেমেতে সৃষ্টিস্থিতি
সেই প্রেমেতে হয় প্রলয়॥

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্‌-এ।

আমার সুখ।

(গল্প)

গৌরীদানের ফললাভের আশায় জমিদার মনোরঞ্জন বাবু পল্লীগ্রামের এক ধনবান গৃহস্থের ঘরে নবম বর্ষীয়া মেয়ে কমলার বিবাহ দিলেন। কিন্তু হায়,—বিবাহের এক মাস পরে তিনি যে সংবাদ শুনিলেন, তাহাতে মেঘ হইতে ভীষণ অশনি-সম্পাতের ন্যায় তাঁহার বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়াছিল। তিনি শুনিলেন,—'জামাইটী কলেরা রোগে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।' কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহেন আর অশ্রুজলে ভাসেন। হায়, —

এত স্নেহের—এত আদরের ননীর পুতলী কমলার আজ এই দশা। হায় অভাগিনী আজ চিরতরে দুঃখ-সাগরে ভাসিল,—তার মুকুল-জীবনেই সুখ-শান্তি সব ফুরাইয়া গেল। নিঠুর নিয়তির একি নির্ম্মম বিধি?—শোক-সন্তপ্ত মনোরঞ্জন বাবু মেয়েকে বুকের মধ্যে টানিয়া অশ্রু উচ্ছসিত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মা ভাবনা কি? আমার বিশাল জমিদারী আছে; তুমি যা'তে সুখী হও, আমি তাই করব।"

হায়, অভাগিনী কমলা বুঝিতে পারিল না যে আজ তার কি মহা সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। সে জ্ঞানহীনা বুঝিবেই বা কিরূপে?—সে শুধু ধূলাখেলা করিতে জানে, স্বামী যে ইহকালের দেবতা, পরকালের সর্ব্বস্ব, অনন্ত কালের সুখ তাহা তো আর সে জানে না? পিতাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে-ও উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল।

পিতা স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন,—"কেঁদো না মা! কেঁদোনা, যা'তে তুমি সুখী হও, আমি তাই করবো!"

কমলা বাল্য-জীবনেই বৈধব্যকে আলিঙ্গন করিল বটে, কিন্তু স্নেহময় পিতা তাহাকে বৈধব্যের আচার-নিয়ম পালন করিতে দিলেন না।

একমাত্র দুহিতা ব্রহ্মচারিণী বেশে সাজিবে, সে শোচনীয় দৃশ্য তিনি পিতা হইয়া কেমন করিয়া চোখে দেখিবেন?—সুতরাং কমলা কিছুই ত্যাগ করিল না;—সাড়ী, সেমিজ, চুড়ি, স্বর্ণালঙ্কার, সুগন্ধি তৈল ও তাম্বুল আলতা সবই ব্যবহার করিতে লাগিল। কেবল ললাটে সিঁন্দুর-বিন্দু এবং মণিবন্ধে লোহার খাড়ো ব্যবহার ত্যাগ করিল;—বাকী সর্ব্বাঙ্গেই সধবা-বেশ। সে পঞ্চ ব্যঞ্জনের সহিত দুইবেলা আহার করিতে লাগিল। এক কথায় সে সধবার বেশে বিধবা হইয়া রহিল!

মনোরঞ্জন বাবু কমলাকে সুখী করিবার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইলেন;—কি করিলে কমলা সুখী হইবে? কমলাই যে তাঁহার সব। অবশেষে স্থির করিলেন;—যে প্রকারে হউক কমলার পুনরায় বিবাহ দিবেন। যদি কমলা তাহাতে সুখী হয়, তিনিও তাহাতে সুখী।

(২)

নদীর স্রোতের ন্যায় জীবন-স্রোত ক্রমাগত বহিয়া চলে; কোন বাধা-বিঘ্ন মানে না—ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। এইরূপে কমলার জীবনের পাঁচটী বৎসর চলিয়া গেল। কমলা এখন আর তেমন ক্ষুদ্র বালিকাটী নাই; ঊষার ললাটে তরুণ-অরুণের প্রথম কিরণচ্ছটার ন্যায়, তাহার কমনীয় দেহে নব যৌবনের লাবণ্য-বিভা ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইতেছিল। এ-হেন কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মানা বিধবা কিশোরীর সধবার বেশ দেখিয়া পাড়ার সূক্ষ্মদৃষ্টিশালিনী রমণীগণের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণ দুঃখ করিয়া বলিল—"কলিকাল! একবারে ঘোর কলিকাল!!—ঘোর কলিকাল!!!"

পিতার আদেশ অনুসারে কমলার প্রত্যহ কেশবিন্যাস করিতে হয়; মুখুয্যেদের মেজ

মেয়ে সরলা আসিয়া কমলার কেশবিন্যাস করিয়া দিয়া যায়। কমলা ও সরলার মধ্যে খুব সখীত্ব ভাব। উভয়ে উভয়কে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।

বৈকালে সরলা আসিয়া কমলার কেশ-বিন্যাস করিতে বসিল; কেশবিন্যাস করিতে করিতে সরলা বুঝিল—কমলা কাঁদিতেছে। সরলা বলিল—"ছি, সই! কাঁদ্‌ছিস্।"

কমলা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া বলিল—"সই! মেয়ে মানুষ বিধবা হ'লে মরে না কেন?—শুধু নীরস বিশুষ্ক ব্যর্থ জীবন-ভার বহিয়া লাভ কি? আমি যদি মরতুম।"

কমলার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল। সরলাও কাঁদিয়া ফেলিল।—অনন্তর বস্ত্রাঞ্চলে কমলার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া সরলা বলিল—"কাঁদিস্ না সই। কাঁদিস্ না, কেঁদে কি হবে? সেই অনাথের নাথ জগত-স্বামীকে ডাক্; বিরহ-ব্যথিত প্রাণে শান্তি পাবি।

কমলা—"সই যে রমণী বিধবা, তার ভোগ বিলাসিতা কেন? বিধবা,—বিধবা-বেশেই থাকিবে, বিধবার আচার-ব্যবহারই করিবে।—বিধবা সধবার আচার-ব্যবহার করিলে জীবন কলুষিত হয়, মন কুপথগামী হয়,—অন্তে অনন্ত নরক ভোগ করে।

সরলা—"সই! তুই এত জানিস্ তবু ক্ষণ-স্থায়ী ঐহিক সুখে মুগ্ধ হয়ে পরকাল নষ্ট করছিস্?

কমলা—"এতদিন তা জান্‌তাম না।"

সরলা—"আর এক কথা শুনছিস্ সই?"

কমলা—"কি?"

সরলা—"সারা পাড়াময় ঢি ঢি পড়ে গেছে।"

কমলা—"কিসের?"

সরলা—"তুই সধবা-বেশে থাকিস্, রোজ দু'বেলা মাছ খাস্, একাদশী করিস্ না—"আর—"

কমলা—"আর কি সই?"

সরলা—"আর তোর বাপ নাকি তোরে আবার বিয়ে দিবেন?"

কমলা—"তা'ও কি হয়?—আমি হিন্দু রমণী—হিন্দু রমণীর এক বই দুই ভাবাই পাপ! সই! আমার কপালে যদি স্বামী-সুখ থাকৃত তা হ'লে তিনি আমায় ছেড়ে যেতেন না। জানিস তো সই! আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে আছে—'বিবাহিতা নারীর জীবনে-মরণে স্বামীই সব—চিন্তা-ধ্যান-জ্ঞান স্বপ্ন!"

সরলা—"তিনি তোমার সুখের জন্য আবার তোমার বিয়ে দিবেন।"

কমলা—"হিন্দু নারীর ক'বার বিয়ে হয় সই? তুই মাকে বলিস্, মা যেন বাবাকে ওরূপ ভয়ঙ্কর বিপরীত কাজ কর্‌তে মানা করেন। তুই আর আমার চুল বাঁধতে আসিস্ না। এ চুল পুড়িয়ে ফেল্‌ব, হাতের চুড়ী ভাঙ্‌ব, পেড়ে কাপড় ছাড়ব, তৈল-আল্‌তা নদী-জলে ফেলে দিব। আমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী-বেশই আমায় মানাবে ভাল।"

সরলা—"সেই ভাল।"

(৩)

কমলা নিজের ঘরে গিয়া অলঙ্কার খুলিল, হাতের বেলোয়ারী চুড়ী ভাঙ্গিল, কাঁচি দ্বারা

ফুলেল-সিক্ত অলক-গুচ্ছ কাটিল, পার্শীসাড়ী ছাড়িয়া একখানি নূতন থান কাপড় পরিল। এতদিনের পর বাল-বিধবা কমলা প্রকৃত বিধবা-বেশ ধারণ করিল।

মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার সাধের মেয়ে কমলার বৈধব্য-বেশ দেখিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন—অশ্রু-আবেগ-কণ্ঠে কহিলেন—"এ সাজ আজ তোমায় কে সাজালে মা?"

কমলাও কাঁদিয়া ফেলিল,—বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন জল মুছিয়া বলিল—"এ সাজ আমি নিজেই সেজেছি বাবা!"

পিতা—"কেন, কেন মা! তোমার ঐ সুন্দর দেহে এ সাজ কি ভাল দেখায় মা?"

কমলা—"বাবা! আমি যে বিধবা;—বিধবার এ সাজ-ই ত ভাল দেখায় বাবা!—বাবা বিধবার পোষাক-পরিচ্ছদের কি দরকার? শরীরের সৌষ্ঠব-সাধনাপেক্ষা, আত্মার সৌন্দর্য্য-বিধানে অধিকতর যত্ন করা উচিত নয় কি বাবা?—আত্মা-পাখী, দেহ-পিঞ্জর, দুইয়ের মধ্যে কোনটি ভাল হওয়া উচিত? পাখীটি না পিঞ্জরটি?"

পিতা—"মা! তুমি এখনও যে ছোট-"

নির্ম্মলা—"না বাবা! আমি আর এখন ছোট নই, এতদিন ছোট ছিলুম, তাই বুঝতে পারি নাই। এখন বড় হয়েছি—জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, এখন সব বুঝতে পেরেছি। এতদিন কেবল পাপ সঞ্চয় করেছি।' কেন বাবা! তুচ্ছ বিলাসিতা-সুখে পরকাল নষ্ট করবো?—ঐহিকের সুখ ক'দিন?"

মনোরঞ্জন বাবু মনে মনে বলিলেন—"তাই ত ক'দিন?"

কমলা—"বাবা!"

পিতা—"কি মা?"

কমলা—"এক কথা শুনলুম, সত্যি কি?"

পিতা—"কি কথা মা?"

কমলা—"আমার নাকি আবার বিয়ে দিতে চান?"

পিতা—"হাঁ, মা! তোমায় সুখী করিতে আবার তোমায় বিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছি।"

কমলা—"তাতে আমি সুখী হবো না।"

পিতা—"কেন মা?"

কমলা স্থিরনেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"বাবা! এক আকাশে দুই সূর্য্য থাকে না, এক হৃদয়ে দুই জনের স্থান হ'তে পারে না। হিন্দু-রমণী এক জনকে হৃদয় দান করে, পরে তাহা অন্যকে সমর্পণ করলে, দ্বিচারিণী হয়, এ উপদেশ ত শৈশবে আপনার কাছেই পেয়েছি! আর আপনিই তো বলেছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" তবে কেন বাবা! তুচ্ছ সুখের জন্য নারী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব?

পিতা—নীরব?

কমলা—"বাবা! আমি যে মোহে এতদিন আচ্ছন্ন থেকে হিন্দু-বিধবার আচার-নিয়ম পালন করি নাই। আজ আমার সে মোহ কাটিয়াছে। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি—"বিধবার ব্রহ্মচারিণী-বেশে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করাই উচিত।"—ভোগ-স্পৃহা, লালসা-বাসনা সব ত্যাগের অনলে পোড়াবো,—আজ হ'তে কঠোর সংযম পালন করবো!

—এক সন্ধ্যা হবিষ্যি কর্‌বো, একাদশীর দিন একাদশী কর্‌বো, কম্বলাসনে শুবো। আর —আর ভক্তি-কুসুম অশ্রু চন্দন মাখায়ে স্বর্গগত স্বামী দেবতার শ্রীচরণোদ্দেশে অর্ঘ্য দিব।"

পিতা—"ননীর পুতলী মা আমার! তোমার কপালে এত দুঃখ-কষ্টও ছিল?

কমলা—"দুঃখ কষ্ট কি বাবা। বিধবা-জীবনে ইহাই—আমার পরম সুখ।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

গয়ার ইতিহাস।

(মুসলমান যুগ)

বিহারে মগধরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আফগণ বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে সহজেই জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বহুবার ভারত লুণ্ঠন করিয়া রাজন্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া হিন্দুশক্তিকে এককালীন ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অপরিজ্ঞাত নাই। কালিঞ্জর, দিল্লী, কান্যকুব্জ, দ্বারিকা প্রভৃতি বার-বার লুণ্ঠন ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলি ভগ্ন করিয়া দেবস্থান হইতে বহু ধনরত্ন পাইয়া বক্তিয়ার মনে করিয়াছিলেন যে গয়ার বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ভগ্ন করিয়াও সেইরূপ প্রভূত ধনরত্ন পাইবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা নানা কারণে ফলবতী হয় নাই; মগধে যে সকল বৌদ্ধ বিহার, চৈত্যক, স্তূপাদি ছিল তাহাই তিনি ভগ্ন করেন কিন্তু আশানুরূপ ধনাদি প্রাপ্ত হন নাই! তাঁহার অমানুষী জিঘাংসা ও অত্যাচারে বহু বৌদ্ধাশ্রম ও নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ অধিবাসিগণ হত হইলেন, কেহ কেহ নেপাল, দক্ষিণদেশ বা তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অপরে কোন উপায় না দেখিয়া বিজেতৃগণের ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা আমরা তাৎকালিক সমসাময়িক ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি। এই হইতে গয়া বা মগধের ইতিহাস মুসলমানরাজগণের সুবা বিহারের ইতিহাসের সহিত জড়িত হইল। খৃষ্টীয় তের শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মেওয়ার রাজগণ বহুবার গয়া তীর্থ ভূমিটীকে যবন ও তুর্কীগণের হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে শেষে রাণা সঙ্গ তাহা পাঠানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেকথা আমি ইতিপূর্ব্বে মোহর চৌধুরীর পূর্ব্বলিখিত প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছি। বক্তিয়ার খিলিজি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী মুসলমান রাজার শাসন কালে বিহারের দক্ষিণ ভাগকে (যাহা প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যকে আলিঙ্গন করে) বঙ্গ সুবে-দারির অধীনে স্থাপিত করা হয়। দাস বংশীয় সম্রাট আলতামশের শাসন কালে ১২২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার সিংহাসন আলাউদ্দিন জানি নামক এক সাহসী শাসকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর পুনরায় দক্ষিণ-বিহার বঙ্গের সহিত যুক্ত হয় এবং পরে সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তোগলক ইহাকে পৃথক শাসকের অধীনে রাখেন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর

সম্রাটের আদেশ মত মগধ রাজ্য জৌনপুর সুবার সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। এই সময় অনেক মুসলমান পাঠান ভদ্রলোক গয়ায় জাইগীর প্রাপ্ত হন। এবং ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইহা সাসেরাম নিবাসী ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাঠান সামন্ত শেরসাহের অধীনে রাখা হয়। এই শেরসাহ ভূপতি মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তাড়াইয়া দিতে ক্রুটী করেন নাই, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। ক্ষণস্থায়ী শেরসাহ বংশের অধঃপতনের পর হুমায়ুন দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইলে পর বিহার পুনশ্চ পৃথক "সুবায়" বিভক্ত হইল এবং ইহার শাসনবিধি পরিচালন জন্য দিল্লী হইতে একজন করিয়া শাসক নিযুক্ত হইয়া আসিতেন এবং পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটগণের অধীনে ইহাকে বঙ্গ সুবেদারীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অতঃপর গয়া জেলার ভাগ্যচক্র মুর্শিদাবাদের নবাবীর সহিত ঘূর্ণিত হইতে থাকে। বিহারে একজন মুর্শিদাবাদের সুবেদারির অধীনে সহকারী শাসক থাকিয়া রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালন করিতে থাকেন। মোগল সম্রাটগণের রাজত্ব কালে কেবল গয়া জেলা নহে, বর্ত্তমান ছোটনাগপুর প্রদেশের কতকাংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান পালামু ও হাজারিবাগ জেলার অংশ বিশেষ গয়ার অধীনে ন্যস্ত ছিল; পরে সাসেরাম বা রোহতাস সরকারের অধীনে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপিত হয়। সেইজন্য গয়ার ইতিহাস লিখিতে যাইলে গয়াজেলার সংলগ্ন জাপলা, ডেবা, পাহাড়ি, বিলৌঞ্জা, ডালটনগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটী পরগণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়। জাপলা প্রভৃতি পরগণা পূর্ব্বে গয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা ক্রমশ পরে বর্ণনা করিব। ছোটনাগপুরের প্রাচীন নাম "কোকরা"। ছোটনাগপুর অতি প্রাচীন কাল হইতেই বন্য অসভ্য চেরো, কোল, খরোয়ারদের আবাস-ভূমি হইয়াছিল। রামগড় ইহা র রাজধানী ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এগুলি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়াবাসভূমি হইয়া উঠে। সম্রাট আকবরও হুমায়ুনের সময় হইতেই এদেশে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাগণ আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়া পার্ব্বত্য উচ্চপ্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করত বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সামন্তরাজরূপে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সহজে এই সকল প্রদেশ অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। এই সকল দেশের আদিম কোল, ভীল, চেরো, ওরাঁও, খরোয়ার অধিবাসীগণকে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর এই দেশ হইতে আরও দক্ষিণে সিরগুজা, হুটর, কোঠীকুন্দা, বিশরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাড়াইয়া পরে ইঁহাদিগকে এই দেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। এই সকল সামন্তরাজগণের সোনপুরা, নগর-উটারি, দেওর রাজবংশ, পাওয়াইর সামন্তরাজগণ, পালামুর নাগবংশী রাজগণ এবং রঙ্কাচৈনপুরাদির রাজবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোনপুরার সুরুয়ার (সরযু পারস্থ রাজপুত ক্ল্যান বা বংশ) হইতে কাধোয়ানের বাবুয়ান এবং ভোগ্য

পত্নীর গর্ভসম্ভূত সাঁড়কীর বাবুয়ান বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। রক্সাবাজ সোনপুরার জাতি। চৈনপুর আদীম পালামু দুর্গের অধিকারী রাজা গোপাল রায়ের ভাণ্ডারিবংশ সম্ভূত। এই সকল রাজবংশ সমূহের সংগৃহীত বিস্তৃত ইতিহাস পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

ছোটনাগপুর প্রদেশের রত্ন সম্ভারের যশ ও গুণগরিমা অতি প্রাচীন কাল হইতে উপগীত হইয়া আসিতেছে। সিংভূমি ও মানভূমি প্রভৃতি জেলার মধ্যে খনিজরত্ন যেমন বেশী ও অধিক মাত্রায় আছে, পালামু ও হাজারিবাগ জেলায় সেরূপ না হইলেও এ জেলা দুইটীর মধ্যে হাজারিবাগ ও গয়া জেলার অভ্রখনি সকলের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পালামু জেলার মধ্যে কয়লা এবং হীরকখনির কথা শুনা যায়। হীরক সম্বন্ধে টভারনীয়াবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটগণের সময়ের ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত পালামুজেলার বিখ্যাত হীরকখনির কথা জানিতে পারা যায়। ইহা এখন লুপ্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা বিষয় পরে লিখিত হইতেছে। ইংরাজ শাসনাধিকারে পালামু জেলাটিকে প্রথমে গয়া জেলার অধীনে এবং পরে লোহারদাগা জিলার অধীনে একটি মহকুমারূপে স্থাপিত করা হয়, কিন্তু ১৮৯২ সাল হইতে ইহাকে রাঁচির অধীনে রাঁচি কমিশনারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সিভিলিয়ান ডেপুটী কমিশনার, সবজজ, কলেক্টার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে সম্পূর্ণ শাসন ভার ন্যস্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত করিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। মোগল শাসনকালে এই জেলার ইতিহাস আর স্বতন্ত্র থাকে নাই। সে সময়ে এই প্রদেশ বনে পরিপূর্ণ ছিল, অধিবাসীরও সংখ্যা খুব স্বল্প ছিল বলিয়া এই দেশের ভাগ্যচক্র গয়া জেলায় ইতিহাস ও ভাগ্যচক্রের সহিত ঘূর্ণিত হইতে থাকে। *

পাঠান ও পূর্ব্ব মোগল সম্রাটগণের শাসন কালে গয়ার সম্বন্ধে যৎ সামান্য কথা পূর্ব্বে গয়ালী এবং শোহরচন্দ্র চৌধুরীর উপাখ্যান প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সময় গয়া বা মগধ বঙ্গের সুবেদারের অধীনে ছিল—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সময়ে সময়ে স্থানীয় সামন্তগণ প্রবল হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব নাজীম বাহাদুরকেও অগ্রাহ্য করিয়া নিজেরা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে ক্রটী করিত না। কাজেই অনেক সময়ে গয়া এবং পালামুর সামন্ত রাজগণ নামে মাত্র মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন; যখন মোগল সৈন্য ইঁহাদিগকে পীড়াপিড়ী করিয়া ইঁহাদের পার্ব্বত্য দুর্গ সকল অবরোধ করিত, তখনই বশ্যতাস্বীকার করিয়া ২৫ বৎসর কর ও রাজস্ব দিতেন এবং সুবিধা পাইলেই "যে কে সেই" হইয়া দাঁড়াইতেন। বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব কালে গয়া ও পালামুজেলা প্রকৃত মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আইসে।

১। কর্ণেল ই এক ডালটনের ডিসক্রিপ্টিভ্ এথনোলজী অব্ বেঙ্গল, ২। স্যার এইচ্ ইলীয়টের ভারত ইতিহাস চতুর্থ ভাগ, ৩। ব্রকম্যান সাহেবের নোট J. A. S. B. Volxl Part I দ্রষ্টব্য।

পালামুজেলার মধ্যে কোকরা খনি এখন কোথায় তাহা স্থির করা কঠিন হইলেও সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে মতামত তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। গয়া জেলার মধ্যে দেওর রাজ ভৈরবচন্দ্র দেব ও ভানুসিংহ দেব, রামগড় রাজ, মালী ডালী ও পাওযাইর পূর্ব্ব রাজগণ, সোনপুরা রাজের পূর্ব্ব পুরুষগণ, ছোট নাগপুর কিলার মহারাজা মধু সিংহ প্রভৃতি সামন্তগণ মোগল সম্রাট আকবরকেও রাজস্ব দানে বঞ্চিত করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। অবশেষে বাদসাহ সুবা বেহারের শাসক সাইস্তা খাঁকে এই সামন্তগণের দমনের জন্য হুকুম দিয়া স্বয়ং মহারাজা মানসিংহকে উড়িষ্যা বিজয়ের জন্য পাঠাইয়া দিয়া, বিহার ও পালামু হইয়া সায়েস্তা খাঁকে পথে শত্রু দমনে সাহায্য করিয়া লইতে আদেশ প্রদান করিলেন। ছোট নাগপুর দুর্গে এই সময়ে ১৫৭০-৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মধু সিংহ, দেও-উমগা দুর্গে মহারাজ ভৈরবচন্দ্র দেব, পাওয়াই গড়ে মহারাজ ভানুপ্রতাব সিংহ, সোনপুরা দুর্গে মহারাজ দম্বর নাথ সাহী দেব, রামগড় দুর্গে মহারাজ দেবেন্দ্র বিজয় প্রতাবসিংহ দেব প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ গয়া, হাজারিবাগ এবং পালামু জেলার দক্ষিণ অংশটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া মোগল শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন রাজার মত শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। সায়েস্তা খাঁ মহারাজ মান সিংহের সহিত সংযোজিত হইয়া প্রথমে পাওয়াই রাজকে শাসন করিয়া ১৫৮৫ সালে পালামু রাজ মধুসিংহকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইঁহার সহিত আকবরপুর ঘাটের নিম্নে একটি বড় যুদ্ধ হয়, তাহাতে পালামুরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এই সময়ে উৎকল প্রদেশ সমূহ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ মানসিংহ এই অভিযানের সম্পূর্ণ ভার সুবাদার সায়েস্তা খাঁর হস্তে দিয়া উড়িষ্যার পাঠান বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বৰ্দ্ধমানাভিমুখে সাসেরামের পথে প্রয়ান করিলেন, সাসেরাম হইয়া তিনি আওরাঙ্গবাদ দিয়া রাণীগঞ্জের সন্নিকট পাকী ইন্দারার মহলে "দৈগুকুচ" করেন। এই স্থানে "তাম্বুগাডার" কথা শুনিয়া দেও-উমগা রাজ ভৈরবচন্দ্রের পুত্র রাজা ভানুসিংহ বহু উপঢৌকন ও স্বর্ণরৌপ্যাদি সহ আসিয়া মহারাজ মানসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়া মোগল বাদসাহ সাহসসাহ সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদ হন। মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বাদসাহের নিকট হইতে ফারমান আনাইয়া দেন। এই হইতে দেও রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এই রাজ্য রাজা দুর্দ্দামা সিংহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা উমগার প্রস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। ভানুসিংহ দেব হইতে পঞ্চদশ পুরুষ অধস্তন রাজা জগন্নাথ প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেও সিংহাসনের বর্ত্তমান অধিকারী হইতেছেন, ইঁহারা সূর্য্য-বংশের শাখা সিসোদীয়া পরিবার ভুক্ত রাজ-

পুত হইতেছেন। দেও দমন করিয়া মহারাজ মানসিংহ সেরসাহর "বাদসাহী সড়ক" হইয়া দামুয়া ভালুযা অতিক্রম করিয়া ১২ দিনে বর্দ্ধমান পঁহুছিয়া, সেখান হইতে সুতানতি গোবিন্দপুর হইয়া তথাকার মাহিষ্য মণ্ডলের পথ প্রদর্শনে * এবং সুদর্শন শ্রেষ্ঠীর কমিশেরিয়েট বন্দোবস্তে হাবড়া জেলার সীমা প্রদেশে গড় মান্দারণ দুর্গের সন্নিকট পাঠান রাজ কত্‌লু খাঁর সহিত তিন দিন তুমুল যুদ্ধের পর নবাব কত্‌লু খাঁকে নিহত করিয়া উড়িষ্যা দেশ পুনরায় মোগল করায়ত্বে আনয়ন করিয়া রাজ প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এ দিকে সাইস্তা খাঁ পালামুর দিকে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান লেশ্‌লি গঞ্জ ও ছেছারির সন্নিকট স্থানে বিপক্ষ দলের সহিত যুদ্ধে রত হন, কিন্তু ঐ যুদ্ধে মোগল বাহিনী না হটিলেও নবাব শাইস্তা খাঁ (বিহার সুবার গভর্ণর) বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইলে গয়া হইয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পরে নবাব জবরদস্ত খাঁ দিল্লীর সম্রাটের ফারমানে বিহারের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ১৮৮৫ সালের শেষ ভাগে পালামুদুর্গ অবরোধ করিলে রাজা মধুসিংহ মোগল রাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদ হইলেন। তিনি একদল সৈন্য লইয়া মহারাজ মানসিংহের সহিত উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনে ১৫৯১ সালে তাঁহার অধীনে একহাজারি মনসব্‌দাররূপে খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বাদসাহ আকবরের ১৬০৫ সালে মৃত্যুর পর, মোগল সাম্রাজ্যে কে সম্রাট হইবে ইহা লইয়া দিল্লীতে সামান্য গোলযোগ উপস্থিত হইলে গয়া ও পালামুর সামন্ত রাজগণ পুনরায় মোগল শক্তিকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে বিস্মৃত হয় নাই।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি-এল।

* সরকার বংশের ইতিহাস দেখ। মাহিষ্য প্রকাশ প্রথমভাগ ৩৩৩ পৃঃ।

গুরুমন্ত্র।

আজ আমরা বিদেশে—পরবাসে। স্বদেশের মায়া-মমতা ভুলিয়া প্রবাসের মায়া-মোহে মুগ্ধ হইয়াছি। কাম-কান্তার মোহবশে দিশা-হারা হইয়া ঘরের পথ বিস্মৃত হইয়াছি, ভুলেও একবার সে পথের অনুসন্ধান করি না। মোহঘুম ঘুচিলেও—সময়ে সময়ে প্রাণের চমক ভাঙ্গিলেও এখন গৃহে যাইবার ইচ্ছা হইলেও যাইতে পারি না, এমনি ভুল, এমনি ভ্রান্তি, এমনি মোহ, এমনি ক্লান্তি। পৃথিবীর মায়া মোহ, এখনকার কামনা-বাসনা, এখনকার সুখ-সৌন্দর্য্য আমাদিগকে এতই মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে আমাদের বাড়ী যাইবার ভাবনা ভাবিতে দেয় না, এখানকার প্রলোভন মুগ্ধ হইয়া আমরা একেবারে আপন-হারা, ঘরের মায়া-মমতা ছাড়া হইয়াছি।

পার্থিব গৃহ যে আমাদের গৃহ নয়, ইহার সুখৈশ্বর্য্য যে আমাদিগকে চিরদিন সন্তোষে রাখিতে পারিবে না ; একদিন না একদিন যে ইহার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া ঘরের দিকে ছুটিতে হইবে, তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই

ভাবেন না, ভাগ্য ক্রমে যদিও কখন সে ভাবনা কাহার কাহার মনে উদয় হয়—কিন্তু এমনি ভ্রমভ্রান্ত হইয়াছি, দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ঘরে যাইবার পথ এমন ভাবে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে তাহার আর কিছুই মনে নাই, ঠিক বিদেশীর বেশে নিতান্ত দীন দুঃখীর মত এখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি। আমরা যে অমৃতের সন্তান, রাজরাজেশ্বরী যে আমাদের মা, নিত্য সুখপূর্ণ আনন্দধাম যে আমাদের গৃহ, সেখানে থাকিলে যে কোন অভাবই থাকে না, সময়ে সময়ে তাহা আমাদের মনে পড়ে কিন্তু উপায় ত নাই, যাইবার ত শক্তি নাই, পথ যে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কামনা-কান্তার প্রেমে মজিয়া অশান্তি, অধর্ম্ম পুত্রগণের জ্বালাতনে ইতোনষ্ট, ততো-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, পদে পদে ভুল, পদে পদে ভ্রান্তি আসিয়া আমাদিগকে জড়িত করিতেছে, সময়ে চমক ভাঙ্গিলেও পথ খুজিয়া পাই না—এমনি দিশাহারা হইয়াছি।

ভারত যুদ্ধের সময় হইতে মহারাজ পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণের পর আর্য্য বংশের ধ্বংশাবশেষের সময় হইতে আমাদের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে, বিদেশের পথে পথে আমরা নিতান্ত দীন দরিদ্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তখন ইচ্ছা করিলেই গৃহাভিমুখে ফিরিতে পারিতাম, এখন আর তাহা পারি না, প্রবাস-প্রেমে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—সব ভুলাইয়া দিয়াছে, আমি কে, আমার কি; কোথায় আসিয়াছি, যাইব কোথা, কিছুই মনে নাই।

যখন পথ ভুলিয়াছি—তখন একজন পথপ্রদর্শক ত চাই—নতুবা স্বদেশও স্ববাসে যাইবার ত উপায় নাই? একজন জানাশুনা, শক্তি-সামর্থ-বান পরিচিত লোক পথ দেখাইয়া না দিলেত যাওয়া যায় না? কবি বলিতেছেন—

"মন চল নিজ নিকেতনে;
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।
সত্য রথে মন কর আরোহন—
প্রেমের আলোক জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পূণ্য ধন
যতনে অতি গোপনে।
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম,
শ্রান্ত হলে তাহে করিও বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থ নিবাসী জনে।

এই পান্থ নিবাসীজন গুরু রূপে, পথ প্রদর্শকরূপে পান্থ ধামে অহরহঃ বিরাজ করিতেছেন, আমরা ঘরের পথ ভুলিয়া গেলে ইঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার কিনারা হইবে, ইঁহারা মহাশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সকল স্থানের পথ-ঘাট ইহাদের জানা আছে, তুমি অসমর্থ অজ্ঞ হইলে—ইহারা তোমাকে নিজের শক্তির দ্বারা শক্তিমন্ত করিয়া পথের কথা কহিয়া দিবেন, তোমার অবস্থা জানিয়া, তোমার শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়া এমন একটী মন্ত্রের ব্যবস্থা দিবেন, যাহা তোমাকে সোজাসুজি লইয়া তোমার গন্তব্য স্থানে, তোমার ইপ্সিত আলয়ে, তোমার চির-পরিচিত গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে। অজানা পথে গিয়া আর ঘুরিয়া

ফিরিয়া মরিতে হইবে না। যিনি ঐ শক্তি সমন্বিত মন্ত্র দিবেন—তিনি স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ, আর যাহা তোমাকে বলিয়া দিবেন—যে মন্ত্রে তোমায় প্রবুদ্ধ করিবেন—তাহাই গুরুমন্ত্র। গুরু প্রাণ খুলিয়া তোমায় সজীব মন্ত্র প্রদান করিলে ত্রিজগতে তোমার আর ভাবনা কি? তুমি যে খানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে, যাহা ইচ্ছা করিতে তোমার ক্ষমতার অভাব হইবে না। যে বীজটী তিনি মন্ত্ররূপে তোমার কর্ণে প্রদান করিবেন—তাহাই তোমার ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র; গুরু ও ইষ্ট-দেবতায় অভেদভাবে ভাবিতে পারিলেই নরের ইষ্ট প্রাপ্তি অনিবার্য্য।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র মন্ত্র গ্রহণের আবশ্যক ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কেবল ব্রাহ্মণে-তর জাতিই দীক্ষিত হইতেন, ব্রাহ্মণের সাবিত্রী শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল—অন্য মন্ত্র গ্রহণের তত আবশ্যক হইত না। তারপর কলির প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ শক্তিহীন হইলে ভগবান সদাশিব জীবের মঙ্গলের জন্য তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন করিয়া মঙ্গলময় নামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করেন। সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির দীক্ষা বিনা কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, এমন কি অদীক্ষিত নর-নারীর হাতের জল শুদ্ধ নহে। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত হইলে রৌরব নরকে যাইতে হয়।

যে দিন হইতে শক্তি কম হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, যেদিন হইতে অধর্ম্ম-অশান্তি, পুত্র ক্রোড়ে কাম কান্তার বশীভূত হইয়া আমরা প্রবাসবাসী হইয়াছি, ঘরে যাইবার ইচ্ছা, ঘরে যাইবার পথ ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে সর্ব্বমঙ্গলময় দেবাদিদেব আমাদের উদ্ধারের জন্য নূতন পন্থার আবিষ্কার করিয়া পুত্র বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতকে ধন্য করিয়াছেন। এক্ষণে এই সদাশিব প্রদর্শিত তান্ত্রিক মতে গুরুকরণ, দীক্ষাগ্রহণ আপামর সাধারণ সকলেরই কর্ত্তব্য।

সত্যযুগে বেদবিহিত, ত্রেতাযুগে স্মৃতির মতে এবং দ্বাপরযুগে পুরাণের বিধিমতে কার্য্য করিতে হইত। এইজন্য তখন ব্রাহ্মণগণকে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইত—স্বতন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবার আবশ্যক হইত না, কলিতে সে শক্তি ক্ষয় হওয়ায়—শূদ্র যজনাদির দ্বারা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, বৈদিক কার্য্য কার্য্যকরী হয় না, এইজন্য তন্ত্রমতে দীক্ষাগ্রহণ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার।

প্রত্যেক জীবাত্মা'ই এক সময় না এক সময় মুক্ত হইবে, তবে সে কতকাল পরে, কত মন্বন্তরের অন্তরে; কত প্রলয়ের প্রলয়ে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। আমরা যেমন কর্ম্ম ও যেমন চিন্তা করিতেছি, তেমনি দেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার ফলভোগ করিতেছি। গত জন্মে যাহা করিয়াছি, এক্ষণে তাহা ভোগ করিতেছি, এজন্মে যাহা করিব, পরজন্মে তাহা ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফলে আমরা উচ্চগতি লাভ করিতে পারি—আবার অধোগতিও লাভ হওয়া সম্ভব—সকলেই আমাদের ইচ্ছাকৃত। সৃষ্টির জীব মাত্রেই সংস্কারের অধীন কিন্তু মানুষ সংস্কারের অধীন হইলেও প্রজ্ঞাবলে আপন

ইচ্ছায় চলিতে পারে। সেই ইচ্ছাশক্তিকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য এখন আমরা অপারক বলিয়া কোন শক্তিমান ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক, যখন আমরা এই সাহায্য প্রাপ্ত হই—তখনই আত্মার উচ্চতর শক্তি ও অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে। আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হয়, ত্বরিত গতিতে উহার ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া সাধক শুদ্ধ স্বভাব ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

আত্মার এই শক্তি সঞ্চার এই ক্রমোন্নত অবস্থা কেবল বই পড়িয়া কিম্বা দর্শন-বিজ্ঞানের জটীল তত্ত্ব ঘাঁটিয়া সঞ্চয় করা যায় না। লেখা-পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইতে পারা যায়—সুবক্তা জ্ঞানী হইয়া জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায় কিন্তু আত্মার উন্নতি করিতে হইলে অপর আত্মার সাহায্য আবশ্যক। যাহার সাহায্যে এইরূপ উন্নতি, এইরূপ শক্তি লাভ হয়—তিনি গুরু আর যিনি সাহায্য লাভ করেন—তিনি শিষ্যপদবাচ্য। গুরু আধ্যাত্মিক বল সম্পন্ন না হইলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। অভাবে ক্ষত্রিয় গুরু, বৈশ্য ও শূদ্রের মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, বৈশ্য গুরু শূদ্রের মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, শূদ্র গুরু সজাতীয় শূদ্রের গুরু হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি গুরু হইতে পারে না।

নিজ নিজ কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণই কর্ত্তব্য—কারণ তাহারা পুরুষানুক্রমে কার্য্য করিয়া শিষ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব যতদূর অবগত হইয়াছেন—ততদূর নূতন গুরু কখনই জানিতে পারেন না। এইজন্য কুলগুরু কখনই পরিত্যজ্য নহে। তবে মন্ত্র গ্রহণ আত্মার উন্নতির জন্য—সমাজে বাহবা লইবার জন্য নহে। গুরু উন্মার্গগামী, ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পরিত্যাগ করিতে বাধা নাই। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

নিজ নিজ কুলমন্ত্র কুলগুরুর নিকট গ্রহণ করিতে হয়। অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রান্তর গ্রহণ করিলে অধোগতি, এমন কি জীবন নাশের সম্ভাবনা। বিষ্ণুমন্ত্র যাহার কুলমন্ত্র তিনি বৈষ্ণব কুলগুরুর নিকট উহা গ্রহণ করিবেন। যিনি শৈব তিনি শিবমন্ত্র; যিনি শাক্ত তিনি শাক্তগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। গুরু যে মন্ত্রে দীক্ষিত, শিষ্যও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। কেবল শাক্তগুরু সকল প্রকার শিষ্যকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণও উত্তর কালের জন্য হিন্দুর সাধনোপায় বিধানের জন্য এইরূপ বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। এক সময় আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে চরমোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা আধ্যাত্ম রাজ্যের অধীশ্বররূপে ভূয়োদর্শন দ্বারা দীক্ষা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহার মর্ম্মভেদ করা পাশবধর্ম্মী মানবের সাধ্য নয়। কারণ আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু বা যোগের নয়ন নাই, কর্ম্মশক্তি আমাদের জড়ত্বের আবরণে আবরিত—কাজেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সূক্ষ্মতত্ত্ব আমরা কেমন করিয়া

অবগত হইব? তাঁহারা সাধন বলে, যোগবলে ক্রিয়াবলে, ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাহা অন্যথা হইবার নহে। যাহারা সাধনায় সিদ্ধ হইতে চাহেন—তাহারা তাঁহাদের প্রদর্শিত দীক্ষা প্রণালী অনুসারে সাধনা করিয়া ধন্য হউন।

পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মানব ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। সেই সংস্কার ইহজীবনের ফলদানের জন্য তাহাকে যেইক্ষণে, যেই তিথিতে, যে নক্ষত্রে, যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করায় ঠিক সেই সকলের শুভাশুভ গণনা করিয়া এবং তাহার নিকট যে দেবতা, যে মন্ত্র অনুকূল—যে দেবতার যে মন্ত্রের সহিত তাহার প্রাণের মিলন হইতে পারে, বিচক্ষণ গুরু সেইরূপ রাশিচক্র, অকথহচক্র প্রভৃতির দ্বারা গণনা স্থির করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলে শিষ্যের নিশ্চয়ই শুভ ফল লাভ হইবে, সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মন্ত্র চৈতন্য করিতে পরিবে, নানা প্রকার বিভূতি ভূষিত হইয়া ইষ্ট-দর্শনে মানবজন্ম সার্থক করিতে পারিবে।

আমাদের সমস্ত গিয়াছে কিন্তু এখন যদি আমরা প্রগাঢ় বিশ্বাসভরে গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারি, যদি এরূপ দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের পথ মুক্ত করিতে আর হতাশ হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হইবে না। ভক্তিবারি বরিষণে হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া, বিমুক্তাত্মা ঈশ্বররূপী গুরু কৃষকের নিকট নিজ নিজ ইষ্টবীজ বপন করিয়া লইলে সরস ক্ষেত্রে বীজ আপনি অঙ্কুরিত হইবে। ইষ্টবীজ জপ করিতে পারিলে, বিশ্বাসের সহিত মন্ত্রার্থ ধরণা করিয়া জপ করিতে শিখিলে সিদ্ধিলাভের আর ভাবনা কি? জপের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। ৮।১০।১০৮।১০০৮ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; উদয়াস্ত বা উদয়োদয় জপ করিয়া হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ সমাধা কর। সাধক, তোমার মঙ্গল হইবে—তুমি ইহকালেই অনন্ত সুখলাভ করিয়া অন্তে পরম গতি লাভ করিবে। জীবনহীন শরীর যেমন কোন কার্য্যক্ষম নহে, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম। অতএব জপসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ বিশেষ আবশ্যক।

"জপাৎসিদ্ধি" সাধনার মূলমন্ত্র। মন্ত্র জপে যত একধী একচিত্ত হইতে পারা যায়—এত আর কিছুতেই নহে। "গুরু কৃপাহি কেবল" গুরু কৃপায় আমরা এই সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় শক্তিশালী হইব, আমাদের চির পরিচিত গৃহের পথ জানিয়া, আবার মা মা বলে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতে সক্ষম হইব। স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিবে, বিস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া আবার জাতিস্মর মহাপুরুষরূপে ভারতের ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া দেবসেবিত দেশকে আবার দেবতার আবাস ভূমে পরিণত করিতে সক্ষম হইব।

সম্পাদক।

সাধ না মিটিল।

কি পাইলে প্রাণের পিপাসা মিটে, বাল্যকাল হইতে তাহা খুঁজিতেছি, কিন্তু কই পিপাসাত মিটিল না। এতকাল ধরিয়া জীবনের কত স্তর উল্লঙ্ঘন করিলাম, কিন্তু কই সাধত পুরিল না। দিনের পর দিন গেল, বৎসরের পর নূতন বৎসর অতীতের অনন্ত ক্রোড়ে মিশিয়া পড়িল, কিন্তু আমার বাসনাত পুরিল না। শৈশবের সাধ, বাল্যকালের সাধ, যৌবনের সাধ সকল সাধই মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু হায়! প্রাণের শূন্যতা মিটিল কই? বাল্যকালের পঠদ্দশার কোমলতার সঙ্গে যৌবনের কুটিল কঠোরতার তরঙ্গ-ভঙ্গে জীবন কত বিচিত্র রেখার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু হায়! হৃদয় শান্ত হইল কৈ? নিমন্ত্রণে ভরপুর ভোজন করিয়া পেটুক ব্যক্তি যেমন আসন হইতে উঠিয়া তৃপ্তোঽস্মি বলিয়া যে ভাবে আনন্দের ধারায় মগ্ন হয়, সে তৃপ্তির কণিকামাত্রও এ জীবনে যদি পাওয়া যাইত, তবে ত এ জীবনের সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হইত। তাস খেলায় বসিয়া খেলার মদিরায় উন্মত্ত পুরুষ পঞ্জা, ছকা ধরিয়া অপর পক্ষকে হারাইয়া যে উল্লাসের লহরী-লীলায় নাচিয়া উঠে, সেই ভাবের আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও যদি পাওয়া যাইত, সেই ভ্রান্তিময় আনন্দের রেখামাত্রও যদি জীবনের দর্পণে প্রতিফলিত হইত, তাহা হইলে স্বীকার করিতাম, মনুষ্য জীবন পাইয়া একটা মোটা রকমের লাভ করিয়া ফেলিয়াছি। সেরূপ লাভ মনে করা ত দূরের কথা, মনুষ্য-জীবন প্রাপ্তিটা যে বিষম লোক্‌সানের মধ্যে, ইহাই আমার দিন দিন ধারণা হইতেছে। এমন লোক্‌সান আর নাই, এমন ক্ষতি আর নাই, এই চিন্তাই আমাকে চিরদিন ব্যাকুল করিতেছে।

এত লেখা-পড়া শিখিয়াই কি বুদ্ধির গোলযোগ ঘটিল, তাহা ত বুঝি না। নচেৎ সংসারের সুখময়ত্ব অনুভব করিতে পাই না কেন? রসগোল্লা খাইতেছি, অথচ তাহার মিষ্টতা, তাহার সুস্বাদ কিছুই পাইতেছি না, এ কিরূপ বিচিত্র জীবন, পাঠক্! তাহা ভাবিয়া দেখুন! যে সংসার কত ললিত-ললাম হইয়া সংসার-সেবকের চক্ষে প্রতিভাত হয়, যাহার উন্মাদিনী মদিরায় মত্ত হইয়া মানুষ জীবন-সংগ্রামে অবিরত ধাবিত হইতেছে, তাহার মোহন মূর্ত্তি ছুঁই ছুঁই করিয়া, কতবার দৌড়াইয়া যাই, কিন্তু হায়! সে অপূর্ব্ব চন্দ্রমা আমার নিকট হইতে ক্রমশই সরিয়া দাঁড়ায়, তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারি না, এমন বিড়ম্বনা আর আছে কি? ভগবান্ সংসার-সেবার উপকরণ—সমস্তই প্রচুর পরিমাণে আমাকে দিয়াছেন, সকলেই সেই সমস্ত উপকরণ পাইয়া যেমন তন্ময় হইয়া তদেকাগ্রচিত্তে তাহার রস আস্বাদ করে, সেরূপ স্বাদিকানুভূতি আমাতে নাই কেন? কেহ বা বিদ্বান্ হইলেই মনে করে, আমার কামনা-পুরিয়া গেল, কেহ বা ধনী হইলেই মনে করে, প্রাণের-আশা মিটিল, কেহ বা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর ভালবাসা পাইলেই জীবন কৃতার্থ হইয়া গেল—মনে করে; কেহ

বা সামাজিক, কেহ বা বাক্ নৈতিক, কেহ বা আবিষ্কারক হইলেই সকল সাধ মিটিল এইরূপ ভাবে। কোন না কোন ভাব লইয়া জীবনের একটা গণ্ডী আঁকিয়া লোকে সেই সীমার মধ্যে বসিয়া জীবন ধন্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু হায়! এইরূপ একটা ভাব লইয়া এ পণ্ডিত দগ্ধ-জীব জুড়াইবার অধিকারী নহে কেন, এ মরুময় জীবনে ঐ একটা লক্ষ্য-স্থিরতাময় তৃপ্তির অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয় না কেন? প্রকৃতির নিয়মে সকলেই যে সুখের অধিকারী, প্রকৃতির দাস আমি, আমাতে তাহার অভাব হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

লোকে যখন বলে "আমি পাগল নহি," তখন আমি নিজে "আমি পাগল হইয়াছি" এরূপ সিদ্ধান্ত করি কিরূপে? আমি যদি পাগল নহি, তবে সাধারণ লোকের চিন্তার সহিত আমার চিন্তা মিলে না কেন? সংসারের ভোগ সুখ—ইন্দ্রিয় সুখ, সাধারণ লোকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, আমি তেমনটি দেখিতে পাই না কেন? তোমার জিহ্বায় চিনির মিষ্টতা যদি অনুভব হইয়া থাকে, তবে অন্যের জিহ্বাতেও ত তাহাই হইবে, অন্যের জিহ্বাতে চিনি তিক্ত বলিয়া ত পরিগণিত হইবে না। যদি হয় তবে বুঝিতে হইবে, জিহ্বায় কোন রোগ জন্মিয়া জিহ্বার স্বাদিকা শক্তি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ তুমি সংসারকে যে চক্ষে দেখিয়া থাক, অন্যে যদি সে চক্ষে না দেখিয়া অন্যরূপে দেখিয়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তির অনুভূতি-শক্তি বিকৃতি-ভাবাপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে? তুমি আসক্তির চক্ষে—মমতামাখা দৃষ্টিতে এই পুত্র পরিবারপূর্ণ সংসারকে যে চক্ষে দেখিয়া থাক, অন্যে যদি অন্যরূপ দেখিয়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে—বুঝিতে হইবে? এইরূপ একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বিলাতে একজন বণিক্ দশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করেন। তিনি ঐ মূলধন খাটাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জীবনে সঞ্চয় করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বকালে এক লক্ষ টাকা নিজের একমাত্র পুত্রের নামে উইল করিলেন। বাকী ঊনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থ দানের উইল করিলেন। পুত্র মুমূর্ষু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতৃদেব! আমি আপনার একমাত্র পুত্র, আমাকে মোটে এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, আর বাকী ঊনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা অন্যের জন্য দান করিয়া গেলেন, এ কিরূপ বিচার হইল? আমি কি তবে আপনার পুত্র নহি? পিতা উত্তর করিলেন—তুমি আমার প্রকৃত পুত্র বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিলাম। আমার পিতৃদেব আমার জন্য দশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমি তাহা খাটাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জীবনে উপার্জ্জন করিয়াছি, সে হিসাবে আমি তোমাকে যে এক লক্ষ টাকা দিয়া গেলাম, তাহা খাটাইয়া জীবনে পঞ্চাশ ক্রোড় টাকা তোমার রোজগার করা উচিত। কেন না তুমি যে আমার প্রকৃত পুত্র। অতএব দেখ! তোমাকে বেশী ভালবাসি বলিয়াই দশ হাজার না রাখিয়া এক লক্ষ টাকা রাখিয়া গেলাম। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাখিলে, তুমি

বাবু হইয়া উড়াইয়া দিতে, তাহা অপেক্ষা পাঁচ জন দীন-দুঃখী প্রতিপালিত হয়, সে আমার পক্ষে স্বর্গ, এই বলিতে বলিতে মুমূর্ষু বণিক্ প্রাণত্যাগ করিলেন। উপযুক্ত-পুত্রও পিতার সেই উত্তর শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন না, পিতার যথারীতি সৎকারান্তে ব্যবসায় মন দিলেন।

তুমি আমি পুত্র পরিবারকে ভালবাসিয়া আসক্তির টানে যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকি, বিলাতী বণিক্ ত সেরূপ চক্ষে দেখিলেন না। তবে কি ঐ বিলাতী বণিক্ আমাদের চক্ষে পাগল? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় কঠিন। সংসারের এক একটি চিত্র সম্মুখে খুলিয়া খুলিয়া ধরিলে কে পাগল, তাহা স্থির করা বড় শক্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতায় একজন ধনী ব্যক্তি জীবনে অনেক টাকা রোজগার করেন। জীবিতাবস্থাতেই তিনি সেই সমস্ত টাকা পুত্র-কন্যা-পরিবারের হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন। যখন তাঁহার শেষ অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন তিনি অক্ষম হইয়া পড়িলেন, তখন সেই বার্দ্ধক্য অবস্থায় শয্যায় পতিত হইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত কিছুদিন রোগ ভুগিতে হইল। সেই শয্যা-শায়ী বৃদ্ধের সেবা করিবার জন্য পুত্র কন্যাগণ প্রথম প্রথম যত্ন করিল বটে, কিন্তু শেষে সকলেই অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ যে গৃহে শুইয়া থাকিতেন, সে গৃহে কেহ পদার্পণও করিত না। এ অবস্থায় সেবা অভাবে বৃদ্ধের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এক দিন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বন্ধুকে বৃদ্ধ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন—দেখ বন্ধু! এমন কোন উপায় বলিয়া দাও, যাহাতে পুত্র কন্যাগণ আমার এ অবস্থায় একবার দেখে। বিজ্ঞ বন্ধু তখন এক উপায় স্থির করিয়া কতকগুলি টাকা বৃদ্ধের হাতে দিয়া কতকগুলি কথা তাঁহার কানে কানে বলিয়া গেলেন, বৃদ্ধ সেই টাকাপূর্ণ বাক্সটি দিবা রাত্রি নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন, যখনই তাঁহার ঘরের কাছে কোন পদশব্দ শুনিতে পান, অমনই বৃদ্ধ বাক্স লইয়া সজোরে নাড়িতে চাড়িতে থাকেন, সেই নাড়া-চাড়ার দরুণ টাকার শব্দ তাঁহার পুত্র কন্যাদের কানে গেল। তখন কন্যা বৃদ্ধের গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তাই ত বাবা! তোমাকে কেহ দেখে না, সেবা অভাবে তোমার বড়ই কষ্ট হইতেছে, আর কেহ না দেখুক, আমি আজ হইতে তোমার সেবা বিশেষরূপে করিব। বৃদ্ধ বলিলেন,—দেখ মা! এই বাক্সস্থিত সমস্ত টাকাই তোমাকে দিয়া যাইব, তুমি আমার এই শেষ দশায় বেশ করিয়া সেবা কর, এই কথা শুনিয়া কন্যা হৃষ্টমনে পিতৃ-সেবায় বিল-ক্ষণরূপে মনোযোগ দিলেন। তারপর পুত্র আসিলে নির্জ্জনে বৃদ্ধ তাহাকেও ঐরূপ বুঝাই-লেন। স্ত্রী ও বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয় পরিবারবর্গকেও বৃদ্ধ বেশ করিয়া ঐরূপ বুঝাইয়া দিলেন। তখন বাড়ীতে বৃদ্ধের সেবার ধুম পড়িয়া গেল। বাড়ীর প্রত্যেক লোকে সকল কাজ ফেলিয়া বৃদ্ধের সেবার জন্য তৎপর হইল। শেষ দিন বন্ধু যখন পুনরায় উপস্থিত হইলেন, তখন বৃদ্ধ বন্ধুটীকে বলিলেন, প্রিয়তম বন্ধু! এই তোমার চাবি লও, বাক্স খুলিয়া তোমার টাকাগুলি লইয়া যাও। তোমার

পরামর্শে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন বন্ধু আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্রই যেন এ সংসার ছাড়িতে পারি! এতদিনে বুঝিয়া লইলাম এ সংসার কি? জানিয়া লইলাম এ সংসার নাট্যশালার কি বিচিত্র ব্যাপার! আর বেশী কথা কি বলিব? বন্ধু টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। রোগে বৃদ্ধের যখন দেহান্ত হইয়া গেল, তখন স্ত্রী পুত্র সকলেই তাড়াতাড়ি বাক্সের চাবি খুঁজিতে লাগিল, চাবি না পাইয়া বাক্স ভাঙ্গিযা ফেলিল, দেখিল বাক্সের ভিতর টাকার পরিবর্ত্তে কতকগুলি ইষ্টক খণ্ড পড়িয়া র'হয়াছে। তখন সকলেরই চমক ভাঙ্গিল, বুঝিল ব্যাপারটা কি?

এই ত তোমার সংসার! বৃদ্ধ পাগল, না তাঁহার বন্ধু পাগল, না, পুত্র কন্যাগণ পাগল? বলিয়া দাও পাগল কে, সেযানাই বা কে, আর চতুরই বা কে? সংসারে এই চিত্র বিরল নহে। ঘরে ঘরে এই চিত্র অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত বিরাজ করিতেছে। এই চিত্রের অবগুণ্ঠন যদি উন্মোচন করিতে যাই, তাহা হইলে কি ইহা তোমার অপ্রিয় হইবে? যদি অপ্রিয় না হয়, যদি তুমি ইহার জন্য আমাকে পাগল না বল তবে আরও চিত্র দেখাইব কি? সংসারের আবরণ উন্মোচন করিয়া সংসারকে ভালবাসিতে যদি চেষ্টা করা যায়, তবে সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না সুতরাং আবরণ উন্মোচন না করাই ভাল। আসক্তির ঘোর নেশা যতক্ষণ না ছুটিয়া যায়, ততক্ষণই সংসার সুমিষ্ট লাগে। মাতালের মদের নেশা ছুটিয়া গেলেই ঘোর কষ্ট উপস্থিত হয়। নেশাটি যতক্ষণ—ততক্ষণই প্রাণটা স্ফুর্ত্তিযুক্ত থাকে, কত আমোদের ফোয়ারা নেশার সময় খুলিয়া যায়, কত অজ্ঞাত সুখের দ্বীপপুঞ্জে মাতালের প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে। সুতরাং যদি সুখ উপভোগ করিতে চাও, তবে নেশাটি জাগাইয়া রাখা প্রয়োজন। নেশা ছুটিলেই ত ঘোর বিপদ্। যদি এইরূপ নেশার ভিতর দিয়াই সংসারের সুখ পাইতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রাণের বাসনা মিটিল কৈ? আমার মর্ম্মতলে যে অভাব-রেখা জাগিতেছে, নেশার সুখে সে অভাব মিটিবে কিরূপে? তাই ত অহর্নিশি অতৃপ্তির অনলে হৃদয় জ্বলিতেছে, তাই ত আমার অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন সদাই বলিতেছে—"সাধ মিটিল না।"

সংসারের ভোগ সুখেও ত সাধ মিটিল না, সুরসাল সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনে আমার রসনার সাধ মিটিল বটে, কিন্তু তাহাতে "আমার" সাধ মিটিল কৈ? "আমি" ও "রসনা" ত এক জিনিষ নহি। নিদ্রাবস্থায় বা তন্দ্রাবস্থায় রসনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হইলেও "আমি" ত তখন বিদ্যমান থাকি। সুতরাং রসনা হইতে "আমি" যখন বিভিন্ন পদার্থ, তখন রসনার সুখকে আমি "আপনার জিনিষ" বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিব না? ইন্দ্রিয়সুখকে আমি নিজের সুখ ভাবিতে পারি কৈ? কেন না ইন্দ্রিয় হইতে আমি যে বিভিন্ন পদার্থ। ইন্দ্রিয় ও আমি যদি এক জিনিষ হইতাম, তাহা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় নষ্ট হইলে—অন্ধ হইলে "আমি মরিয়াছি" এইরূপ অনুভব হইত,

তাহা যখন হয় না, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি হইতে "আমি" যে স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। "আমি" শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, সে বিষয়ে আরও যুক্তি আছে। শরীর বা ইন্দ্রিয় পরিণামী পদার্থ। অর্থাৎ ইহাদের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শরীর কখন মোটা, কখন কৃশ হয়, চক্ষু কখন ভাল থাকে, কখনও বা কানা হইয়া যায়। যদি "আমি" এই শরীর বা ইন্দ্রিয় হইতে অভিন্ন পদার্থ হইতাম, অর্থাৎ এক জিনিষ হইতাম, তাহা হইলে এই "আমিরও" কখন না কখন কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইত। শরীরের কৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তনের ন্যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অন্ধতা অবস্থা পরিবর্ত্তনের ন্যায় "আমিরও" ঐরূপ একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না। "আমিত্ব" সম্বন্ধে অবস্থা পরিবর্ত্তন কাহারও অনুভব হয় না। "আমি আছি কিনা", অথবা "আমি নাই" ইত্যাকারও কি অনুভব হইয়া থাকে ? "আমিত্ব" জ্ঞান সর্ব্বদা একই রকমে দেদীপ্যমান থাকে। সুতরাং এই অপরির্ত্তনশীল "আমি" পরিবর্ত্তনশীল শরীর বা ইন্দ্রিয় হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়াদির সাধ যাহাতে মিটে, "আমার" সাধ তাহাতে মিটিবে কেন ? "আমার· সাধ যাহাতে মিটে তাহার উপায় কেহ কি বলিতে পার ?

ইন্দ্রিয়ের সাধ মিটিয়াছে, শরীরের সাধ মিটিয়াছে, কিন্তু "আমার" সাধ মিটিল না। বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, যৌবনে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি, সংসারের ভোগবাসনা যথাশক্তি মিটাইতেছি, কিন্তু আমার সাধ পুরিল কৈ ? দুঃখীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালে মনে করিতাম, বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইলেই সকল কষ্ট দূর হইবে। বিদ্যা ত উপার্জ্জন করিলাম, বিদ্যার সুখ্যাতিও পাইলাম, আবার যৌবনে অর্থ রোজগার করিয়াও ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা করিলাম, মান, যশ, পাণ্ডিত্য, অর্থ, কথঞ্চিৎ নিজের চেষ্টায় সকলই পাইলাম, সংসারের উপকরণ সামগ্রী সকলই আয়ত্ত করিলাম। কিন্তু যাহা পাইলে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, তাহা ত পাইলাম না। ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া যাইতে পারিলেই এ জীবনের সমস্ত সাধ মিটিয়া গেল, এইরূপ চিন্তা লইয়াই যদি সুখে কাল কাটাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমি ধন্য হইতাম। কিন্তু শাস্ত্র পড়িয়া চিন্তা যে বড় হইয়া গিয়াছে। দুঃখীর সন্তান বড়লোকের সংসর্গে থাকিলে তাহার মেজাজ যেমন বিগড়াইয়া যায়, সেইরূপ উচ্চ চিন্তাপূর্ণ শাস্ত্রের সংসর্গে থাকিয়া চিন্তা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। চিন্তা বড় হইলে কি হইবে, সামার্থ্য যে নিতান্তই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যের ভিতরে উচ্চ চিন্তার সমাবেশ হইলে সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে ? তাই বলিতেছি,—এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন এ জগতে আর নাই।

সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ পড়িয়াছি। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছি। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের প্রাণায়ামের ব্যাপারও দেখিয়াছি। আবার স্মৃতিশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড

আলোচনা করিয়াছি। তন্ত্রের সিদ্ধি-সাধনার কথাও বিচার করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের এতগুলি পথ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত আলোড়ন করিয়া বিগত কয়েক বর্ষ হইতে বিশেষ চিন্তা করিয়া জীবনের সন্ধিস্থলে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চাই।

বর্ত্তমান কলিযুগে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মানবের পক্ষে শঙ্করাচার্য্যের মত বৈদান্তিক জ্ঞানী হওয়া বড়ই শক্ত কথা। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তদর্শন বর্ত্তমানকালের উপযোগী নহে। শঙ্করের বেদান্তে ভক্তির সম্পর্ক মাত্র নাই। আবার স্মৃতিশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডও সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। কেননা সেরূপ কর্ম্মসম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-দীপ্ত যুগে ক্ষীণ-শক্তি হিন্দুর পক্ষে কর্ম্মী হইয়া ধর্ম্মসাধন করা নিতাই অসম্ভব। আবার বিবাহিত গৃহস্থের পক্ষে যোগসাধনা বা প্রাণায়ামাদি সম্পূর্ণ-রূপে অবিহিত। গৃহস্থ প্রাণায়াম করিলে নিশ্চয়ই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইবেন। আবার তান্ত্রিক হইতে গেলে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইবেন। সুতরাং কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, বা তান্ত্রিক হওয়া বর্ত্তমানকালীন হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব। রামানুজাচার্য্যের দর্শন-শাস্ত্র পড়িলে জ্ঞানীভক্তের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শঙ্করাচার্য্যের মত নীরস বৈদান্তিক নহেন। তিনি ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই উভয়েরই অভিন্নভাবে উপাসক। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই সম্মিলিত যুগলমূর্ত্তির উপাসক। তিনি বৈদান্তিক অথচ ভক্ত, তিনি জ্ঞানী, অথচ ভোগী। জ্ঞান ও ভক্তির সুন্দর সামঞ্জস্য তাঁহার দর্শনে যেমন আছে, এমন আর কোথাও নাই।

ধর্ম্মরাজ্যে যদি সাধ মিটাইতে হয়, তবে জ্ঞানী ভক্তের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত কর। জ্ঞানের স্ফটিক নির্ম্মল পাত্রে যদি ভক্তির ফুটন্ত ফুল সংগ্রহ করিতে পার, তবে তাহার মত সাধের জিনিষ জগতে আর নাই। যে জ্ঞান ভক্তিকে বিদূরিত করে, আমি সে জ্ঞান চাহি না, আবার যে ভক্তি জ্ঞানের সম্পর্কে থাকিতে চাহে না, আমি সে ভক্তিরও ভিখারি নহি। শঙ্করাচার্য্য একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসক। প্রকৃতিকে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলেন। ব্রহ্ম ছাড়া তাঁহার মতে সমস্তই অলীক। রামানুজাচার্য্য বলেন—ব্রহ্ম ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি আদি কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং প্রকৃতি ও ব্রহ্ম উভয়ই উপাসনার লক্ষ্য।

দ্বৈতজ্ঞানী আমরা, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি অর্থাৎ পিতা ও মাতা এই উভয়েরই চরণে শরণ চাই। যে পিতা-মাতার স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাবৃত্তি অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই ভক্তি শ্রদ্ধা কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহাদের চরণে সমর্পণ করা আমাদের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, যেমন সহজসাধ্য, তেমন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরকে পিতৃ শক্তি বা মাতৃ শক্তির ভিতর দিয়া উপাসনা করা সাধকের পক্ষে সহজ সিদ্ধ সাধনা। যে ভাব আমাদের মর্ম্মগত, ধর্ম্মরাজ্যে তাহারই পরিপুষ্টি

আমাদের সহজ উপায়। শঙ্করাচার্য্যও এই সহজ ভাবের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি নিজরচিত বেদান্তশাস্ত্রে ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপাকে পড়িয়া সেই ভক্তিকে আবার আশ্রয় করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় তিনি যখন জ্ঞান স্বরূপ মহাদেবের উপাসনা জন্য বিল্বপত্র সঞ্চয় করিতে যান, তখন বিল্ব-কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক তিনি মহাশক্তি স্বরূপিণী ভগবতী মূল প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজ্যে ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই মিলিত মূর্ত্তির ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনাই প্রকৃত ব্যবস্থা।

যাহা পাইলে এ জীবন চরিতার্থ হয়, সেই ভক্তির বিমল সুধা ভক্ত নহিলে কে বুঝিতে পারে? কেবল ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইয়া আমরা ভক্তির আস্বাদে বঞ্চিত থাকিতে চাই, এ কি কম বিড়ম্বনা। চীনদেশে যদি আমাদের জন্ম হইত, তবে না হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। যে দেশে ভগবদ্ভক্তির স্রোত বহিয়া গিয়াছে, মাতৃ পিতৃ চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যাহাদের গোড়ার শিক্ষা, সেই দেশে ভগবদ্ভক্তি শিখাইবার জন্য যদি স্কুল প্রস্তুত হয়, তবে কি দুর্ভাগ্যের কথা নহে? ইন্দ্রিয়-সুখ পশুরাও ত ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে আর নূতনত্ব কি আছে? বিষয়-সুখের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির স্ফূর্ত্তি যদি অনুভব করিতে পারি, তবেই ত মানব জীবন সার্থক হইল। যাঁহার কৃপায় এমন দুর্লভ মানব জন্ম, এমন সুখের ভোগায়তন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, একবিন্দু কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি তাঁহার চরণে যদি ঢালিতে প্রবৃত্তি না হয়, দিনান্তে তাঁহার নাম লইতেও যদি সাবকাশ না পাই, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? কত সময় হাই তুলিয়া, বাজে কথা কহিয়া, পরনিন্দা করিয়া কাটাইয়া দিই, অন্ততঃ সেই সময়টা না হয় একবার ভগবানের নাম লইতে তোমার আপত্তি কি? যদি পরকাল থাকে, ঈশ্বর থাকেন, তোমার সে পরিশ্রম ত ব্যর্থ যাইবে না। আর ঈশ্বর যদি নাই থাকেন, তবে বৃথা সময় কাটান অপেক্ষা ভগবানের নাম লইয়া সময় কাটান ভাল নয় কি? একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, আমরা যখন নিদ্রা যাই, তখনই জগতের উপকার করি, অর্থাৎ মানুষ এতই হিংস্রক জন্তু যে জাগিয়া থাকিলেই পরের কোন না কোনরূপে অনিষ্ট চিন্তা করিবে। সুতরাং আমাদের নিদ্রাকালটাই জগতের পক্ষে শান্তিদায়ক। সে হিসাবে ঈশ্বর চিন্তাব্যপদেশে মানব। তোমার অন্যমনস্ক থাকাও ত জগতের পক্ষে মঙ্গলকর।

যাহা পাইলে এ হৃদয় জুড়াইয়া যায়, সাধক! তাহা বলিয়া দাও! সংসারকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিব না। সংসারের লোক আমার প্রাণের জ্বালা বুঝিতে পারে না। আমি যাহা চাই, পৃথিবীর সেবক যারা, তারা তাহা মিটাইতে পারে না। আমার মর্ম্মতলে যে তৃষ্ণা জাগিতেছে, পৃথিবীর ময়লা মাটি-মাখা জল সে তৃষ্ণা দূর করিতে পারে না। আমি যাহার জন্য পালায়িত, তাহাঁর সন্ধান কে

আনিয়া দিবে? এ সংসার-মরুভূমে হৃদয় যাহার জন্য চির পিপাসু হইয়া রহিয়াছে, কি জানি কোন্ পথে গেলে তাহা পাইব? যাহা পাইলে আর আমার কিছু চাহিবার থাকে না, আমি তাহারই ভিখারি। সে গুপ্তধামের বার্ত্তা ভক্ত সাধক ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না। জগতের নিকট আমার কিছু চাহিবার জিনিষ নাই। জগতে যে জিনিষ পাই, তাহা পাইয়াও আকাঙ্ক্ষা ত মিটিয়া আসে না। যে জিনিষ পাইলে আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়, যদি তাহাই না পাইলাম, তবে এ জীবনে করিলাম কি? এ সংসার-নাট্যশালায় হাসিলাম, নাচিলাম, গাহিলাম, কিন্তু যাহা পাইবার জন্য আসিয়াছিলাম—তাহা পাইলাম কৈ? যে সাধ মিটাইতে আসিয়াছিলাম—তাহা মিটিল কৈ? সেইজন্য আমার হৃদয়ের কেন্দ্র-স্থল হইতে কে যেন সদাই ধ্বনি করিতেছে, "আমার সাধ মিটিল না, আমার প্রাণের বাসনা পুরিল না।"

কবিকুঞ্জ।

প্রাণের গাথা।

(ভৈরবী)

কোথা শিব-সীমন্তিনী!
কি হবে দীনের গতি বলে দে জননী!
অকূলে আকুল তারা,
দুকুল হয়েছি হারা,
অকূলেতে দে মা কূল,
ওমা কুল-কুণ্ডলিনী।
বিলাস-বিভবে বিভোর প্রাণ,
রঙ্গরসে দিন বৃথা অবসান,
আরাম-শয়নে, বিরাম ধেয়ানে
অশনে, বসনে মত্ত নিত্য নিস্তারিণী।
কামনা সতত কামিনী কাঞ্চনে,—
এ ভাব অভাব হবে কত দিনে?
ভাবময়ী-ভাব— সে ভাব বিহনে
ভবের এ ভাব যাবে না ভবানি!
ভব-ভাব-ঘোর কবে হবে ভোর,
সে ভাবে বিভোর হব ভব-রাণী?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস সি,

কণা।

সমগ্র ভুবনে সূর্য্য বিতরে কিরণ—
চন্দ্র তারা উদ্ভাসিত আলোকে তাহার
কণারাশি লাভে পূর্ণ কমল জীবন
পবিত্রতা সৌন্দর্য্যের সুন্দর আধার।
প্রাবৃটে জলদদল ঢালি বারিধারা
উত্তপ্ত ধরণী বক্ষ করিছে শীতল।
চাতক মাগিছে জল সদা শান্তিহারা
বিন্দু বারি লাভে তার জীবন সফল!
হে নাথ! অনন্ত তুমি মহিমা তোমার
হীন বুদ্ধি মানবের চিন্তার অতীত
কত দানে দি'চ্ছ ভরি শূন্য প্রাণ তার
এক এক করি নিত্য গণিবে সে কত?
অমর আত্মার ক্ষুদ্র এ জীবন মম
ধন্য হবে লভে তব এক কণা প্রেম।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

আমিত্ব।

ব্রহ্মাণ্ড তোমারি নাথ। তুমিই সকল হরি,
জলে জলবিম্বসম মোরা হেথা বাঁচি মরি।
সকলি তোমারি নাথ। তুমি দেব বিশ্বময়,
তোমারি রচিত বিশ্ব গায় সদা তব জয়।
সুষমা আধার তুমি—তুমি হে সুন্দরতম,
তব রূপ-কণা পেয়ে এ দেহ সুন্দর মম।
তোমারি হে কীর্ত্তি যশঃ ঐশ্বর্য্যের অভিমান,
নিন্দা-ঘৃণা সবি তব তোমারি হে অপমান।
সফলতা বিফলতা কৃতিত্ব মাধুর্য্য তব,
যন্ত্রী তুমি যন্ত্র মোরা বৃথা করি কলরব।
আকুলি-ব্যাকুলি তব তোমারি হে হাহাকার,
তব স্নেহ-ভালবাসা তোমারি হে অত্যাচার।
তোমারি নয়নে হরি। তোমারি এ অশ্রুকণ,
হাসি-কান্না সবি তব, মোরা ভাবি কর্ম্মফল।
কত যে দিয়েছ তুমি ফিরি নিছ আববার,
সান্ত্বনা অভয় বাণী সবি তব উপহার।
সুখ শান্তি প্রীতি হরি। তোমারি স্নেহের দান,
শোক-দুঃখ-ব্যথা সবি তোমারি হে অভিমান।
দীনতা ক্ষীণতা আর অপূর্ব্ব অমূল্য নিধি
সকল তোমার প্রভু। তুমিই দিয়েছ বিধি।
কাচ-বিরচিত গেহ আমার আমিত্ব হরি,
দয়া করি ফেল নাথ। পদাঘাতে চূর্ণ করি।
দূর হোক্ সুখ-দুঃখ মায়া মোহ ক্ষুদ্র জ্ঞান,
বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর। ভাবি, করি তব ধ্যান।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

কাহার?

কাহারি সে গান শুধু গাহিতে শিখিয়া
পুলকিত করে আমার হিয়া।
কাহারি মহিমা বুঝাতে আমারে
ব্রজের সে লীলা দিল জানাইয়া॥
কাহারি চরণ চুমিতে ছোটে সান্ধ্য সমীরণ
শিহরি শিহরি উঠে এ পরাণ।
কাহারি তরে, দূরে আছি পড়ে চাহিনা যাইতে
পরশিতে সে চরণ মহান্॥
কাহারি মরণ শান্তি, মধু আলাপনে
পুলকিতে মোরে জাগিয়ে উঠে।
কাহারি অলস কাঁদনি কাতরতা প্রাণে
শোভিছ (প্রভু) হৃদয়-যমুনা-তটে॥
কাহারি সে বাঁশীর স্বর দূর হ'তে আসি
আধ ভাঙ্গা স্মৃতি লয়ে যায় দূরে।
(তখন) কাহারি তরে হয়ে উন্মনা, উদাস পরাণ
তীব্র আঁধারে ভাবে কাহারে অদূরে?

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

স্বপনে।

যবে প্রভাতের পিক গায় নাই গীত,
পাতার আড়ালে বসিয়ে,
যবে বন উপবনে ফোটেনিক ফুল
প্রভাত আবেগে ভরিয়ে!
যবে কাননের কোলে সেই-মধু-বোলে;
ধরেনিক' পাপিয়া তান,
যবে ফুলের রেণুটী মাখিয়া ভ্রমর,
হয় আগুয়ান!
যবে কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে প্রণয়
ঘুমায়ে ছিল লো লুটিয়ে
তুমি সেই বেলা প্রিয়ে, দেখা দিয়ে মোরে
বলেছ কতই বুঝায়ে।
তুমি কতই আশায় ভাষায় হৃদিবে
করেছিলে যে অর্ঘ্যদান,
ওগো, বিধি বিড়ম্বনায় প্রভাতে সে ত
হয়ে গেল আবার ম্লান।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

ধূলির সঙ্গ।

একদিন ওহে ধূলি। অবাধে তোমায়—
দলিয়া করেছি নত চরণ তলায়,
স্বজনের পাদস্পর্শ করিয়াছ বলি'
শিরস্ লুটায়ে আজি শিরে লই তুলি।

শ্রীবঙ্কচন্দ্র নাথ।

সুখান্বেষণে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদিন যিনি আমায় শুধু আদরের মিষ্ট-মধু পান করাইয়া আসিতেছিলেন, আজ তিনিই আমায় তিরস্কারের তিক্ত রস পান করাইলেন। ইতিপূর্ব্বে কখনও আমি তাহা পান করি নাই, তাই আজ তাহার কটু আস্বাদন আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া সমস্ত গ্রন্থিগুলিকে যেন শিথিল করিয়া ফেলিল। ঘরের যে দিকে চাহিতে লাগিলাম, সেই দিকেই যেন সেই ভর্ৎসনা তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; চতুঃপার্শ্ব হইতে সেই নীরব প্রাচীরগুলি যেন আমাকে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল,—"কেমন, আর পিতৃ-আদরের অহঙ্কার কর্ব্বে? এখন ত তুমি ত্যজ্যপুত্র হতে বস্‌লে।" বলিতে পারি না, সহসা আমার মর্ম্মস্থলে কি যেন এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, উঃ! সত্য সত্যই ত পিতা আমাকে ত্যাগ কর্ব্বেন বলেছেন। আমি তাঁর কে?—ছেলে। আর নির্ম্মলা?—সে ত কেউ নয়; কিন্তু সে কি না আজ তাঁর সকল আদরের আদরিণী! আর আমি কি না আজ তাঁর সকল লাঞ্ছনার পাত্র। নির্ম্মলা কাল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'বে। আর আমি কাল পথে পথে কাঙ্গালের মত ঘুরে বেড়াব! বেশ তাই হোক্। তবে আর আমার এখানে থাক্‌বার কি অধিকার আছে? না, এই মুহূর্ত্তেই আমি চলে যাব। দেখিতে দেখিতে ঘরখানি যেন অশান্তির অনল-নিশ্বাসে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আমি আর তিষ্টিতে পারিলাম না। ছুটিয়া ঘরের বাহির হইলাম, অন্দরমহল, বহির্ব্বাটী ত্যাগ করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় যাইব? আমার মত হতভাগ্যের স্থান কোথা আছে? ভাবিতে ভাবিতে নন্দন-কাননের দিকে ছুটিলাম।

(৮)

নন্দন-কাননে উপস্থিত হইবামাত্র আচার্য্য বিমলানন্দ প্রমুখ সচিববৃন্দ সসম্মান অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে সেই রাজাসনের উপর বসাইলেন। দীর্ঘকাল আমি সেই আসন গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিলাম বলিয়া তাঁহারা অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন এবং আবার যে আমি সেই আসন পুনরায় গ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এইরূপ হর্ষ বিষাদের অভিনয় শেষ হইলে, আমি আমার সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক তাহাদের নিকট বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ অবস্থায় আমার পুনরায় বাড়ী যাওয়া উচিত কি না? তাহাতে সকলেই সমস্বরে উত্তর করিল—না,—কখনই না। তখন আমি মনে মনে নন্দন-কাননের উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম—নন্দন-কানন! আমার বড় সাধের নন্দন-কানন! দীর্ঘকালের পর আবার তোমার অঙ্কে ফিরে এলুম। হৃদয় বড় উত্তপ্ত, তোমার ঐ সুখের ফোয়ারা খুলে দাও, আমি তার সহস্র ধারার নীচে একবার বসি। আমি বড় হতাদর—তোমার ঐ আদরের সুললিত বাহু প্রসারণ কর, আমি একবার তার মাঝে নিজেকে জড়িয়ে ধরি। আমি যে তোমারই—তুমি যে আমারই।

আর বাটীতে ফিরিলাম না। নন্দন-কাননেই থাকিতে লাগিলাম। যেদিন বাটী হইতে চলিয়া আসি, সেইদিন সন্ধ্যার সময় রমাকাকা একবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলাম—বুঝি আমাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য পিতা তাহাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যখন শুনিলাম যে, নন্দন-কাননে আসার পর হইতে পিতা আমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন নাই, তখন বুঝিলাম—পিতা সেই দিনই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। রমাকাকাও যেন সেইরূপ কি একটা কথা আমায় ইঙ্গিতে বলিলেন। তবে তিনি এটুকুও বলিলেন যে, পিতার পরিত্যজ্য হইলেও আমি রমাকাকার পরিত্যজ্য নহি। ইহাতে রমাকাকার উপর আমার ভক্তির ভাব অনেকটা বাড়িল বটে কিন্তু পিতার উপর ভক্তিভাব সমূলে নষ্ট হইয়া গেল। আর নির্ম্মলা? তার উপর দারুণ ঘৃণার ভাব আসিয়া পড়িল। কারণ সেই ত এই সব অনর্থের মূল। আমার পদাঘাতে পীড়িতা হইয়া সে যে কেমন আছে—এ কথা জানিবার ইচ্ছাও আমার মনে আদৌ হইল না।

একদিন, দুই দিন, তিন দিন—ক্রমশঃ তিন মাস অতীত হইয়া গেল। রমা কাকাও আর আসেন না। বাটীর কোনও সংবাদ আর পাই না। সে জন্য দুর্ভাবনা আমার মনের ত্রি-সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে না। তখন যে আমার সেবকগণ দিবানিশি আমার মনকে ষোড়শোপচারে ইন্দ্রিয় সুখের ভোগ দিতেছে, সে সময় কি সে রূপ অসুখকর কোনও চিন্তা গ্রহণ করিতে পারে?

একদিন অপরাহ্নে মুক্ত বাতায়নপথে বসিয়া আছি। পাপ পার্শ্বচরগণ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশতঃ সকলেই অনুপস্থিত। জানি না কোন পুণ্য মুহূর্ত্তে কোন দেবতার আশীর্ব্বাদে কেমন যেন এক নূতন বায়ুর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া মৃদুভাবে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল—সহসা চিত্তের দীর্ঘ ব্যাপী উদ্দাম উন্মাদ চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল—হৃদয় কেমন যেন এক নূতন বিষাদ রাগিণীতে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—সহসা কোন এক সুদূর প্রদেশ হইতে যেন কাহার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। একি। এ কার ক্রন্দন রোল। কোন মুমূর্ষের কাতর ধ্বনি! আমি চকিত নয়নে গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম, সুন্দর পশ্চিম গগনের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড তেজঃপুঞ্জ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড—সমস্ত দিবস সমরাঙ্গনে মাতিবার পর এখন হতবীর্য্য হইয়া ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িতেছে; ভাবিলাম, ও ত সূর্য্য নয়, ও যে আমার প্রতিকৃতি! আজ আমি আমার জীবনের প্রখর আলোক-যৌবন তেজে তেজিয়ান হ'য়ে সংসারের সংগ্রাম-ভূমিতে বীরের মত মেতে চলেছি কিন্তু যখন মরণ নিশার কাল ছায়া জীবন সন্ধ্যায় দেখা দিবে,তখন যে ঠিক এই সূর্য্যের মত সকল তেজ হারিয়ে ফেলে আমাকেও এক অজ্ঞাত দেশের বুকে ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়্‌তে হ'বে।'

এইরূপ সহসা এক অহেতুকী আত্ম-চিন্তা আসিয়া আমাকে বিভোর করিয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় পিতার বহুদিনের ভৃত্য—ভোম্বা ছুটিয়া আসিয়া আমার পদতলে,পড়িয়া কাঁদিতে

লাগিল। আমি সবিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে ভোলা দাদা ?'

সে মাথা চাপড়াইয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে দাদাবাবু, আর কি হয়েছে! কর্ত্তা বাবু আর বোধ হয় বাঁচেন না।"

এই কথা শুনিবামাত্রই আমার মনের মাঝে পূর্ব্বের ক্রোধ ও অভিমান পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল, বলিলাম—তাতে আমার কি ? তিনি আমার কে ? আমি ত তাঁর ত্যজ্যপুত্র।' তখন ভোলা গলদশ্রুনয়নে রাগ ভরে বলিতে লাগিল—"সে কি! একদিনের একটী ছোট কথায় তোমার বাপের তত মায়া, তত স্নেহ একবারে ভুলে গেলে! তাঁর মরণে তোমার কিছু নয়! তিনি তোমার কে! বলি, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কে তোমায় প্রাণ দিয়ে লালন-পালন ক'রেছিল ? তাঁর স্নেহের যদি একটুকু অভাব, হ'ত দাদাবাবু! তা হ'লে তুমি কি আজ আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বল্‌তে পার্ত্তে ?'

বৃদ্ধ ভোলার এই কথা কয়টীর মধ্যে ক্রোধের আবরণে এরূপ একটী স্নিগ্ধ ভাব ছিল যে তাহার দ্বারা আমার উদ্ধত হৃদয় একটু বিনত হইল। আমি তখন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলাম,—সে যাই হোক্, এখন ত আমি তাঁর আর স্নেহের পাত্র নই—এখন আমি তাঁর বিষদৃষ্টি। তাঁর যা কিছু স্নেহ, মমতা নির্ম্মলাই সব নিয়ে ফেলেছে, তা না হ'লে, তুমিই বল দেখি ভোলাদাদা, আমি আজ এতদিন এখানে এসেছি, কই, একদিনও ত তিনি আমার খোঁজে একটা লোকও পাঠান নি ?'

ভোলা বিস্মিত-লোচনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সে কি! বিমলবাবু কি তোমায় একদিনও কোন কথাই বলেন নি ?'

আঃ। কই না।

ভোঃ।—এ কি রকম হ'ল! তুমি যে দিন বাড়ী থেকে চ'লে এলে, সেদিন থেকে রোজ রোজ তিনি তোমার খোঁজে বিমলবাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছেন, তুমি যাতে বাড়ী যাও—সেজন্য তাঁকে কত ক'রে ব'লে পাঠিয়েছেন। বিমলবাবু তার উত্তরে বলেছেন যে, তুমি তাঁর কথার একান্ত অবাধ্য—কিছুতেই বাড়ী যাবে না। এ সব কথা কি তুমি আদৌ জান না ?

আঃ।—না।

ভোলাদাদা তখন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—ভাই, আমি তোমায় অনেক দিন ধ'রে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। এ সময় একবার এ বৃদ্ধের কথা শোন। তুমি ছেলে মানুষ, আপনার খেয়ালে আপনি ছুটে চলেছ, তাই দেখ্‌তে পাচ্ছনা কি ব্যাপার ঘটেছে। আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, দুষ্টেরা কি একটা দুরভিসন্ধি ক'রে বাপ-ছেলের মাঝে যে একটী মায়ার বাধন আছে—সেটীকে কাট্‌তে চায়। ভাই! আর ছেলে মানুষি ক'রো না—একবার ভাব; ঘুমিয়ে না থেকে একবার চেয়ে দেখ। না—না—আর ভাব্‌বারও সময় নেই, দেখ্‌বারও সময় নেই চল—তোমার বাপের কাঁছে ছুটে চল। আর দেরী কল্লে ঐ রাগ, ঐ অভিমান নিয়েই থাক্‌তে হবে। তোমার জন্যে ভেবে ভেবেই —তোমার বাপের রোগ হ'য়েছে—সেই

রোগেই আজ তাঁর মৃত্যুর দিন নিয়ে এসেছে। বোধ হয় একবার তোমাকেই দেখ্‌বার জন্য তিনি অপেক্ষা ক'চ্ছেন। চল, ভাই, এবার শেষ দেখা কর্ব্বে চল, এ জন্মের মত তাঁর কাছে যত দোষ ক'রেছ, তার ক্ষমা চাইবে চল—চির-দিনের মত তাঁর চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে তাঁর সেই আশীর্ব্বাদ মাথায় নেবে চল। এক বার চ'লে গেলে আর ফিরাতে পার্ব্বে না। একটা অনুতাপ শেষে তোমার সারাজীবনটীকে পোড়াতে থাকবে। হায়! হায়! বাপ-মায়ের মত সামগ্রী কি আর এ জগতে কিছু আছে রে ভাই!' ভোলাদাদা আর বলিতে পারিল না—বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে থামিয়া গেল। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল।

আমি যেন এতক্ষণ অজ্ঞান, অচেতন, অচল একখানি প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিলাম। হৃদয়ের মধ্যে দাবানলপ্রায় কেমন যেন একটা অনুশোচনার আগুন নিরাশ্বাস-ঝটিকার সহিত মাতিয়া শিরা-নিচয়কে আরণ্যপাদপের ন্যায় পুড়াইতেছিল। এতক্ষণ নয়নের কোণে এক বিন্দুও জল ছিল না। এইবার জল দেখা দিল—ক্রমে ক্রমে উথলিয়া উঠিয়া বৃষ্টি-ধারার মত পড়িতে লাগিল।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—ছুটিলাম। যতই ছুটিতে থাকি ততই প্রতি পদ-বিক্ষেপে মনে হইতে থাকে, ঐ—ঐ—বুঝি নির্ম্মলার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যায়! হায়! হায়! ঐ বুঝি সকলই ফুরায়ে গেল! অমনি আরও দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকি। হায়! আজ কত-দিন পরে একবার শেষ দেখা-দেখিবার জন্য, শেষ আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞার জন্য পিতার নিকটে ছুটিয়া চলিলাম।

পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তাঁহার সেই কান্তিময় দেহ অন্তিম-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত। নির্ম্মলা তাঁহার সেই দুর্ব্বল মস্তকখানি নিজ অঙ্কের উপর রাখিয়া সজল নয়নে কাতর দৃষ্টিতে বিশ্বনিয়ন্তার করুণা ভিক্ষা করিতেছে। অহো! সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমি আজ কতদূর চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু আজও ত আমার মানস-দর্পণে সেই চিত্র তেমনই প্রতি-ফলিত।

আমি নির্ব্বাক নিস্তব্ধভাবে মুহূর্ত্তকাল ঐ চিত্র দেখিলাম, তারপর হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে কেমন যেন একটা আবেগ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আমি কম্পিত দেহে পিতার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম।

তিনি তখন তাঁহার সেই রোগক্ষীণ কণ্ঠে একবার ডাকিলেন,—"নয়নানন্দ! বহুদিন পরে পূর্ব্বেরই মত সেই আহ্বান শুনিয়া আমার চিত্তবেদনা যেন দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া কণ্ঠ-রোধ করিল। আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। পিতা বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই অস্ফুটস্বরে সান্ত্বনার সুরে বলিতে লাগিলেন—'তুমি আর মনোকষ্ট বহন ক'রো না। তোমায় আমি মার্জ্জনা কল্লুম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যেন আর কখনও কুপথে মতি না যায়। নির্ম্মলাকে আর কখনও তাচ্ছিল্য ক'রো না। তার উপদেশ নিয়ে কার্য্য ক'রো। তারপর কি বলিলেন আর বুঝিতে পারিলাম না।

তখন আমি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে অস্তোন্মুখ দিনমণি মুক্ত গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্নিগ্ধ, শান্ত কিরণ-সলিলে যেন পিতাকে স্নান করাইতেছে—তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে যেন তাঁহার কোন অভীষ্ট দেবতার আরাধনায় নিমগ্ন। আমি তন্ময়চিত্তে ঐ ধ্যান-চিত্র দেখিতে লাগিলাম। সহসা নির্ম্মলা ও ভোলাদাদার ক্রন্দন-রোল আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমার তখন চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলাম পিতা আর ইহধামে নাই।—তিনি তাঁহার সেই অভীষ্ট দেবতার সন্নিধানে বোধ হয় যেন এক সুদূর সুন্দর অমর-নিবাসে চলিয়া গিয়াছেন।

(৯)

"যে মুহূর্ত্তে বুঝিলাম পিতা এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই মনে হইল বুঝি এত দিন পরে আজ সহসা একটী প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ড আমার মাথার উপর হইতে খসিয়া গেল আর যুগপৎ এক ধারণাতীত অতি বিস্তৃত মহাশূন্য মুখব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত ভীতি-বিহ্বল চিত্তে দুই চক্ষু বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম—'আমার আর কে আছে? কে আমায় বাঁচাবে?

অন্তর্দর্শিনী নির্ম্মলা যেন আমার সেই গভীর হৃদয়-বেদনা জানিতে পারিয়াই ত্রাস্তে আমার কাছে আসিয়া তাহার স্বভাব-সুলভ শান্ত স্বরে বলিল—'ভয় কি, রমাকাকা আছে।'

হায়! আশা! তুমি প্রতারণাময়ী হইলেও শান্তিদায়িনী। নির্ম্মলার এ কথায় আমার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। সেই আশা শান্তিময় কর প্রসারণ করিয়া আমার ক্ষুব্ধ চিত্তকে প্রশমিত করিল। আমি ভাবিলাম 'বাস্তবিকই ত, আমার রমা কাকা আছে।'

আমি তখন ভোলা দাদাকে বলিলাম, 'ভোলা দাদা, একবার তুমি রমা কাকাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস। এ সময় তাঁকে একবার দেখ্‌তে পেলেও আমার মনে অনেক বল পাব।'

ভোলা অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, 'দাদা বাবু, অমি ত আজ সকাল থেকে তাঁকে এখানে দেখ্‌তে পাইনি!'

বলিতে পারি না কেন ভোলার এ কথা-গুলি শুনিবামাত্র মনে এক ঘোর সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে আপনার মনে বলিয়া উঠিলাম, 'তাইত কেন বল দেখি?'

সে 'কেন'র উত্তরের প্রতীক্ষায় বেশী ক্ষণ থাকিতে হইল না। আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই রমা কাকার ভৃত্য সিদ্ধু ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে একটী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে রমা কাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় সে একখানি পত্র আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পত্রের উপরি-ভাগে রমা কাকার হস্তাক্ষর দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হা! ভগবান্! আমার অদৃষ্টে আরও দুঃখ আছে না কি!

তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। যাহা পড়িলাম তাহাতে আমি যেন

হঠাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। উঃ এ যে গুপ্ত ছুরিকাঘাত অপেক্ষাও নিদারুণ! মানব-হৃদয়ে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা! এ যে অননুভবনীয়, অবিশ্বাসনীয়, অচিন্তানীয়!

আমি ক্রোধে, দুঃখে, হতাসে মুহ্যমান্ হইয়া নির্ম্মলাকে বলিতে লাগিলাম, কি দেখ্ছ নির্ম্মলা! আমি যা বল্‌ব তা তুমি বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌বে? পিতৃ-অন্নে প্রতিপালিত যে রমা কাকা, তিনি আজ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি লিখ্ছেন জান? লিখ্ছেন যে রাজস্বের দায়ে জমিদারী আর দেনার দায়ে বাস্তুভিটাটী নীলাম হ'য়ে গেছে, আর ক্রেতা হচ্ছেন তিনি স্বয়ং। তবে যদি ইচ্ছে করি তাহলে কিছুদিন আমরা এবাড়ীতে থাকিতে পারি। সর্ব্বস্বাপহারক বিশ্বাসঘাতকের প্রসাদভোজী হ'য়ে আজ নিজের বাড়ীতে দীন অতিথির মত থাকৃতে হবে! উঃ এ যে অসহ-নীয়! হা! ভগবান্! এ সময় যদি তুমি আমায় মৃত্যু-ভিক্ষা দিতে তাহ'লে তোমার দয়াবান নামের সার্থকতা হ'ত! আমি মাথায় হাত দিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলাম।

নির্ম্মলা স্থির স্বরে বলিল, 'স্থির হ'ও। ধৈর্য্য ধর। তুমি পুরুষ মানুষ; বিপদের সময় ধৈর্য্য হারান কি তোমার উচিৎ?"

আমি নির্ম্মলার মুখের দিকে শোকার্ত্তের মত কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—'এতক্ষণে আমি সত্যসত্যই 'পিতৃহীন' হ'লুম। এইবার বল দেখি, এখন আমার কে আছে।'

নির্ম্মলা দৃঢ়স্বরে বলিল,—'আমি আছি।' তোলাদাদা আরও দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি আছি।'

আর পরক্ষণেই ঠিক যেন আমার মাথার উপর হইতে আরও দৃঢ়স্বরে একটী উত্তর আসিল, 'আর আমি আছি।'

আমরা সকলেই চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে এক দীর্ঘ কলেবর জটাজুটধর সন্ন্যাসী। সর্ব্বনাশ! নিমিষের মধ্যে আমার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত কে যেন শোষণ করিল! এ যে সেই সন্ন্যাসী! আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম, 'এ সব তোমার অভিশাপ, সন্ন্যাসী! তুমি সরে যাও।'

'এ সব আমার আশীর্ব্বাদ। আমি সরে যাচ্ছি বটে কিন্তু আমি আবার আস্‌ব।' জলদগম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি ভগ্ন হৃদয়ে নির্ম্মলাকে বলিতে লাগিলাম,—'নির্ম্মলা, আমি এ সন্ন্যাসীকে বিশেষরূপে চিনি। এ আমার শত্রু। নিশ্চয়ই আমার আবার কোন নূতন বিপদ আসছে।

নির্ম্মলা অবিচলিতচিত্তে বলিতে লাগিল, 'আসুক নূতন বিপদ, তাতে ভয় কি? তার সঙ্গে বিবাদ করুন না, বরং তাহাকে বরণ করে মাথায় তুলে নেব। আজ যে সুখের সিংহা-সনে ব'সে আছি, কাল সেই সিংহাসন একটা দমকা বাতাসের ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে দুঃখের অগাধ সমুদ্রে ডুবে যাবে, এত জানা কথা। এত জগতের রীতি। এত জগদীশ্বরের নিয়ম। এত মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা। সে রীতি সে নিয়ম, সে ইচ্ছা পালন করুব এত খুব আনন্দের কথা। এতে আর কষ্টই বা কি আর ভয়ই বা কি।'

আমি স্থিরনেত্রে নির্ম্মলার ঐ কথাগুলি শুনিতেছিলাম আর ভাবতেছিলাম, 'নির্ম্মলা! তোমার মধ্যে এত জ্ঞান, এত শান্তি, এত ধৈর্য্য। এঁ ত আমি পূর্ব্বে বুঝতে পারি-নি।'

নির্ম্মলা চুপ করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, 'নির্ম্মলা, তোমার উপদেশ নিয়ে কার্য্য কর্‌বার জন্য পিতা আমাকে আদেশ ক'রে গেছেন। অতএব তুমিই এখন আমার একমাত্র উপদেষ্টা। তবে বল, নির্ম্মলা, এখন আমার কর্ত্তব্য কি?'

নির্ম্মলা। তোমাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যদি দয়া করে আমার কথা শোন তাহ'লে চল আজ ঐ মহাশ্মশানে শ্বশুরের পবিত্র শবদেহের সঙ্গে আমাদের এতদিনের সুখ দুঃখের পুঞ্জীভূত স্মৃতিরাশি ভস্মীভূত ক'রে অন্যত্র চ'লে যাই। কাল প্রভাতে তপনদেব যখন নূতন রাগে পূর্ব্ব গগনে দেখা দিবেন, তখন আমরা নূতন প্রাণে নূতন দেশে নূতন লোকের মত পথ পর্য্যটন কর্‌তে থাক্‌ব। এত বড় পৃথিবী, এতে কি আমাদের মত দীন আশ্রয়হীনের স্থান নেই? নিশ্চয়ই আছে। তা না হ'লে জগৎ মিছে, জগদীশ্বর মিছে, তাঁর সৃষ্টিও মিছে।'

ভোলা দাদা এতক্ষণ নীরব ছিল। নির্ম্মলার কথায় যেন অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়া উঠিল, বৌদিদি, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। এ বাড়ীটা পর্য্যন্ত যখন আর দাদা বাবুর নেই তখন বিশ্বাসঘাতক রমানাথ বাবুর অনুগ্রহে এখানে থাকা আমাদের মরণ-সমান।'

রমা কাকার বিশ্বাসঘাতকতার কথা কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ভোলার কথায় আবার তাহা আমার মনে পড়িল—বুকের মাঝে নির্ব্বাপিত আগুণ আবার জ্বলিয়া উঠিল।

আমি ভোলা ও নির্ম্মলাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমার সেই সাধের নন্দন কাননে ছুটিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া শুনিলাম, আমার পাপ-বন্ধুগণ মূল্যবান সাজ সরঞ্জাম সহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তখন আমার নন্দন-কানন যেন প্রেত-ভূমি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি অচিরাৎ স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি লাগাইলাম। আমার সাধের নন্দন-কানন আজ ধূ ধূ করিয়া আমারই সম্মুখে পুড়িতে লাগিল। আমি সে দৃশ্য দর্শনে কতকটা যেন তৃপ্তিলাভ করিলাম। তারপর যে স্থলে বড় বড় অক্ষরে "নন্দন-কানন" লেখা ছিল সে স্থলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি-গর্ভে নিক্ষেপ করিলাম এবং পার্শ্বস্থিত ভস্মস্তূপের এক প্রান্ত হইতে কিছুটা ভস্ম লইয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলাম "প্রেতভূমি"।

আর তিলার্দ্ধমাত্রকাল বিলম্ব না করিয়া বাটী ফিরিলাম। বলিতে পারি না আমার মূর্ত্তি দেখিয়া ভোলা ও নির্ম্মলা কেন সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল।

অবশেষে নির্ম্মলা যাহা বলিয়াছিল তাহাই হইল। আমার শৈশবের ক্রীড়া-নিকেতন, কৈশোরের বিলাস-কানন, যৌবনের বিহার-ভবন, নন্দনপুরের এক প্রান্তে সেই উন্মুক্ত শ্মশান-বক্ষে পিতার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া সেই কৃষ্ণময়ী রজনীর শ্যামাঞ্চলের অন্তরালে আমরা তিনটী প্রাণী জীবনের নূতন পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন আমার জীবনের মধ্যাহ্নকাল।

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম্-এ, বি-এল্।

শ্রীভগবানের রাসলীলা।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথাটী শুনিলেই আজ কাল শিক্ষিত মহলে সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, ভগবানের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাকে একটী অশ্লীল বীভৎস ব্যাপার বলিয়া কত প্রতিবাদ উত্থাপন করিবেন। যে ধর্ম্মে এইরূপ দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে—তাহা যে নিতান্তই অসভ্য ও বর্ব্বরের ধর্ম্ম—এবং যে ধর্ম্মে এইরূপ উৎকট আদি রসের অভিনয় হইয়াছে—তাহার উচ্ছেদ সাধন এবং যে রাসরসিক রসময় পুরুষ ইহার নায়ক, তাহাকে দেবত্ব হইতে বরখাস্ত করা আধুনিক সভ্যতাপ্রিয় ব্যক্তিগণের একান্ত অভিপ্রেত।

ভগবানের রাসলীলা যে অশ্লীল ব্যভিচার নহে—তাহা সাধ্যানুসারে কতক কতক দেখাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি—ভালবাসা নামক একটী বৃত্তি লইয়াই জগতের স্থায়ীত্ব সুদৃঢ় হইয়াছে। এই স্থায়ীত্বের মূলে যদি ভালবাসা ভালরূপে সংবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব এতদিন লোপ হইয়া যাইত—ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ দেখিতে পাইত না—ভালবাসাবিহীন হইলে বিশ্বরাজ্য এতদিন যে মরুভূমিতে পরিণত হইত—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ভালবাসাই এই দুঃখদাবদগ্ধ সংসারকে মধুর করিয়া রাখিয়াছে—দুঃখময় সংসারকে ইন্দ্রের সুখময় নন্দনে পরিণত করিতে ভালবাসার প্রভাবই নিত্য বর্ত্তমান। এককথায় সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—একমাত্র ভালবাসা, ভালবাসা না থাকিলে এতদিন ইহা শ্মশানভূমে পরিণত হইত। পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, স্বামী-স্ত্রীতে,

---

গ্রাহকগণের প্রতি —"আলোচনা" যে মাসের কাগজ তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সকল গ্রাহকগণের নিকট আমার নিজের তত্ত্বাবধানে ডাকে পাঠান হয়, অতএব ইহাতে ভুল-ভ্রান্তি বা না পাঠাইবার কোন কারণ নাই। গ্রাহকগণ কাগজ না পাইলে পোষ্ট-আফিসের দোষ মনে করিয়া নিজ নিজ ডাকঘরে সংবাদ লইবেন, কিংবা পোষ্টমাষ্টারকে ইহার [illegible] জানাইবেন। সেই মাসের ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের জানাইলেও প্রতিকার করিতে পারি। ১৫ দিন অতীত হইলে আর কোন উপায় করিতে পারা যাইবে না। আর এই দুর্মূল্যের দিনে আমরা কাহাকেও পুরাতন সংখ্যা দ্বিতীয়বার পাঠাইতে বাধ্য নহি। আবশ্যক হইলে প্রতি সংখ্যার চারি আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। নিবেদন ইতি।

ম্যানেজার।

বন্ধুতে-বন্ধুতে ভালবাসার সূক্ষ্ম সূত্র জগতের শিরায় শিরায় নিবদ্ধ। মানবের যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে, ভালবাসাই তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এ বৃত্তি অপূর্ণ থাকিলে মানুষ অপূর্ণ—তাহার জীবন অপূর্ণতাময়, এরূপ জীব-জীবন জগতের কোন কাজে লাগিবার নহে। স্বামী স্ত্রী পরস্পর ভালবাসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখানুভব করেন, পিতাপুত্রে ইহার দ্বারা জীবন ধন্য করেন, বন্ধু-বন্ধুতেও সেইরূপ, সুখের চরম উপলব্ধি করিতে হইলে ভালবাসার ভিতর দিয়া না যাইলে উপায়ান্তর নাই। এই ভালবাসা স্বরূপত একই পদার্থ হইলেও আধার ভেদে নাম ভেদ বা শ্রেণীভেদ হইয়া থাকে। ইহা গুরুজনের প্রতি অর্পিত হইলে "শ্রদ্ধা" পুত্রে অর্পিত হইলে "বাৎসল্য" বন্ধুতে বন্ধুতে হইলে বন্ধুত্ব এবং ভৃত্যের প্রভুর প্রতি ভালবাসা হইলে দাস্য, স্বামী স্ত্রীতে হইলে "দাম্পত্য-প্রণয়" মূলে জিনিসটা কিন্তু একই—আধার ভেদে নাম ভেদ হয় মাত্র—নতুবা কোন বিভিন্নতা নাই। সংসারে আমরা ভালবাসাটীকে যেরূপভাবে প্রয়োগ করি—ভগবানের উপাসনা করিতে গেলেও আমাদিগকে ঠিক সেই ভাবেই প্রয়োগ করা উচিত। ভগবানকে কেহ মাতৃভাবে, কেহ পিতৃভাবে—কেহ প্রভুভাবে—অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভাবে তাহার উপাসনা প্রশস্ত। এই সকল ভাব আমরা সংসারে নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, অতএব এই সকল নিত্য অভ্যস্ত ভাবই ঈশ্বরে প্রয়োগ করা উচিত। সংসারের যে ভাব আমাদের নিত্য পরিচিত, আমরা সেই ভাবে সেই ভাবের ঠাকুরকে ভাবনা করিতে বাধ্য—অন্যভাবে ভাবিলে কোন ফল হইবে না। ভগবানকে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া তাহার উপাসনা করা যাইতে পারে, আবার তাঁহার দাস হইয়া, তাঁহার সখা হইয়া, তাঁহার কান্তা হইয়া ভালবাসিবার অধিকারও ভক্তের আছে। যদি প্রাণকান্তরূপে ভাবিয়া সাধক প্রেমময় ভগবানের চরণে আপনার জীবন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন—তবে সেই ভালবাসার নাম প্রেম-স্বরূপ ভক্তি মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে ভালবাসিয়াছিলেন—সে বাৎসল্য স্বরূপ ভক্তি, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে "প্রাণ-সখা" রূপে স্বরূপ ভক্তি করিয়াছিলেন; ব্রজ-বালকগণও ঐরূপ, অক্রুরাদির ভাব পরম দাস্য-ভাব। আর ব্রজগোপিকাগণ তাঁহাকে কান্ত-ভাবে ভাবিয়াছিলেন—তাহাদের ভালভাসা অভেদাত্মক পরমাভক্তি। জিনিসটা এক কিন্তু পাত্রভেদে নামভেদ হইয়া—তাহা ভগবদ্ভক্তি-রূপে পরিণত হইয়াছে—ফলতঃ সবই এক, এইজন্য ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়া-ছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহার সেইভাবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকি।

ব্রজবালাগণ যদি তাঁহাকে পাইবার জন্য স্বামী ভাবেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রাণের ধনকে পাইবার জন্য "প্রাণনাথ" বলিয়াই যদি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকেন—তবে তাহা ব্যভিচার হইল কিরূপে? যদি পরপুরুষ বোধে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার

জন্য তাঁহার সহিত সঙ্গত হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে দোষ দর্শিত হইতে পারিত। গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে মানব বলিয়া ভাবিতেন না, রাসের সময় তাঁহাদের স্তব পাঠ যথা— "ন খলু গোপিকা-নন্দনো ভবান, বিখন-সার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে, সখ উদেয়িবান্ সাত্ব তাং কুলে" হে অনাথের নাথ প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ। তুমি গোপকুলে জন্মিয়াছ বলিয়া আমরা তোমাকে সামান্য গোপপুত্র ভাবি না। তুমি জগৎপতি, দেবগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। রাসের এই সকল কথা যাহারা ভাগবতে পাঠ করিয়াছেন—যাহারা ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন—তাঁহারা কখনই ইহাকে অশ্লীল বলিবেন না। গোপিকাগণ যাহাকে ঈশ্বর বোধে স্তব করিতেন, সেই পূজনীয় দেবতার কাছে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন—ইহা কি কখন সম্ভব? কেহ কি কখন দেবতার কাছে কুভাব লইয়া যাইতে পারে? যাহাকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করিতেছেন—তাহাকেই উপপতি বোধে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে বসিয়াছেন—ইহা কি কখন সম্ভব? অতি বড় পশুপ্রকৃতিও ভগবানকে ডাকিবার সময় একটু পবিত্র ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তবে উপাসনায় অগ্রসর হয়। আর এক কথা, মনে যে সময় এক বৃত্তির উদয় হয়—ঠিক সেই সময় সেই মনে অন্য বৃত্তি উদয় হইতে পারে না—ইহা দার্শনিক সত্য। শিরোবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি-গণ বলেন—বুভুক্ষাবৃত্তি, প্রেমবৃত্তি যেমন মানব মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট আছে—তেমনি শ্রেষ্ঠব্যক্তির পূজা করিবার জন্যও এক বৃত্তি তদীয় মস্তিষ্ক আধারে অবস্থিত আছে। এই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোন ক্ষেত্রও জগতে আছে। আমরা পাঁচটী বাহ্য ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছি—জগতে ইহার যদি আবশ্যক না থাকিত—তাহা হইলে ইহার সৃষ্টি হইত না। জগতে দেখিবার দরকার আছে বলিয়াই যেমন চক্ষুর আবশ্যক বোধে সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি পূজা করিবার "পূপুজিষা" বৃত্তির ক্ষেত্র আছে—যিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই বৃত্তি তাঁহারই প্রতি অর্পিত হইতে পারে—তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীভগবান। এই পুপুজিষা বৃত্তি চরিতার্থের ক্ষেত্র যখন ভগবান, গুরুর গুরু, পরম পুরুষ, পূজ্য হইতেও পূজ্যতম, তখন তাহার কাছে ইন্দ্রিয় ব্যাপার, যাহা সামান্য বালকের কাছেও প্রকাশ করিতে পারা যায় না, সেই ব্যাপার লইয়া অভিসারিকা বা কামভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হওয়া কি ভক্তশ্রেষ্ঠা গোপিকা-গণের পক্ষে সম্ভব? তোমরা ভালবাসা বৃত্তি লইয়া সংসারে পিতৃমাতৃভাবে, গুরুভাবে উপাসনা করিতে যাও, গোপিকাগণও তেমনি কান্তভাবে প্রাণের দেবতাপদে প্রেম—ভক্তি ভালবাসার অঞ্জলি প্রদান করিয়া পরমাত্মভাবে পরমাত্মা-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন—সুতরাং তাহা অশ্লীল কিসে? ঈশ্বরে যাহা ভক্তি—তাহা দুর্নীতি হইবে কেন, দেবতায় যাহা অনুরক্তি—তাহা ব্যভিচার হইবে কোন্ হিসাবে?

রস শব্দ হইতে রাস হইয়াছে। কবিরাজী শাস্ত্রে রস হইতে রসায়ন হইতে দেখা

যায়। যাহার দ্বারা শরীর ধাতুর পরিবর্ত্তন করিয়া রোগের বিনাশ করতঃ নবজীবন আনিয়া দেয়, সেই রস ধাতু হইতে রাস হইয়াছে। রসে দৈহিক পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হয়। রাসলীলায় পুরুষে পুংত্ব স্ত্রীতে স্ত্রীত্ব ছিল না। রাসের সময় শ্রীকৃষ্ণের পুংত্ব বিকাশ হয় নাই এবং যে সকল স্ত্রী রাস মণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের স্ত্রীত্বের বিকাশ ছিল না। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব বিকাশের পূর্ব্বে এই লীলা বিস্তার হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে দ্বাদশ বৎসর অবধি অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার পরেই ভগবানের মথুরা লীলা, অতএব ইহাতে অশ্লীলতা কোথায়? ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় নবভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া নবলীলা বিস্তার করেন অর্থাৎ বিবাহাদি করেন।

ঈশ্বর মাতা কি পিতা, সখা কি স্বামী এ প্রবন্ধে তাহার অবতারণা করিব না। তবে তিনি যাহাই হউন, কি বলিয়া উপাসনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহাকে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত করিবার জন্য আমরা তাঁহার উপাসনা করি না। তাহার অভাব কিসের, তিনি যে সদাই সন্তুষ্ট তিনি আমার চির আনন্দময় প্রভু, ক্ষণ মাত্র তাহার সন্তোষের অভাব নাই—তাহাকে নূতন করিয়া তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট করিবে কি? এই যে সকল অনুষ্ঠান, এই যে সকল পূজা উপাসনা—এ সকল আমাদের নিজের সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হইবার জন্য। তাঁহাকে যেরূপভাবে ভাল বাসিলে তোমার প্রাণ তৃপ্ত হয়—তুমি তাহাকে সেই রূপ ভাবেই ভালবাস, যে ভাবে তুমি তাহাকে আয়ত্ত করিতে পার—সেই ভাবেই কর তাহাতে আসে যায় কি? আমার মা জননী তাঁহাকে ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বলিয়া সন্তুষ্ট, মা যশোদা পুত্র বলে সন্তুষ্ট, রাখাল বালকগণ সখা ভাবে সন্তুষ্ট আর ব্রজগোপিকাগণ প্রাণনাথ বলিয়া তাহার সেবায় সন্তুষ্ট, একই ঈশ্বর ভিন্ন ভাবে পূজিত, যিনি যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুন না কেন—মনোভাবের ভেদ অনুসারে ভালবাসার প্রভাব ভিন্ন হইলেও সকল উপাসনার মূল উদ্দেশ্য তাঁহাকে ভালবাসা, তাঁহাকে পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যে যেভাবে ভাল বাসুক তাহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে না। সংসারের ভালবাসা বহির্মুখীন, ক্ষণ ভঙ্গুর—এই আছে এই নাই,—ইহাতে জীবের বন্ধন মুক্ত না হইয়া বরং দৃঢ়তর হইয়া যায় কিন্তু এই ভালবাসাকে প্রেমময়ের চরণে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তির পথ অবশ্যম্ভাবী। ভগবানের রাসলীলায় "আত্মারামঃ স রেমে" আত্মরমণ নিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণ আত্মস্বরূপ, তাহার রমণ ক্রিয়া কি রক্তমাংসময় ব্যভিচার জড়িত হইতে পারে, পরন্তু ভাবময় সাধনার একটা উপাদান মাত্র—সাধক মাত্রেই এ কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। যে ভালবাসায় অভিন্নত্ব সম্পাদিত হয়; যে ভালবাসা ভালবাসার আধারে মনুষ্যকে ডুবাইয়া অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়—তাহাই হইল ভালবাসার চূড়ান্ত। প্রেমেই, ভালবাসার পূর্ণপরিতৃপ্তি—গোপিকাগণ ইহাই লইয়া

উপাসনা রাজ্যে বিচরণ করিতেন—তবে তাহা অশ্লীল কিসে হইল ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সকল গোপিকার মাতৃত্ব সূচিত হয় নাই, তাঁহারাই রাসে অবস্থিতা ছিলেন, আর রাসেশ্বরী ছিলেন—প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধা শক্তিরও মাতৃত্ব ছিল না; ভগবানের নিকট আয়ানের বর গ্রহণ সময় আয়ানও যেমন পুংশক্তি বিহীন, শ্রীরাধাও সেইরূপ স্ত্রীশক্তি বিহীনা হইয়া অযোনি সম্ভবা রূপে বৃষভানু রাজ ভবনে প্রতিপালিত হন। এই হেতু শ্রীমতী কখন মাতৃ নামে অভিহিতা, মাতৃরূপে পূজিতা হন নাই, মা রাধা কেহ কখন বলেন নাই—মা নাম তাঁহাতে আরোপিত হইলে যেন ভাল লাগিত না। প্রেমের রাজ্যে, ভক্তির রাজ্যে, ভালবাসার রাজ্যে তিনি আদর্শ, তিনি মূর্ত্তিমতী ভক্তি স্বরূপা বলিয়া শ্রীমতী আখ্যায় আখ্যায়িতা হইয়াছিলেন এবং তাহারই প্রেমঋণ পরিশোধের জন্য, প্রাণান্তকর ভক্তি ভালবাসার প্রতিদান করিবার জন্য ভগবান সেই সময় গৌররূপে ধরায় অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—ভগবানের এমন আত্মবিসর্জ্জন এক গোপিকা ভিন্ন আর কাহার জন্য হইয়াছিল কি ? তুমি আমি পার্থিব স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাকে যেরূপ চক্ষে দেখি,—সেরূপ ভাবে ইহাকে দেখিলে বাস্তবিক ঐশ্বরিক প্রেমের অপমান করা হয়। উপভোগের অংশ, রক্ত মাংসের সম্বন্ধ বাদ দিয়া দেখ দেখি রাগ মার্গের সাধক-মণি চণ্ডীদাস কি বলিয়াছিলেন—

শুন রজকিনি রামি।
রজকিণীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
রজকিণী প্রেম, নিকষিত হেম
দ্বিজ চণ্ডী দাসে কয়।

কামগন্ধ বিবর্জ্জিত প্রেম কি আমাদের বুঝিবার বস্তু ? সোণার পাথর বাটী যেমন, উপভোগবর্জ্জিত প্রেম ও আমাদের পক্ষে তেমন সাধন মার্গের শীর্ষস্থ হইতে না পারিলে, প্রেম-ভক্তির অগাধ সলিলে ডুবিয়া একেবারে আত্মহারা না হইলে—ইহা বুঝা অসম্ভব। কত জন্মজন্মান্তর সাধনা করিয়া যাঁহাকে পাইবার জন্য দেবতাগণ লালায়িত, গোপিকাগণ একজন্মে তাঁহাকে এইভাবে লাভ করিয়া কি ধন্যা হন নাই ?

গীতায় যে ভগবান অর্জ্জুনকে আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, ভাগবতে প্রেম-মন্ত্রে সেই ভগবান গোপিকাগণকে শিক্ষা দিয়াছেন—ইহাদের ভক্তির—ইহাদের সাধনার কি তুলনা আছে ? নানা ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে নানাভাবে সাধনা করিবার পন্থা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ব্রজগোপিকার সাধনার মত অতুলনীয় সাধনা হিন্দু-শাস্ত্র ছাড়া আর কোথাও নাই। যাহাকে আত্মদান করিয়াছি, হৃদয় খুলিয়া যাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছি—তাহার অজানিত তাহাকে অদেয় কি আছে ? হৃদয় বল্লভের, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পদে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া তাহারা কৃষ্ণময়জগত দেখিতেন। রাসরসিক রসময়ের সুবৃহৎ সত্ত্বায় নিজ ক্ষুদ্র সত্ত্বাটুকু ডুবাইয়া দিয়া রসকেলি করিয়াছিলেন। শ্যাম-সরোবরে প্রাণ ভরিয়া ডুব দিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া-

ছিলেন। যাঁহারা জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রাণময়ের রূপ দেখিতেন, যাঁহারা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপ মাধুরী দেখিয়া কৃষ্ণময় জীবন ধারণ করিতেন যাঁহাদের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি, তাহাদের ভক্তি বা ভালবাসার কল্পনা, অভক্ত, অসাধক ভগবানের প্রতি বাক্তিমাত্রহীন পাষণ্ড আমরা কি বুঝিব?

বেশী ভক্ত হইলেও প্রাণে একটা অহঙ্কার হয়—ধ্রুব, কি প্রহ্লাদ, কি অর্জ্জুন, প্রভৃতিরও হইয়াছিল কিন্তু ব্রজগোপিকার প্রাণে কি সে ভাব লেশমাত্র কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? অর্জ্জুন মনে করিতেন—আমি ভগবানের বড় ভক্ত, কি দর্পহারী একদিন তাঁহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলেন, মৃগয়ায় বন ভ্রমণ করিয়া উভয়ে কাতর হইলেন, পিপাসায় প্রাণ যায়, এমন সময় ভগবান মায়া বলে বন মধ্যে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা সৃষ্টি করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ অট্টালিকা দেখিয়া দুই জনে তাহাতে প্রবেশ করিলেন—অর্জ্জুন বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি দ্বারবানকে তথায় সে রজনী যাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণও কপট নিদ্রিত। মধ্য রাত্রে অর্জ্জুনের একবার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সহসা ঊর্দ্ধে চাহিয়া মস্তকের উপর তিন খানি শাণিত অস্ত্র ঝুলিতেছে—দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য্য হইয়া অর্জ্জুন প্রহরীকে ইহার বৃত্তান্ত বলিতে বলিলেন। প্রহরী বলিল—ইহা প্রহ্লাদ, ধ্রুব, আর অর্জ্জুন এই তিনজন পাষাণ্ড অভক্তের মুণ্ডচ্ছেদন করিবার জন্য ঝুলান রহিয়াছে। ততোধিক বিস্মিত হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, কেন, প্রহরী। ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। প্রহরী বলিল—প্রথম অভক্ত প্রহ্লাদ, তাহার পিতা যখন বলিল—তোর কৃষ্ণ কোথায়? ইহাতে অভক্ত আপনার প্রাণ রক্ষার্থ এবং নিজের কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য স্তম্ভ দেখাইয়া বলিল—ইহার মধ্যে আছেন। প্রাণের এমনি মমতা যে তাহার রক্ষার জন্য ভগবৎ শরীরে অস্ত্রাঘাত করাইল। প্রথমখানি তাহার জন্য ঝুলান রহিয়াছে। আর দ্বিতীয় অভক্ত ধ্রুব—সে কেবল "পদ্মপলাশ লোচন" রবে চীৎকার করিয়া ভগবানকে বন্য ব্যাঘ্রের মুখে তুলিয়া দিয়াছিল—দুরাত্মা এমন স্বার্থপর। দ্বিতীয় খানি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবে। আর তৃতীয় খানি অর্জ্জুন নামক একটা দুর্বৃত্ত আছে, তাহার জন্য, সে নরাধম—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবানকে রথের সারথি করিয়া তাহার কোমল গাত্রে কত তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করাইয়াছে—নিজে অক্ষত শরীরে রথের ভিতর অবস্থিতি করিয়াছে। যে নিজের স্বার্থসাধনের জন্য প্রাণের প্রাণ জগবন্ধুকে এমন ভাবে নির্যাতন করিতে পারে, তাহার মত অধার্ম্মিক জগতে আর কে আছে? কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল—তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আর সে সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন—তিনি একটা বটের মধ্যে পড়িয়া

রহিয়াছেন। অর্জ্জুন ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ভগ-ভগবান বলিলেন—তোমার মনে প্রধান ভক্ত বলিয়া একটা অভিমান জন্মিয়াছিল—তাই এই মায়িক ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া তোমার অভিমান ভঙ্গ করিলাম—ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে ভক্তির অভিমানও ভক্তের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন হেন ভক্তের ভক্তিও নিখুঁৎ নহে; তাহাতেও অভিমানের কলঙ্কপাত হইয়াছিল, আর ব্রজে ব্রজগোপিকার ভক্তিতে কি কেহ কোন খুঁৎ বাহির করিতে পারেন?

ইহাদের তুল্য নির্ম্মল প্রেম—এমন অহেতুকী ভক্তি কি আর কোন ভক্ত ভগবানে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন? এমন আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ করিয়া আত্মানন্দে—ব্রহ্মানন্দে, পরমব্রহ্মের প্রেমসাগরে একেবারে নিখুঁৎভাবে আত্মহারা হইয়া তলাইয়া যাইতে, ভগবৎ তন্মাত্রে অস্তিত্বরহিতা হইয়া তন্ময় হইতে আর কোন ভক্ত কি পারিয়াছে? হিন্দু-শাস্ত্রে ব্রজগোপিকা ভিন্ন কি এমন কোন ভক্তের নামোল্লেখ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র করিতে পারেন?

এমন নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ভক্তির খেলা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ভিন্ন, শুধু রাসলীলা কেন শ্রীবৃন্দাবনে যে কোন লীলা লীলাময় দেখাইয়াছেন—তাহা আর কোথায় দেখিতে পাইবে? অভক্তের চক্ষে দেখিলে হইবে না, কামকান্তার ভাবে বিভোর হইয়া ভাবিলে চলিবে না, [illegible] ভক্তিমার্গে চিত্ত লয় করিয়া সাধকের চক্ষে একবার দেখুন দেখি—রাসরস রসিক রসময়ের রাসলীলায় আত্মদানের কি জ্বলন্ত—কি প্রেমকুটন্ত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে? ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় নিস্বার্থভাবে ভগবানের উপাসনা কোনও ভক্ত করিতে পারে নাই। সকল ভক্তেরই এক একটা বাসনা লইয়া উপাসনার পথ মুক্ত হয় কিন্তু গোপিকাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে কোন বাসনা ছিল না—যদি থাকিত তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া প্রার্থনারূপে বাহির হইত। ব্রজগোপিকা জীবনে কোন প্রার্থনা জানান নাই। অতএব ইহা নিস্পৃহ, নির্লোভ—নিবৃত্তিমার্গের সাধকের যাহা হইয়া থাকে—ইহা তাহাই। রাসলীলা সাধনমার্গের চূড়ান্ত আদর্শ; আপন ভুলিয়া আত্মারামের হওয়া, প্রাণ দিয়া প্রাণময়ে মিশাইয়া যাওয়াই রাসলীলার আদর্শ দৃষ্টান্ত—সাধনার উচ্চস্তরে বসিয়া ভক্তির চক্ষে দেখিলে সাধক মাত্রেই এ লীলার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

সম্পাদক।

সুখান্বেষণে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

সুখীরও দিন যেরূপ যায়, দুঃখীরও দিন সেইরূপ যায়। দিন কাহারও থাকে না। কাজেই আমাদেরও দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল।

যখন প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব সুন্দর রক্তিম সাজে সজ্জিত হইয়া গগণ-মার্গে তাঁহার

দৈনন্দিন ভ্রমণ কার্য্য আরম্ভ করিতেন আমরাও তাঁহার সঙ্গী হইয়া পথপর্য্যটন আরম্ভ করিতাম ; তারপর যখন সেই সূর্য্যদেব সায়ংকালে ক্লান্তি বিনোদনের জন্য অবকাশ লইতেন, আমরাও পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রাম করিতাম। আমাদের গন্তব্য কোথায় তাহা জানিতাম না, তথাপি এরূপভাবে ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিলাম।

একত্রে কোন কাজ করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে কার্য্যের ভাগ করিয়া লইতে হয় সুতরাং আমরা তিন জন আমাদিগের মধ্যে কার্য্যের বিভাগ করিয়া লইলাম। আমি ভোলাদাদার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতাম। নির্ম্মলা আহার্য্য প্রস্তুত করিত আর বিরামদায়িনী রজনীর স্নিগ্ধ ছায়ায় কোন এক মধুর-ভাষিণী তটিনীর স্বপ্নময় নির্জ্জন তটে অথবা কোন এক জ্যোৎস্না-বিধৌত অরণ্যানীর নিভৃত কুঞ্জে বাসযা বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে "রামায়ণ" ও "মহাভারতের" শ্লোকগুলির পুনরাবৃত্তি করিত। আহা! সে কতই মধুর! কতই ভাবময়! কতই মর্ম্মস্পর্শী! শুনিতে শুনিতে কখনও কখনও ভাব-বিমুগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনিই হারাইয়া ফেলিতাম।

প্রথমে যখন পথ-ভ্রমণে বাহির হই তখন ভাবিয়াছিলাম পথে কত কষ্টই না পাইব, কিন্তু পরে দেখিলাম সে ভাবনা ভিত্তিহীন। কই, কষ্ট ত পাইলাম না! কষ্টের পরিবর্ত্তে যেন কেমন একটা নূতন সুখের আস্বাদন পাইলাম। জন্মাবধি কারারুদ্ধ ছিলাম হঠাৎ জানিনা কোন দেবতার আশীর্ব্বাদে কারামুক্ত হইয়া নিবিড় নিলীমা-মণ্ডিত উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির নিত্য নূতন মাধুরী ছবি দেখিতে পাইতাম, তখন যে অপূর্ব্ব অসীম আনন্দ রসে হৃদয় ভরিয়া যাইত,তাহা অনির্ব্বচনীয় ও অনুপমেয়। সেই সময় ভাবিতাম হায়! কেন আমি এতদিন নিকৃষ্টভোজী কুক্কুরের মত সেই নন্দনকাননরূপ প্রেতভূমিতে পলিত শবসম পূতিগন্ধময় সুখরাশির জন্য লোলরসনায় ঘুরিয়া মরিতেছিলাম।

পথ-পর্য্যটনে প্রায় তিন মাস অতীত হইল। সহসা একদিন ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকাময় আবরণ ভেদ করিয়া এমন একটী ঘটনা দেখা দিল—যাহাতে আমার নূতন জীবন-ধারা আবার একটী নূতন দিকে ধাবিত হইল। পিতার মৃত্যুতে ও অতুল পৈতৃক সম্পত্তির বঞ্চনে আমার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নহে। কই, তাহাতে আমার জীর্ণ পুরাতন দেহ-মনটী ত ভাঙ্গিয়া যায় নাই! এবার সেটীও ভাঙ্গিয়া যাইল এবং তাহার স্থানে যেন একটী নূতন দেহ-মন পাইলাম। অতএব এ ঘটনাটী না বলিয়া আমি কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।

তখন সন্ধ্যার কৃষ্ণ-ছায়া জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পথ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল না। এমন সময় একদিন আমরা সমস্ত দিবস ভ্রমণের পর বিশ্রামের জন্য একটী বটবৃক্ষ তলে আশ্রয় লইলাম।

বৈশাখী পূর্ণিমা। শীঘ্রই পূর্ণচন্দ্রের উদয়

হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশটী স্বচ্ছ কিরণ-ধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। তখন দেখিলাম, পশ্চাতে এক সুদীর্ঘ-কলেবর গিরিবর সেই পূত কিরণ-সলিলে স্নাত হইয়া ধ্যান-নিমগ্ন-চিত্তে যোগীবরের মত বিরাজ করিতেছে, সম্মুখে এক মধুর রঙ্গিনী তরঙ্গিনী চন্দ্রিকা-ভরণে স্বীয় অঙ্গ সজ্জিত করিয়া যেন সেই পরম-প্রেমময়ের প্রেমাস্বাদনে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া চলিয়াছে, আর দুই পার্শ্বে দূর-বনান্তরালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপাবলী জ্বালিয়া যেন ভক্তিভরে স্তব্ধভাবে সেই বিশ্বদেবতার আরতি করিতেছে। বাঃ! বাঃ! কি শান্ত সৌন্দর্য্য! কি অতুলনীয় রমণীয়তা! আহা! এমনটী পূর্ব্বে কোথাও কখনও দেখি নাই। পাষাণ-কঠিন মানব-হৃদয়ও এভাবদর্শনে বিচলিত হয়। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী নয়, এ স্বর্গদ্বার! আমি তন্ময়চিত্তে বসিয়া বসিয়া এরূপ ভাবিতেছি, এমত সময় মনে হইল যেন আমার অন্তরের একটী রুদ্ধ প্রস্রবণ হটাৎ খুলিয়া গেল—যুগপৎ যেন এক দুর্দ্দমনীয় স্রোত কোথায় এক নূতন দেশে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে প্রবলবেগে টানিতে লাগিল। আমি আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিলাম না। ভোলা ও নির্ম্মলা বসিয়া রহিল, আমি নির্ব্বাকভাবে নদীতীর ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এইরূপে কতদূর চলিয়া গেলাম বলিতে পারি না। অবশেষে ক্লান্ত-চরণে এক উপলখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম। ঐ সময় অনতিদূরে মৃদু নৈশ গগন কাঁপাইয়া কে যেন গাহিতেছিল,—

কত নিশি, আমি,
ওগো! হৃদি-স্বামী!
রহিব বিরহে জাগিয়া।
পিপাসিত চিত
যাচিছে নিয়ত
তোমারি মিলন অমিয়া।
হেরি' এ মধুরা
পূর্ণিমা যামিনী,
কাঁদি গো তাপিতা
তব বিরহিণী,
কোথা তাপহারী
হৃদয় বিহারী!
জুড়াও বারেক আসিয়া॥
বুঝি কোথা কোন্
সুদূর গগনে,
রেখেছ লুকায়ে
তোমারে গোপনে,
এস, নাথ! এস,
হৃদয়েতে ব'স
কনক আসন পাতিয়া॥

গান থামিয়া গেল। কিন্তু তখনও যেন আমার কানে প্রতিধ্বনি হইতেছিল,—

'বুঝি কোথা কোন সুদূর গগনে
রেখেছ লুকায়ে তোমারে গোপনে,
এস নাথ! এস, হৃদয়েতে ব'স
কনক আসন পাতিয়া॥

সেই নির্জ্জন প্রান্তরের মাঝে এ কোন্ বেদনাতুরের করুণ মর্ম্মস্পর্শী গান—তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে বোধ হয় যেন, সেই মুহূর্ত্তে তাহার বেদনার কিছুটা আমারও

অন্তরের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। আমি ব্যাকুল চিত্তে সেই চন্দ্রিমা বিকসিত নীলনভোমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন এক নূতন চিন্তার ঘোরে আমি বিভোর হইয়া পড়িলাম।

যখন চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিল, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। এতক্ষণ ভোলা ও নির্ম্মলার কথা মনে ছিল না, এইবার তাহাদের কথা মনে পড়িল। সহসা কেন যেন অন্তরাত্মার সত্রাস কম্পন অনুভব করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম। তাইত। তবে কি তাদের কোন অমঙ্গল ঘ'টেছে, ঘ'টতেও পারে। এত মাঠের মাঝে তাদের দুজনকে ফেলে রেখে আসা আমার খুব নির্ব্বুদ্ধিতারই কাজ হ'য়েছে।

আমি তখন আত্ম ভৎসনা করিতে করিতে ত্বরিত পদে ফিরিতে লাগিলাম।

যখন পূর্ব্ব কথিত বটবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। "ভোলাদাদা" "ভোলাদাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলাম না। তখন সন্দেহ ঘনীভূত হইল। পরে আরও নিকটবর্ত্তী হইলে যেন কাহার অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি. শুনিতে পাইলাম। বুকের মাঝে কে যেন সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! যা ভাবিলাম তাই নাকি।

গাছের তলায় ছুটীয়া আসিয়া দেখিলাম সম্মুখেই নদীর তটে যেন একটী মনুষ্য দেহ জড়বৎ পড়িয়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সর্ব্বনাশ! এ কি, এ যে ভোলাদাদা!

তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। আমি বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছি, এমন সময় আবার সেই কাতর স্বর শুনিতে পাইলাম। দূরে থাকায় সে কার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারি নাই। এবার বুঝিতে পারিলাম—ওহো! এ যে নির্ম্মলার!

আমি তখন ক্ষিপ্রগতিতে গাছের অপর এক পার্শ্বে যাইয়া দেখিলাম যে কিছু দূরেই নির্ম্মলা শুইয়া আছে। তাহার হস্তপদ যেন রজ্জুবদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিমিষের মধ্যে দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে তাহার কাছে ছুটীয়া গেলাম। নির্ম্মলা—নির্ম্মলা—নির্ম্মলা—বলিয়া আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা বলিতে পারিলাম না।

নির্ম্মলা আমার মনের তীব্র উদ্বেগ বুঝিতে পারিয়া ধীরভাবে বলিল—ধৈর্য্য ধর। প্রথমে আমার বাধন খুলে দাও, তারপর আমি সব বলছি।

আমি যত সত্বর পারিলাম বন্ধন খুলিয়া দিয়া যেন শক্তি শূন্য দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম।

নির্ম্মলা অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া বলিল—তুমি আমার মাথার কাছে বস। আমি তোমার কোলের উপর মাথা রাখি।

আমি মায়া-মুগ্ধের মত নির্ম্মলার কথানুযায়ী কোল পাতিয়া, বসিলাম। সে আবার

কোলে মাথা রাখিয়া বলিতে লাগিল—টাকা ও গহনার লোভে একজন সাধুবেশী দস্যু আমাদের এ দশা ঘটাইয়াছে। সে যে কতক্ষণ আমাদের পিছন নিয়েছিল তা বল্‌তে পারি না। তোমার ফির্‌তে বিলম্ব দেখে আমাকে ও ভোলাদাদাকে চিন্তিত মনে ব'সে আছি, হটাৎ সেই দস্যু বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ভোলাদাদাকে ছুরি মার্‌লে। ভোলা দাদা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাকে বাধা দিতে লাগ্‌লো। শেষে যখন তার মৃতদেহ মাটীর উপর লুটিয়ে পড্‌ল—তখন আমি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম। তখন সেই দস্যুটা আমাকে মরণের ভয় দেখিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা কর্লে। আমি কিছুতেই বল্লাম না। তারপর সে আমার হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রহার কর্ত্তে লাগ্‌লো। তাতেও আমি তোমার কথা—বল্লুম না। শেষে গয়না ও টাকার থলিটা দেখ্‌তে পেয়ে নিয়ে পালালো, আর যাবার সময় বেগে আমাকে একটা ছুরির আঘাত ক'রে গেল।"

সর্পদংষ্টের মত আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—এ্যা! সে কি! নির্ম্মলা তোমাকেও জখম ক'রেছে!' তাহার বুকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে সত্য সত্যই—অনর্গল রক্তঃস্রাব হইতেছে।

উঃ! নির্ম্মলা, আজ আমিই তোমাদের এ হত্যার কারণ। গয়না ও টাকা সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে তোমায় কত নিষেধ কর্লে কিন্তু আমিই তা শুনলুম না। কিন্তু তৈজস সমস্ত [illegible] গয়না ও টাকার মায়া ত্যাগ কর্ত্তে পারলুম না—তাই আজ তোমাদের এই দশা, এই বলিয়া আমি সজল-নেত্রে—অপরাধীর মত নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিলাম। এই সময় কেমন যে একটা কঠিন বেদনা আমার বুকের মধ্যে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া অস্থি-পঞ্জর কয় খানিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমার প্রাণের ব্যথা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয়, প্রবোধ দিবার জন্য নির্ম্মলা বলিল—'ভবিতব্য হবেই হবে। তাতে কা'রও হাত নেই—তা ছাড়া তোমাকে জগদীশ্বরের ওপর সম্পূর্ণভাবে আত্ম নির্ভরতা শেখাবার জন্যই বোধ হয়, আজকের এই ঘটনা। সুতরাং এও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা, তবে এর জন্য কষ্ট কি? নির্ম্মলা, এই সবে মাত্র—আমি তোমায় চিন্তে পেরেছিলুম—তাই, মনে ক'রেছিলুম যে যদিও সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, তবু তোমাকে আর ভোলাদাদাকে নিয়ে জীবনের বাকী দিন টুকু আনন্দে কাটিয়ে দিব। বিধি বাদী হ'য়ে সে আশাটুকুও যে আজ কেড়ে নিলে নির্ম্মলা! সুখের জিনিষ সবই চ'লে গেল, আর এতে কষ্ট কি! উঃ! আমি যে ভাব্‌তে পাচ্ছি না তোমরা আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলে আমি—একলা এই মরুময় পৃথিবীর মাঝে কি ক'রে থাক্‌বো—বলিতে বলিতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে থামিয়া গেলাম। দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে অজস্র ধারায় সেই জল নির্ম্মলার বেদনা-পাণ্ডুর গণ্ডদেশের উপর পড়িতে লাগিল। বোধ হয়, বিচ্ছেদের কাল আসন্ন বুঝিয়া—একবার শেষ মিলনের জন্য

নির্ম্মলা আমার দুই হাত বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষত বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

তারপর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ক্ষীণস্বরে নির্ম্মলা বলিতে লাগিল,—'তুমি আমার স্বামী, গুরু, দেবতা, তোমায় ছেড়ে আমার গতি—কোথায়? বোধ হয় তোমার চরম লক্ষ্যের পথে আমি একটুকু—অন্তরায় হ'য়েছিলুম তাই—জগদীশ্বর আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আমায় সরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু স্থির জেনো, তিনি চিরদিনের জন্য আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পার্ব্বেন না। যে অজানা দেশে আমাকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমি তোমার মিলন প্রত্যাশিণী হ'য়ে থাক্‌বো। যখন তোমার এ জগতের কাজ শেষ হ'য়ে যাবে, তখন আবার আমরা মিল্‌বো, ভোলা দাদাকে পাবো, শ্বাশুড়িকে পাবো, সকলকে পাবো। সকলে মিলে আবার এক নূতন সংসার পাৎবো। এ সংসারে যে সুখ পেলাম না, সেখানে সে সুখ পাবো। সে সুখ অনন্ত—অবিরাম।

এই বলিয়া নির্ম্মলা যেমন জোরে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল, অমনি তাহার ক্ষত বক্ষ আরও বেগে রক্তবমন করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ—অবসন্ন হইয়া পড়িল।

আমি নিরুপায় হইয়া ব্যাকুল-চিত্তে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা তাহার ক্ষত স্থানে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু তাহা বিফল হইল। রক্ত কিছুতেই থামিল না। তখন একমনে সেই অসহায়ের সহায় দীনবন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। মনে হয়—জগদীশ্বরকে সেই আমার প্রথম ডাকা।

এদিকে নির্ম্মলার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় ক্রমশঃই নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। তাহার চোখের আরও নিকটে আমার মুখ লইয়া যাইবার জন্য অস্পষ্ট ভাবে বলিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাই করিলাম।

তখন নির্ম্মলা তাহার সেই দুর্ব্বল হস্ত দুই-খানি আমার স্কন্ধের উপর রাখিয়া অতি ক্ষীণ-স্বরে বলিতে লাগিল,—আমার মনে হ'চ্ছে—যেন চাঁদের আলোয় আর তেজ নেই। সমস্তই যেন একটা কাল আচ্ছাদনে ঢেকে যাচ্ছে। তবে এই বুঝি মৃত্যুর কাল ছায়া!' এই খানে ক্ষণেক থাকিবার পর সহসা যেন কি এক গুপ্ত বেদনায় অস্থির হইয়া আমার মুখের দিকে আকুল নয়নে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—'যাক্—সব আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাক্,—সব অন্ধকারে ডুবে যাক্, কিন্তু তুমি চলে যেওনা। এস, তুমি আরও আমার চোখের কাছে মুখ নিয়ে এস।'

আমি যন্ত্র চালিত পুতুলের মত তাহার চোখের আরও কাছে মুখ লইয়া যাইলাম। নির্ম্মলা—আমার দিকে সতৃষ্ণনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সেই ক্ষীণ রক্তহীন হস্ত দুইখানি আমার স্কন্ধের উপর হইতে নামাইয়া করযোড়ে সেই সুদূর নিশীথ গগনের এক প্রান্তে, তাহার সেই করুণাপ্রার্থী নয়নদ্বয় প্রেরণ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে যেন অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিতেছে—'দয়াময়! তুমি রইলে আর আমার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ রইলো। দেখো প্রভু

যেন—' আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

আমি সাগ্রহে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, তাহার ওষ্ঠদ্বয় মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে আর জলভারাক্রান্ত চক্ষু দরদর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

তারপর নির্ম্মলা অতি কষ্টে আমার চরণ-ধূলা লইয়া নিজের মাথায় দিয়া কি যেন বলিবার প্রয়াস পাইল। আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া শুনিলাম, সে বলিতেছে,—'হৃদয়দেবতা! আশীর্ব্বাদ কর, তোমায় যেন জন্মজন্মান্তরে আবার পাই।'

তারপর? তারপর সব শেষ। নির্ম্মলা থামিয়া গেল—ইহজন্মের মত বিদায় লইয়া থামিয়া গেল; বুঝিলাম, এ জগতে আর নির্ম্মলার কথা আমি শুনিতে পাইব না। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে আমার কাছে ছিল, তাই তাহার কথা শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু এখন সে যে বহুদূরে!—সে মরণ-সমুদ্রের পরপারে! আর কি তার কথা এ জীবনে আমি শুনিতে পাইব!

(১১)

নির্ম্মলার মৃত্যুতে বুঝিতে পারিলাম যে জগতে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক মৃত্যু আছে। ভ্রাতাদের স্ত্রীপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুকে উপহাস করিয়াছি; পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, মৃত্যুকে চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই; খোকাবাবারও মৃত্যু ঘটিল, মৃত্যু আমার কাছে বিভীষিকাময় হইয়াও হইল না; এইবার নির্ম্মলা মরিল, মৃত্যুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলাম। তাই, আজ সাধ হইল দেখি, ভাল করিয়া দেখি, মৃত্যু কি।

মৃত্যু চিত্র দেখিবার জন্য বিস্ফারিত-নেত্রে নির্ম্মলার মুখের উপর চাহিলাম। কিন্তু একি! যাহা দেখিলাম সে ত মৃত্যু-চিত্র নয়! সে যে স্বর্গ ছবি! দেখিলাম, নির্ম্মলার মুখমণ্ডলের উপর কেমন যেন এক দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডিত পুণ্যময় দেশের হৃদয়-বিমোহন মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।—যেন এই জীব-জগতের মহাশ্মশানে অহোরাত্র পৈশাচিক নৃত্যোন্মত্ত সুখ-দুঃখ-ভয়-ক্রোধ-হিংসা-অভিমান সেই মোহময় শান্তির দেশে কোন এক কুহকীর কুহকদণ্ডের মৃদুস্পর্শে হৃত-চেতন্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!—আর যেন এই সতত ঘূর্ণায়মান সংসার-চক্রের উচ্ছৃঙ্খল শ্রুতি-কঠোর ঘর্ঘর শব্দ সেখানে কোন এক মায়াময়ের মায়ামন্ত্রে মধুময় নীরব গীতিতে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলাম, যে মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবকুল ভীত—সঙ্কুচিত—উৎকণ্ঠিত সেই মৃত্যুর চিত্র কি এতই সুন্দর! এতই মধুর! এতই স্নিগ্ধ! এতই শান্তিময়! তাই যদি হয় তবে—বিকার-গ্রস্ত রোগীর মত উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলাম—'নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! আমি আর এই মরুময় জগতের সুখ-মরীচিকায় ভুলিয়া থাকিতে চাহি না—চল, এখনই তোমার ঐ শান্তিময় আনন্দধামে নিয়ে চল।' এই বলিয়া আমি নির্ম্মলার মৃতদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িলাম। একেবারে উৎকট শোক, দুঃখ, ও চিন্তার নিদারুণ তাড়না আমার

দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহ্য করিতে পারিল না। অচিরাৎ সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমশঃই আমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে মোহাচ্ছন্ন হইয়া মাটীর উপর গড়াইয়া পড়িলাম।

মোহঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি একাকী এক বিঘোরা যামিনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারের ভিতরে কোন এক অপরিচিত পথে একটী ক্ষীণ আলোকের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমশঃ যেন এক কণ্টক-ঘন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চরণ ক্ষত-বিক্ষত হইল, দেহে রক্তের স্রোত বহিল, তবুও আমি বিরত হইলাম না। এমন সময় কে যেন পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠে অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল,—'সাবধান। ও আলেয়া, প্রকৃত আলো নয়। প্রকৃত আলো দেখ্‌তে চাও ত বনের বাহিরে এস।' আমি চতুর্দ্দিকে চাহিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন ভাবিলাম, 'সর্ব্বনাশ! আমি এ আলেয়ার পিছনে ছুট্‌তে ছুটতে কোথায় এসে পড়েছি! এখানে ত কেউ নেই! কে আমায় রক্ষে কর্‌বে? কে আমায় এই বিপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যের বাহিরে নিয়ে যাবে?" হঠাৎ দেখিলাম ঠিক এই সময় কোথা হইতে যেন দুইটী মানুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন আমার সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, আর একজন আমার পিছনে সাহস দিতে দিতে আসিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধাধর সিংহ রায়, এম, এ, বি, এল।

বৈবস্বত মনু।

ইতিপূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধে আমরা পৃথিবীর সামাজিক শাসন-কর্ত্তার বিষয় আলোচনা করিব।

পৃথিবী একটী গ্রহ, ইহার নাম বিষ্ণু, এই বিষ্ণুকে কোন কোন স্থানে শ্বেতদ্বীপাধিপতি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির বিষ্ণু ইনি নহেন। এই ত্রিমূর্ত্তির অন্তর্গত বিষ্ণু আমাদের সৌরমণ্ডলের অধিপতি সুতরাং তিনি সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য সমুদয় গ্রহমণ্ডিত, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হইতেছেন ও আমাদের পৃথিবীর পালক বিষ্ণুর উপরে হইতেছেন। আমাদের পৃথিবীর রাজা এক গ্রহাধিপতিদেব হইতেছেন মাত্র। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাদের অধিপতি ত্রিমূর্ত্তিদের উপর একজন মহানু পুরুষ আছেন, ইহাকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে, ইনি শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ। বনমালা শোভিত পীতাম্বর ও কৌস্তভমণি ভূষিত।

পৃথিবীর রাজা শ্বেতদ্বীপাধিপতি বিষ্ণু আমাদের পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপ রাজা হইতেছেন, তিনি পৃথিবী সম্বন্ধে সকল বিভাগেরই কর্ত্তা, অধীনস্থ দেবগণ ইঁহাকেই [illegible], ইহার অধীনে বহুতর কর্ম্মচারিবৃন্দ পৃথিবীর ব্যাপার পরিচালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই মহান্, অমিতশক্তিধর ও [illegible] হইতেছেন, কিন্তু বিষ্ণু [illegible] বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

ধর্ম্মরাজ্যের শাসনের কথা আমরা লিখিতে গিয়া বলিয়াছি যে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের উন্নতি করা ও নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করা এবং ধর্ম্মপথের পথিকদের পরিচালন করা সমস্তই এক বিভাগের কার্য্য, সেই বিভাগের উপর যিনি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাঁহার নাম জগদ্গুরু; বৌদ্ধগণ এই পদের নাম বোধিসত্ত্ব বলিয়া থাকেন। আমরা জানিতেছি যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই পদে বহুকাল আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার উচ্চতর পদে উন্নতি হইবার পর হইতে ভগবান মৈত্রেয় ঋষি এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইনি এখনও এই কার্য্যেই রহিয়াছেন এবং শীঘ্রই ইনি মর্ত্ত্যলোকে নরদেহে প্রকাশ হইয়া সকল ধর্ম্মের সাধকগণকে নূতন শক্তিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিতে আসিতেছেন।

সামাজিক, নৈতিক, আন্তর্জাগতিক শাসনকার্য্যে উক্ত শ্বেতদ্বীপাধিপতি বিষ্ণুর অধীনে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নাম মনু। ভূমিকম্প, আগ্নেয় উৎপাত আদি, মানবজাতির ক্রমোন্নতি, নানাজাতির উৎপত্তি, জাতিবিশেষের ধ্বংস, নূতন রাজ্য ও সভ্যতা স্থাপন, প্রাচীন রাজ্যের ও সভ্যতার লোপ, যুদ্ধবিদ্রোহাদি ব্যাপার সমুদয় এই বিভাগে পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিভাগের কর্ম্মচারীর ইঙ্গিতে মহাসমুদ্রে নূতন দেশের উৎপত্তি হয়, মহাদেশ ধ্বংস হইয়া অতল জলে ডুবিয়া যায়। কোন জাতিবিশেষের উৎপত্তি হইয়া তাহার বিস্তার হইয়া শেষে তাহা লোপ হইয়া যায়। মানবের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি গঠিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মহাজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানবের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতিবিশেষের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া অন্য জাতির সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধান ও যুদ্ধে উদ্দেশ্যমত কোন জাতিবিশেষের জয় বা পরাজয় করান হইয়া থাকে, কোন কার্য্যই পৃথিবীর লোকের ইচ্ছামতে হয় না।

ধর্ম্মরাজ্যে যেরূপ মানবের শিক্ষা ও পারলৌকিক উন্নতির গঠন হয়; শাসন বিভাগে সেইরূপে লোকের ও এই পৃথিবীর ইহলৌকিক সুখস্বচ্ছন্দতার ও সামাজিক নৈতিক এবং আন্তর্জাতিক উন্নতি-বিধান করা হইয়া থাকে।

মনু আদর্শ মানব, প্রত্যেক মহাজাতির আদর্শ স্বরূপ এক এক জন মনু আছেন। প্রত্যেক মহাজাতির আকৃতি কোন এক বিশেষ প্রকারের হইয়া থাকে, আবার সেই মহাজাতির অন্তর্গত সাত প্রকার শাখাজাতীয় মানবদের আকৃতিরও অনেক বিভিন্নতা থাকে। এক চীনদেশবাসী লোকের সহিত একজন ইংরাজের আকৃতির তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই উভয়ের মধ্যে কতই প্রভেদ, ইহা হইতেই মহাজাতির মধ্যে গঠনের প্রভেদ কিরূপ হইয়া থাকে বুঝা যায়। এক এক শাখাজাতিতে সেই মহাজাতির মূল গঠন বজায় রাখিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য কারণ বশতঃ আকৃতির কোন প্রকার বিশেষত্ব উৎপাদন করা হইয়া থাকে। একজন জার্ম্মাণের সহিত একজন ইটালিয়ানের চেহারায় তুলনা করিলে এই শাখাজাতি মধ্যে কিরূপ আকৃতির বৈষম্য হয়—দেখা যায়। দুই জাতিই আর্য্য নামক

মহাজাতির শাখা হইতেছে। জার্ম্মাণরা পঞ্চম শাখাজাতি, ইটালিয়ানরা চতুর্থ শাখাজাতি।

জাপানী, আমেরিকাবাসী রেড ইণ্ডিয়ান নামক তাম্রবর্ণের জাতি, ও কাবাইল জাতি, সকলেই চতুর্থ মহাজাতির লোক, কিন্তু জাপ্যনীরা এই মহাজাতির সপ্তম শাখাজাতি, এই জাতির নাম মঙ্গোলিয়ান, আমেরিকার তাম্রবর্ণ জাতি চতুর্থ মহাজাতির টলটেক নামক তৃতীয় শাখাজাতির অন্তর্গত, কাবাইল জাতি আকাডিয়ান নামক চতুর্থ শাখাজাতি হইতেছে। কিন্তু এই সকল চতুর্থ মহাজাতির কাল বহু পূর্ব্বে শেষ হইয়া যাওয়ায় এই জাতির লোকেদের ভিতর খাঁটী গড়ন আর মিলে না। অন্যান্য জাতির সহিত বিবাহাদি সূত্রে মিশ্র গঠন হইতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান আর্য্যজাতির বৈবস্বত মনু নিখুত চেহারা, ইঁহাতে এই জাতির যেরূপ গঠন হওয়া---মহারাজ বিষ্ণুর ইচ্ছা ও তিনি যে আদর্শ এই মনুকে দেখাইয়াছিলেন তাহাই পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। আর্য্যজাতির এক্ষণে অভ্যুদয় কাল চলিতেছে ও বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। আর্য্যজাতি পঞ্চম মহাজাতি, এই মহাজাতি হইতে পাঁচটি শাখাজাতির উদ্ভব হইয়াছে, আর দুইটী শাখাজাতির উৎপত্তি হইতে এখনও বাকি আছে। হিন্দুজাতি ইহার প্রথম ও প্রধান শাখাজাতি, আরব জাতি ইহার দ্বিতীয় শাখা, তৎপরে ইরানিয়ান জাতি তৃতীয়, তৎপরে কেলটিক জাতি চতুর্থ, এবং টিউটন জাতি পঞ্চম শাখাজাতি হইতেছে। ষষ্ঠ শাখাজাতি আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেটস্ নামক স্থানের কালিফর্ণিয়া প্রদেশে আবির্ভাব—বিজ্ঞ লোকে ইহা অনুভব করিতেছেন।

এস্থলে অপরাপর মহাজাতি ও শাখাজাতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম দুই মহাজাতি পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। তৃতীয় মহাজাতির নাম লেমুরিয়ান, ইহাদের বাসস্থান লেমুরিয়া নামক মহাদেশে ছিল। এই মহাদেশের এক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে প্রায় সমুদয় অংশই গিয়াছে; এই জাতির খাঁটী আকৃতি মেলা দুষ্কর, নিগ্রোজাতি অনেক অসবর্ণ বিবাহে মিশ্রিত হইয়া কতকটা জাতীয়তা এখনও রক্ষা করিতেছে। চতুর্থ মহাজাতির নাম আটলান্টিয়ান মহাজাতি। ইঁহারা আটলান্টিস নামক মহাদেশে বাস করিতেন। ইউরোপের পশ্চিম অংশ, আফ্রিকা ও আমেরিকা জুড়িয়া আটলান্টিক মহাসাগরের স্থলে এই মহাদেশ ছিল। প্রথম শাখাজাতির নাম রোমোহাল, টলাভাটলি। দ্বিতীয় শাখাজাতি, টলটেক তৃতীয়, টুরানিয়ান চতুর্থ, সেমিটিক পঞ্চম, আকাডিয়ান ষষ্ঠ ও মঙ্গোলিয়ান সপ্তম শাখাজাতি মধ্যে পরিগণিত।

ষষ্ঠ মহাজাতি হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে, কিন্তু এই জাতি যে মহাদেশে বাস করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে যেখানে লেমুরিয়া মহাদেশ ছিল, কতকটা সেই স্থান লইয়া নূতন দেশ গঠিত হইবার জন্য ঘন ঘন ভূমিকম্প হইতেছে, ও মাটি জাগিয়া উঠিতেছে। এই সকল

মহাদেশকে আমাদের পুরাণে এক এক দ্বীপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, শ্বেতদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ ইত্যাদি। "সপ্তদ্বীপা মেদিনী" অর্থে সাত মহাজাতির সাতটী মহাদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বৈবস্বত মনু আমাদের মনু, আমরা বৈবস্বত মনুর বংশধর। মনুর প্রধান কার্য্য এক মহাজাতির সৃষ্টি করা ও সেই জাতিকে নানাপ্রকার শিক্ষার দ্বারা কতকটা সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়া। মহারাজ পৃথিবীপতি আর্য্যজাতির যে আদর্শ দিয়াছেন, সেই আদর্শ মত আকারে মানুষ গঠন করবার জন্য ইহাকে অনেক খাটিতে হয়। প্রথমতঃ তিনি কতকগুলি লোক পূর্ব্বজাতি হইতে বাছিয়া লয়েন, তাহাদের কোন এক স্থানে নানা আপদ-বিপদ, আকস্মিক ঘটনা ইত্যাদি সূত্রে আনিয়া একত্রে বাস করান ; ক্রমে তাহাদের সহিত চতুঃপার্শ্বের লোকের সম্বন্ধ আদি থাকা বন্ধ করেন, তাহারা যেন কোন কারণে ইণ্টার্ণ (দেশান্তরিত) হইয়াছেন ও অন্য লোকের সহিত মেশামিশি করিতে নিষেধ আজ্ঞা পাইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় পড়িয়া যান। পরে ইঁহাদের বংশে মনু স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সেই লোকদের মধ্যে প্রধান হইয়া আবশ্যকীয় বিধি নিষেধ রূপ সামাজিক রীতিনীতি প্রচার করেন। বিবাহাদি করিয়া সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার অনেকটা অনুরূপ হয়েন, এইরূপে সেই মহাজাতির আদর্শের দিকে মানব ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে।

এই বিস্তীর্ণ আটলান্টিক মহাদেশ হইতে নানা স্থানের নানা লোককে একত্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজে জন্মগ্রহণ ও সন্তান-সন্ততির দ্বারা উহাদের লোক বৃদ্ধি করিবার পর প্রায় খৃষ্ট জন্মিবার লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জাতিকে একেবারে অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক দ্বীপে আনিয়া বাস করান। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৭৯৭ সালে আফ্রিকার মধ্য দিয়া এই লোকদিগকে তিনি আরব দেশে লইয়া আসেন, আরবদেশে কিছুকাল বসবাস করেন। এই সময়ে ইহারা বৈবস্বত মনুর মত সাক্ষাৎভাবে পালন করিতেন, ইহাদের কোন কারণে আবশ্যক হইলে আহ্বানমাত্র মনু প্রকাশ হইয়া যুক্তি আদেশ দিতেন।

পরে এই দেশ হইতে যেখানে এখন সাইবেরিয়া দেশ দেখিতে পাই, তাহা তৎকালে চীন সমুদ্র ছিল, এই সমুদ্রের তীরে ইহাদের লইয়া আসেন, এখান হইতে গোবি নামক সমুদ্র তীরে লইয়া আসেন, এই গোবি সাগর এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এইখানে আর্য্যজাতির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বংশ বৃদ্ধি হইয়া আর্য্য নামক এক জাতি হইল। ইহাদের মধ্যে যাহাদের মতি গতি, আকার অবয়ব বিসদৃশ হইয়া পড়িল, তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া পরস্পর যুদ্ধ দ্বারা ধ্বংস করা হইত। কোন কোন লোক দলবদ্ধ হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইয়া ক্রমে নাশ প্রাপ্ত হইত। এইরূপে সুদীর্ঘকাল গড়া-ভাঙ্গা করিয়া কতকটা আদর্শ অনুরূপ মানবের গঠন হইয়া উঠিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষাট হাজার বর্ষ কালে আর্য্যজাতি একটী মহৎ জাতিরূপে পরিগণিত হইল। এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত, সুসভ্য, শিক্ষিত জাতির লোক তৎকালে পৃথিবীতে বিরল হইয়া পড়িল।

সময় সময় উপনিবেশ স্থাপন জন্য বৈবস্বত মনু এই স্থান হইতে দলে দলে লোক বাহির করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই দলের কর্ত্তা হইয়া তিনি প্রায়ই নিজে যাইতেন। প্রথমে তিনি আরব দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, দক্ষিণে আফ্রিকা পর্য্যন্ত ইঁহাদের বিস্তৃতি হয়। অপর এক দল আসিয়া পারস্য দেশে রাজ্য স্থাপন করেন। এক দল ইউরোপের দিকে যাইয়া গ্রীক ও রোমীয় রাজত্ব স্থাপন করেন, অপর এক দল ইউরোপের অংশে যাইয়া জার্ম্মাণ ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি করেন ও রাজত্ব স্থাপন করেন। শেষে গোবিতে আর্য্যজাতির অবশিষ্ট যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের তিনি ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। ইঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া এই দেশ জয় করিয়া অতি উচ্চ প্রকারের সভ্যতার বিস্তার করেন। এই সভ্যতার ব্যবস্থাদি সমুদয়ই মনু কর্ত্তৃক প্রচারিত বলিয়া আজও চলিয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা এই সমস্ত বিধিতে পরিপূর্ণ। এখন সামাজিক ও নৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণতা আর কোথাও নাই। যাঁহারা মনুসংহিতা বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভগবানদাস এম্-এ কৃত "Science of Social Organisation" নামক গ্রন্থ পড়িবেন।

আর্য্যজাতির এই সকল নানা দেশযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা এস্থলে স্থানাভাব। যাহারা সুদীর্ঘ কাল পূর্ব্বের এই সকল ব্যাপার পাঠ করিতে কৌতুহলী হইবেন, তাঁহারা থিয়জফিষ্ট নামক মাসিক পত্রিকায় "অ্যালসিওনির ত্রিশটী জন্ম বিবরণ" নামক প্রবন্ধগুলি পড়িতে পারেন। এইরূপে আর্য্যজাতি গঠনের জন্য মনুকে যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার বর্ণনা এস্থলে বিশেষরূপে করা হইল না। তবে এটুকু বলা চাই যে প্রত্যেক যাত্রার পূর্ব্বে আর্য্যজাতির লোক সকলে গোবিতীরে উপস্থিত হইয়া মনু প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষদের আহ্বান করিতেন, এই আহ্বানে তাঁহারা সশরীরে আবির্ভাব হইতেন। এক সময়ের ঘটনাতে আমরা পড়িলাম, শুক্রলোক হইতে যে মহাপুরুষ পৃথিবীতে মানব জাতির কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন, সেই মহারাজ সনৎকুমার ও মনু এবং জগদ্‌গুরু এই তিন জনে আবির্ভাব হইলেন, এবং যাত্রা যাহাতে শুভ হয়, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৎকালে দেবগণ এরূপে আহ্বান মাত্রে আসিতেন ও তাঁহাদের তখন স্থূল চক্ষে দর্শনযোগ্য শরীর হইত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক্ষণে ষষ্ঠ শাখাজাতির সৃষ্টিকার্য্যে আমাদের মনু ব্যস্ত রহিয়াছেন, এই জাতি হইতেই পরবর্ত্তী মনু তাঁহার ষষ্ঠ মহাজাতির জন্য লোক বাছিয়া লইবেন। আমরা আরও জানিয়াছি যে, মাদ্রাজের থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রবর্ত্তক দুই জন জীবন্মুক্ত ঋষিদের মধ্যে একজন

পরবর্ত্তী মনু হইবেন ও অপর একজন জগদ্‌গুরু হইবেন। পাঠকগণও ইচ্ছা করিলে আপনাদের এমনভাবে গঠন করিতে পারেন যে, এই পদ তাঁহাদের লভ্য হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে "অ্যালসিওনির ত্রিশটী জন্মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধের বিষয় বলিয়াছি—তাহাতে আমরা এই দুই মহাপুরুষ কি অবস্থায় কোন্ দেশে কিরূপ বংশে জন্ম লইয়া কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়া ও কিরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়া শেষে জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও মনুর কাজ করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত দেখিতে পাই।

জগদ্‌গুরুর প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে মৈত্রেয় ঋষি জগদ্‌গুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়া হিমালয়ে বাস করিতেছেন; এবং তিনি নিজ শরীরকে যোগাগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া বহুকাল হইতে বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহার এই যোগাগ্নি-সম্ভূত দেহ বহুকাল স্থায়ী হইয়াছে ও তাহা চর্ম্মচক্ষের দর্শনযোগ্য। সেইরূপ আমাদের বৈবস্বত মনুও হিমালয়ে জগদ্‌গুরুর আশ্রমের অনতিদূরে থাকেন ও তাঁহার দেহও দর্শনযোগ্য। যিনি দেখিয়াছেন—তিনি বলেন, ইনি জগদ্‌গুরুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। ইনি দেখিতে অতি সুপুরুষ, ইনি পুরুষোত্তম ও পুরুষসিংহও বটেন। আর্য্যজাতির সৌন্দর্য্যের আদর্শ যিনি, তাঁহার আকৃতি সুন্দর ত হইবেই। বক্ষোপরি কটা ও স্বর্ণবর্ণের সুদীর্ঘ কেশরাশি ঝুলিতেছে, সিংহের কেশরের ন্যায় জটা সেই পুরুষসিংহের অনতিক্রম্য শক্তি ও তেজের আধার শিরোদেশে লম্বমান রহিয়াছে। আকৃতি অতি পরাক্রান্ত নৃপতির ন্যায় শৌর্য্যশোভিত, চক্ষু দুইটী ঈগল পক্ষীর চক্ষের ন্যায় জ্যোতিতে পূর্ণ, স্বর্ণবর্ণের আলোক দীপ্তি পাইতেছে।

যখন আমরা দেখি, দেশ যুদ্ধ হেতু বিপর্য্যস্ত হইতে বসিয়াছে, রাজ্য টলমলায়মান হইতেছে, সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অদূরে গুরুতর পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন আমাদের বিচলিত হইবার কারণ নাই। আমাদের তখন বুঝা উচিত, মনু যেরূপ প্রয়োজন, যেরূপ মানবজাতির উন্নতি হইবে, তাহাই করিবার জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় এই সকল আসিয়াছে, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জ্ঞাত আছেন এবং সর্ব্বদা সকল সময়ে তিনিই আমাদের নেতা। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার স্রোত পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে, সেইজন্যই এই মহামারী রণ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার ফলে সচরাচর লোকে যেমন মনে করিতেছেন, যে ইউরোপের ধ্বংসাবস্থা হইবে তাহা নহে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে মানবজাতি নবজীবন লাভ করিবে। এই উদ্দেশ্যেই বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক ইউরোপীয় মহা সমরের অবতারণা হইয়াছে।

মনু কথাটী আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি, পঞ্জিকাতে মনুর অধিকার কাল লিখিত থাকে, তাহা আমরা আর বিশ্বাস করিতে পারি না, এজন্য এই প্রবন্ধে কতকটা আমরা আলোচনা করিলাম এবং তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সাক্ষাৎ তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ হইতে কতকটা বর্ণনা দেওয়া

হইল।

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি
সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ সুখমবাপ্নোতু
সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্।

পৌরাণিক পঞ্চ পুষ্প।

(ধর্ম্মমূলক পাঁচটী ক্ষুদ্র গল্প।)

নাম-মাহাত্ম্য। (১)

সে অনেক দিনের কথা। স্মরণাতীত কালে মহাযোগী মহেশ্বরের কণ্ঠে এক ছড়া হাড়ের মালা ছিল। ভোলানাথ শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া মড়ার হাড় কুড়াইয়া এ সাধের মালা ছড়াটী গাঁথিয়া আপন কণ্ঠে পরিয়াছিলেন! এ মালার শক্তি অনন্ত, গুণ অপূর্ব্ব, প্রভাব অলৌকিক! ইহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহা রত্ন; ইহা মহা বৈরাগ্যের জলন্ত চিহ্ন, অনন্ত দৈন্যের চরম নিদর্শন, বিষয়-ত্যাগী শ্মশানবাসীর অপূর্ব্ব অঙ্গাভরণ!

এই অস্থিময় হারের অসাধারণ গুণের কথা কার্ত্তিক-গণেশের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা এ মালা ছড়াটীর শক্তি ভালরূপই জানিতেন। একদিন উভয় ভ্রাতা মিলিয়া এই হারের নিমিত্ত পিতা মহাদেবের নিকট মহা আব্দার জুড়িয়া দিলেন। দুইজনের কেহই সে মালা ছড়াটি না লইয়া ছাড়িবেন না, এমনি তাঁহাদের আন্তরিক জেদ্—এমনি তাঁহাদের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা!

মহাদেব প্রমাদ গণিলেন। একগাছি মালা তিনি কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে দিবেন? উভয়ের আব্দার অত্যাচারে তাঁহার যোগের বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল। অগত্যা তিনি বলিলেন, "তোমাদের দু'জনের মধ্যে অদ্যই পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, আমি এ হার তাঁহাকেই প্রদান করিব, সূর্য্যাস্তের পর আসিলে কেহই ইহা পাইবে না।

কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর; আর গণেশের বাহন ইঁদুর। ইঁদুর ময়ূরের ন্যায় দ্রুতগমনে চির অসক্ত। তাই পিতৃ-বাক্য শুনিয়া কার্ত্তিকের প্রাণ বিজয়-উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে ময়ূর বাহনে ভূতীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। শিখীরাজ উধাও ছুটিল। আর গণেশ নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পিতৃপদ-প্রান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গণপতি সহসা ভগ্নহৃদয় প্রণয়ীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠিলেন! অনন্তর তিনি "হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!" বলিয়া মধুর ধ্বনিতে দশ দিক পূর্ণ করিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হরি-সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। অহো কি মধুর—কি মনোমদ ঐ হরিধ্বনি!

গণেশের ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, এ জগতের কোন ভাবনা চিন্তাই যেন নাই; তিনি বিশ্ব ভুলিয়া অবিরত গাইতেছেন, "হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!—হরি হরিবোল!" অহো! বেণু-বীণা-বিনিন্দিত সে স্বরতরঙ্গে এ বিরাট বিশ্ব পরিপূর্ণ হইল যে! এখন [illegible]

ভোলা-প্রাণ খোলা সুরসঙ্গীত এ জগতে বুঝি আর কেহ শুনেন নাই! কে জানে ঐ নামের ভিতর কি আছে? নাম সুধা পানে বিশ্বপ্রাণী জুড়াইল যে!

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়! গণপতির হরি-সঙ্গীতের আর বিরাম নাই; তিনি বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া মনে-প্রাণে অবিরত কেবলই হরি-সঙ্গীত করিতেছেন? কার্ত্তিক পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তখনও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। সহসা হরিনামমুগ্ধ ভোলা মহেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া প্রেমভরে গণেশকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মালা ছড়াটি গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "বৎস! বহুক্ষণ তোমার বিশ্বতীর্থ পর্য্যটন শেষ হইয়াছে; তাই ভিখারীর সর্ব্বস্বধন এই মহা গুণশালী মহাশক্তির মহাসিদ্ধির মালা তোমাকেই প্রদান করিলাম। কারণ যেখানে হরি-প্রসঙ্গ—হরি-সঙ্গীত হয়, পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। যথা:—

"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী
তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থাণি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতো-
দারককথাপ্রসঙ্গঃ ॥"

হরি! হরি! হরি! হরিনামের কি অনন্ত শক্তি—কি অসাধারণ প্রভাব! নামের গুণে আজ কর্ম্মফল পরাভূত হইল—গণেশ ঘরে বসিয়া বিশ্বতীর্থ ভ্রমণের মহা ফললাভে ধন্য হইলেন!

আহা! এ মধুর হরিনামেই না একদিন গঙ্গা উজান বহিত, ভাবাবেশে পশুপক্ষী অশ্রুপাত করিত, পাষাণ গলিত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সোণার অঙ্গ মাটিতে গড়াইত! যাঁহার নামের এত গুণ—এমন উন্মাদিনী শক্তি না জানি তিনি কেমন! পাপী-পাষণ্ড বলিয়া কি তাঁহার দর্শন মিলিবে না?

"ডাক্‌লে তাঁরে প্রেমভরে,
স্নেহে হরি পার করে।"

পাপী-তাপীর প্রতি যে তাঁহার অসাধারণ স্নেহ-মমতা। তিনি যে পতিতপাবন! তাঁহার এত দয়া বলিয়াই তিনি বিশ্বপ্রাণীর প্রাণের ঠাকুর—হৃদয়ের ধন—আরাধ্য দেবতা! বল, সাধক! প্রেমভরে একবার "হরিবল"।

—০—

নাম-প্রভাব। (২)

পূর্ব্বকালে এদেশে এক রাজার একটী মাত্র পুত্র ছিল। রাজা-রাণীর নিকট সে পুত্র "সাত রাজার ধন এক মাণিকের" চেয়েও মহারত্ন। সহসা রাজপুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। কত চিকিৎসক দেখিলেন, কত মুল্যবান ঔষধের ব্যবস্থা হইল, কত সেবা-শুশ্রূষা চলিল, কিন্তু রাজপুত্রের বিষম ব্যাধি আর কিছুতেই আরোগ্য হইল না। রাজকুমার বুঝি আর প্রাণে বাঁচিলেন না, শত অরিষ্ট লক্ষণ দর্শনে চিকিৎসকগণ রোগী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিপদে শ্রীমধুসূদন। সহসা নৃপতির মনে শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ হইল; কে যেন তাঁহার কর্ণমূলে বলিয়া গেল, "হরিনামের ন্যায় এমন মহৌষধ আর নাই," তাই তিনি নগরময় অবিরাম হরিসঙ্কীর্ত্তনের ব

আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন। অচিরে রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল "হরিবোল। হরিবোল।" রবে রাজার রাজ্য মুখরিত হইয়া উঠিল!

এদিকে রাজপুরীর চতুর্দ্দিকে অবিচ্ছেদ ভাবে তুলসীবৃক্ষ রোপিত হইল। সেই পবিত্র তুলসী বনের কেন্দ্রস্থলে রাজকুমারকে রাখিয়া তাঁহার চারিদিকে অবিরত হরিসংকীর্ত্তন করা হইতে লাগিল।

তিন দিন অতীতপ্রায়। রাজ্যময় কাহারও আহার নাই, নিদ্রা নাই —মর জগতের কোন ভাবনা-চিন্তাই যেন নাই! সকলেই হরিনাম কীর্ত্তনে উন্মত্ত! তখন সকলে দেখিল, রাজপুত্রের দেহে কোনরূপ ব্যাধির লক্ষণই আর নাই; তিনি সুস্থ-সবল দেহে 'হরিবোল।' 'হরিবোল!' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রেমাশ্রু প্রবাহে তাঁহার বক্ষ সিক্ত হইতেছে। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়া 'হরিবোল!' 'হরিবোল!' বলিয়া প্রেমভরে ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। হরিনামের এমনি গুণ!—এমনি অপূর্ব্ব অনন্ত মাহাত্ম্য!

এস, ভাই সকল। ভব ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত হইবে ত প্রাণ ভরিয়া সদা 'হরি হরি' বলিয়া ডাক। সুখে-দুঃখে অবিরত বল,—
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! বল,—

"কেবল মাত্র হরিবোল!
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
কেবল মাত্র হরিবোল!
যাগ নাই যজ্ঞ নাই, তন্ত্র নাই মন্ত্র নাই,
কেবল মাত্র হরিবোল!
যে দিকেতে চাই, দেখিবারে পাই,
কেবল মাত্র হরিবোল!
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
কেবল মাত্র হরিবোল।"

—•—

ভক্তির অভিমান। (৩)

একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনসহ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথ-শ্রান্ত অর্জ্জুন এক বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, তিনি এক সুসজ্জিত সুন্দর প্রাসাদে সুকোমল শয্যায় নিদ্রিত আছেন, তাঁহার মাথার উপর তিনখানি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ঝুলিতেছে। তিনি প্রহরীকে জিজ্ঞাসিলেন, এখানে এরূপভাবে এ তিনখানি অস্ত্র লম্বমান কেন? প্রহরী উত্তর করিল, 'জগতের তিনজন প্রধান পাষণ্ডের শিরশ্ছেদ করিবার জন্যই এ তিনখানি অস্ত্র লম্বমান আছে।' অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, "তাহাদের নাম কি?' প্রহরী উত্তর করিল, "একজনের নাম প্রহ্লাদ; সে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে স্ফটিকস্তম্ভ দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'এখানে আমার ভগবান আছেন।' প্রহ্লাদ ভগবানকে ভাল বাসিলে, তাহার ভালবাসার বস্তুকে এমন ভাবে কখনই শত্রু হস্তে সপিয়া দিতে পারিত না; কে কবে আপনার ভালবাসার জনকে শত্রু হস্তে সঁপিয়া দেয়? দ্বিতীয় পাষাণ্ড—ধ্রুব। ধ্রুব আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভগবানকে বিজন বনে ব্যাঘ্রমুখে অর্পণ করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। ইহার নামেই কি ভালবাসা? তৃতীয় পাষাণ্ড অর্জ্জুন। যুদ্ধদেত্র [illegible]

সারথী করিয়া তাঁহার আড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করাই কি তাহার ভগবদ্ভক্তির পরিচয়? তাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইলে কখনই ঐরূপ করিতে পারিত না।' অর্জ্জুনের সুপ্তিস্বপ্ন ভাঙ্গিল, ভক্তির অভিমান দূর হইল। তিনি বুঝিলেন—ভগবানকে ভালবাসিতে হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, চাই নিরভিমান ভক্তি—চাই আত্ম-বিসর্জ্জন।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, একদিন তাঁহার মনে এই অভিমান হইয়াছিল, তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমার মত ভক্ত বুঝি ভগবানের আর কেহ নাই,—আমিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" তাই ভগবান এই মায়া-স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, তাহাতে কোনও দোষ নাই, তাহারা জানিতেন যে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের শত্রু-মিত্র নাই—সামান্য বন্য ব্যাঘ্র বা হিরণ্যকশিপু তাঁহার কি করিতে পারে? তাই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ভগবদ্ভক্তিও ঐরূপ দোষ কলুষ সম্পর্ক শূন্য। শুধু ভক্তের ভক্তির অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্তই ভগবানের এই মায়াস্বপ্ন সৃষ্টির অদ্ভুত খেলা! ইহা ভগবানের অপার কৃপা।

অর্জ্জুন মাটি হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব অভিমানে অর্জ্জুন মাটি হইয়াই বলিয়াছিলেন, "শিষ্যস্তেহহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" "সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার অমিয় মধুর উপদেশে তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্র পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছিলেন। অভিমানশূন্য না হইলে ভগবৎ চরণ লাভ করা যায় না। অভিমান ত্যাগ বড় শক্ত কাজ। তাই ভক্ত ভগবানের এত প্রিয়। ভাই! যদি শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে—তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করিতে চাহ, তবে অভিমান ত্যাগ কর।"

অহঙ্কারী পাপী যারা,
তাঁহার নাগাল পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু তিনি সকলে জানে।"

—•—

ভক্তের ভগবান। (৪)

"ভক্তি হীন নর সুধা দিলে সুধাই নারে,
ভক্তজন বিষ এনে দিলে খাই।"

সুদামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-সখা। সুদামা ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত। কিন্তু তিনি বড় দরিদ্র। বড় কষ্টেই তাঁহার জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় রাজা হইয়াছেন, আর পণ্ডিত সুদামা অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গাল—তাঁহার দুঃখের অবধি নাই।

একদিন ব্রাহ্মণ-পত্নী বলিলেন,—'দেখ, তুমি এত বড় পণ্ডিত অথচ পয়সা কড়ি উপার্জ্জন করিতে পার না! আমাদের যে দুঃখ চিরকাল সেই দুঃখই যদি থাকিল, তবে আর তোমার এত লেখাপড়া শিক্ষায় লাভ কি? একবার কিছু অর্থ অর্জ্জনের নিমিত্ত যত্ন করিয়া দেখিলে হয় না?' পণ্ডিত বলিলেন, 'আমার বিদ্যা এত তুচ্ছ নয় যে, সে বিদ্যা সামান্য অর্থ উপার্জ্জনার্থ নিয়োগ করিব?" ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, "ভাল, তুমি তোমার বিদ্যা দ্বারা অর্থ লাভ করিতে চাহ না, আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ ত

তোমার বাল্যবন্ধু, তিনি এক্ষণ দ্বারকায় রাজা, তুমি একবার তাঁহার নিকট যাও না কেন? সুদামা বলিলেন, 'ভগবানের সহিত আমার সখ্যভাব আছে বলিয়া, আমি তাঁহার নিকট তুচ্ছ টাকাকড়ি প্রার্থনা করিতে যাইব? ভগবদ্ভক্তি কি এতই সাধারণ পদার্থ যে, তদ্‌বিনিময়ে সামান্য অর্থ প্রাপ্ত হইতে যত্ন করিব? আমার দ্বারা তাহা হইবে না।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'আমি তোমাকে তাঁহার নিকট যাইয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে বলিতেছি না; তিনি তোমার বন্ধু, বন্ধুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ত দোষ নাই! তুমি শুধু সাক্ষাৎ মাত্র করিবে, তোমাকে তাঁহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতে হইবে না, তাহাতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।'

পত্নীর কথায় ব্রাহ্মণ বস্ত্রাঞ্চলে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল কণা বাঁধিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণ দর্শনার্থ দ্বারকাভিমুখে রওনা হইলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকার রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারকাধিপতিকে দ্বারবান দ্বারা স্বীয় আগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজ-ভবনের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অনুপম শোভা দর্শনে তিনি ভাবিলেন, যিনি এ অতুল সম্পদের অধিকারী, তাঁহার কি আমার ন্যায় একজন দরিদ্র বাল্যবন্ধুর কথা স্মরণ থাকিতে পারে? হয় ত এ দীর্ঘকালে তিনি আমাকে ভুলিয়াই বা গিয়া থাকিবেন! দারুণ দুশ্চিন্তায় ব্রাহ্মণ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট, রুক্মিণী ও সত্যভামা তাঁহার পদসেবায় নিরত। অন্তর্য্যামী ভগবান সহসা বাল্য-সখার আগমন-বার্ত্তা প্রাণে অনুভব করিয়াই দৌড়িয়া দ্বারে উপনীত হইয়া বন্ধুকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার কত যত্ন! রুক্মিণী ও সত্যভামা তাঁহার পদধৌত করিয়া দিলেন। ভগবান বন্ধুকে স্বর্ণাসনে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে করিতে কত কথা কহিতে—কত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় ভগবান বলিলেন, 'ভাই, বহুদিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, লোকে বন্ধুকে কত উপহার প্রদান করিয়া থাকে, আমার জন্য তুমি কি আনিয়াছ? যাহা আনিয়াছ শীঘ্র দাও, উহা দেখিবার জন্য আমার বড় কৌতুহল হইয়াছে। সুদামা বড় দরিদ্র, রাজ-বন্ধুকে উপহার দিবার মত মূল্যবান দ্রব্য ত সে আনিতে সমর্থ হয় নাই! ভক্ত বস্ত্রাঞ্চল হইতে তণ্ডুল-কণাগুলি খুলিয়া ভগবানের হস্তে উৎসর্গ করিলেন। ভগবান সাদরে তাহা হাত পাতিয়া লইয়া প্রীতির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনগ্রাস তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিয়া যেই চতুর্থ গ্রাস গ্রহণোদ্যত হইয়াছেন, অমনি রুক্মিণী ও সত্যভামা যুগপৎ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রভু! করেন কি? বন্ধু প্রদত্ত তণ্ডুল-কণা আর খাইবেন না, প্রথম গ্রাস গ্রহণ করিয়া আপনি কাঙ্গালকে স্বর্গীয় সম্পদ দান করিয়াছেন, দ্বিতীয় গ্রাসে মর্ত্ত্যের এবং তৃতীয় গ্রাসে পাতালের ঐশ্বর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে! তিন গ্রাসে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য

তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন! আর কি আছে? তাঁহাকে আর কি দিবেন? চতুর্থ গ্রাস গ্রহণ করিলে যে, আমাদিগকেই তাঁহার সেবার জন্য যাইতে হইবে! আমরা কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে, বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া প্রভু, তোমার পদসেবায় বঞ্চিত হইব? তখন ভগবান বন্ধু-প্রদত্ত তণ্ডুল-কণা ভক্ষণে বিরত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। একটা কথা আছে যে,—

"যে করে আমার আশ,
আমি করি তার সর্ব্বনাশ,
তবু যে করে আমার আশ,
আমি হই তার দাসের দাস।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার সহিত ব্যবহারে একথা বেশ প্রতিপন্ন করিয়াছেন! ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অপার করুণা,—কি অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা! এজন্যই বুঝি ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হইলে, আর ছাড়িয়া দিতে চাহে না—চিরদিন হৃদয়-মন্দিরে রাখিয়া পূজা করেন। তাই ভক্ত কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,—

"বঁধুহে ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব॥"

পণ্ডিত সুদামা এইরূপ মহাসুখে কিছুদিন বন্ধু-ভবনে অবস্থান করিয়া স্বভবনে যাত্রা করিলেন। তিনি যেমন রিক্তহস্তে আসিয়াছিলেন, তেমনি রিক্তহস্তেই বাটীতে প্রতিগমন করিলেন! লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বন্ধুর নিকট কিছুই চাহিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! সময়ে মরম কথা বলিতে নারিনু!" অর্থ ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পারিলাম না, এখন বাড়ী যাইয়া ব্রাহ্মণীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? সহধর্ম্মিণীর বিরক্তি-ভয়ে ব্রাহ্মণ বড়ই বিষাদিত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ ব্রাহ্মণ নিজ বাটীর সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অতি জীর্ণ পর্ণকুটীরের পরিবর্ত্তে তথায় এক বিরাট সৌধভবন শোভা পাইতেছে।

এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে ব্রাহ্মণ বিস্ময়-বিষাদে অভিভূত হইলেন! তাঁহার মনে হইল, হয় ত কোন পরাক্রান্ত রাজা—আমার অনুপস্থিতি-কালে আমার পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার রাজ-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন! বাড়ী, ঘর ও পত্নীর নিমিত্ত ব্রাহ্মণের মনে দুঃখ হইল। সহসা ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গবাক্ষ-পথে অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ডাকিতেছেন! তিনি ভাবিলেন, হায়! দুরাত্মা আমার সহধর্ম্মিণীকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে! ব্রাহ্মণীও হয় ত রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তবে আবার তিনি আমাকে ডাকিতেছেন কেন? বধ করা ব্যতীত তাঁহার এ আহ্বানের উদ্দেশ্য কি? এই মনে করিয়া ভীতি-বিহ্বল ব্রাহ্মণ সে স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণী লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণকে গৃহে আনয়ন করিলেন, এবং স্বহস্তে তাঁহার পদ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ব্যজন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"এ অপূর্ব্ব অট্টালিকা এবং অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে তুমি এত ভীত হইতেছ

কেন ?—এসব তোমারই বন্ধু-দর্শনের ফল।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কৈ আমি ত তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই !" ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"তুমিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু প্রার্থনা কর নাই, তিনিও সাক্ষাতে কিছু প্রদান করেন নাই ; অন্তর্য্যামী ভগবান তিনি, তোমার অন্তরের ভাব জানিয়া—তোমার অসাক্ষাতেই তিনি তোমাকে এসব দিয়াছেন।" ভক্তি-বিশ্বাসে ব্রাহ্মণের দু'চক্ষু বহিয়া অশ্রু-গঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

—— ০ ——

গুরু-গৃহে ভগবান। (৫)

এখানে ভগবদ্ভক্ত বিদুরের গৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য-গ্রহণ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা রাজনৈতিক মীমাংসার নিমিত্ত রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনের দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের কিছু পূর্ব্বে সভা ভঙ্গ হইল। কুরুরাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ভগবান রাজ-আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া ভিখারী বিদুরের পর্ণকুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

বিদুর গৃহে ছিলেন না ; তিনি তৎকালে ভিক্ষার্থ বাহির হইয়াছিলেন। বিদুর-পত্নী তখন স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আগমনেতি নি এমনি আত্মবিস্মৃতা হইলেন যে, তাঁহার কটির বস্ত্র ভূতলে পড়িয়া থাকিল, তিনি সেই উলঙ্গিনীবেশেই ভগবানের অভ্যর্থনার নিমিত্ত চঞ্চলা বালিকার ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া সাদরে পাদ্য-অর্ঘ্য দানে গৃহে আনিলেন।

দীনের পর্ণকুটীর তখন অন্নশূন্য ; গৃহে এককাঁদি সুপক্ক মর্ত্ত্যমান কলা ছিল, তিনি তাহাই একটির পর একটী করিয়া ভগবানের শ্রীমুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী রমণী তখন তন্ময়চিত্ত—এ বিশ্ব তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন! তাই তিনি কখনও কদলির ত্বক্ ছাড়াইয়া শাঁস, কখনও বা শাঁস ফেলিয়া ত্বকই শ্রীভগবানের মুখে তুলিয়া দিতেছেন—আর শ্রীভগবান হর্ষভরে তাহাই ভক্ষণ করিতেছেন।

এমন সময়ে বিদুর গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন—ভক্তিমতী উলঙ্গিনী রমণী আত্মহারা হইয়া ভগবানের শ্রীমুখে কদলির ত্বক্ তুলিয়া দিতেছেন! এ দৃশ্য দর্শনে তাঁহার প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। তিনি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে পত্নীর অঙ্গ আবৃত করিয়া দিয়া প্রীতিভরে বলিলেন,—"পত্নী ! তুমিই ভাগ্যবতী, ভগবান তোমার প্রদত্ত কদলির ত্বক্ও উপেক্ষা না করিয়া সাগ্রহে ভক্ষণ করিতেছেন !"

পতীর কথায় পত্নীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি লজ্জায় দন্তে জিভ কাটিয়া বস্ত্র পরিধানার্থ সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। তখন ভক্তের সহিত ভগবানের কত কথা—কত মধুর প্রেমালাপ চলিতে লাগিল।

ভগবান, বিদুর-পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত,তুমি শীঘ্র আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া আন। বিদুর সে দিন কতক-

গুলি তণ্ডুল-কণা ব্যতীত আর কিছুই ভিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। এই জন্য তণ্ডুল না থাকায় তিনি অন্ন প্রস্তুত করিতে ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। ভগবান বলিলেন,—"আমি উহাই ভক্ষণ করিব, তুমি শীঘ্রই রন্ধন করিয়া দাও।" বিদুর-পত্নী বলিলেন,—"প্রভু! আমি শূদ্রাণী হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে আমার পক্কান্ন প্রদান করিব?" ভগ বান শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ, তোমাকেই রাঁধিতে হইবে.আমি আজ তোমার পবিত্র হস্ত-পক্ক অন্ন গ্রহণ করিব বলিয়াই দুর্য্যোধনের রাজ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি।" অতঃপর বিদুর-পত্নী সেই তণ্ডুল-কণাগুলি রন্ধন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, —কেমন করিয়াই বা আমি ইহা ভগবানের সম্মুখে প্রদান করিব? অন্তর্য্যামী ভগবান ভক্তের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া তাঁহার রন্ধন-শালায় প্রবেশ করতঃ স্বহস্তে অন্নথালা টানিয়া লইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের এমনি অপার কৃপা।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

হৃদয়-সখা।

তুমিত আমার হৃদয়েরি সখা
রয়েছ আমার হৃদয়ে;
এত কাছে থাকি হে জীবন সখা,
কেন গো রয়েছ লুকায়ে?
ভাবিতাম মনে কতদূরে তুমি—
ভুলিয়া রয়েছ হে অন্তরযামী,
আকুলিত হিয়া দিবস-যামিনী
বেড়াত বাহিরে ঘুরিয়ে;
ওগো! তুমি যে রয়েছ হৃদয়ে।
বাজীকর তুমি খেলিতেছ খেলা,
আমার অলক্ষ্যে লুকায়ে,
মন্ত্রে মুগ্ধ করি অসার "আমার"
বদনে দিয়াছ ফুটায়ে।
ওগো প্রেমময়, মানস মোহন
কেটে দাও প্রভো মায়ার বাঁধন,
আর কত দিবে মরম বেদন
আশার পিছনে ছুটায়ে;
ওগো। আমার অলক্ষ্যে লুকায়ে!
হৃদয়-বিমানে বিবেক তপন
হাজার কিরণ রাশিতে
ভাতাও অচিরে ওগো প্রিয়তম
হৃদয়ে তোমারে দেখিতে।
মোহের ছলনে আমারে ভুলায়ে
অবিদ্যা তিমিরে দিয়াছ রাখিয়ে,
(এবে) জ্ঞানের আলোক ফুটাও হাসিয়ে।
হৃদি-সখা তোমা হেরিতে;
ওগো! হাজার কিরণ রাশিতে।

শ্রীবঙ্কচন্দ্র নাথ বিদ্যাবিনোদ।

অভিমানিনী প্রতি।

(বেহাগ-খাম্বাজ—আড়াঠেকা)

(আমার) সাধেরই সেতার—নাহি যে সে তার,
সে তারের তারে, বাজে না বাজে না;

ছিঁড়ে গেছে তার, ডুবেছে ঝঙ্কার,
সুর-ভরা-তানে, আর গো গাহে না।
কত যে সোহাগে, বাঁজিত সে আগে,
রাগিণী মিলায়ে নব নব রাগে,—
নীরব কেন গো আজিকে বিরাগে ?—
অনুরাগে কথা কহ না কহ না।
অমিয়-ঝরণা ঝরিত সে তানে,
প্রেম-মন্দাকিনী ছুটিত পরাণে,
সে তান, সে লয় হরে কি বিলয় !
প্রলয় পরাণে তুলো না তুলো না।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস্-সি।

দুঃখিনীর আত্মকথা।

(গল্প)

বেশ মনে আছে, সেদিন শনিবার। সকাল সকাল কলেজ হইতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই দেখি, সদরদরজার পাশে একটা পাগ্‌লী বসিয়া আছে। একখানা আধময়লা কাপড়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। বয়স আন্দাজ চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। তাহার সেই পাণ্ডুর মুখখানি দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাতে কোন্ সুদূর অতীতের স্মৃতি, একটা তীব্র বেদনার আভাস থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কি জানি কেন সেই বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া তাহার ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। আমাকে দেখিয়াই কিন্তু পাগ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে করিলাম, কিছু পাইবার আশায় এখানে বসিয়া আছে। তাহাকে বলিলাম—"পাগ্‌লী, তুই একটু ব'স্ আমি আস্‌ছি।"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসিয়া বইগুলি টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিলাম। তারপর ট্রাঙ্কটা খুলিয়া একটা সিকি বাহির করিয়া আবার পাগ্‌লীর কাছে আসিলাম। দেখিলাম, সে তখনও তেমনিভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি সিকিটা ছুড়িয়া দিয়া বলিলাম,—"এই নে পাগ্‌লী।"

সে কিন্তু সিকিটা লইল না। "বাবু, পয়সা কি হবে ?" বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি কি মর্ম্মস্পর্শী! আমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে সেই হাসির হা হা শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 'তবে তুই কি চাস্" বলিয়া সিকিটা কুড়াইয়া লইলাম।

"বাবু, আমার কথা কি শুন্‌তে পার্‌বেন ? না—না—আপনার সে ক্ষমতা নাই—সে ধৈর্য্য নাই ! না বাবু, আপনি পার্‌বেন না—আমি উঠি।" এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

আমি তাহাকে থামাইয়া বলিলাম,—"মা পাগ্‌লী, তুই যা বল্‌বি আমি তাই বেশ মন দিয়ে শুন্‌বো। তোর কথা জান্‌তে আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।"

"তবে ভাল হয়ে বসুন ; আমি ব'লে যাই—" বলিয়া পাগ্‌লী চিরপরিচিতার ন্যায় ঘরের দাওয়ায় আসিয়া ভাল করিয়া বসিল। আমিও একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহার কাছে বসিলাম। পাগ্‌লী বলিতে লাগিল :—

"আমার বাড়ী নদের জেলায় উ—গাঁয়ে।

আমার বাপমায়ের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। অতি কষ্টে সংসার চলিত। কয়েকটা গরু আর কয়েক বিঘা জমি ছিল—বাবা তাই নিয়ে চাষবাস কর্‌তেন। আমরা তাঁতী জাত হলেও বাবা তাঁতের কাজ বড় পছন্দ কর্‌তেন না। সংসারে বাবা, মা আর একটা রাখাল ছিল। মা আমার এলোভুলো মানুষ—সংসারের কাজ-কর্ম্ম বড় একটা বুঝ্‌তেন না। বাবাই সমস্ত দেখিতেন। এমনি ক'রে তাঁহাদের সংসারটা একরকমে চলিত। তারপর যেদিন আমি চাঁদপানা মুখ নিয়ে পৃথিবীর মাথা ছুঁলাম, সেইদিন হ'তেই আমাদের সংসার ছারখারে যাইতে লাগিল। এ হতভাগিনীর জন্মাইবার দুই দিন পরেই বাবা মারা গেলেন। তাই দুঃখে প'ড়ে মা আমার নাম রাখ্‌লেন—"দুঃখিনী"। সেই অবধি আমি সকলের কাছে এই নামেই পরিচিতা হ'য়ে আস্‌ছি।

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মা আমার সংসারে কোন কিছুরই অভাব বোধ কর্‌তেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর মায়ের মাথায় টনক পড়্‌ল। তিনি ভেবে আকুল হলেন। তবে একটা সহায় ছিল। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই হরিশ দত্তের বাড়ী। তাঁর সঙ্গে বাবার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তাঁকে আমি কাকা বলে ডাক্‌তাম। তিনিই সে দুঃসময়ে এসে আমাদিগকে বুকে করে নিলেন। কতক জোতজমা বিক্রী করে মায়ের হাতে টাকা আনিয়া দিলেন। দুঃখিনী মা আমার সেই টাকা লইয়া সুতা কিনে, নলি পাকিয়ে যা কিছু পেতেন, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে আমাদের সংসার চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। হরিশ কাকার নরেশ বলে একটি ছেলে ছিল। তদ্ভিন্ন তাঁর সংসারে আর কেহই ছিল না। তবে গ্রাম সম্পর্কে পাতান মাসীগোছের নরেশবাবুর এক পিসীমা মধ্যে মধ্যে তাঁদের বাড়ী আস্‌তেন। হরিশ কাকাদের অবস্থা অত্যন্ত ভাল ছিল। গাঁয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড একখানা কাপড়ের দোকান—তদ্ভিন্ন জমিজায়গাও যথেষ্ট ছিল। বাড়ীতে চাকরেরও অভাব ছিল না। একমাত্র ছেলে নরেশবাবুকে নিয়ে কাকা বেশ সুখেই দিন কাটাতেন। নরেশবাবু প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে দেখাশুনা করে যেতেন। আমারও ক্রমে তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হইল। এম্‌নি করে দশ বৎসর অতিবাহিত হইল। মেয়ে বড় হয়েছে দেখে মা আমার বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। যদিও আমার বয়স তখন সবেমাত্র দশ; কিন্তু দেখ্‌তে আমি ঠিক তের বৎসরের মেয়ের মতন ছিলাম। নরেশ বাবুর বয়স তখন ষোল। তিনি লেখাপড়া ছেড়ে কাপড়ের দোকানে বসেছেন। পূর্ব্বের মত আর আমি তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথা বল্‌তে পার্‌তাম না। বাধ বাধ ঠেক্‌তো। নরেশবাবু কিন্তু আমার সঙ্গে মিশ্‌বার জন্য খুব চেষ্টা কর্‌তেন। আমার সলজ্জ ভাব দেখে মনে হত যে, তিনি বড় খুসী হতেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে থামিল।

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম,—"তার-পর কি হ'ল পাগ্‌লী ?"

আমার ঔৎসুক্য দেখিয়া পাগ্‌লী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল :—

"হাঁ, তারপর একদিন সন্ধ্যার পর আমি নরেশবাবুদের আমবাগানে বেড়াতে গেলাম। তখন সবেমাত্র চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা যেন হাস্‌ছে। আকাশে টুপটাপ করে দু'একটা তারা ফুটে উঠ্‌ছে। মধ্যে মধ্যে এক একখানা সাদা মেঘ উকিঝুঁকি মার্‌ছে। আমি এক মনে এই সব দেখ্‌ছি—হাঠৎ মনে হ'ল কে যেন আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌ছে—"দুখী, দুখী, একলা বসে কি কর্‌ছ?" ফিরে দেখি নরেশবাবু। আমি তাঁর দিকে চাইতেই তিনি ফিক্ ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। আমার প্রাণটা সে হাসিতে যেন কেমনধারা হ'যে গেল। হেসে বল্লাম্—"কেন, চাঁদ দেখ্‌ছি।"

"আচ্ছা দুখী, চাঁদকেই কেবল তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, আর আমাকে বুঝি—"

"দ্যাত" বলে আমি তাঁর মুখ চেপে ধর্‌লাম। তিনি তখন একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লেন,—"আচ্ছা দুখী তুমি কি আমায় ভালবাস?"

"দেখ দেখ ঐ মেঘখানা কেমন ভেসে যাচ্ছে" ব'লে তাঁকে অন্যমনস্ক কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। তিনি তো আমার মত বোকা নন। আমার চালাকি বুঝ্‌তে পেরে বল্লেন,—"দুখী, তুমি আমাকে ভুলাবার চেষ্টা কর্‌ছ?"

হাতে হাতে ধরা প'ড়ে লজ্জায় আমার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লাম্,—"না, না—ওই মেঘখানা বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল কিনা তাই।"

"যাক্ সে কথা" ব'লে নরেশবাবু আবার আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—"কই বল্লে না?"

"কি বল্‌বো?" ব'লেই হেসে ফেল্লাম্।

"ফের দুষ্টুমি" ব'লে নরেশবাবু আমার হাতখানা ঝাকা দিয়ে বল্লেন,—"বল, আমাকে তুমি ভালবাস কিনা।"

এর উত্তর কি দিব—খুঁজে পেলাম না! একবার মনে কর্‌লাম্ যাক্ ছাই বলেই ফেলিনা কেন—"তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালবাসি" কিন্তু লজ্জা করে না বুঝি? আমি মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"আচ্ছা বল্‌বে না, তবে এই আমি চল্লাম্। আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আড়ি।" এই বলে সত্যসত্যই পা বাড়ালেন। এমন সময় "দুখী, দুখী" বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে মা এসে উপস্থিত হ'লেন। নরেশ বাবু ত সটান চম্পট। আমি থতমত খেয়ে বল্লাম,—"কি মা?"

"রাত্রি যে দশটা বাজে—তার কি কিছু খেয়াল আছে? পাগলী মেয়ে আমার বনে বনে ঘুর্‌তেই ভালবাসে।" এই বলিয়া মা আমার হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। তেমনই ভাবে বেশ হাসিয়া খেলিয়া আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে নরেশ বাবুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া উঠিল। মা আমার বিয়ের জন্য দিনরাত্রি ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। হরিশকাকাও চারিদিকে ঘটক পাঠিয়ে পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে আজকাল করিয়া আরও এক বৎসর অতীত হইল। এখন বিবাহ না দিয়া আর কিছুতেই রাখা যায়না দেখিয়া মা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এবং হরিশ

কাকাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো! মেয়েটার কি উপায় হবে—" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"এর জন্য কান্না কেন? এতে তোমার কোন ভাবনা নাই। তবে আজকাল যেরূপ দিন পড়েচে, তাতে ভাল পাত্র শীঘ্র পাওয়া কঠিন। দেখি আরও দুই একমাস চেষ্টা করে, যদি একান্তই ভাল পাত্র পাওয়া না যায়, তবে আমার নরেশ ত আছেই।"

মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ঠাকুরপো! আমার দুখীর কি সে বরাত হবে?"

"খুব হবে। আমি থাক্‌তে তোমার কোন ভাবনা নাই।" এই বলিয়া কাকা চলিয়া গেলেন।

যখন কাকার সঙ্গে মার এইসব কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আমি তখন জানালার পাশে লুকিয়ে সব শুন্‌ছিলুম। নরেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবার আশা আছে জেনে আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠলো। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কল্লুম—"ভগবান্! দুই মাসের মধ্যে যেন আমার কোন পাত্র না জুটে। আমি প্রাণ থাকিতে নরেশ বাবুকে ছাড়া আর কাহাকে বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বো না।"

ভগবান্ বোধ হয়, এ দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনিলেন। কাকা একদিন বৈকালে আমাদের বাড়ী এসে মাকে বল্লেন—"দেখ বৌ, যখন এই দুই মাসেও দুখীর কোনও ভাল পাত্র পাওয়া গেল না, তখন আগামী শ্রাবণ মাসের ৪ঠা তারিখে আমার নরেশের সঙ্গে দুখীর বিবাহের দিন স্থির করেছি। আর বিবাহের খরচ-পত্রও আমিই সব দিব।" কাকার কথা শুনে মায়ের চোক দিয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"ঠাকুরপো, পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে।" তার পর কাকা চলিয়া গেলেন।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত কথা শুনলুম, আনন্দে আমার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। সেই দিন হইতে আমার মনে কত রকম সুখের কল্পনা উদয় হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

নরেশ বাবুর সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর হইতে তিনি আর আমার সহিত দেখা কর্ত্তেন না। বুঝিলাম—তিনি লজ্জায় অমন কচ্ছেন।

সুখের সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে দিয়ে শীঘ্রই এই কয়টা দিন কেটে গেল। তারপর একদিন সকালে উঠে দেখি, আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকজন এসেছে, এবং সকলেই কাজে ব্যস্ত। বাহির বাড়ীতে সানায়ের রাগিণী শুনে বুঝলুম্ আজ আমার বিবাহ। সন্ধ্যার সময় বাজনা বাজিয়ে বর এলেন। মাথায় ছোট টোপর পরে আমি তার পাশে বসিলাম, পুরুতঠাকুর মন্ত্র পাঠ করিলেন—আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। সে দিন আমার মনে যে কি আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগলো, তা নিজেই বুঝতে পাল্লাম না।

তারপর আমি শ্বশুরবাড়ী গেলাম। শ্বশুর মহাশয় আমাকে খুব ভাল বাসিতেন, বৌমা বলিতে অজ্ঞান হইতেন। বিয়ের পর হইতে মাকে তিনি আর সুতা কাটিতে দিতেন না।

মায়ের সমস্ত খরচ তিনি দিতে লাগিলেন। মায়ের আমার কোন কষ্টই রহিল না। অতঃপর বেশ সুখেই মায়ের দিন কাটিতে লাগিল। আমিও স্বামীর অগাধ ভালবাসা পেয়ে মনের আনন্দে ঘরকন্না করতে লাগলাম। হায়! তখন কে জানিত যে, আমার সে সাধের ঘর ছেলেদের খেলাঘরের মত একদিন চুরমার হয়ে যাবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাগলী আবার থামিল। তাহার চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল। আমি সমবেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"পাগলী, তোর কি বলিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে?"

"না, না—আমার কষ্ট কি বাবু! আজ যে আপনাকে আমার দুঃখের কথা বলবার জন্যই এসেছি।" এই বলিয়া পাগলী আবার বলিতে লাগিল—

"তারপর স্বামীর ভালবাসায়, শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর-যত্নে, দাস-দাসীদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় কয়েক বৎসর আমার সুখেই কাটলো। তারপর একদিন শুনিলাম, স্বামীকে বিদেশে দোকান কত্তে যেতে হবে। তার সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। শুনেই আমার প্রাণের ভিতর কি এক অজানিত আশঙ্কায় শিউরে উঠল। তা ছাড়া মাকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি করব, শ্বশুরের আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে জন্মভূমি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে রায়গঞ্জে যেতে হ'ল। পূর্ব্ব হইতেই সেখানে আমাদের থাকিবার জন্য একটা বাড়ী ঠিক হয়ে ছিল। আমরা সেই বাড়ীতেই উঠলাম। চাকর চাকরাণী সমস্তই ঠিক ছিল। এই নূতন বাড়ীতে এসে আমরা কোন কষ্টই জান্‌তেও পাল্লাম না। উনি সেই বাড়ীর সংলগ্ন একখানি বড় ঘরে দোকান করতে লাগলেন। দোকানে বেশ দু'পয়সা লাভ হতে লাগলো। আমার কিন্তু এ জায়গা বড় ভাল লাগত না। সর্ব্বদা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। কি করব, কোন রকমে এই ভাবে এক বৎসর কেটে গেল। তারপরে আমার একটী খোকা হইল। তখন আমি যেন সেই নৈরাশ্যের ভিতর একটা শান্তি পাইলাম। খোকাকে কোলে পাইয়া আমার সকল কষ্ট দূর হইল। শ্বশুর মহাশয় সংবাদ পাইয়া খোকাকে দেখিতে আসিলেন। তারপর তিনি আমাদিগকে দেশে লইয়া গেলেন। আমরা দেশে আসিয়াছি শুনিয়া মা আমাদের বাড়ী আসিলেন এবং খোকাকে কোলে লইয়া কত আনন্দ করিতে লাগিলেন। আমরা যত দিন দেশে ছিলাম, ততদিন মাই খোকাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। শাশুড়ী খোকার নাম রাখিলেন—নিধুবাবু। এইভাবে আমোদ-আহ্লাদে ছয় মাস কাটিয়া গেল। তারপর আবার আমরা রায়গঞ্জের বাসায় আসিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীনলিনাক্ষ হোড়।

শাস্তি ও শান্তি।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
গীতা ৪-৮

'দুর্ব্বৃত্ত দিগের দলন ঘটিলেই সাধুরা পরিত্রাণ পাইয়া নিরাপদ হন।' সামান্য ক্ষেত্রে সামান্য মনুষ্যে ঐশী শক্তি সঞ্জাত হইয়া তাহা সাধন করে, বিশেষ স্থলে ক্রমোর্দ্ধ বলে শেষে ভগবান্‌কে অবতার গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম প্রথম মনুষ্য করিলেও তাহা ভগবানের ইচ্ছাপ্রসূত। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইলেই শান্তি। শাস্তি উড়িয়া গিয়া দেশ নিরুপদ্রব হয়। কিন্তু ভগবানের কার্য্য বুঝিয়া, সেই দিকে চলিতে পারা সামান্য মানুষের কাজ নয়। তাই মানুষের চক্ষুতে সব আশ্চর্য্যের প্রতিফলন ঘটে। এই চারি বৎসরের অধিক কালব্যাপী যে মহাসমর ইউরোপে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে তাপদগ্ধ করিতেছিল, ধ্বংশ-শক্তির সম্প্রসারণে কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তিতে সকলকে আকর্ষণ করিয়া মুহ্যমান রাখিয়াছিল, একের স্বার্থ রক্ষার সমরে সমস্ত সভ্য সম্প্রদায়ের ধন-জন সবই হাঁদমুখে সবেগে ফেলিতেছিল, ইহা মানুষের চক্ষে আশ্চর্য্যপূর্ণ হইলেও ভগবানের নিকট ধ্বংস হইলেও সার্ব্বজনীন শুক্তিই প্রকাশিত হয়; নতুবা তাঁহার ন্যায়বিচার কিরূপ?

সে বিচার সূক্ষ্ম, যে সূক্ষ্মত্বে স্থূলজীবী আমাদের অধিকার নাই;—এজন্য এ যুদ্ধের ফল 'সু' কি 'কু' তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই —শক্তিও নাই। ভগবান কৃষ্ণ এই পাবনী শক্তিতেই নিজ বংশও ধ্বংশ করিয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের অবসান হইল। প্রথমে 'শান্তি' না 'শাস্তি' আসিল? শাস্তি ত প্রথম হইতেই উভয় পক্ষের হইতেছে। ধন জন অনেক গিয়াছে। তবে এ বিভ্রাটে ও সব ধরিতে নাই। সূক্ষ্মবিচারে দেখিতে হইলে, শেষ শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু শাস্তিও ব্যাপিয়া রহিল, ব্যক্তি-বিশেষকে—জাতি বিশেষকে, সমগ্র ইউরোপকে নয়।

নিরাময় নিরাতঙ্ক পুরীর মধ্যে জর্ম্মণ সম্রাট সকল শক্তিকে লইয়া, সকল শক্তির হইয়া, বেশ আনন্দে নাচিতেছিলেন। হঠাৎ দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাগল করিল। রাজ-

শক্তির প্রভুত্বে,—কঠিন আদেশে সমগ্র জর্ম্মণ জাতি তাঁহার পশ্চাতে বেলজিয়ম দমনে চলিল। কত অশ্রুভরা চক্ষু, কত বেদনাভরা হৃদয়, কত ভারগ্রস্ত শির, নীরবে কাতর প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজ-শক্তি টলিল না। ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইল; শ্মশানের দ্বার উন্মুক্ত হইল, চিতা জ্বলিল। এ ও সে একে একে পড়িতে আরম্ভ করিল। মাংসমেদে চিতার চির প্রজ্জ্বলন ঘটিল—আর থামিল না। বেলজিয়ম হইতে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ চিতায় পরিপূর্ণ হইল। সমগ্র শক্তি তাহাতে ঝাঁপ দিতে ছুটিল।

কেন ছুটিল? বেলজিয়ম নিরীহ, দুর্ব্বৃত্ততায় জর্ম্মণ তাহাকে গ্রাস করিবে, এ অন্যায় ইংলণ্ড সহিতে পারিল না। জর্ম্মণ সম্রাট শোণিত সম্বন্ধে আপনার হইলেও তিনি ন্যায়ের মাথায় পা দিয়াছেন, ন্যায়বীর ন্যায়াধীশ পঞ্চম জর্জ্জ কিরূপে সহিবেন? ভগবানের দিকে তাকাইয়া রক্ষা-মন্ত্রে বেলজিয়ম রক্ষায় ছুটিলেন। এই যুদ্ধই এত দিন বহু বিস্তৃত হইয়া ইউরোপকে শ্মশানে পরিণত করিল। কত মায়ের কোল শূন্য, কত স্ত্রীর হৃদয় শূন্য, কত শিশু রক্ষাধার পিতা শূন্য, আর কত বলিব,—সব গিয়াছে, এ ইচ্ছা কি ভগবানের? পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ ত তাহাই। আবার সেই অর্থেই সাধুর প্রাণে শান্তি!

এ যুদ্ধের মূল কাইসার। সুতরাং দোষীও তিনি। তিনি যাহা করিয়াছেন, যদি তাহার মূলে ন্যায় থাকিত, তবে সভ্য সমাজ তাঁহাকে আজ বিজয়-মাল্যে ভূষিত করিতেন—পরাজিত হইলেও মিত্রশক্তি আজ বীরত্বের সম্মান রক্ষার্থ আনন্দিত হইতেন। কিন্তু কাইসারের ভাগ্যে সে অর্ঘ্য নাই। তিনি যুদ্ধের মূল হইতে গুপ্ত মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়া সবমেরিন, টরপিডো, মাইন, আকাশচারী বিমান, অলক্ষ্যে পানীয় জলে বিষ সংযোগ ইত্যাদি যে সকল গুপ্ত ঘাতক সকলকে দশদিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার সকল সুখের, সকল যশের, মূল নষ্ট করিয়া সকল শান্তি আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার কৃতকর্ম্মে যে সকল চিতা জ্বলিয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত হইলেও তাহাদের জ্বলন্ত-অঙ্গার একত্রীভূত হইয়া চিন্তার সহিত তাঁহাকে দিবা-নিশি দগ্ধ করিতে থাকিল। এই জন্যই তাঁহার শেষ জীবনের শেষ অভিনয় চির পরিস্ফুট রহিল, যবনিকা পড়িল না। তাঁহার অন্তর্দাহে শান্তিই এ ভগ্ন অভিনয়ের সুস্পষ্ট দৃশ্য!

যে রাজশক্তিতে তিনি প্রজাপুঞ্জের সব হইয়া সব লইয়াছিলেন, সেই প্রজাশক্তি তিল হইতে তালে উঠিয়া আর কত সহিবে, তাঁহার সেই রাজ-মুকুট শক্তির বিলোপ সাধন করিল। তাঁহার সাধের প্রাসাদ শ্মশান হইল, মনের নন্দনকাননে অসুর নাচিতে লাগিল, শুধু তাই নয় চিরকাল ধরিয়া নাচিতে থাকিল। প্রভুত্ব ভৃত্যত্বে আসিয়া ম্লানমুখে স্থান ত্যাগ করিল।

হায়! কাল-ধর্ম্ম—হায় যুগ-প্রলয়! তোমরাই সত্য! আর সত্য ভগবানের কার্য্য!

কাইসার সত্ত্বগুণে ভূষিত ছিলেন না, রজো-তমঃগুণ তাঁহাকে এই সর্ব্বনাশকারী অমঙ্গলময়ী পথে আকাঙ্ক্ষার দাস করিয়া, নাচাইয়া

আলোক হইতে অন্ধকারে আনিয়াছিল ; তাই তাঁহার হঠাৎ এই পরিণতি! এক মাস পূর্ব্বে যাঁহার নামে দেহ শিহরিত, আজ তাঁহার এই অবস্থা!

এই জন্যই আগে শাস্তি হইয়া পরে শান্তি ঘটিলে, যাহা ঘটিল, তাহাতে আর অবাধ যন্ত্রণা আসে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভগবানের ইচ্ছায় কাইসারের পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত পাপ-পরম্পরায় তাহা হইবে না, সেই জন্যই তিনি "বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে," এই কবি বাক্যকে ত্যাগ করিয়া, নিজে বদ্ধ। তাঁহার সেই দেহ, সেই কর-চরণ, সেই চক্ষু-কর্ণ, সেই মন-বুদ্ধি, সব আছে কিন্তু থাকিতেও নাই। ন্যায়ের সীমা এমনি সূক্ষ্ম।

তিনি নিন্দিত, গুপ্ত-মন্ত্রণায় ধ্বংস-বিস্তারের জন্য ; নিরীহ, নিরপেক্ষ বালক-বালিকা ও নর-নারীদিগকে ধ্বংসের জন্য। সেই অন্তর্দ্দাহে কিরূপে ভুগিতে হয়,—নিজের ক্ষতি হইলে কি যাতনা হয়, নিজের পুত্র কলত্রের সহিত সুখ-বিচ্ছেদ ঘটিলে, কি বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার হৃদয়ে একযোগে জ্বালাময়ী শিক্ষা বিস্তারে দেখাইবে বলিয়া তিনি জীবিত, তাই আগে শাস্তি—পরে তাঁহার অন্তরের শান্তি!

অবশ্যই ইহা সুখের কথা নয়। তবে তাঁহার দুষ্কার্য্যের কারণ বলিবার বা আলোচনা করিবার শক্তি সাধারণের, এই জন্য এ সকল কথা।

মহাবীর নেপোলিয়ান প্রথমে এই শান্তি টালিয়া নিজের উগ্র আশা, উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষায় শেষে এই শাস্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই সকল ক্ষেত্রে আগে শাস্তি পরে শান্তি।

কেন এ বিভ্রাট? লোক-জীবনে তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল, আর স্বায়াধীশ রাজজীবনে অন্যায়াচরণের জন্য জ্বলন্ত বহ্নি! মানুষ অন্যায় করিলে, রাজা তাঁহার বিচার করেন, শাস্তি দেন। অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালনই রাজধর্ম্ম! দিল্লীশ্বর নাসীরুদ্দিন, প্রজার জন্য ন্যস্ত অর্থ তাঁহার ব্যয় করিবার অধিকার নাই বলিয়া, একদিন মহিষীর একটী পাচিকার প্রার্থনাও নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। সেই রাজা ত কাইসার? তিনি নিজ প্রভুত্ববলে কঠিন আদেশে প্রজার ধন-প্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা হাহাকার শব্দ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায় নাই। শত্রু হইলেও অন্যায় ও কপট ব্যবহারে সকলকে ধ্বংসমুখে রাখিয়াছিলেন, একবার ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবারও তাঁহার অবকাশ হয় নাই। দয়া-করুণার কোমল ছবিগুলিতে আগুন দিয়া, কেবল স্বার্থাকাঙ্ক্ষার দিকে চলিয়াছিলেন। এ সকলের কর্ত্তা কে, তিনিই ত? তবে এ বিভ্রাটের উৎপত্তিও তাহা হইতে। শক্তি-সামর্থ্য, অর্থবল, লোকবল, অস্ত্র ইত্যাদি ক্ষণধ্বংসী, ফুৎকারে উড়িয়া যায়। তবে তাহাদের গর্ব্ব কি? সেই গর্ব্বই পরিণামে এই শাস্তির আকারে তাঁহার জীবনের উপর, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে চির জীবনের জন্য রহিয়া গেল। তাঁহার জন্য ইউরোপে যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণে যে কত বৎসর অতীত হইবে, তাহা বলা যায়

না। তাই তাঁহার এ শাস্তি।

কোথায় তিনি আজ অন্যান্য শক্তির সমকক্ষতায় শান্তি স্থাপয়িতৃগণের মধ্যে একজন হইয়া দেশের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান থাকিবেন, না, মুকুলেই শিশির সম্পাত! মানের অভিনয় ফুরাইল, সাজ সজ্জা ছিড়িয়া পড়িল, রঙ্গমঞ্চ ভাঙ্গিয়া গেল! থাকিলেন—তিনি মাত্র ভগ্ন-মন্দির-কোটরগত হইয়া, আশাহীন,উৎসাহহীন, তন্দ্রাহীন,স্বপ্নহীন,সুষুপ্তিহীন ও জাগরণহীন জীবনে! উদ্দাম জীবনের আলোকময় তেজঃপুঞ্জ বৃহস্পতি চলিয়া গেল, পড়িয়া রহিল ঘোর অন্ধকার, তাহাতে আলোকের আশা আর নাই। অথবা ভগবানের ইচ্ছা কে বলিবে।

ব্যক্তিগত আশা বা শক্তি সামান্য কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র নদীর স্রোত মাত্র। তাহা তটস্থ সাধারণের উপকার করিলেও, জাতীয় শক্তি যে ভাগীরথীর স্রোত, তাহার উপর কখন যাইতে পারে না—মিশিয়া যায়। কাইসারের জাতীয় শক্তির উন্মাদনার মধ্যে তাহার মুখ্য ব্যক্তিগত শক্তি এক ভাবেই বিলয় পাইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা এইরূপই, কাহাকেও দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে না দিয়া, কাজ করিয়া স্বকীয় সর্ব্বময় প্রভুত্ব ও সার্ব্বজনীন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানুষ ভাবে, আকাশ হইতে পড়িল।

ভগবানের সেই দুর্ব্বৃত্তধ্বংসী অবতার বা ইচ্ছা কই? যুদ্ধের প্রথম উদ্যমে জয় ও ধ্বংসের উচ্চমঞ্চে দাঁড়াইয়া কাইসারই নিজেকে ভগবানের অবতার বলিয়া রটাইতেছেন শুনিয়াছিলাম।

ভগবানের অবতারের কার্য্যে ধ্বংস ত থাকিবেই, সে ধ্বংসে হৃদয় কাঁপিবে না,—'হায়' 'আহা'! শব্দ থাকিবে না, আনন্দ আসিবে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির ভিতর তিনি বা তাঁহার ইচ্ছা কার্য্য করিত,—সে কার্য্যে আজ পর্য্যন্ত শ্রোতার কাণে আনন্দ বর্ষণ করে, শাস্তির স্থলে শান্তিই আসিয়া পড়ে। এই তথ্যে কাইসারের প্রভু-শক্তি, অসীম বিশ্ব-প্রভু-শক্তির নিকট, সিন্ধুর নিকট কণিকা মাত্র। তবে সে শক্তি কোথায়? তাহা সর্ব্ব শক্তির ভিতরে অলক্ষ্যে থাকিয়া দুর্ব্বৃত্ত দলন করিয়াছে, ইহাই বুঝা যায়, আর বুঝা যায় সেই শক্তির ইচ্ছাই মূর্ত্তিমতী হইয়া, সম্মিলন শক্তিরূপে আজ ইউরোপের ধিকি ধিকি জ্বালাময়ী নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া সকলকে শান্তি দিল; সেই সঙ্গে কাইসারও (ন্যায় চক্ষে দেখিলে) শাস্তি পাইলেন; কিন্তু মানবিক জীবন তাহা দেখিতে চায় না বা দেখে না; এই জন্যই বলি, তাঁহার আশ্রয় এখন কেবল শাস্তি! তাই আগে শান্তি পরে শাস্তি!

তিনি শান্তিময়, তাঁহার প্রদত্ত শাস্তি ভিন্ন জগৎ শান্তিতে ভাসে না। তাঁহার ইচ্ছাই শান্তি। তিনি নরকাগ্নির মধ্যে থাকিলেও, তাহা শান্তিময়। সেইজন্যই বিষে, জলে, অগ্নিতে, হস্তিপদেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় নাই। কাতর প্রার্থনাতে ভক্তি মাখাইয়া ভগবান্ বলিয়া ডাকিলেই তিনি মরকে অমর করেন—বিষকে অমৃত করেন। যাহা কেহ কখন ভাবে নাই, তাহা নিমিষে হইয়া যায়,—কেহ কারণ খুঁজিয়া পায় না। তাঁহার কার্য্যকারণ-ভাব বুঝিবে কে? তাই ইউরোপের মহা নরকাগ্নিতে

যাহা নির্ব্বাণের আশা ছিল না, মহাপুরুষ প্রেসিডেণ্ট উইলসনের মন্ত্রশক্তি, কি এক শক্তিতে কার্য্যশক্তি আনয়ন করিল, ইহাই শান্তি! কবিও তাহাই বলেন,—

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, যরি ঋতুরাজ যেন
বসন্ত, অমৃত কিংবা জীবশূন্য দেহে।'

মাইকেল্।

ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি—'শান্তি!' মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। এই হিসাবেই শান্তি!

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

স্বপনে।

যবে প্রভাতের পিক গায় নাই গীত
পাতার আড়ালে বসিয়ে,
যবে বন উপবনে ফোটে নিক' ফুল
প্রভাত আবেগে ভরিয়ে।

যবে কাননের কোণে সেই মধু বোলে,
ধরে নি' পাপিয়া তান্,
যবে ফুলের রেণুটী মাখিয়া ভ্রমর
হয়নি গো আগুয়ান।

যবে কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে প্রণয়ে
ঘুমায়ে ছিল সব লুটিয়ে,
(তুমি) সেই বেলা প্রিয়ে দেখা দিয়ে মোরে
বলেছ কতই বুঝায়ে।
(তুমি) কতই আশায় ভাসায়ে হৃদিরে
করেছিলে যে অর্ঘ্য দান,
(ওগো) বিধি বিড়ম্বনায় প্রভাতে যে তাহা
হয়ে গেল আবার ম্লান।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

গয়ার ইতিহাস।

বাদসাহ (সেলিম) জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গয়ার স্বাধীন সামন্তরাজগুলিকে দমিত করিবার জন্য সুবেদার ইব্রাহীম খাঁকে বিহার হইতে যাইতে হুকুম করিলেন। নবাব ইব্রাহীম খাঁর সুবেদারীর কালে পালামুর হীরকখনির সৌরভ দিল্লী-দরবারেও ধাবিত হইয়াছিল। বাদসাহ জাহাঙ্গীর এই কার্য্যে সুবেদার জাফর খাঁকে ব্রতী করেন কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কোক্‌রা পর্য্যন্ত অভিযান লইয়া যাইতে না যাইতে হোসেনাবাঁদের সন্নিকট সঁঢ়াকারার কোর্টের নিকট কালগ্রাসে পতিত হন; যুদ্ধের অভিযান কাজেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ নবাব ইব্রাহীম খাঁকে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া এই হীরকখনি অধিকার করিয়া লইবার আদেশ সহ প্রেরণ করিলেন। টেভার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলেন যে এইখানি কোক্‌রাগ্রামে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে কোক্‌রার অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা কম কঠিন নহে। আমার মনে হয় কোইল ও সঙ্খ নামক দুইটী নদীর মুলদেশে

যে বিস্তীর্ণ "বেসীন্" বা সমতল উচ্চভূমি আছে (এবং যেথান হইতে সন্নিকটেই হুটার ও আওরাঙ্গা প্রভৃতির কয়লার খনি আছে) তাহার সন্নিকটেই এই প্রসিদ্ধ খনি অবস্থিত ছিল। টাভার্ণিয়ারের বিবরণ অনুসারে বল্, হল্যাণ্ড, হিউজেস্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই খনির অস্তিত্ব নির্দ্দেশ্ করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান রোহতাসগড় হইতে কোকরা ৮১ মাইল দূরে কোইল নদীর মূলের দিকে সুমেলপুর বা সম্বলপুরের সন্নিকট অবস্থিত। * সুমেলপুর বর্ত্তমান সেসাগ্রাম হইতে পারে। নবাব দাউদ খাঁ ১৬৬০—৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন পালামুর বিদ্রোহী সামন্তরাজগণকে দমিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন,তখন তিনি পালামুর অন্তর্গত কোকরা রাজধানীতে পালামুর রাজারূপে একজন কোলবংশীয় রাজপুত রাজাকে অধিষ্ঠিত পাইয়াছিলেন। ইনিই সম্ভবতঃ টেভারণিয়ারের "হীরক রাজা" হইতে পারেন, যেহেতু দাউদ খাঁর পাঁচ বৎসর মাত্র পরে টেভার্ণিয়ার হীরক-খনি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিহার প্রদেশের শাসক নবাব দাউদ খাঁ থাকেন। তিনি গয়া এবং পালামু জেলার সকল সামন্তরাজগণকে বশে আনিয়া কর গ্রহণ করিতে থাকেন। দাউদ খাঁ বাদসাহ আওরাঙ্গজেবের সময়ে একজন ভাল সুশাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই দাউদ খাঁ গয়া জেলার অন্তর্গত দাউদনগর নামক গ্রাম স্থাপন করেন। দাউদনগর আওরাঙ্গাবাদ মহকুমার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট গ্রাম। ইহা সোন নদের পূর্ব্বতীরের উপর অবস্থিত। নবাব দাউদ খাঁ সুবেদারের বংশধরগণের মধ্যে নবাব দাউদ খাঁ, নবাব আহম্মদ, আহম্মদ খাঁ, নবাব কাইউন সাহেব প্রভৃতি অদ্যাবধি দাউদ নগরে বাস করিয়া থাকেন। ১৬৬০—৬৫ খৃষ্টাব্দে পালামু এবং রামগড় রাজদ্বয়কে বিজয় করিয়া যখন সুবেদার নবাব দাউদ খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন কালীন দাউদ নগরের সন্নিকট "তাঁবু গাড়িয়া" বিশ্রাম জন্য সৈন্যসামন্তসহ "কুচ্" করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া এইখানে একটি নিজ নামে গ্রাম বা "বস্তী" স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়া "দাউদ নগর" গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার নামে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার পৌত্র আহম্মদ খাঁ এই নগরের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় নামে একটী অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধিত অংশটির নাম আহম্মদগঞ্জ, এইখানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। এইখানে ভাল কম্বল, সতরঞ্জি, তসর কাপড়, গুড়, দোলো, পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হয়। এইখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটিও আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নবাব দাউদ খাঁ এই নগরটিকে স্থাপন করিয়া একটি বেশ সুরক্ষিত গড়ে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পালামু জেলার শাসনভার বিহার সুবেদারের অধীনে একজন নায়েব সুবেদারের উপর রক্ষিত হইল। তাঁহার সদর মহকুমা স্থান হোসেনাবাদ-জাপলায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি সোনপুরা রাজাকে

* J. H. S B ৫০ ভাগ ৩৯ পৃঃ।

বিজয় করিয়া তাঁহাকে শাসন জন্য নিকটেই হোসেনাবাদ নামক নগর স্থাপন করিয়া সেই-খানে বসবাস করিতে লাগিলেন। হোসেনা-বাদের নবাব-বংশ এককালে খুবই প্রতাপশালী ছিলেন, এখন তাঁহারা হতশ্রী ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। হোসেনাবাদে একটি সাবরেজেষ্ট্রী আফিস ও থানা আছে। ইহা বারুণ ডাল্টনগঞ্জ লাইনের উপর একটি ষ্টেশন। এইখানে বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত জাপলা লাইম ওয়ার্কস্ লিমিটেড নামক একটি পাথুরে চূণের কারখানা আছে। প্রসন্ন বাবু অতি অমায়িক ও সদাশয় লোক। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বাবু ভোলানাথ দত্ত পিতার খাত পাইয়াছেন। জাপ্‌লা হোসেনা-বাদের দত্ত বাবুরা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল ৺ হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয় হইতেছেন। হোসেনাবাদ একটি বেশ বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম হইলেও বিগত কয়েক বৎ-সরের প্লেগে ইহার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে এবং নগরটি ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। শস্য, ঘৃত, কাগজের জন্য সাবে ঘাস, বাঁশ, পাহাড়ী কাঠ, কম্বল, ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য এই-খানকার ষ্টেশন হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পালামুজেলার মধ্যে হীরক ছাড়া অপর খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার মধ্যে কয়লা, চূণ, লৌহ প্রভৃতি আছে। কয়লাখনির মধ্যে রামগড়, বোকাকো (M. Geo. Sur. of India ৬ ভাগ), আওরাঙ্গা হুটার M. G. S. I vol XV দেওবর, কর্ণপুরা, করহরবাড়ী (M. G. S. I vol vii) সিংহ-ভূম জেলার মধ্যে নদীর চালীতে সুবর্ণ পাওয়া যায়। Ball's Geo Survy of India vol III P. ৪0, m G S I vol X viii) ইহা ব্যতীত জাপলা ও বিলোঞ্জা পরগণার যে সমস্ত গিরিরাজি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগের মধ্যে খয়রা, তাপ্পার অন্তর্গত খয়েরা, শিরদীলি, কুলীয়া, মুরুরাতু, ডালা প্রভৃতি গ্রামের পর্ব্বত-গুলির মধ্যে চুণ এবং লৌহ বহুল পরিদৃষ্ট হয়। বনে শাল, খয়ের প্রভৃতি কাষ্ঠও বহুল আছে। এই বিশাল কাজরু ষ্টেটের অধিকারী হাইকোর্টের উকীল ৺উমেশচন্দ্র সরকারের পুত্র কলিকাতা ও পাটনা হাইকোর্টের উকীল বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ শরিক ভূম্যধিকারী হইতেছেন। এ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

দেশের এই প্রকার উচ্ছৃঙ্খল সময়ে যখন মোগল সম্রাটগণ ক্রমশঃই হীনবল হইয়া আসিতেছিলেন সেই সময়ে ১৭৩০খৃষ্টাব্দে আলি-বর্দ্দী খাঁ বিহারের ডেপুটী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আইসেন। নবাব নাজীম সুজাউদ্দৌলা আলীবর্দ্দীকে খুব ভাল বাসিতেন। আলি-বর্দ্দী দেখিলেন যে, গয়া এবং পালামুর উপ-রোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের দমিত না করিলে ভবিষ্যতে মোগল সুবেদারীর পর্য্যন্ত বিপদপাত লইতে পারে বলিয়া তিনি টিকারী-রাজ সুন্দরসিংহ, দেওরাজ ছত্রপতিসিংহ এবং নওয়াদার নবাব নামদার খাঁ মুইমের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়া নওয়াদা, আবগীলা, উমগা, তেলপ্রিহা, আয়ন-পরাইয়া, উতরন্দ, নেরা, পালী, ডুমরা প্রভৃতি

স্থানের যুদ্ধে ঐ সকল সামন্ত রাজগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন এবং তাঁহারা মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর ও রাজস্ব দান করিতে লাগিলেন, এদিকে সায়ের-উল্ মুতাক্ষরীনের লেখক গোলাম হোসেন খাঁর পিতা নবাব হেদায়েৎআলী খাঁ। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অব্যবহিত পরে বিহারের ডেপুটী গভর্ণররূপে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পালামু জেলার ঐরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া পালামুরাজ ও সোনপুরী রাজদ্বয়কে বশে আনিয়া পালামু পরগণা এবং সোনপুরী-রাজের অধিকৃত জাপলা, বিলৌজা প্রভৃতি পঞ্চ-পরগণার এবং পাওয়াই রাজাধিকৃত সিরিশ ও কুটুম্বা পরগণার উপর মোগলের সম্পূর্ণ স্বামীত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে রামগড়রাজ বশ্যতা স্বীকার না করিলে নবাব হেদায়েৎ আলি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রামগড় জয়ের জন্য সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। ভীমচুলা, কীতাত, কাজল, বিশ্বরামপুর, পাণ্ডু, ডালা, পাটন, আসাতু প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে রামগড়-রাজ তীব্র বাধা দিয়াও মোগল-বাহিনীকে হটাইতে না পারিয়া শেষে দুর্গ ছাড়িয়া বনের মধ্যে পলায়ন করিলে ডেপুটী গভর্ণর নবাব সাহেব রামগড় জয় করিয়া শ্রবণ করিলেন যে, মহারাষ্ট্রগণ ৫০০০০ সৈন্য সহ পণ্ডিত রঘুজী ভোঁসলার নেতৃত্বে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদ পাইয়াই আলিবর্দ্দী খাঁ পালামু ও গয়া স্থানের সকল ভার ডেপুটী গভর্ণর হেদায়েৎ আলি খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রগণকে দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য পাটনায় গমন করিলেন। নূতন সহকারী গভর্ণর সাহেব রামগড়ের রাজাকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরিয়া দিয়া সোন-পুরাদি নব বিজিত ভূভাগ গুলির শাসন ও বন্দোবস্তের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের যুগে এবং ব্রিটিশ শক্তির প্রথম অভ্যুত্থানের কালে গয়াজেলা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিজিত সৈন্যগণের দ্বারা লুণ্ঠিত হইত বলিয়া নিঃস্ব অধিবাসিগণের আর কষ্টের সীমা থাকিত না। নবাব হেদায়েৎ আলি খাঁ নিজ শাসন-কার্য্য সুচারুরূপ পরিচালন জন্য জাপলা পরগণার অন্তর্গত দৌরিয়াদি মৌজার সন্নিকট হোসেনাবাদ নামক একটি নগর স্থাপন করিয়া সেই খানে বাস করিতে লাগিলেন। সোনপুরারাজ রাজ কর না দেওয়ায় দিল্লীর আদেশে ক্রমে তাঁহার তালুক নবাব সাহেব দখল করিয়া লইয়া দিল্লী হইতে ফারমান আনাইয়া নিজ নামে বন্দোবস্ত করাইয়া লইলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শেষে মোগল সম্রাটগণের শাসন কালে যখন মোগল সাম্রাজ্য দ্রুতবেগে ধ্বংসের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, তখন দিল্লীর মোগল দরবারের যাবতীয় আমীর ওমরাহগণ গয়া, সাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতির জায়গীরে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্পী ও কর্ম্মকারগণকে সেই সঙ্গে দেশে আনিয়া বাসস্থাপন করাইয়াছিলেন। গয়া জেলার মধ্যে জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত দৌলতপুরের কাজি আসাদ আলি খাঁ,

দাউদনগরের নবাব দাউদ খাঁ, নওয়াদা মহকুমার অন্তর্গত মকদুমপুর নরহট্টের কাজী, ঐ মহকুমার রাজৌলী থানার অন্তর্গত কশ্বে-র্জরা-উর্ফ-শিরদীলা নিবাসী সাইয়দ শাহ আসাদুল্লারি, জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত পিঞ্জৌরার সৈয়দ ও আল্লঅর শরীফের শাহ সাহেব প্রভৃতির বংশাবলীর গয়া জিলায় বাসস্থাপন এইরূপে হইয়াছিল। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বালাজী রাও ৫০০০০ হাজার সৈন্যসহ গয়ার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে আসিবার সময় গয়া নগর লুণ্ঠন করত তত্রত্য মুসলমান অধিবাসিগণকে বিধ্বস্ত করেন। পালী এবং উৎরেনের যুদ্ধে টিকারী-রাজ পরাজিত হইলে, মহারাষ্ট্র সেনাধিপতিকে প্রভূত অর্থদণ্ড দিয়া স্বীয় বিশাল রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল্।

মনুষ্যত্ব।

মনুষ্যত্ব আমাদের একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়; এবং উহা নিতান্ত আবশ্যকীয় ও উপাদেয়। মানুষ যদি প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া আপন আপন মনুষ্যত্বের বিষয় আলোচনা করে, মানব হইয়া কে কতটুকু মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে যদি তাহা আপন হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখে, তাহা হইলে, এ জগতের অনেক দুঃখ-দৈন্যের লাঘব হয়। যদি সকলেই মনুষ্যত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সত্যধর্ম্মের পবিত্র সাহসে হৃদয়কে বলীয়ান্ করতঃ কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে জগতে আর কোন প্রকার বৈষম্য উপস্থিত হয় না; এবং মর্ম্মাহত ব্যক্তির হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। সংসারে এত ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণাসমূহও আর স্থান পায় না। যে বিষ জগতে নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, যে বিষের জ্বালায় জগৎ জর্জ্জরীভূত, জ্বালাময়, কঠোরতাময় হইয়া পড়িয়াছে, যে বিষে জগতের কোমল কমনীয় আকৃতিকে বিকৃত ও বিভীষিকাময়ী করিয়া ফেলে—সে বিষেরও আর অস্তিত্ব থাকে না।

বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রদত্ত যাবতীয় পবিত্র পদার্থ, অক্ষয় শক্তি ও অনন্ত সুখপূর্ণ,সদা দেদীপ্যমান্ যে স্থান—তাহাই জগৎ নামে অভিহিত। সেইরূপ জগতের স্বর্গীয় শক্তির অর্থাৎ মনুষ্যত্বের ব্যভিচারিত্বই জগতের শত্রু। যাহা বিকৃত, তাহাই সত্যের বিরোধী; সুতরাং মানবের মনুষ্যত্বই স্বর্গীয় জগতের আধার এবং মনুষ্যত্বের ব্যভিচারই বিকৃত জগতের হেতুভূত। এই ব্যভিচার কোন্ পথ দিয়া আসিয়া এমন শত্রুতা সাধিতে লাগিল, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। তবে এই সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, মানবের প্রকৃতির সহিত জড়জগতের কিরূপ সম্বন্ধ।

মানুষ এবং জড়জগৎ পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, পরস্পর কেহ কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর যে অতি সরল ও সত্যসূত্রে সমস্ত জগৎ গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ছেদন করা মানবের

অসাধ্য। ঈশ্বর হইতে জগৎ পর্য্যন্ত যে এক নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, সরল ও পবিত্র পথ আছে, মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জন্মাবধি সেই পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য। যদি সেই স্বর্গীয় পথের সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে জগতে সত্যেরও কোন অস্তিত্ব থাকিত না।

সেই সরল পবিত্র পথ দিয়া ঈশ্বরের কল্যাণ-ময় আদেশ জগতে আসিয়া পৌঁছায়। মানব-মাত্রেরই হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত এই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই মানব-হৃদয় অনু-সন্ধান করিলে সেই আলোকমালা পরিশোভিত পবিত্র পথ দেখিতে পাওয়া যায়।

চুরি করা, মিথ্যাকথা বলা, পরহিংসা করা প্রভৃতি কার্য্য পাপ কি পুণ্য, তাহা যদি জানিতে চাও, তবে তর্ক যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া, আপন হৃদয়কে একান্তমনে জিজ্ঞাসা কর—সদুত্তর পাইবে। সেই হৃদয়-বাণী তোমায় স্তম্ভিত করিয়া দিবে, তোমার পাপ-প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবে; মুহূর্ত্তের জন্যও সত্যের আলোক তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত করিবে। তখন তুমি আপনি বুঝিতে পারিবে, মিথ্যা বলা, চুরি করা পাপকার্য্য। তখনই জানিতে পারিতে—তোমাকে শাসন করিতে, তোমায় সাবধান করিতে—তোমার হৃদয় ব্যতীত অন্য কেহ নাই। তাই বলি—মানুষ জন্মাবধি আমরণ এই সত্য, সরল, স্বর্গীয় পথে বিচরণ করিতে বাধ্য থাকিবে, বিমল মন হইতে বিমল বাসনা প্রসূত হইয়া, বিমলভাবে সংসার রঙ্গভূমিতে লীলা করিবে, স্বর্গীয় সম্পদের গৌরব রক্ষা করিবে—ইহাই ভগবানের আদেশ। কিন্তু এখন সেই আদেশের বিপর্য্যয় হয় কেন? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।" যে বাসনার কথা উপরে লিখিত হইল, তাহা শুদ্ধা বাসনা। আর এক প্রকার বাসনা আছে, তাহাকে মলিনা বাসনা বলে। মলিনা বাসনা সত্যের ও হৃদয়ের শাসনকে উপেক্ষা করে। এই মলিনা বাসনার বশবর্ত্তী হইলেই মানব ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় এবং পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এই মলিনা বাসনাই মানুষকে অহরহঃ দুঃখের পেষণে নিষ্পেষিত করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ সহজে এই ব্যভিচারের বিনাশ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। কারণ, যে মলিনা বাসনা হইতে ব্যভিচারের উৎপত্তি হয়, শুদ্ধা বাসনা ও তৎসহচরিত মনুষ্যত্ব ভিন্ন তাহার বিনাশ হয় না।

মানব যখন ব্যভিচারের তাড়নায় মর্ম্মাহত হইয়া, ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করে, পাপানলে যখন তাহার হৃদয় জ্বলিয়া-পুড়িয়া যায়, যখন সে আপন হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অভাব অনুভব করে, তখন তাহাকে মনুষ্যত্বই আশ্রয় প্রদান করে। যখন সে মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বের আশ্রয় লয় নাই—ইহা বুঝিতে পারিল, তখন তাহার মনু-ষ্যত্ব ফিরিয়া আসিল, মলিনা বাসনা দূরীভূত হইয়া শুদ্ধা বাসনা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

যদি সত্য ও মনুষ্যত্বের শাসন অজেয় না হইত, তাহা হইলে মন্দকে ভাল করা যাইত না, বিকৃতকে প্রকৃত করা অসম্ভব হইত।

মনুষ্যত্বের শক্তি স্বর্গীয় ও অজেয়, তাই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মানব মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হইতে পারে না। যাহা উপাদেয়, যাহা স্বর্গীয়, তাহাই মনুষ্যত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের প্রাণ এবং শান্তি মনুষ্যত্বের নিকেতন। অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী মনুষ্যত্বের সেবক। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন অন্ধকার কোন্ নিভৃত কন্দরে লুক্কায়িত হয়, সেইরূপ মানব-হৃদয়ে মনুষ্যত্ব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, পর-নিন্দা, মিথ্যা, বৈষম্য প্রভৃতি বিকৃত জগতের সমস্ত নারকীয় পদার্থগুলি লয়প্রাপ্ত হয়। জলে যেমন আগুন জ্বলে না, শত্রু-মিত্র যেমন একত্রে বেড়ায় না, সেইরূপ মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্বের ব্যভিচারও এক স্থানে থাকিতে পারে না। মনুষ্যত্বের আগমনে ব্যভিচার দূরে পলায়ন করে।

জাতিভেদের আদি কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যত্বের তারতম্যানুসারে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি জগতে মনুষ্যত্বের সমান অধিকার থাকিত, তাহা হইলে এরূপ জাতিভেদ প্রথাও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মনুষ্যত্বাধিকারী ছিলেন বলিয়া আর্য্য নামে জগতে পূজ্য ছিলেন। আমরা তাঁহাদের এমন একটী গুণও প্রাপ্ত হই নাই, যাহাতে আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। এই আর্য্যগণ এক সময়ে জগৎপূজ্য ছিলেন, আর আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়া মনুষ্যত্ব বিহীনাবস্থায় কোন-প্রকারে এখন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি মাত্র। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীনলিনাক্ষ হোড়।

সাকার দেবতা।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

"বিনোদ!"

"আদেশ করুন!"

"আমি পণ নিব, তা'তে তোর কি?

"বাবা! বিয়ের পণ কি আপনার নেওয়া উচিৎ? আমাদের কি টাকার অভাব আছে? আমরাই যদি পণ নিয়ে বিয়ে করি, তা' হ'লে যারা গরীব তারা ত নেবেই।"

"আমি তোর কাছে উপদেশ নিতে আসি নাই;—শুধু বল্ বিবাহ করবি কি না?"

"বাবা! আমি যে পণ-প্রথা নিবারণের জন্য কত সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছি, কত লোককে উপদেশ দিয়েছি;—এখন আমিই যদি পণ নিয়ে বিয়ে করি, তা' হ'লে লোকে কি বল্‌বে? কেমন করে লোক-সমাজে এ কালামুখ দেখাব?"

"এখন বক্তৃতা রাখ, স্পষ্ট বল,—এ বিবাহ করবি কি না?

"না"—দৃঢ়স্বরে বিনোদ বলিল—"না' আমি পণ নিয়ে বিয়ে করবো না।"

"এই কি ঠিক?"

"হাঁ, এই ঠিক।"

পিতা জগদীশ বাবু পুত্রের অবাধ্যতায়

ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"যে পুত্র পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘন করে, সে পুত্র—পুত্র নয়—শত্রু। আমার বাড়ী হ'তে দূর হ'য়ে যাও, তুমি আমার ত্যজ্য পুত্র।"

"এখনি যাচ্ছি!" এই বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল।

বিনোদ এক বস্ত্রেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। গৃহিণী পুত্র বিনোদের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। হায়, শ্যাম-বিহীন শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় তাঁহার আনন্দ-নিকেতন আজ নিরানন্দময় হইয়া উঠিল।—হায় রে মায়ের প্রাণ!

(২)

পরিত্যক্ত বিনোদ বাটী হইতে বাহির হইয়া, নিজের জীবনকে নদী-বক্ষে বিক্ষিপ্ত নিরবলম্বন তৃণের মত অনুভব করিতে লাগিল। শৈশবের খেলা-ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান জীবনের অবস্থার বিষয় একে একে তাহার স্মৃতিপটে উদয় হইতে লাগিল। সে কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখ।য় কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল;—হায়! আজ তাহা নদী-সৈকতের বালুকা-স্তূপের মত নিমিষে ভাঙ্গিয়া গেল।

বিনোদ ভাবিতে লাগিল,—অমন স্নেহময় পিতা আমার, কেমন করিয়া আজ এত নির্ম্মম হইলেন! কি এমন অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য আজ তিনি আমায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন! অর্থের জন্য! হায়, পুত্রের চেয়ে অর্থই কি বড় হইল? এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে কলিকাতায় আসিল। কিন্তু কি করিয়া জীবনযাপন করিবে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে বন্ধু বিমলচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

বিমল বলিল—"বেশ, ভাল কাজই করেছ ভাই! অর্থ-লোভে তুমি যে পুরুষার্থ বিক্রয় কর নাই, তজ্জন্য তোমায় শত শত ধন্যবাদ দিই। সম্প্রতি আমাদের এখানেই থাক; তার পর দেখে-শুনে চাকুরির চেষ্টা করো। আর দেখো ভাই! এ সব কথা যেন বাবা জান্‌তে না পারেন।"

বিনোদ বন্ধুগৃহে আশ্রয় পাইল। বিমলের পিতা ভবেশবাবু দয়া করিয়া তাঁহার গৃহে বিনোদের দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দিন বেশ সুখেই যাইতে লাগিল। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সুদূর পল্লী-প্রান্তে অপত্য-মায়া-মুগ্ধা স্নেহময়ী জননীর কথা মনে জাগিয়া উঠিত, আবার নিজ মনেই ধীরে ধীরে বিরাম লাভ করিত।

ছয় মাস অতীত হইল বিনোদকুমার বন্ধু-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, ইহার মধ্যে সে মাতাকে কোন চিঠি-পত্রাদি লেখে নাই। পিতা তাহাকে বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া দুই-তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অভিমানী বিনোদকুমার মনের ক্ষোভে সে সকল পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই।

(৩)

মানুষ যখন বড় স্নেহের বস্তু হারাইয়া ফেলে, তখন সে সেই জিনিষের অভাবে দিবানিশি মর্ম্মন্তুদ যাতনায় নয়ন-জল পরিত্যাগ করে।

জগদীশ বাবুর অবস্থা ঠিক সেইরূপ। তিনি যখন বিনোদকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তখন ক্রোধের বশেই তেমন কঠিন-হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রোধানল ক্রমে সময়-সলিলে নির্ব্বাপিত হইলে বিনোদের জন্য তাঁহার প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তম পুত্রকে বিদায় দিয়া কয়েক দিন চখের জল ফেলিলেন,—ক্রমে চোখের ধারা শুখাইল, কিন্তু প্রাণের আগুন রাবণের চিতার মত জ্বলিতে লাগিল।

এ দিকে অন্তপুরেও সুখ-শান্তি নাই। বিনোদ-জননী পুত্র-বিরহে দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছেন, সে অশ্রুর বিরাম নাই। এই সুদীর্ঘ ছয়টী মাস যাবৎ অবিরল ধারায় ঝরিতেছে। হায়, তাঁহার চির-শান্ত-হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে—বুঝি বিনোদ ব্যতীত সে আগুন নিবিবে না। বিনোদ যে তাঁহার বড় আদরের—বড় স্নেহের ধন।

যাহাকে বিন্দু বিন্দু বুকের রক্ত দিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যার মলিন মুখ দেখিলে নিজে কাঁদিয়াছেন, যার রোগে সারা-রাত্রি জাগিয়া বাতাস করিয়াছেন,—সেই প্রাণাধিক বিনোদ কোথায়? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ-জননী বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। পুত্র-বিরহ-কাতরা জননী শয্যা গ্রহণ করিলেন।

একদিন তিনি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, —"তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমার বিনোদকে এনে দেখাও, আমি জন্মের মত সেই চাঁদ মুখ-খানি দেখে যাই। যাও—একবার এনে তাকে দেখাও। আমার বুকের নিধি—হৃদয়-শোণিত প্রাণাধিক বিনোদকে একটিবার মাত্র দেখাও। আমার এই অন্তিম-শয্যার শেষ মিনতি কি রাখবে না?" কাতর ও মিনতিপূর্ণ স্বরে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়ের নিভৃতকন্দর ফাটিয়া উষ্ণাশ্রু-প্রস্রবণ রোগশীর্ণ গণ্ডস্থল প্লাবিত করতঃ উপাধান সিক্ত করিল। শান্তি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বাম হস্তে মাথা টিপিতেছিল আর দক্ষিণ হস্তে অবিরাম বাতাস করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে মায়ের চোখের জল মুছাইয়া দিতেছিল। এবারেও সে অশ্রু মুছাইয়া দিল। কিন্তু বুকফাটা অশ্রু তাহাতে মিটে কি? প্লাবনের ধারা সহজে যায় কি? হৃদয় প্লাবিত বন্যার স্রোত বাঁধে আটকায় কি? হায় রে জননীর প্রাণ! জগদীশ বাবুও বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া দুই হাতে চোক ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়তমা পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"কেঁদ না পুণ্য! বিনোদ যা'তে বাড়ী আসে, আমি এখনি তার ব্যবস্থা করছি"।

জগদীশ বাবু সেই দিনই পুত্রের নিকট আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিলেন,—"তোমার জননী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা, দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে শীঘ্র আসিবে।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিনোদ একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল; এমন সময় পিয়ন আসিয়া ডাকিল—"বিনোদ বাবুকা তার আয়া হ্যায়!" বিনোদ চমকিত হইয়া দ্রুত বাহির হইয়া তার গ্রহণ করিল। শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত হস্তে তাহা উন্মুক্ত করিল! এ কি ভীষণ

বজ্রাঘাত !!

বিনোদের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে ভবেশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার কাছে নিজের সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিল।

ভবেশ বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তার পর ভর্ৎসনা স্বরে কহিলেন—"হায়, তুমি করেছ কি? এমন স্নেহময় পিতামাতার বুকে ব্যথা দিয়া আসিয়াছ? পুত্রের জন্য পিতামাতা যে কত কষ্ট বুক পেতে সহ্য করেন, তা' শুধু পিতা-মাতাই জানেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতেই তাঁহারা সন্তান লালন-পালন জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন। তুমি এমনই নির্ব্বোধ, এমনই উচ্ছৃঙ্খল যে, পরমারাধ্য পূজনীয় পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া মাতৃদেবীর হৃদয়ে নিদারুণ শোকানল জ্বালাইয়া দিয়া পরাশ্রয়ে—পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছ। জেনো—পিতামাতার মনে কষ্ট দিলে কখনও সুখলাভ করা যায় না, বরং আজীবন নিদারুণ দুঃখ-দাবদাহে দগ্ধীভূত হইতে হয়। জান ত, 'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥' পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের অন্য কোন দেবতা নাই, পিতাই সব। সেই পূজনীয় পিতা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহা করাই পুত্রের একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি যে বল্লে—'পণ নিলে, দেহ বিক্রয় করা হয়।' এ দেহ তুমি কোথায় পাইলে? এ দেহ তোমার নয়—তোমার পিতামাতার। তোমার এ দেহ লইয়া তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন—তোমার কি?"

বিনোদ ভাবিল—"তাই তো, আমার কি? ইহাতে আমার কি অধিকার আছে?"

ভবেশ বাবু বলিলেন—"বিনোদ! যাও—এখনি গৃহে যাও, আরাধ্য দেব-দেবী জনক-জননীর নিকট ক্ষমা চাওগে। তাঁহাদের পদসেবা করিয়া পুত্র-জীবন সার্থক করগে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—'পিতরং মাতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্। সদা গৃহী নিষেবেত সেবা-ধর্ম্ম প্রযত্নবান্॥' হিন্দু আমরা—শাস্ত্রের এ উপদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর দেখ, ঈশ্বর নিরাকার অজ্ঞেয় পুরুষ, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না! কিন্তু এই সংসারে পিতামাতাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই—জগতে পিতামাতাই সজীব ও সাকার দেবতা!"

ভবেশ বাবুর উপদেশ-বাণী শুনিয়া বিনোদের মনে নিদারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। তাঁহার সেই গর্হিতাচরণই যে মায়ের পীড়ার একমাত্র কারণ, তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না; সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে বিনোদকুমার গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সংসারে পিতামাতাই যে সজীব ও সাকার-দেবতা ইহা বেশ বুঝিতে পারিল। সেই হইতে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ॥" তাহার মূল মন্ত্র হইল।

(৫)

বিনোদ নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল, চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার,—কোলের মানুষ চেনা যায়

না। এই ভীষণ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিনোদ আশা ও নিরাশার মধ্যস্থলে পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। "মা আছেন কি নাই,—বাড়ী গিয়া মাকে দেখিতে পাইব কি না,—যদি না পাই, তবে যে আমার পরিবর্ত্তিত জীবনের নবীন ভক্তি-ফুলে তাঁহাকে পূজা করিতে পারিব না।"

ক্রমে বিনোদ স্বগ্রামে প্রবেশ করিল এবং দূরে অস্পষ্ট প্রদীপালোক দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল—ঐ আমাদের বাড়ী। ঐ স্থানে আমার পরমারাধ্য পিতা-মাতা অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে আপন বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শুনিতে পাইল,—গৃহমধ্যে শান্তি শোক-বিজড়িত-স্বরে কাঁদিতেছে। বিনোদ বুঝিতে পারিল—তাহার জননী আর ইহ জগতে নাই। তাই সে রুদ্ধআবেগে দরজার নিকটে আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—"শান্তি।" শান্তি দ্বার উন্মুক্ত করিল এবং দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিনোদ অশ্রু-উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল—"শান্তি, মা কোথা ?"

অশ্রু মুছিতে মুছিতে শান্তি বলিল—"মা, তোমায় হারাইয়া আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মা'র আর জীবনের আশা নাই। তুমি তাঁকে দেখবে এস।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদ দেখিল, সেই চির-স্নেহময়ী, হাস্যময়ী জননী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছেন। তাহার সেই সোণার অঙ্গে কে যেন কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে। বিনোদ আবেগভরে ডাকিল—"মা !"

"শুধু ডাকিস্ কেন ? আমার বিনোদ এখনও এল না ? বিনোদ যে আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের ধন।"

"এই যে আমি এসেছি মা!"

"কই, কই, দুঃখিনীর জীবনসম্বল হারানিধি কই ? আয় আয় বাপ ! তোকে বুকে ধরে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি।" বলিতে বলিতে স্নেহময়ী বিনোদ-জননী শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত ব্যাধি যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। বিনোদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। জননীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং বলিল,—"মা, মা ! তোর অবাধ্য সন্তানকে ক্ষমা কর মা।"

জননী সস্নেহে পুত্রকে কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। জগদীশ বাবু এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। স্নেহ-কোমল স্বরে ডাকিলেন—"বাবা বিনোদ !" বিনোদ পিতার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা ! আমায় ক্ষমা করুন। না বুঝিয়া এতদিন আপনাদের দেব-হৃদয়ে ব্যথা দিয়া মহাপাপ-সাগরে ডুবিয়াছি। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, সন্তানের উপর পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অধিকার। কেন না, পিতা-মাতা সন্তানের পরমারাধ্য সাকার দেবতা।"

জগদীশ বাবু সস্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

হরিনাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর)

সে কালের বাঙ্গালার নবাব হোসেন সাহ সুবুদ্ধি রায়কে "করোয়ার পানী" পান করাইয়া জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন। কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উষ্ণ ঘৃত পানে জীবন ত্যাগ করিবার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে জীবনত্যাগের পরিবর্ত্তে হরিনাম করিয়া পাপমুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যথা,—

"প্রভু কহে ইহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, শুচিসম্পন্ন ভক্তির অনলে নীচজাতির জাতীয় অপবিত্রতা অতি সত্বর বিনষ্ট হয়, এবং অগোণে অতীব পবিত্রতার উদয় হয়। এরূপ পবিত্র জ্ঞানহীন চণ্ডালও মহামান্য, কিন্তু বেদজ্ঞ নাস্তিকও তাঁহার ন্যায় মাননীয় নহে।" যথা—

"শুচিঃ সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি-দগ্ধ-দুর্জ্জাতি-কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি
নাস্তিকঃ॥"

নীচজাতীয় সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণে পতিত হইলে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সনাতন বলিলেন,—"প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচজাতি, অতি হীনাচারী।" প্রত্যুত্তরে প্রভু বলিলেন,—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে, ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।" প্রভু আরও বলিলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থাভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥
নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচপূজ্যো
যথাহ্যহম্॥"

"অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনংহি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ গাত্র সঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ঠাকুর হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস! কলিতে গো-ব্রাহ্মণ হিংসাকারী যবনগণের মুক্তির উপায় কি হইবে?" হরিদাস বলিলেন,—

"যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম','হারাম' বোল কহে নামাভাসে॥"
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হারাম', 'হারাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥
অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এইতো স্বভাব।
অব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন স্বভাব॥"

"নামৈকং যস্যবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং
গতং বা।

শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতংতারয়-
ত্যেব শতং॥"

"নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥"
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মী করিয়া লইবার, বিজাতীয়কে সজাতীয় বলিয়া গ্রহণ করিবার এবং নীচ জাতীয় লোকদিগকে উন্নীত করিবার ইহা উৎকৃষ্ট পন্থা। জানি না, ইহাপেক্ষা সুন্দর ও সরল পথ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মে আছে কি না? খরস্রোতা কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিধ্বংসের ন্যায় নিয়ত হিন্দুধর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গে কে এমন মহাপুরুষ আছেন, যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় উদার পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পতনশীল জাতিকে তাহাদের স্বধর্ম্মত্যাগরূপ মহাব্যাধি ও জাতীয় অপঘাত নিবারণ করিতে পারেন? কে এমন ধর্ম্মবীর আছেন, যিনি হরিনাম প্লাবনে অশুচিকে শুচি করিতে, নীচকে উচ্চ করিতে, পাপীকে পুণ্যবান্ করিয়া, আপন সমাজ ও ধর্ম্মের বিশাল ক্রোড়ে স্থান দান করিতে সমর্থ হইবেন?

কোনও পল্লীগ্রামে একটীমাত্র ভাল পুষ্করিণী ছিল, পল্লীস্থ সকল লোকে সেই পুকুরের জল পান করিত। উহা ব্যতীত তাহাদের আর ভাল জল পাইবার উপায় ছিল না। এক সময়ে কতকগুলি দুষ্টলোক ঐ জলাশয়ের তীরে, ঘাটে, পথে, চতুর্দ্দিকে মলত্যাগ করিয়া গ্রামবাসিগণকে বিরক্ত করিতে লাগিল। শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা এই উপদ্রবের শান্তি করিতে না পারিয়া অবশেষে পুলিসে সংবাদ দিল। তৎপরে থানা হইতে একদিন একজন পুলিস আসিয়া যেমনি একটা নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিল, অমনি সেইদিন হইতে সেই দুষ্কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষমতার এমনই গুণ, এমনই প্রভাব।

এখানে আর একটি কাহিনী বলিব। কথাটা নিতান্তই গল্প নহে, খুব সত্য কথা। বারদীর লোকবিশ্রুত সিদ্ধপুরুষকে আপনারা অনেকেই জানেন। একদা তিনি জলপথে কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে তাঁহার জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন আনিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য কহিলেন, "ও প্রভু! সহরের পথে এ জনতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া আনিব—'ছুঁই' লাগিবে যে!" গুরু উত্তর করিলেন, "ক্ষতি নাই।" শিষ্য অন্ন-ব্যঞ্জন আনিবার নিমিত্ত দুই চারি পদ গমন করিলেন, মহাপুরুষ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "দেখ, যে খাদ্য দ্রব্য আনিবে, তাহা আমি খাইতে পারিব, তুমি কিন্তু পারিবে না।" শিষ্য বলিলেন "কেন প্রভু! আপনি পারিবেন, আর আমি পারিব না কেন?" গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'না বৎস, আমি ব্রাহ্মণ—আমি যাহা পারি, তাহা তুমি পারিবে না; তুমি ত এখনও ব্রাহ্মণ হও নাই; যখন পরম-ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হইবে তখন তুমিও পারিবে।"

প্রান্তরে বিচরি যবে   হাতালি * নিরখি সবে
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বলি করি অনুমান;

* হাতাইল।

উঠিলে শেখর শিরে, হেরি সব একাকারে,
তখন জমিতে নাহি থাকে ভেদ জ্ঞান।
যত কাল নরগণ, নাহি করে আরোহণ,
ধর্ম্মের উন্নত শীর্ষ ভূধর উপর ,
তত দিন তার হায়, ভেদ-জ্ঞান থেকে যায়,
বিধর্ম্মী হেরিয়া তার জ্বলে কলেবর।
ধর্ম্মের উন্নত স্তরে, যে জন উঠিতে পারে,
ভেদ-বুদ্ধি তাঁর চিতে কভু নাহি রয়,
হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্ট প্রভৃতি, সতত সমান প্রীতি,
ঈশ-প্রেমে পূর্ণ সদা যাঁহার হৃদয়।

দেবতার যাহা সাজে, মানুষের তাহা সাজে না; সিদ্ধপুরুষের যাহা সহজসাধ্য, সাধারণ লোকে তাহা করিতে সমর্থ হয় না; অধিকারীর যাহা অনায়াসসাধ্য, অনধিকারীর তাহা অসাধ্য। শ্রীচৈতন্যদেব যাহা পারিয়াছেন, আমাদের মত ক্ষুদ্রলোক—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, সে কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে কেন? যিনি নিজে সাত্ত্বিক, শুদ্ধ ও শুচিসম্পন্ন নহেন, তিনি অপর অসাত্ত্বিক অশুদ্ধ ও অশুচিকে সাত্ত্বিক শুদ্ধ ও শুচি করিয়া লইবেন কেমন করিয়া? যিনি আপনি নামরসে ডুবিয়া ভক্তিতে গলিয়া, প্রেমে মাতিয়া 'হরিবোল' বলিয়া প্রেমিক ভক্ত হইতে না পারিয়াছেন, যিনি সাধনা-বলে সিদ্ধির চাপরাশ প্রাপ্ত না হইয়াছেন, অপরে তাঁহার কথা শুনিবে কেন? যিনি আপনি শুচিসম্পন্ন নহেন, তাঁহার পক্ষে অশুচিকে শুচি করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যিনি আপনি কায়মনোপ্রাণে—আচারে-ব্যবহারে হিন্দু নহেন, ভক্ত নহেন, প্রেমিক নহেন, ভগবানের নামে যাঁহার পবিত্র অশ্রু-গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, 'হরি' বলিতে যাহার নয়ন-জল ঝরে না, তিনি অন্যকে পাপী, পাষণ্ড, পতিতকে—বিজাতীয় বিধর্ম্মীকে 'হরি' বলিয়া শুচি-শুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে, অহিন্দুকে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু-সমাজের বিশাল-ক্রোড়ে স্থান দান করিতে প্রয়াস পাইবেন, কি শক্তি প্রভাবে, কাহার বলে—কোন্ সাহসে? তাহার কথা জগৎ শুনিবে কেন? অন্যকে আপন কথা শুনাইয়া আপনার মতাবলম্বী করিতে হইলে শক্তি চাই, সাধনা চাই, সাধনা বলে ভগবানের নিকট হইতে তাঁহার নামের চাপরাশ প্রাপ্ত হওয়া চাই। অন্যথা একজন মানুষের কথা জগতের সহস্র সহস্র লোক উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে কেন? যিনি নিজে শুচি-শুদ্ধ, সাত্ত্বিক-সিদ্ধ—যিনি নিজে 'হরিবোল' বলিয়া পাগল হইতে পারিয়াছেন, এ বিশ্ব উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শুনে, মকরন্দলোভী মধুকরের ন্যায় নিয়ত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। তাই অগ্রে নিজে অধিকারী হওয়া চাই, আগে স্বয়ং শুচি-শুদ্ধ, সাত্ত্বিক-সিদ্ধ হও—আগে নিজে 'হরিবোল' বলিয়া পবিত্র হও—পাগল হও; তবে ত তুমি শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় অন্যকে 'হরি' বলাইতে, অশুচিকে শুচি করিতে, পতিতকে পবিত্র করিতে, অহিন্দুকে হিন্দু করিতে সমর্থ হইবে! অধিকার অর্জ্জন না করিয়া মহাপুরুষের আদর্শে শিশুর ন্যায় অনলে হস্তার্পণ করিয়া বৃথা দহন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ফল কি?

এখানে একটা গল্প মনে পড়িল। এক সিদ্ধপুরুষের বহু শিষ্য ছিল। একদা যোগীবর শিষ্যগণ সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন অন্তে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। পথপ্রান্তে এক মুসলমানভবনে ভোজ হইতেছিল, সশিষ্য সন্ন্যাসী সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যবনান্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। ঘটনাক্রমে পরদিন তাঁহাদের আর আহার্য্য মিলিল না। তৃতীয় দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, খাদ্যাভাবে তাঁহারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তখন মহাপুরুষ এক কর্ম্মকার-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সদ্যদগ্ধ হিঙ্গুল-রক্তিম লৌহপিণ্ড সমূহ পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের ন্যায় অতি দ্রুত ভোজন করিতে লাগিলেন, এবং শিষ্যদিগকেও উহা আহারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের এ অমানুষিক কার্য্য দর্শনে শিষ্যগণ মূকের ন্যায় চাহিয়া থাকিল, কেহই সে জ্বলন্ত লৌহগোলা ভক্ষণে সাহসী হইল না। তখন গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! যবনান্ন গ্রহণে তোমরা আমার পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে, আর এক্ষণ জলন্ত লৌহগোলা ভক্ষণে ভীত হইতেছ কেন?" এই বলিয়াই মহাপুরুষ শিষ্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ফলতঃ স্বয়ং সিদ্ধিলাভ না করিয়া—কৃতী না হইয়া মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণে গুরুকার্য্য সম্পাদনে প্রয়াস পাইলে পদে পদেই এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য্যের আধ্যাত্মিক ভাব ও গূঢ় অর্থ উপলব্ধি না করিয়া স্বকপোলকল্পিত ঘৃণিত ব্যাখ্যা পূর্ব্বক রাস, বস্ত্রহরণ ও কিশোরীভজন প্রভৃতির বিকৃত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের কথাটা স্মরণ করিয়া ক্ষুদ্র একটা পাহাড়—পর্ব্বত—অন্ততঃ দশ-বিশ মণ একটা প্রস্তরপিণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়া দেখিয়াছেন কি? না, সে যে বড় শক্ত কাজ! উহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষেরই কার্য্য! একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে যে, "যার কাজ তারে সাজে, অন্যের নামে ঠেঙ্গা বাজে।" ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে এ কথাটার মূল্য বড় কম নহে।

যবন হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিয়া ঠাকুর হইয়াছিলেন। দুই দশ বার 'হরিবোল!' 'হরিবোল!' বলিয়াই তিনি হিন্দু হইতে—ঠাকুর হইতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। হরিনাম কীর্ত্তন ও শ্রবণে পুণ্য আছে,—হরিনামে আত্মার তৃপ্তি, মনের শান্তি, প্রাণের ভক্তি এবং দেহের পবিত্রতা লাভ হয়; তাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, বালকদিগকে মিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া হরিনাম শুনাইতেন। এ হইতেই হরিনামের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া একটা জনশ্রুতি আছে। সাধনায় সিদ্ধি; সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। নাম-যজ্ঞ মহাযজ্ঞ—নাম-সাধনা মহা সাধনা। নাম যজ্ঞ কখনও নিষ্ফল হয় না; যে যত নাম করিতে পারে, মোক্ষ তাহার তত নিকটবর্ত্তী।

ক্রমশঃ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

সুখান্বেষণে।

(গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, এতক্ষণ যে একটা ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলাম, এখানে সে অন্ধকারটী নাই। অমানিশার অবসানে উষার স্নিগ্ধ জ্যোতির মত কেমন যেন এক অব্যক্ত মধুর আলোকে নয়ন পুলকিত হইল। এইখানে আমার সঙ্গিদ্বয় বলিল,—"বুঝতে পাচ্ছ কি, এই আলো কোথা থেকে আসছে ?"

আমি বলিলাম—"না।"

১ম সঙ্গী। অদূরেই এক রাজার রাজ্য আছে। রাজার আদেশে সে রাজ্যে কোথাও একটু অন্ধকার থাকিতে পারে না। আজ্ঞা-বহের মত সূর্য্য সেখানে নিত্য নূতন কিরণ বিতরণ কচ্ছে। সেই দীপ্তিমান্ দেশের প্রভায় এ স্থানটী এত প্রভান্বিত। তুমি সে রাজ্যে যাবে ?

আমি। হাঁ যাব।

সঙ্গিদ্বয় এবার একটী নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল। যতই পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আলোর স্পষ্টতা বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে আমরা পূর্ব্বকথিত রাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, আহা ! কি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় সেই দ্বার! তাহার উপর স্তরে স্তরে কেমন যে এক শুভ্র বিমল জ্যোতি মধুর হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া দিক্‌দিগন্তে ছুটিতেছিল, তাহা আমি এ লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি না।

হা বিধাতা ! কেন সেদিন সেই স্বপনের আবরণে ঐ ত্রিদিব প্রতিমাখানি আমাকে দেখাইলে ? আর কি আমি এ জীবনে তাহা দেখিতে পাইব না ?

তারপর আমি বিস্ময়পূর্ণ-হৃদয়ে সেই তোরণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একজন রক্তবস্ত্র পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর, তবে এ দ্বার উন্মুক্ত হইবে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমার দুই পাশে দুইটী অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল. আর দেখিলাম, একি ! সেই দুইটী অগ্নিকুণ্ডে সহসা আমার সেই দুইটী সঙ্গী তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিল। যুগপৎ অনলরাশি দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নির আলোকে এবার আমার সঙ্গিদ্বয়কে চিনিতে পারিলাম— ওহো ! এরা যে নির্ম্মলা ও ভোলাদাদা !

আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসী যেন দেব-বিনিন্দিত-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং।
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং॥
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং।
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াত।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং॥
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলং।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং॥
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

সন্ন্যাসীর মুখনিঃসৃত কবিতাটী শুনিতে শুনিতে সহসা মনে হইল যেন সে কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত। সেই সময়ে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম—সত্য সত্যই আমার দুই পার্শ্বে দুইটী অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আর সেই অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই সন্ন্যাসী সেই ভাবে সেই স্বরে পাঠ করিতেছেন

যাবজ্জননং তাবন্মরণং।
তাবজ্জননী জঠরে শয়নং॥
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥"

আমার মনে হইল, বুঝি তখনও আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চক্ষুদ্বয় বার বার মুছিলাম, কিন্তু তাহাতেও সেই কুণ্ডলাকার অগ্নিরাশি বা সেই উন্নতশীর্ষ তান-মগ্ন সন্ন্যাসী আমার নয়ন-পথ হইতে কিছুতেই সরিয়া গেল না। শুনিলাম—সন্ন্যাসী তখনও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,

"সুরবর মন্দির তরুতলবাসঃ।
শয্যা ভূতল মজিনং বাসঃ॥
সর্ব্বপরিগ্রহ ভোগত্যাগ।
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥"

সহসা সন্ন্যাসী থামিয়া যাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কেমন যেন এক অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি বাহির হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"নয়নানন্দ, চিন্তে পাচ্ছ আমি কে?"

সন্ন্যাসীর এই গম্ভীর প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানি না, কোন্ গুপ্ততারে যে আঘাত করিল;—নিমেষের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ বেদনাময় স্মৃতির বাজনা বাজিয়া উঠিয়া আমার দেহের ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তবিন্দু ছুটাইতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! এ যে সেই সন্ন্যাসী! যাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে অকারণে এক পৈশাচিক লালসার তৃপ্তির জন্য আমি একদিন হত্যা করেছি। এ সন্ন্যাসী আবার এখানে কেন? নিশ্চয়ই প্রতিহিংসা সাধনের জন্য! উপায় কি? কে আছে, কে আমায় বাঁচাবে? নির্ম্মলা কোথা? ভোলাদাদা কোথা?

চারিপাশে চাহিয়া দেখিলাম—নির্ম্মলাকেও দেখিতে পাইলাম না, আর ভোলাদাদাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন তাহাদিগের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম—এই বিশাল জনহীন প্রান্তরে তবে ত আর আমায় রক্ষা করিবার কেহ নাই।

বেদনা দ্বিগুণ হইল। আমি তখন নিরুপায় হইয়া সন্ন্যাসীকে আবেগ-কম্পিত-হৃদয়ে বলিয়া উঠিলাম—"সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! আমি তোমায় চিন্তে পেরেছি। তুমি সেই ব্রাহ্মণ। আর আমার বাঁচবার সাধ নেই। দাও, আমায় মৃত্যু ভিক্ষা দাও। আমার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত কর। এ জগতে আর আমার কেহ নাই। এই বলিয়া আমি সন্ন্যাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম।

উঠ বৎস! এ জগতে তোমার এখনও আমি আছি। এই বলিয়া সন্ন্যাসী আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসীর প্রতি আমার যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"নয়নানন্দ! শোন, তবে আজ তোমাকে আমি সমস্ত কথা বলি। যে দিন তুমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে বিনাশ করলে, সেইদিন আমি যোগদৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেলুম যে, তুমি সুখের লালসায় উন্মাদের মত জীবনের উষাকাল হইতে এক মিথ্যা তামসিক সুখের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছ। তাই সেইদিন আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে, ভগবৎ কৃপায় একদিন না একদিন তোমাকে আমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করে, মানব-জীবনের প্রকৃত সুখের অনন্ত ভাণ্ডার দেখিয়ে দেব। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষ্যে ছায়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু বৎস! এতদিন সে শুভযোগ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয় নাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে অনুকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আজ তাহা উপস্থিত।"

তারপর সন্ন্যাসী আমার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর তাঁহার বাম হস্তটী রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"নয়নানন্দ! ঐ যে সম্মুখে কলনাদিনী তরঙ্গিনী দেখতে পাচ্ছ, ওর নাম কি জান? ওর নাম জাহ্নবী। দেখ বৎস! এই পতিতপাবনী জাহ্নবীর পবিত্র সৈকতে কেমন এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে।"

কিন্তু কই? আমি ত মহাযজ্ঞ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি বার বার চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম শুধু সেই দুই অগ্নিকুণ্ড। আর এ কি! সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ভোলা ও নির্ম্মলার মৃতদেহ। আমি দারুণ যন্ত্রণায় বলিলাম,—"সন্ন্যাসী! এ যে দেখছি—চিতানল। আর এ চিতানলে যে আমার জীবনের শেষ আশা ও ভরসা, সহায় ও সম্বল, স্বস্তি ও শান্তি ভস্মীভূত হচ্ছে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"না বৎস। এ চিতানল নয়, এ হোমানল। এই পবিত্র হোমানলের হবি পতিব্রতা নির্ম্মলা ও প্রভুভক্ত ভোলা; হোত্রী আমি আর ফলকামী তুমি। যাও বৎস! আর বিলম্ব করো না। জাহ্নবীর ঐ পূতসলিলে স্নান করে এস। এখনই আমি তোমায় সেই চরম সাত্ত্বিক সুখের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করব।"

সন্ন্যাসীর এই আদেশবাণী সজোরে আমার হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিল। আমি তৎক্ষণাৎ জাহ্নবীর শীতল জলে অবগাহন করিয়া সিক্তবস্ত্রে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন তিনি আমার নয়নদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া অস্পষ্টভাবে যেন কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ আমার দেহের সমস্ত জ্বালা যেন জুড়াইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে চক্ষুর উপর হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন—

"বৎস! একবার ঐ অনলরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর।" আমি চাহিয়া দেখিলাম—সেই চিতা নির্ব্বাপিতপ্রায়, এবং তাহা হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। সেই ধূমরাশির মধ্যভাগে ভোলা ও নির্ম্মলা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আর তাহাদের মাঝখানে এক রক্তপতাকা দোদুল্যমান রহিয়াছে এবং সেই রক্তপতাকার উপর জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—ত্যাগ।

এ অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া আমার মন আবার বিচঞ্চল হইয়া উঠিল; ভাবিলাম,—'এ কি! কি দেখ্‌ছি? স্বপ্ন! না প্রহেলিকা! তবে কি এ সন্ন্যাসী ঐন্দ্রজালিক? এ কি তার ইন্দ্রজাল? না—না—তা ত' নয়। ও মূর্ত্তি যে ভোলা ও নির্ম্মলার জীবন্ত মূর্ত্তি। হায়! হায়! ও কি আমার ভুলিবার! ও যে আমার চির-পরিচিত! তবে, হয় ওরাও মরেনি—বেঁচে আছে, আর নয় আমিও মরেছি—বেঁচে নেই। ওই! ওরা যে ক্রমশঃ ওপরে উঠ্‌ছে! আমি যাই হই, আর ওরা যাই হোক, আমি ওদের সঙ্গে যাব।' এই ভাবিয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিব বলিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমত সময় সন্ন্যাসী আমার দক্ষিণ হস্তটী ধরিয়া বলিলেন,—'বৎস! মনকে আর বিক্ষিপ্ত ক'রো না। ওই যে লেখা আজ তোমার সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওই সেই মহান নবীন-মন্ত্র। যেদিন তুমি ঐ ভোলা ও নির্ম্মলার মত ঐ মহামন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে পার্ব্বে সেই দিন—বৎস! সেই দিন—তুমিও ওদের মত সমস্ত অবরোধ ভেঙ্গে ফেলে সেই অনন্ত-আনন্দধাম স্বর্গলোকে যেতে পারবে আর সেই চির-মিলনের ভূমিতে সকলের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অতুল-আনন্দ উপভোগ কর্ব্বে। সে এক পুণ্যময় মুহূর্ত্ত—বৎস! সে মুহূর্ত্ত এখনও তোমার আসে নি। যাও, নয়নানন্দ! এখন তারই জন্য প্রস্তুত হও। এ নূতন উষার আলোকে, নূতন জীবন ল'য়ে, নূতন শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে, ঐ নূতন মন্ত্রের সাধনায় আবার জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এবার পল্লীতে-পল্লীতে, নগরে-নগরে, কান্তারে-কান্তারে, রোগ-শোক-জরাগ্রস্ত মৃত্যু-ক্লেশ-প্রপীড়িত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জর্জ্জরিত দীনহীন নর-নারীর সেবায় মনোপ্রাণ নিয়োজিত কর। সুখান্বেষী-যুবক! শোন—ভাল ক'রে শোন—সুখ ও স্বর্গ ভোগে নয়—ত্যাগে।

"নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।"

সন্ন্যাসীর ঐ শেষ কথাগুলি যামিনীর শেষ যামে মেঘ-মন্দ্রের মত ধ্বনিত হইয়া সেই শব্দ-হীন, জনহীন প্রান্তরের বক্ষে যেন ভীম-রবে প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—

"নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং॥"

ঠিক সেই সময় মনে হইল যেন নির্ম্মলার সেই নির্ব্বাক্‌ ছায়া মূর্ত্তিও মৃদু ওষ্ঠ-সঞ্চালনে বলিতেছে,—'নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।'

আমি কি যেন কেমন হইয়া গেলাম বলিতে পারি না। একবার পার্শে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন স্থির নয়নে সেই ছায়ামূর্ত্তি দুইটীর দিকে চাহিলাম। তখন যেন অনেক দূর উঠিয়া

গিয়াছিল। ক্রমশঃ আরও উঠিল—আরও উঠিল—আরও উঠিল—কত দূর উঠিল বলিতে পারি না। শেষে মনে হইল যেন সেই দিগন্ত-প্রসারী চির-শ্যামল স্বচ্ছোজ্জ্বল নভোমণ্ডলের এক স্থানে যাইয়া পৌঁছিল। সে স্থানের নক্ষত্রগুলি, উষার উজ্জ্বল আলোকে হীনপ্রভা হইয়া গিয়াছিল। তাহারাও তাহাদেরই মাঝে—চিরতরে আমার নয়ন-পথ ছাড়িয়া অনন্তের কোন অজানিত পথে চলিয়া গেল।

তারপর কতক্ষণ যে আমি পলকহীন নেত্রে সেই শূন্য পথপানে চাহিয়া রহিলাম তাহা বলিতে পারি না। মনের মধ্যে যুগপৎ বহুবিধ বিরুদ্ধ ভাব উদিত হইয়া পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া তুলিল। সে বিবাদের মাঝে পড়িয়া আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিলাম!

ক্রমে সেই পূর্ণিমা-রজনীর অবসানে অলস অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল—ক্রমে প্রভাত-সমীরণ আবার নব-উদ্দীপনা লইয়া—সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বহিয়া যাইতে লাগিল—ক্রমে বিহগকুল আবার আনন্দ-সঙ্গীত গাহিয়া কর্ম্ম-জগতে আনন্দের ধারা ঢালিতে লাগিল—ক্রমে কর্ম্মশীল বিশ্ববাসী আবার সকলে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি দুঃস্বপ্নগ্রস্ত অর্দ্ধ-সুপ্ত ব্যক্তির মত অবসন্ন প্রাণের ভাবময় অবসাদকে কতকাংশে ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার আমিও যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে বিশ্বময় কর্ম্মের সারা পড়িয়া গেল। হায়! অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া আবার আমিও নূতন কর্ম্মের পথে ছুটিয়া চলিলাম!

ওগো! সেই বুঝি আমার প্রকৃত জাগরণের দিন!!

সে ত আজ কত দিনের ঘটনা। তারপর এক এক করিয়া কত দিন, কত রাত্রি, কত মাস, কত বর্ষ, কত গ্রীষ্ম,কত বসন্ত কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মহাকালে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি—সেই আমি—একাকী ঘূর্ণীবায়ুর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া একমনে শুধু আপনার কর্ম্ম-পথ ধরিয়া আসিয়াছি। সম্মুখেও লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু হায়! আজ যে তা আর পারি না! এ যে আমার জীবনের সন্ধ্যাকাল! দেখিতে পাইতেছি অদূরেই ঐ সন্ধ্যার অন্তরালে এক বিরাট গভীর রাত্রি মুখ-ব্যাদান করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভয়ে পিছনে অতীত পথে চাহিয়া দেখি কিন্তু ওগো! কই! এই ধূলায় অন্ধ পথশ্রান্ত পথিককে এ মহা নিশার তিমিরময় পথ দেখাইবরে জন্য সেথানেও যে তেমন আলোক নাই! ওগো! সেখানেও যে এক ঘন কাল ছায়া সমস্ত পথটীকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে! তবে কি—তবে কি আমি এ মহানিশার পরপারে যাইতে পারিব না? না—না, নির্ম্মলা যে যাইবার সময় আমায় আশ্বাস দিয়া গিয়াছে—সন্ন্যাসীও যে যাইবার সময় আমায় আশ্বাস দিয়া গিয়াছে। হায়! সন্ন্যাসি! আমার শক্তিদাতা! আমার জীবন-দাতা! তবে এখন কোথায় তুমি? একবার সে দিনের মত আমার নিকটে দাঁড়াও—একবার তুমি আশ্বাস দিয়া আমার সন্দেহ-দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করে তোল—ওগো! একবার তুমি জলদগম্ভীর স্বরে বল—কবে আমার এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন হইবে, কবে আমার এ মহানিশার পর মহা জাগরণের দিন আসিবে, কবে আমার সেই নরহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন শেষ হইবে, কবে আমার সেই আনন্দ-ধামে যাইবার শুভ অবসর ঘটিয়া উঠিবে?

"ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।"

আমরা ঐ উপরোক্ত কাহিনীটী পাঠ শেষ করিয়া কেমন যেন বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলাম। অবশেষে রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া স্বস্থানে ফিরিলাম। কেহ কোন কথা বলিল না। কেবলমাত্র "দার্শনিক" বন্ধুটী পথে আসিতে আসিতে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিল,—"Truths are stranger than fiction."

[সমাপ্ত]

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম, এ; বি, এল।

বাণী-বন্দনা।

(১)

পুলকে নৃত্য করিছে তটিনী,
কুসুমোৎসবে হাসিছে ধরণী,
সাধনকুঞ্জে এস গো জননী,
শ্বেত-শতদলবাসিনি।

(২)

পুষ্পিত-পিক-গুঞ্জিত-বনে,
এস গো জননী ধীরচরণে,
আঁধারকুঞ্জ আলোকি' বরণে,
এস মা শ্বেতবরণী।

(৩)

তোমার মধুর-মঞ্জু-রাগিনী,
আবার শ্রবণে পশুক জননী,
শ্বেত-শতদলে এস বীণাপাণি,
মঞ্জুল-বীণা-বাদিনি।

(৪)

সুর-সাহানায় ভুলোকে-দ্যুলোকে,
মাতায়ে এস মা বিপুল পুলকে,
বিরাজ মানস-কল্পনালোকে,
লয়ে সঙ্গীত-কাহিনী।

(৫)

বিদ্যাদাত্রী জননী এস মা,
প্রকাশি' তোমার অতুল মহিমা,
মুছে দাও যত কলুষ-কালিমা,
এস মন্দিরে জননী।

(৬)

এস মা শ্বেত-সরোজ আসনে,
গীতি-মুখরিত কুঞ্জ-ভবনে,
শত-ভক্তের পূত আরাধনে,
এস মা বিদ্যাদায়িনি।

(৭)

এস কোকিলের মধু-ময় গীতে,
শিশির-সিক্ত-কুসুম-রাশিতে,
এস অজ্ঞান-তিমির নাশিতে,
অখিল-জ্ঞানের-রাণী।

(৮)

এস মা সুরভি-স্নিগ্ধ-বাতাসে,
শ্যাম-হসিত-নীল-আকাশে,
নবীনানন্দে প্লাবিয়া' বিশ্বে,
এস চম্পক-বরণী।

(৯)

আজি মা তোমার চরণ পরশে,
সারাটি বঙ্গ হাসুক হরষে,
বিতরি' শান্তি ভক্ত-মানসে,
এস মা নিখিল-রাণী।

(১০)

লেপি' দাও ভালে স্নেহ-চন্দন,
হউক ধন্য মোদের জীবন,
হৃদয়ে জাগুক নব-স্পন্দন,
তোমার আশীষে জননী।

(১১)

সাধনা মোদের সার্থক কর,
কর্ম্মের পথে বর্ত্তিকা ধর,
সংসার পথে, শিরে আমাদের,
ছড়াও আশীষ বাণী।

(১২)

এস অজ্ঞান-তমোহারিণি,
এস হৃদি-শতদলবাসিনি,
এস বীণাপাণি বিদ্যাদায়িনি,
এস মা বঙ্গবাণী।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বে সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যক। সভ্যতা বলিতে সাধারণতঃ আমরা ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সু-অবস্থা, বৈষয়িক সম্পত্তি, সুশিক্ষা, সচ্চরিত্র, স্বদেশহিতৈষণা, পরোপকার,—এক কথায় মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অবস্থাকেই বুঝি। মনুষ্যত্বের বিকশিত অবস্থাই সভ্যতা;—আদিম অজ্ঞ অসভ্য মানুষ আপনাকে ক্রমশঃ বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, ক্রমশঃ আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত মহৎভাব সকল জাগরিত করিয়া আপনার যথার্থ সভ্য অবস্থাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে—তাহার সঙ্গে আনুসঙ্গিক ভাব অন্যান্য পার্থিব বিষয়েরও উন্নতি করিতেছে। মানুষ আজ পর্য্যন্ত জগতে যাহা-কিছু অভিনব বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকর দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়াছে বা এখনও করিতেছে, সেই সমস্তই মানুষের নিজ স্বরূপকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতে উদ্ভুত। জগতের ধারণা এই যে, মানবজাতি এই বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে মাত্র; সুতরাং, মানব-সভ্যতার চরম অবস্থা কি,, তাহা আমরা এখনও সুস্পষ্টরূপে ধারণায় আনিতে পারি না —সুদুর ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পৃথিবীকে কেবল ত্রিকালদর্শী ঋষিরাই মানসচক্ষে দেখিতে পারেন। আমাদের মত সাধারণ লোকের ভবিষ্যতে মানব-সভ্যতা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ভাবা বিড়ম্বনামাত্র। কাজেই, বিংশ-শতাব্দীর বর্ত্তমান অবস্থার মাপ-কাঠিতেই আমাদের মানব-সভ্যতার আলোচনা করিতে হইবে।

এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা কিরূপভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে দেখিতে পাই যে, মানব-সভ্যতা বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা সহসা প্রাপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান মানব-সভ্যতা বহুযুগের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া জলধিতলে প্রবালদ্বীপের মত একটু একটু করিয়া সভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। মানবসভ্যতার পশ্চাতে এক অতীব কৌতুকাবহ স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। সেই আশ্চর্য্য ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে

মানবের অটুট ধৈর্য্যের—মানব-সভ্যতার মহা সিন্ধুর ন্যায় ধৈর্য্যের—জলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সেই মানব-সভ্যতা সাগরাভিমুখী কল্লোলিনীর ন্যায় নানা ভাবে, নানা ছন্দে, কখনও বা উপলাহত হইয়া সবেগে, আবার কখনও বা অবাধ গতিতে ললিত ভঙ্গিমায় মৃদু মৃদু কল্লোলে চলিয়াছে—সেই বেগবতী নদী কখনও বা গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে পতিত হইয়া মৃতবৎ স্থির ধীর হইয়া পড়িয়াছে—আবার পরেই দ্বিগুণতেজে কুল প্লাবিত করিয়া মহাবেগে ছুটিয়াছে! এই মানব-সভ্যতা কোন্ স্মরণাতীত যুগ হইতে ছুটিয়াছে এবং কোথায় গিয়া থামিবে, অথবা ইহার কখনও বিরাম হইবে কি না তাহা একমাত্র ভবিতব্যতাই জানেন। মানুষ, মানব-সভ্যতার এই সুগভীর রহস্যপূর্ণ ইতিহাস পড়িতে আসিয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানুষ, সুপ্রাচীন মানব-সভ্যতার সুগভীরতা দেখিয়া পাষাণবৎ মূক হইয়া পড়ে। মানব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর ইতিহাস—অদ্ভুত! কিরূপভাবে এই সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশের পথে চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের কোনও ধারাবাহিক বিবরণী দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তথাপি এই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস এরূপ কৌতুকাবহ ও ঘটনাবহুল যে, দুই-এক কথায় তাহার বিবরণ দেওয়া কঠিন।

অধুনালুপ্ত জন্তুবিদ্যা ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবিদ্যাবিশারদগণের মতে মানব-সভ্যতার বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগের অল্প পরে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক্, মানুষ কিরূপে শিশুর ন্যায় ক্রমশঃ আপনাকে বিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং সেই স্থির-ধীর চেষ্টার ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমানকালে কেমনই বা দাঁড়াইয়াছে।

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আমাদিগকে বিংশ-শতাব্দীর উন্নত যুগ হইতে সেই আদিম-যুগে যাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, বিংশশতাব্দীর সভ্যতার মাপ-কাটি সঙ্গে লইয়াই আমরা আদিম জগতে যাইতেছি। কিন্তু আমরা যেন না ভুলি যে, আমরাই এককালে আদিম যুগের মানুষ ছিলাম। এই ধারণা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইলে বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ বলিয়া আমাদের গর্ব্ব মাথা তুলিতে পারিবে না। আদিম যুগে উপনীত হইয়া প্রথমেই আমাদের সেই সময়ের বর্ব্বরতা চক্ষে পড়ে; আমরা আদিম মানুষ ও অরণ্যের জন্তুর মধ্যে কোনও বিশিষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাই না; সেই মানুষকে আপনার খাদ্যের জন্য কোন প্রকারও পশুবৎ আচরণ করিতে বিরত দেখি না; সেই মানুষ গৃহহীন, উলঙ্গ, কদর্য্য; মোট কথা, সেই মানুষে ও পশুতে খুব অল্প বিভিন্নতাই দেখিতে পাই।

সেই আদিম যুগ হইতে পরবর্ত্তী প্রস্তরযুগে উপনীত হইয়া, সেই অসভ্য মানুষের উন্নতি লক্ষ্য করিলাম। সেই মানুষ এক্ষণে প্রস্তরের নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, যদিও সেই সমস্ত জিনিস দেখিয়া আধুনিক

উন্নত যুগের লোক নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। তারপর সেই মানুষকে উন্নত প্রস্তরযুগে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের প্রস্তর দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখিলাম। এই পর্য্যন্ত আসিয়াই একবার ভাবিয়া লইলে দেখিতে পাইব, সেই আদিম মানুষে ও প্রস্তর যুগের মানুষে অনেক পার্থক্য; এ যুগের লোক অনেকটা পশুভাব ত্যাগ করিয়াছে। আরও দেখিবার বিষয় এই যে, মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তি কিরূপভাবে ক্রমশঃ জাগরিত হইয়া উঠিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ বিকাশের পথে লইয়া চলিয়াছে।

প্রস্তরযুগ হইতে দ্বাপর বা তাম্রযুগ এবং তারপর লৌহ যুগে উপস্থিত হইয়া আদিম মানুষের আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিতে পাইলাম। এই দুই যুগে মানুষ নিজবুদ্ধি-বৃত্তি-প্রভাবে নানাবিধ ধাতব দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এই দুই যুগের মানুষ আপনার কাজের জন্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা লাভ করিয়াছে। এই দুই যুগেই প্রকৃতপক্ষে, বর্ত্তমান বৈষয়িক বৈজ্ঞানিক যুগের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এক্ষণে মানব-সমাজ ক্রমশঃ বিকাশের পথে চলিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির ন্যায় সামাজিক উন্নতিরও আরম্ভ হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত আমরা যতদূর আসিয়াছি, তাহার কোনও প্রকৃত ইতিহাস নাই। আনুমানিক একশত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই যুগগুলি বর্ত্তমান ছিল। তাহার পর হইতে একপ্রকার ঐতিহাসিক বিবরণী পাওয়া যায়।

তারপর আমরা যতই বিংশশতাব্দীর দিকে ফিরিয়া আসি, ততই মানব-সভ্যতার অভিনব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। ক্রমশঃ আমরা বৃহৎ মস্তকের মানুষকে অভিনব উপায়ে নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে দেখি; তারপর দেখি সেই মানুষ অনেক পরিমাণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতধরণের চিত্রবিদ্যা ও সাহিত্য জন্মলাভ করিয়া মানুষের মধ্যে নবচেতনার সৃষ্টি করিয়াছে; আরও দেখিতে পাই, রাজশাসন অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলতা-যুক্ত ও উচ্চধরণের হইয়াছে। এতদূর আসিয়া এইরূপে আমরা মানব-সভ্যতার সর্ব্বমুখীন্ বিকাশের চেষ্টা লক্ষ্য করি। এই সময়ে যেন আমরা মানব-সভ্যতার চেতনার পরিচয় পাই।

সেই আদিম মানুষের সহিত এই ইতিহাসের প্রারম্ভিক যুগের তুলনা করিলে, মানুষ কিরূপভাবে উন্নতির পথে চলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। এই মানুষ, সেই আদিম মানুষের ন্যায় মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম নহে; এক্ষণে সে বাকশক্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া কথা কহিতে শিখিয়াছে এবং সাহিত্য ও কলাবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই মানুষ অগ্নির ব্যবহার, তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ, নানাবিধ পাত্র ও শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত, লৌহকে নিজ কাজে ব্যবহার এবং ক্রমশঃ লিখন ও লিপির আবিষ্কার ও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আদিম মানুষের ন্যায় এই মানুষ নিজ উদরপূর্ত্তি করিয়াই কালক্ষেপ করে না, এক্ষণে সে নানাবিধ গৃহপালিত

জন্তুরও ভরণপোষণ করে।

ঐতিহাসিকের মতে অধিকাংশ উন্নত জাতিই খৃষ্টীয় ছয় হাজার বৎসরের কমে লিখন-প্রণালী সম্পাদন করিতে পারে নাই। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সভ্যতা অনেকদূর অগ্রসর না হইলে, মানুষ তারপূর্ব্বে লিখন-প্রণালী জানিতে ও ব্যবহার করিতে পারে না। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি যে, মধ্যযুগের পূর্ব্বে মানব-সভ্যতা অপেক্ষাকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

তারপর মধ্যযুগের মানুষকে নানাবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা করিতে দেখি। সেই সমস্তের মধ্যে (১) জ্যোতিষিক আবিষ্কার যে, আমাদের গ্রহজগতের কেন্দ্র সূর্য্য—পৃথিবী নহে, (২) বারুদ, (৩) দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র, (৪) কাগজ ও ছাপিবার কাগজ, ও (৫) বাষ্প-যন্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারপর দেখিতে পাই মানব-সভ্যতা নানাভাবে বিকাশের দিকে ছুটিয়াছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে ও মানব-সভ্যতা যুগে যুগে নবভাবে প্রস্ফুটিত হইতেছে।

আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব যে সুপ্রাচীন মানবসভ্যতার অবস্থা এই বিংশ-শতাব্দীতে কিরূপ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ভাল-মন্দ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদিগকে সভ্যতার প্রকৃত নিদর্শন কি তাহা বুঝিতে হইবে। কারণ, কোনও জিনিসের পরীক্ষা করিতে হইলে,তাহার কি দিয়াপরীক্ষা করিব—তাহা জানা আবশ্যক।

সভ্যতার প্রকৃত নিদর্শন কি, ভাবিলে প্রথমেই আমাদের চরিত্রবলের কথা মনে হয়; বাস্তবিকই, জাতির চরিত্রবলই সকল জাতির সভ্যতার মাপ-কাটি। মানব-চরিত্রই মানব-সভ্যতার কষ্টিপাথর। কোনও দেশ সভ্য কি অসভ্য, তাহা সেই দেশবাসিগণের ব্যবহার হইতে বুঝিতে পারা যায়। কোন্ সভ্যতা কত খাঁটি তাহা দেখিতে হইলে, সভ্যতার ব্যবহার জাঁকজমকে বাঁধিয়া গেলে চলিবে না, আমাদিগকে দেশবাসীর চরিত্রের প্রতি, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আরও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সভ্যদেশের লোক স্বদেশপ্রেমিক, সাহসী, সরল ও তাহারা পরহিতার্থে সদাসর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিতে পারে; সভ্য মানুষের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রেম বিরাজ করে;—যে, মানব-সভ্যতা, মানবেরই বিকাশ; যে, মানব-সভ্যতা বলিতে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা উঠিলেও, প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশকেই বুঝায়।

আজকাল আমরা জাতীয়তা, জাতিগত-সংস্কারবর্জ্জিত সার্ব্বভৌমিকত্ব বা বিশ্বজনীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চভাব অধিকাংশ মানব-জাতির মধ্যেই লক্ষ্য করি। মানব, বহুশতাব্দীর দ্বন্দ্ব-কোলাহল, হীনতা, ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া উঠিতে চাহিতেছে। অধ্যাত্মরাজ্যে সমস্ত জীবেরই যে স্থান আছে—সকলের অন্তরে অন্তরে যে নিগূঢ় মিলন-সূত্র আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ পৃথিবীতে বিশ্বপ্রেম বিলাইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনার নৈতিক

বিকাশের দিকেও মনোযোগ দিয়াছে। এক কথায়, এই জ্ঞান-গরিমায় বিংশশতাব্দীর মানুষ আপনার অবস্থাহৃদয়ঙ্গম করিয়া, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই বিংশ-শতাব্দীর মানুষ, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়া এখন অতি বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইয়াছে। নিজ বুদ্ধি-বৃত্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।

এই বিংশশতাব্দীতে প্রবল রজোগুণশালী পাশ্চাত্য জগতের নেতারূপে যেন কি এক অপূর্ব্ব শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মহোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আত্মা বহির্মুখী। স্থূল জগতের তুচ্ছ জিনিস লইয়াই ইহার আদর্শ গঠিত। ইহার মূল, অর্থ; ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই ইহার চরম লক্ষ্য। এই জন্যই ইয়ুরোপে দ্বন্দ্ব-কোলাহল, জীবন-যুদ্ধের এতপ্রভাব এবং শিল্প-বাণিজ্য, কলকারখানার এত আধিপত্য। যাহাই হউক পাশ্চাত্যের এই প্রবল কর্ম্মের ফলে পার্থিব বহু বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে। শ্রমী ও আত্মত্যাগী মানুষ জগদ্‌বরেণ্য হইয়াছে। শ্রমের আদর বাড়িয়াছে।

ঐহিক উন্নতিকামী পাশ্চাত্যের মতে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেইখানে, যেখানে মানুষের চেষ্টায় ব্যক্তিগত সুখের পরাকাষ্ঠা—সেই জন্যই বড় বড় আবিষ্কার বা উদ্ভাবনগুলি তাঁহাদের মতে মানুষের জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্যই ব্যক্তিগত কর্ম্মী সর্ব্বত্রই মানব সভ্যতার হিতসাধক ধুরন্ধর। পাশ্চাত্য মতে উন্নতি বলিতে সাধারণের কর্ম্মকুশলতা বুঝায়। জড়বাদী ইয়ুরোপ চায়—পারত্রিক সফলতা। পাশ্চাত্যের এই অদম্য কর্ম্মের ফলে, জগতে বাস্তবিকই অদ্ভুত সৃষ্টি হইয়াছে,—মানুষ যাহা কখনও সম্ভব বলিয়া ভাবে নাই, তাহাই পাশ্চাত্য ধুরন্ধরগণ ঘটাইয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিতেছে। সেই আদিম যুগের অসহায়-মানুষ যদি আজ আসিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী দর্শন করে, তবে সে বুঝিতে পারিবে না যে, সে জাগরিত অবস্থায় আছে, না কোনও স্বপ্ন-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে—তাহার চক্ষে এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী এবং অত্যদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক মায়ারাজ্য বলিয়া মনে হইবে; সে যেরূপ সুখ কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারিত না, আধুনিক যুগের মানুষকে সেই সুখ ভোগ করিতে দেখিয়া তাহার মনে হইবে, সে পৃথিবীর পথ ভুলিয়া নন্দনকাননে উপস্থিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল প্রখর তেজরশ্মিতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে!

আধুনিক সভ্যজগতের মূলমন্ত্রের মধ্যে কয়েকটী কথা উল্লেখযোগ্য, যথা, (১) বিচক্ষণতার সহিত উত্তরাধিকারী হইবার নিয়ম প্রয়োগ করিয়া জাতির শৃঙ্খলা-বিধানরূপ মঙ্গল করণ, (২) জাতিগত হিংসা ও সামরিক ব্যাপারে সম্প্রদায়গত ক্ষতি অল্পকরণ, এবং (৩) শিল্প ও আর্থিক উন্নতির জন্য চিরন্তন আন্দোলন ও এই উপায়ে পৃথিবীকে একত্র করা।

স্বীকার করি, বিংশ শতাব্দী সুখ-সাচ্ছন্দ্য,

ধনে, বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় মানবের গৌরবের বিষয় হইয়াছে এবং জগতে বিশ্বপ্রেম, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি সুমহান্ ভাবরাজি প্রচার করিয়া মানব-জাতিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যদি বলিতে হয়, বিংশ-শতাব্দীতে মানব-সভ্যতা কিরূপ বিকশিত হইয়াছে---সভ্যতার পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে,—তবে বলিব,যুগযুগান্তরে এই উত্থান-পতনশীল স্রোতস্বিনী মানব-সভ্যতা বৈজ্ঞানিক বিংশ-শতাব্দীতে এক কঠিন পরীক্ষা-গহ্বরে পড়িয়াছে ;—শতাব্দীর পর শতাব্দীর বৈষয়িক উন্নতির চরমোৎকর্ষ বোধ হয়, এই বিংশ শতাব্দীতে সাধিত হইতে চলিয়াছে,—অন্ততঃ, এ কথা বেশ জোরের সহিত বলা যায় যে, বৈষয়িক বা পারত্রিক উন্নতির জন্য বসুমতীকে আর বহু যুগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ; এবং বিংশ শতাব্দী এই বিষয়ে গৌরব করিতে পারে যে, পৃথিবীতে সে ঐরূপ উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহা বিরাট মানব-সভ্যতার এক অংশ মাত্র এবং অতি অল্প মাত্র ; সভ্যতার যে চরম ফল—যে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা, তাহার জন্য মানুষকে এখনও কোটি কোটি জন্ম ধারিয়া তপস্যা করিতে হইবে এবং সেই দিনই মানব, সভ্যতার—যথার্থ সভ্যতার—সেই চরম অবস্থায় উপনীত হইবে ; সে দিন মানব আর মরজগতের আশাহত, শোকাকুল মানুষ থাকিবে না—যে দিন মানুষ উচ্চতর কোনও দেবলোকের প্রাণী হইবে। অপূর্ব্ব জ্যোতিরালোকিত সেই মহামহিম দিন কখনও আসিবে কি ! কিন্তু সেদিন আমরা তো আর জয়-পরাজয়ের, উন্নতি-অবনতির, সুখ-দুঃখের মানুষ থাকিব না ! তবে কে আমাদের এই অনন্ত কালের চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমাদ্রির সুগভীর ধৈর্য্যের, মহাসিন্ধুর গুরুগম্ভীর অশ্বাসবাণীর, অনন্ত নীলাকাশের প্রশান্ত আশার, ঝঞ্চা-বাত-বিক্ষুব্ধ বিপুল মানব-সভ্যতা-কল্লোলিনীর সেই দিনের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত সুবিশাল জলধি-কেন্দ্রে বিশ্রাম লাভের মহা গান গাহিবে ! *

শ্রীনীহার রায়।

সাধক কমলাকান্ত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনা একখানি বহুজনাকীর্ণ সুন্দর গ্রাম। উহাকে নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পতিত-পাবনী সুরধনীর পশ্চিমতীরে কালনা অবস্থিত। এখানকার বাজার, বন্দর, দেবালয়, বর্দ্ধমানের সমাজবাটী প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। অম্বিকা-কালনা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান হইলেও এই অম্বিকা-কালনায় কোন রাঢ়ি-শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে শক্তিসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্ম হয়। ঐ অম্বিকা-কালনা তাঁহার আদি বাসস্থান। ১২১৬ বঙ্গাব্দে ঐ জেলার অন্তর্গত কোটালহাট গ্রামে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ইহাকে একখানি বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া

---

* ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, গৌহাটী 'ছাত্রসম্মিলনীর' সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

Encyclopædia Britanica হইতে সাহায্য গৃহীত।

—লেখক।

দেন। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা কালনা হইতে তিনি বর্দ্ধমানে গমন করেন। কমলাকান্তের শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার মাতা স্বর্গ লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপনয়ন হয় এবং তিনি যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও নানা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রবিচারে প্রাচীন বহুদর্শী ব্যক্তিবৃন্দও তাঁহার নিকট পরাজিত হইতেন। গুরুগৃহে শিক্ষার পর তিনি নিজ আলয়ে গমন করেন এবং তাঁহার পিতাঠাকুর আত্মীয় স্বজনের উপদেশে তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহ করিয়া তিনি বহুকাল বেশ সংসারাশ্রমে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিলে সংসারের অনিত্যতা দেখিয়া তাহাতে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিল। অল্প কালের মধ্যেই তিনি প্রেম পিপাসু হইয়া কুল-গুরুর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে তিনি বীরভূম জেলার বিখ্যাত সাধু বামা ক্ষেপার সাধনস্থান তারাপীঠে উপস্থিত হন। তখন তথায় তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জনৈক সিদ্ধ কৌল অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ ও সাধন সম্বন্ধীয় কথোপকথনে কমলাকান্ত জানিতে পারিলেন, তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ সিদ্ধ কৌল। তিনি তখনই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কমলাকান্ত সাধন-রহস্য অবগত হইয়া বুঝিলেন, সংসার ছাড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই বরং তন্ত্রোক্ত সাধনায় গৃহ ও গৃহিণীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি কিছুকাল তারাপীঠে অবস্থান করিয়া গৃহে গমন করেন এবং সস্ত্রীক অভিষেক ও ক্রমদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের জন্য বাসভবন ও পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় সাধক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়া সাধনা করিতেন। তিনি প্রত্যহ জপ করিতেন, পার্ব্বণ দিনে সস্ত্রীক কুলাচার পদ্ধতিতে পূজা-হোমাদি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও যখন যাহা পাইতেন নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বাদে অবশিষ্ট সমস্তই দীন দুঃখী ও বিদ্যার্থিগণকে দান করিতেন। এই সময় বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র সাধকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিবিধ গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত মহারাজ বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় ও জনশ্রুতি অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ ব্যতিত তাঁহার অনেক ভক্ত ও শিষ্য ছিল। গুরুদেবের সাধন ভজনে প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া মহারাজ পূজাদির ব্যয় স্বরূপ একটা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি শ্যামা পূজার দিন গুরুদেবের বাড়ীতে বহু অর্থব্যয়ে মায়ের পূজাদি ও দীন দুঃখীদিগের সেবা এবং আরও নানা সৎকার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করাইতেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপচাঁদও কমলাকান্তের সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কমলাকান্ত অবকাশকালে

নিজেই কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়িনী, বিজয়া, আগমনী, শ্যামা ও শিব প্রভৃতি নানা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া মার নিকট গাহিতেন। গান লিখিয়া লইবার জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত ছিল না। দক্ষিণেশ্বরের প্রভু রামকৃষ্ণ কমলাকান্তের রচিত সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার রচিত গান গাহিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর ১২৬৫ সালে প্রথমতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাহা অনেক সাহিত্যিকের দ্বারা খণ্ড ও অখণ্ড প্রভৃতি নানা আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি "সাধন-পঞ্চক" (ষট্‌চক্র নিরূপণ) নামে একখানি গ্রন্থ বাংলা পয়ারে লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ বহু প্রাচীন, সেইজন্য সে সমস্ত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি অতীতের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত কিংবদন্তী বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্প জন বোধ হয় অবগত আছেন। "আলোচনার" সহৃদয় পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়ার অবগতির জন্য আমরা তাঁহার দুই একটী প্রবাদ উল্লেখ করিতেছি। প্রবাদগুলি বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

"একদা কোন ব্যক্তি কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত জানিয়া রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি কামিনী-কাঞ্চনে অনুরক্ত থাকিয়া কিরূপে সাধন ভজন করেন?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, রমণী-হৃদয় সরলতা, কোমলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার। রমণী সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে যত্নবতী। রমণী স্নিগ্ধ প্রেমময়ী ও কমনীয়রূপে বিভূষিতা। এক মাত্র রমণীগণই পুরুষের উগ্র ও কঠোর প্রকৃতি সংযমিত করিতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু" অর্থাৎ সাধ্বী রমণীমাত্রেই সেই মহাশক্তি স্বরূপিনী জগদম্বার অংশোদ্ভূতা। সুতরাং সতীসাধ্বী স্ত্রী সংসারে সাধন ও ভজন পথের সমধিক সহায় স্বরূপিনী—আনুকূল্যকারিণী কদাচ বিঘ্নদায়িনী নহেন। এরূপ সাধন ভজনের সহায়স্বরূপিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী রমণী কখনও "কামিনী-কাঞ্চনের" কামিনী হইতে পারে না। সে "কামিনী" স্বতন্ত্র।"

অন্য প্রবাদটী এইরূপ।—

"একদা কমলাকান্ত নির্জ্জন পঞ্চবটীতে বসিয়া জপ করিতে করিতে দেখিলেন,—তিমিরাবৃত বনভূমি সহসা আলোকিত হইল এবং সেই জ্যোতির ভিতরে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি অবস্থিতা। তিনি আনন্দে "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে জ্যোতিরাশি অন্তর্হিত হইল। পূর্ব্ববৎ অন্ধকারে বনভূমি আবৃত হইল। এইরূপ ঘটনা একাদিক্রমে তিন চারি দিন হইয়াছিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে জপকালে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। পরে অন্তরের মধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন, যেন তিনি বহু উচ্চে এক পর্ব্বতের শীর্ষদেশে উপনীত হইয়াছেন। সে স্থান অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত, পার্থিব জগতের

বহির্দ্দেশে কোনও নিভৃত শান্তিময় প্রদেশে অবস্থিত। পাখীর কাকলী, ভ্রমরের গুণ গুণ, এবং নির্ঝরিণীর অবিরত ঝর্ ঝর্ শব্দে এবং ঝিল্লীর অবিরত ঝিঁ ঝিঁ শব্দে কমলা-কান্তের মন-প্রাণ উধাও হইয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোনও অজানিত অথচ চিরাকাঙ্ক্ষিত দেশে উপনীত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন—সম্মুখে কারুকার্য্যখচিত দুগ্ধ-ধবল শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনে শিব-মূর্ত্তি, তাঁহার পার্শ্বে রজত-কাঞ্চনকান্তি দেবী গৌরী অব-স্থিতা, তাঁহাদের অপরূপ রূপে মন্দির উদ্ভা-সিত। তিনি আত্মহারাভাবে যুগলমূর্ত্তি দেখিতে-ছেন, সহসা সেইখানে তারাপীঠের সেই অবধূত—কমলাকান্তের কৌলগুরু যেন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "বৎস! এই তোমার ইষ্ট দেব-দেবী বসিয়া আছেন, প্রাণ ভরিয়া দর্শন স্পর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া লও।" অনন্তর তিনি মুহূর্ত্তে উক্ত যুগল মূর্ত্তির সহিত মিশাইয়া গেলেন। কমলাকান্ত "মা" "মা" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া সিংহাসন তলে লুটাইয়া পড়িলেন। জগজ্জননী যেন আদরে ও সস্নেহে তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সে সুখস্পর্শে কমলা-কান্ত জ্ঞান হারাইলেন। যখন তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রভাতের তরুণতা দেখা দিয়াছে। কমলাকান্তের সহধর্ম্মিনী স্বামীর পা দুখানি স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। পরে তাঁহার স্ত্রীকে ভর করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে হাস্যমুখে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি-লেন।" অতঃপর এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিনী কাল-কবলিত হন। তিনি দামোদর নদের বেলাভূমিতে স্বীয় পত্নীর দেহ দাহ করিয়া এক গীত রচনা করেন। রচনা শেষ হইলে 'কালী সব ঘুচালি লেটা'—এই গীতটী নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পত্নীর ঐ শ্মশানক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করা যায় না। একদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোনও কার্য্যবশতঃ "ওড়-গাঁয়ের ডাঙ্গা" দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও প্রহারিত হইয়া নির্ভীক চিত্তে নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন।

"আর কিছু নেই নেই মা শ্যামা
তোমার কেবল চরণ দুটী রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি
দেখে হলেম্ সাহস-ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতিবন্ধু দারাসুত
সুখের সময় সবাই তারা
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই
ঘড়বাড়ী "ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা"।
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
(নৈলে) জপ করে যে তোমায় পাওয়া
সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা"॥

দস্যুদল এই সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহাকে দেবতা

জ্ঞানে ক্ষমা প্রার্থনা করত স্বস্থানে প্রস্থান করিল। উপরোক্ত "ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা" একটী বিশাল লোকালয়শূন্য প্রান্তর। ডিষ্ট্রীক বোর্ডের যে রাস্তা গুস্কারা হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান-কাটোয়ার রাস্তার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই রাস্তা এই "ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার" উপর দিয়া আসিয়াছে। এখানে উপস্থিত বেশ চাষ আবাদ কার্য্য চলিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলে মহারাজ তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, মহারাজ!

"কি গরজ কেন গঙ্গা-তীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি স্মরণ লব।" ইত্যাদি।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন—

"এবার কালী বলে, বাহুতুলে যাব শ্যামা মায়ের কাছে।
কালী নাম সারাৎসার,
নিঃসরে বদনে যার,
সেজন ভক্ত জীবন্মুক্ত, দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে॥"

* *

এবার নাম জেনেছি, ধাম জেনেছি, পথ বড় সুগম হয়েছে।

সাধকের কি দৃঢ় বিশ্বাস! তাঁহারা এরূপ বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মুক্তির পথও উন্মুক্ত থাকে।

কমলাকান্ত আরও বলিয়াছেন—

"সুখের বাসনা কর আর কদিন!
ত্যজি অন্য বোল কালী কালী বল,
মানব জনম যদিন॥"

আগমনীতে বলিয়াছেন—

"শুনেছি মা! মহিমা তোমার, ওগো প্রাণ গৌরি!
তুমি ত্রিভুবন জননী॥"

আবার বিজয়ায় গাহিয়াছিলেন—

"ফিরে চাও, গো উমা! তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও, গো!"।

ভক্তের এ করুণ গানে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়।

তিনি শেষ শিব-সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন—

"যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।
পুরুষ পুরুষ-প্রধান, ত্রিলোকের বাস॥"

সাধকের এই বিশ্বাসই মুক্তির প্রশস্ত সোপান। যাহা হউক মহারাজ তেজশ্চন্দ্র গুরুর সেই "কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব"—এই গান ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহারাজকে তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন। যথাসময়ে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই শয্যা প্রস্তুত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতে শয়ন করিয়া গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করিলেন। অমনি ভূগর্ভভেদ করিয়া সেইস্থানে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই জল পান করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, এক্ষণে বোধ হয় আপনার ক্ষোভ বিদূরিত হইয়াছে; যাহা হউক এক্ষণে আমি চলিলাম।" এই বলিয়া

তিনি কৈলাস যাত্রা করিলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ কুশ-শয্যায় পড়িয়া রহিল। তদনন্তর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সাধকের ব্রাহ্মণ-শিষ্য ও ছাত্রমণ্ডলীর সাহায্যে সেই পূত দেহ বাগান বাড়ীর সেই পঞ্চবটীতে আনয়ন করিলেন। তথায় চন্দন কাষ্ঠ ও ঘৃত দ্বারা তাঁহার দেহের সৎকার হইল। অনেকে ভক্তিভরে তাঁহার পবিত্র চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিল। তাঁহার সাধন ভজনের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক সাধক কমলাকান্তের ভদ্রোচিত ভাব-ভক্তিসূচক স্থললিত সঙ্গীতগুলি শুধু তাহার গ্রামবাসী জনসাধারণের নিকট নহে, বঙ্গদেশের নিকট তাঁহাকে চির-অমর করিয়া রাখিয়াছে। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভক্ত, শিষ্য ও দেশবাসীর নিকট "ঠাকুর" এই মহৎ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর কমলাকান্তের পবিত্র জীবনী ও তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা বিস্তৃতভাবে করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধক প্রবর কমলাকান্ত শক্তি সাধনায় বড় কম শক্তি সঞ্চয় করেন নাই; রামপ্রসাদের পরই সাধক-শাক্ত ভক্ত কমলাকান্তের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার সঙ্গীতও রামপ্রসাদের ন্যায় প্রাণস্পর্শী, এত মর্ম্মস্পর্শী ছিল, যে গাহিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, প্রাণের মধ্যে মাতৃশক্তির কি একটা অজানা আবেগ-উৎকণ্ঠা আপনাপনি জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় আন্দোলিত করে। তিনি জগজ্জননীকে কেমন দৃঢ়রূপে হৃদয় মধ্যে বাঁধিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী তাহার প্রমাণ—

আদর করে হৃদে রাখি আমার আদরিনী
শ্যামা মাকে।
(ও মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি আর
যেন কেউ না দেখে,
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায়
জুড়াই আঁখি,
(কেবল) রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে
ডাকে।
অজ্ঞান কুসঙ্গী যত, নিকট হতে দিও নাকো
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অন্যের কাছে রাখে।

এমন আত্মনিবেদন, মায়ের প্রকৃতি পুত্রের এমন মাখামাখি ভাব, মনের প্রতি এমন ঐকান্তিক প্রার্থনা, মন আর আমি, মন আমার আমি মনের—যাহা করিব—আমরা দুইজনেই করিব, মনকে লইয়া এমন উৎকণ্ঠিতভাবে মাতৃ চরণে উৎসর্গ না করিলে কি সাধক হওয়া যায়? কমলাকান্ত যে খুব বড় একজন সাধক ছিলেন —তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই—তবে তিনি এত গুপ্ত ছিলেন যে বহু অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। "আলোচনার" পাঠকগণ যদি এই মহাত্মা সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা "আলোচনা"য় প্রকাশ করিব।

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

আবাহন-সঙ্গীত।

(জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবকাল সন্নিকট, এতদুপলক্ষে কোন ভক্ত তাঁহার আগমন বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, এই সঙ্গীতটীতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।)

এস গুরুদেব ! এস হে,
আঁধারে আলোকে ফিরিয়া এ লোকে,
এস দয়াময় এস হে ॥
গহনে গহনে, বিপিনে বিজনে,
দাঁড়াও তুমি আসিয়া হে।
এস এস গুরুদেব, এস হে ॥
মন্দরে কন্দরে, ভূ-স্তরে ভূধরে,
বিহর মধুর হাসি হে।
এস এস গুরুদেব, এস হে ॥
চন্দনে অর্চ্চনে জীবনে জীবনে
ছড়ায়ে চরণ আলোক হে।
পত্রেতে পুষ্পেতে অর্ঘ্যেতে পূজাতে
শোভিত কর এ লোক হে।
এস এস গুরুদেব, এস হে ॥
শক্তিতে ভক্তিতে জ্যোতিতে জ্যোতিতে
প্রকাশ করি করুণা হে;
শয়নে স্বপনে নয়নে নয়নে
শিখাও জীবে সাধনা হে।
এস এস গুরুদেব, এস হে ॥
সোহাগে সম্পদে আপদে বিপদে
ভকতেরই পূজা লও হে।
এস এস গুরুদেব, এস হে ॥
দুঃখেতে তাপেতে রোগেতে শোকেতে
অভয় আসি দেও হে।
এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

শ্মশান।

১

কে হে তুমি তত্ত্বগুরু ভীষণ মূরতি,
অঙ্গে শব-ভস্ম-লেপ নর-হাড়মালী—
নীরবে দিতেছ শিক্ষা, সংসারে বিরক্তি;
তাই বুঝি হোম কর অগ্নিকুণ্ড জ্বালি ?

২

পরিধান প্রেত-বাস দিক্‌পালধারী,
পূর্ণকুম্ভ জলে তুমি হও অভিষেক;
তব সহচর মৃত্যু, সর্ব্ব গর্ব্বহারী,
প্রচারিছে এ জগতে তোমার বিবেক !

৩

জগতের যত সব যোগী-তত্ত্বজ্ঞানী,
বড় ভালবাসে তাঁরা তব সহবাস;
তাইত তোমার নাম পবিত্র শ্মশান,
কবে হবে দরশন করি অভিলাষ।

৪

শিখরে তুষাররাশি হয়ে বিগলিত,
অবশেষে হয় যথা সাগরে মিলিত;
দেহ হ'তে প্রাণবায়ু হ'লে বহির্গত,
তব সঙ্গ বিনা আর নাহি অন্য গতি।

৫

রাজা, প্রজা, সদসৎ কাল-সহকারে,
সকলেই ল'য়ে থাকে তোমার আশ্রয়;
তথাপি বলিয়া থাকে ভীষণ তোমায়,
জগতের রীতি-নীতি বোঝা নাহি যায়।

৬

মানবে ভ্রুকুটী করি দেখাইছ ভীতি,
সাধুজনে কর তুমি তত্ত্বজ্ঞান দান;

ধনমদ গর্ব্বিতেরে শিখাইছ নীতি,
উদাসীন; বরণীয় তুমি হে "শ্মশান"।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ রায়।

নাম গান।

১

করি এস তাঁরি নাম গান।
স্বচিত যাঁহার ধরা,
ফল-পুষ্প-বৃক্ষে ভরা,
অপার আনন্দধারা করিছে প্রদান।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

২

করি এস তাঁরি নাম গান।
কোটী গ্রহ উপগ্রহ,
সুবিশাল তারাব্যূহ,
যাঁহার আদেশে শূন্যে ভ্রমে অবিরাম।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৩

করি এস তাঁরি নাম গান।
জীবের মঙ্গল তরে,
যিনি দূর শূন্য'পরে,
সমুজ্জ্বল রবি শশী করেছে নির্ম্মাণ।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৪

করি এস তাঁরি নাম গান।
সলিল অনিল যাঁর,
সাধিতেছে অনিবার,
সমভাবে সর্ব্বকাল জীবের কল্যাণ।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৫

করি এস তাঁরি নাম গান।
পয়োধরে পয়ঃধার,
দিয়াছেন যিনি মা'র,
বাঁচাইতে জ্ঞানহীন শিশুর পরাণ।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৬

করি এস তাঁরি নাম গান।
যাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে,
উর্ম্মিমালা বুকে লয়ে'
বারিধি অনন্তকাল বহে অবিরাম।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৭

করি এস তাঁরি নাম গান।
যাঁহার সৃজিত গিরি,
মহারণ্য শিরে ধরি,
উঠিয়াছে মহাগর্ব্বে ভেদিয়া বিমান।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৮

করি এস তাঁরি নাম গান।
মার বুকে স্নেহরাশি,
যিনি দয়া পরকাশি,
জীবের মঙ্গলতরে করেছেন দান।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

৯

করি এস তাঁরি নাম গান।
সবে মিলি ভক্তিভরে,
করযোড়ে নতশিরে,
তাঁহার চরণে সবে করহ প্রণাম।
করি এস তাঁরি নাম গান॥

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়।

নৈষধ-চরিত।

প্রথম সর্গ।

১

প্রদীপ্ত তপন তুল্য উৎসব-তৎপর,
নল নামে ছিল রাজা খ্যাত চরাচর।
আস্বাদিয়ে বাক্য-সুধা যার বুধগণ (১)
অমৃতেও সমাদর করে না তেমন॥

২

পীযুষ হইতে রম্য বাক্যরস যার,
পুণ্যশ্লোক ছিল সেই ভূপাল সংসারে।
স্বর্ণদণ্ড সম দীপ্ত প্রতাপ যাঁহার,
ব্যাপ্ত কীর্ত্তি সুবিমল ভুবন মাঝারে॥

৩

কলিযুগে যার কথা করিলে স্মরণ,
পবিত্রতা লভে যেন সলিল সেচন।
আবিল বচন মম তবু সুনিশ্চয়,
নলের কীর্ত্তন গাহি হবে পূতময়॥

৪

সেই নল চতুর্দ্দশ বিদ্যার মাঝারে (২)
অধ্যয়ন, অবগতি, আচার, প্রচারে—
বিভজি, করিল চতুর্দ্দশত্ব (৩) সাধন,
জানি না কি ভাবে হবে বিরোধমোচন।

৫

সুপ-বিদ্যা পারদর্শী ছিল সেই নল,
অঙ্গগুণে (৪) রসে করে বিস্তৃতি সাধন।
বেদ-তুল্য সেই রস অষ্টাদশ হয়ে,
অষ্টাদশ-দ্বীপ-লক্ষ্মী আনিল হরিয়ে॥

৬

আশী-পঙ্ক্তি-অংশভূত সর্ব্ব দিগীশ্বর,
কামবৃত্তি (৫) রোধিবারে নিয়ত তৎপর॥
তৃতীয় নয়ন তুল্য শাস্ত্র অভ্যাসিয়ে,
দেবতা-সমত্ব সব লইল পূরিয়ে॥

৭

চতুষ্পাদে ধর্ম্মদেবে করিলে স্থাপন,
কোন জন নাহি করে তপ আচরণ?
অধর্ম্মও পদাঙ্গুলে পৃথিবী পরশিয়ে,—
দাঁড়ায়ে রয়েছে নিত্য তপস্বী (৬) হইয়ে॥

৮

বিজয়-প্রয়াণে তার বলোদ্ধৃত ধূলি,
প্রতাপ-বহ্নির যেন ধূমের পাটলী।
পড়িয়ে সাগর-জলে হইয়ে পঙ্কিল,
করেছিল সুধাকরে কলঙ্কে আবিল॥

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

প্রেমের স্মৃতি।

গোপনে ব্রাহ্মকন্যা ললিতার পাণিগ্রহণ করা অপরাধে, মহিম যখন তাহার পিতা কর্ত্তৃক গৃহ বিতাড়িত হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিল, তখন মাধবপুরে তাহার দূর

---

(১) বুধগণ—পণ্ডিতবৃন্দ ও সুরবৃন্দ।

(২) চতুর্দ্দশবিদ্যা—ষড়ঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৩) চতুর্দ্দশত্ব সাধন—ষট্‌পঞ্চাশৎ সাধন; ১৪ কে ৪ বার আবৃত্তি করিলে ৫৬ সংখ্যা হয়। অথবা চারটী অবস্থা প্রাপ্ত করা।

(৪) উন্মনাদি ত্রিবিধ ধর্ম্মে—বেদপক্ষে অঙ্গভূত নিরুক্তাদির প্রপক্ষে।

(৫) কামবৃত্তি—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি ও মন্মথ-বিকার।

(৬) তপস্বী—দীন ও তপশ্চারী।

আত্মীয়া ভগিনী কমলাদেবী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন; এবং মৃত্যুকালে তাঁহার ক্ষেতখামার আদি যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি মহিমকে 'উইল' করিয়া দিলেন। মহিমের আর বি, এ পড়া হইল না। সে মাধবপুরে সংসার পাতিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল; পর্ণকুটীরটী ললিতার বাসোপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত ললিতাকে আর এখানে আনিতে পারিল না। সে চাষ করিত, ক্ষেত-খামার দেখিত, আবার সময় পাইলে, পাখি মারিয়া, খরগোস শীকার করিয়া দিন কাটা-ইত। সে বড় একটা কাহার সহিত মিশিত না, অবসর সময়ে আপনার মাঠের মাঝখানে ছোট্ট মাচানটির উপর বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে কত কি যে ভাবিত, কত লোক সে বিষয় লইয়া কত আন্দোলন করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই।

একদিন সে তার ছোট্ট মাচানটির উপর বসিয়া আছে। তার দৃষ্টি উদাস, দূর ক্ষেত্রের উপর নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে যেন কেমন এক স্বপ্নাবিষ্ট-ভাব, কেমন এক আকুলতা মাখান ছিল। এমনি ভাবে চাহিয়া থাকিয়া সে আপনার মনে বলিতে লাগিল "আমার ইচ্ছে ছিল যে, সে এর আগেই দেখে, যখন ধানগুলি বেশ সবুজ থাকে আর বোধ হয়"—মহিম বোধ হয় আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ কি এক আবেগে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চাকরটি মাচানের নিকট শুইয়াছিল। ভাবিল, মনিব বোধ হয় কোন শীকার দেখিয়াছেন। কাজেই সেও তার নিজের কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাহার মনিব যেদিকে চাহিয়াছিল, সেই দিকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু শীকার কোথায়! মহিম তখন যে তার কল্পনা রাজ্যে শীকার খেলিতেছে। সুতরাং চাকরটি বিফলমনোরথ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তার ঐ ক্ষুদ্র কুটিরটির চারিদিক খালি পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও বা শুকনা গাছের পাতা জমির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জমি ও ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠের ধুলা ও শুষ্ক পাতা গুলো বাতাসের আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে তার ঘরের চারিদিকে তাদের নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। ছোট ছোট লতানে গাছ গুলি জলাভাবে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, আর তার খোড়ো ঘরের চাল দুরন্ত হাওয়ার সঙ্গে ক্রমাগত যুঝিয়া যেন রুক্ষ ও জীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

মহিম দাঁড়াইয়া একমনে কত কি কল্পনা করিতেছে॥ ভাবে বিভোর। 'মেঘদুতের' যক্ষের ন্যায় "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" প্রিয়ার স্মৃতি তার মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল। কত কথা তাহার চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিল, যদি সে একবার বর্ষার সময় আসে। কিন্তু তার ঐ ভগ্নপ্রায় কুটিরটি! যদি দুরন্ত ঝড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে? তাহার উপর সর্ব্বধ্বংসকারী ম্যালেরিয়া যদি প্রিয়ার কোন অনিষ্ট করে! নাঃ—সর্ব্বাপেক্ষা গরমকালে আসাই ভাল। কিন্তু তখন যে এ শুধু প্রান্তর। সে যে সবুজ

ধানের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বেড়াইতে বড়ই ভালবাসে। কোথাও জলে বাঁধ দিয়া কোথাও মাছ ধরিয়া বেড়ানতে যে তার কত আমোদ। সে যে বলেছিল দুই বৎসর পরে আসবে। তাকে কি ব'লতে পারি এস না। দিন যত কাছে আসছে, ততই যে আমার মন একটা অব্যক্ত আনন্দে নেচে উঠছে। এই দুই বৎসরের পরিশ্রম, এই রাতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্য দিয়েও যে আমি প্রিয়ার কোমল আহ্বান শুনতে পাই। ঐ সেই অঙ্গন। ঐ খানেই যে আমাদের প্রথম হৃদয়ের বিনিময়। যখন আমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ললিতাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে, কপোলে তার শেষ চুম্বনের রেখাটী অঙ্কিত করে বলেছিলাম "লাল, এ নির্জ্জন কুটির বোধ হয় তোমার ভাল লাগবে না, তুমি এ গরীবকে কেন তোমার হৃদয়ের মধ্যে বরণ ক'রে নিয়েছ। তুমি কি আর এখানে আসবে?" তখন সে তার রক্তপুষ্প পুটতুল্য ওষ্ঠ ঈষৎ উল্টাইয়া ও হাসিতে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া আমার কানের কাছে চুপে চুপে বলেছিল "তোমার সঙ্গে যদি বনেও থাকতে হয়, সেই যে আমার কাছে রাজধানী"

মহিম মনে করিয়াছিল যে,এই দুই বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ভিতর সে তার ঘরগুলি ভাল করিয়া তুলিবে, কিছু নূতন জিনিষ দিয়া তার ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিবে। কিন্তু হায়! নূতন নূতন অভাব আজ যে তার সমস্ত টাকাগুলি টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন যে এ কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। সকাল হইতে সন্ধ্যা, সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ, সে যে প্রাণপণে খাটিয়াছে, আর তারপর যখন সে নিজের লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিতে গিয়াছে,—দেখিয়াছে, লোকসানের ভাগই বেশী। এ সমস্তই না তার প্রিয়াকে বলিয়াছিল। এর উত্তরে সে শুধু জানিয়েছিল "আমি তোমায় ভালবাসি"। যে দিন একখানি ক্ষুদ্র পত্র তাহার আসিবার বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসিল তখন সে কতই না আনন্দিত হইয়াছিল। আহা! তার সঙ্গে এই নির্জ্জন কুটিরে বাস কত সুখের! তার সেই মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তার সেই প্রেমপূর্ণ চাহনি, আজ মহিমের মনে অখণ্ড তালে অখণ্ড ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছিল এবং তাহা ললিতাকে তাহার অজ্ঞাতসারে যেন স্মৃতির সরমে রাঙাইয়া তুলিতেছিল। মহিম সেই সময়কার মত স্থান কাল সবই ভুলিয়া গিয়াছিল। পার্শ্বে চাকরটীকে দেখিয়া তার সেই ক্ষণিক বিহ্বল ভাবের জন্য কিছু লজ্জিত হইল। কোনও প্রকারে প্রকৃতস্থ হইয়া কহিল "মধু, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, চল বাড়ী যাই। আজ আমার স্ত্রী আসবে, আমাকে এখনই ষ্টেসনে যেতে হবে।" তারপর সে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া সাবান দিয়া মুখ, হাত, পা, বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া লইল। একখানি ব্রুস দিয়া অসংযত চুলগুলি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া দিল। নিজের তোরঙ্গটি খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া একখানি কাপড়, একটি জামা বাহির করিল ও সে গুলি শীঘ্র পরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির ম্লান আলোটুকু সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে তখনও

নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই। এবার মহিমের চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল। সে এক-বার চারিদিকে :চাহিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, হায়! আজ সুদূর ইউরোপে কি ভীষণ সংগ্রামই চলিতেছে। কতলোক না খাইতে পাইয়া অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। কিন্তু তাহার এই গোলাবাড়ী ঐ ধান্যের ক্ষেত তাহা-দের কি কিছু সাহায্য করিতে পারে না? আজ কাল কত লোক সৈন্য-বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া অকাতরে দেশের জন্য প্রাণ-দিতেছে তাহার দ্বারা কি কিছুই হইতে পারে না? সে কি কেবল উদরান্নের সংস্থানের জন্যই এ জগতে আসিয়াছিল।

(২)

মহিম ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইল, দূরে গাড়ী আসিতেছে। তখন কেমন একটা ভাব তার মনের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের মত সঞ্চারিত হইয়া হৃদয় স্পন্দিত করিল। ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইলে সে দেখিতে পাইল, সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে দুটি শান্ত স্থির চক্ষের দৃষ্টি তাহার উপরই শুধু স্থাপিত রহিয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া ললিতাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ-কালব্যাপী বিরহের অগ্নিস্রাবী দহন সেই কুসুমতুল্য পেলব হস্তের স্পর্শে যেন জুড়াইয়া গেল।

মহিম বলিল "আজ রাত্রেই কি আমরা বাড়ী ফিরিয়া যাইব, না এখানে কোন বাসা লইয়া থাকিব।"

যেখানে দাঁড়াইয়া তাহারা কথা কহিতে-ছিল, তাহা একটি সরাইয়ের অংশ,তাহার উপর-কার ছাদটা টিন দিয়া ছাওয়া।

ললিতা বলিল "আজকে এখানে রাত-কাটাবার চেয়েও একদিন রাস্তায় তোমার কোন বন্ধুর বাড়ী থাকিয়া কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী পৌঁছান ভাল। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নার আলোকে আমরা বেশ ধীরে ধীরে যাইতে পারিব। আমার এ ক্ষুদ্র ঘর অপেক্ষা জ্যোৎস্নার আলোকে উন্মুক্ত প্রান্তর বেশ লাগে"।

মহিম তাহাকে একবার আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া তাহার নির্ভীক চক্ষু দুটির উপর নিজের দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ছাড়িয়া দিল, এই হঠাৎ আলিঙ্গনে ললিতার কিন্তু কণ্ঠ হইতে মুখ পর্য্যন্ত সব লাল হইয়া গেল। সে বলিল "আমাদের এই দুই বৎসরের ব্যবধান যেন কত যুগ বলিয়া মনে হইয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে, এখনি যেন সমস্ত আমি দেখিয়া লই।" তারপর তাহারা যাত্রা করিল। নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ দিয়া যখন তাহারা যাইতে-ছিল, তখন তাহাদের মনে হইতেছিল, আজ এ পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই যেন একমাত্র দুটি জীব—অন্ততঃ এক রাত্রির জন্যও। এ বিশাল ধরিত্রী যেন তাহাদেরই।

পরদিন তাহারা আঁধার-তরল সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া বহুদিনের স্মৃতি জড়িত সেই নির্জ্জন কুটিরে আসিয়া আবার মিলিত হইল। প্রভাতের আলো যখন ধীরে ধীরে বৃক্ষরাজির উপর দিয়া নামিয়া আসিল, সেই সময় ললিতা ঘরের বাহিরে আসিয়া সেই

পুরাণ প্রাণ-মাতান মিষ্ট-স্বরে বলিল, "মহিম তুমি কি এসব ঘর নিজের হাতে তৈরী ক'রেছ? এ যে বড়ই সুন্দর হ'য়েছে।" মহিম বলিল "আমাকে আর উপহাস কোরোনা ললি, আমি অনেক যত্নে এসব তৈরী ক'রেছি, আমিত পূর্ব্বেই তোমায় বলেছিলাম, আমার হাতে এখন টাকা নেই, তবে আমি শীঘ্রই—" ললিতা আর বলিতে দিল না, সে বাধা দিয়া বলিল" এ আমি চির-দিনই ভাল বাসি। ভবিষ্যত যে আমাদের উজ্জ্বল তা আমি দেখতে পাচ্ছি। সহরে অট্টালিকা শ্রেণীর ভিতর বাস করা যে কত কষ্টকর তাও তুমি জান। আর তোমা ছাড়া......তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, যে আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটিরটির চারিদিকে স্বর্গীয় পুণ্যের ছবি ফুটে র'য়েছে। আর তুমি যেখানে সে যায়গা যে আমার কাছে স্বর্গ।" মহিম আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়-বীণায় বড় করুণ সুরে আবার প্রেমের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। অতীত ও বর্ত্তমান যেন সব এক হইয়া মিশিয়া গেল। সে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। সে সময় তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তখন তাহার হৃদয় যে পূর্ণ, কেবল ললিতাময়।

(৩)

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে কত বর্ষার ঝড়, গ্রীষ্মের গরম, শীতের ঠাণ্ডা সমস্তই তাহাদের ঐ কুটিরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত অসুখ, মনস্তাপ সাংসারিক কষ্ট তাহারা মাথার উপর পাতিয়া লইয়াছে—কিন্তু কিছুতেই তাহাদের এ পবিত্র প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ মাতৃত্বের ভার ললিতার মুখে চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। তাহাদের প্রেমের গাঙে একদিন সুখের বন্যা ডাকিয়া কানে কানে আশার বাণী কহিয়া গেল। তাহারা প্রায়ই দুজনে সন্ধ্যা বেলা বসিয়া কল্পনার তুলিকাতে তাহাদের ভবিষ্যত জীবন নানা রংঙে রঞ্জিত করিয়া তুলিত। কখন ললিতা একেলা বসিয়া বসিয়া আপনার সুখের স্বপ্ন দেখিত। তখন তাহার চক্ষুতে আনন্দ, আশা, ভয় ও আশ্চর্য্য একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিত। যখন সে কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িত, তখন নিজের মনে স্ফূর্ত্তি আনিবার জন্য গান গাহিত, বলিত, "আমি যদি রাতদিন আনন্দিতা থাকি তাহা হইলে আমার যে পুত্র হইবে---সে দুঃখে কখন অবসন্ন হ'য়ে পড়বে না।"

যতই তাহাদের সুখের দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহারা আর এক ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িল। এই সময় ত ললিতাকে সহরে লইয়া যাইতে হইবে, কোন ডাক্তার ত এখানে পাওয়া যাইবে না। মহিমের হাঁসপাতালের একজন ডাক্তারের সহিত আলাপ ছিল। তাহাকে পত্র লিখিয়া সে সমস্ত ঠিক করিল। কিন্তু আর একজন তাহার হস্তে এই যুগল দম্পতির সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুঃখে পরিণত করিতেছিল। সহরের হাঁসপাতালে যাইবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় ললিতা পীড়িতা হইয়া পড়িল। মহিম এতকাল

যত দুঃখ-কষ্ট সমস্ত নিজের কঠিন স্কন্ধের উপর চাপাইয়া লইয়াছিল কিন্তু এই ঘটনা যেন তাহার সবল হৃদ্‌পিণ্ডটাকে একেবারে নিৰ্জ্জীব, দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। তাহার দেহের কঠিন মাংসপেশীগুলি যেন কোন যাদুকরের গোপন ঈঙ্গিতে শিথিল হইয়া পড়িল। ললিতা বুঝিতে পারিয়াছিল যে,তাহাকে এবার এ-জগত হইতে শেষ বিদায় লইতে হইবে,কিন্তু সে বহুকষ্টে মুখে আনন্দের হাসি টানিয়া আনিয়া মহিমকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সে যে তাহার জন্য এত কষ্ট করিতেছে, দিনরাত অনাহারে বিনিদ্র অবস্থায় তাহার সেবা করিতেছে, এই যে তাহার নিকট অমূল্য।

(৪)

রাত্রে ললিতা তাহার ক্ষুদ্র জানালাটির ভিতর দিয়া দূর গগনের দিকে চাহিয়া থাকিত ও চঞ্চল শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, শুইয়া শুইয়া তাহাই দেখিত। একদিন সেই দূর গগন ভেদ করিয়া মৃত্যুর করাল শীর্ণ হস্তের ঈঙ্গিতে ললিতা কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উষার ধূসর ছায়া ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পৃথিবীর গায়ে সবেমাত্র উঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহিম সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রাতের শীতল বায়ুতে একটু অবসাদ দূর করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। সেই সময় ললিতা ধীরে ধীরে তাহার শীর্ণ হস্ত দুখানি উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল "হে প্রভু, তুমি দয়ার সাগর, আমার স্বামীকে এ বিরহ সহ্য করিবার শক্তি দাও, প্রভু! তাহা না হইলে আমার মরণেও শান্তি নাই দয়াময়।"

ধীরে ধীরে ললিতার জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। ঘরে ঢুকিয়া মহিম তাহা লক্ষ্য করিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া ললিতার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল। ললিতার চক্ষের সম্মুখে তখন কে যেন একখানি কাল যবনিকা টানিয়া দিতেছিল, এখনি যেন তাহার জীবন-নাট্যের অবসান হইবে। একবার তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। যেন প্রাণপণে লুপ্তপ্রায় শক্তিকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে। মহিম আস্তে আস্তে ললিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। শুনিতে পাইল, তাহার ক্ষীণ মৃদু কণ্ঠস্বর যেন সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করিতেছে, আর তাহা যেন কোন দূর নদী-তীর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—"স্বামিন্!—আমি চল্লুম,—জগতের—কাজ—করো। কৰ্ত্তব্য—ভুল—না।" স্বর আর বাহির হইল না, যেন উন্মত্ত হাওয়া তাহা দূর দিগন্তে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া অতল-সাগর গর্ভে ডুবাইয়া দিল। এই সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মৰ্ম্মস্পর্শী আদেশ। আর সে চক্ষু মেলিল না। যেন সে তাহার যাহা কিছু বলিবার ছিল বলিয়া সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবানের চরণে নিজের যাহা কিছু ছিল গচ্ছিত রাখিয়া, সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া জাগরণোন্মুখ কৰ্ম্মকোলাহল পৃথিবীর বক্ষে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তখন ললিতার তুষার-শীতল মুখখানির উপর ক্রীড়া করিতেছিল। চঞ্চল পবন তাহার

পশম-তুল্য কেশগুচ্ছ দুলাইয়া খেলিতেছিল, যেন বিরহ-বিধুরা যুবতী সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—এখনি জাগিবে। মুখখানি যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে ছাইয়া রহিয়াছে। মহিমের যেন এ সকলি সেই নিয়তির কঠোর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সেইরূপ ভাবেই হাঁটু ভাঙ্গিয়া মূঢ় মূকের মত বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যারাণী সবেমাত্র তাঁহার নীল অঞ্চলখানি উড়াইয়া পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিতেছেন। পক্ষীরা স্ব স্ব কুলায় বসিয়া জগদীশ্বরের স্তুতি-গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই স্থির শান্ত প্রকৃতির কিছুই একজনের ভাল লাগিতেছিল না; সে দূরে দাঁড়াইয়া শ্মশানে অগ্নির তাণ্ডব নৃত্য দেখিতেছিল। আর এক একবার দুই হাতে বুক চাপিয়া পৃথিবীর উপর শুইয়া পড়িতেছিল। যেন এই অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সমস্ত জিনিসগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। কখন বা দুই হাতে পঞ্জর টিপিয়া ধরিতেছিল—যেন এখনি এক একটি করিয়া খসিয়া পড়িবে। ক্রমে অগ্নির তেজ কমিয়া আসিতে লাগিল। মহিম ধীরে ধীরে আসিয়া চিতার নিকট দাঁড়াইল ও যেন কিছু খুঁজিতে লাগিল।

রাত্রি নিস্তব্ধ। কেবল চঞ্চল-পবন তৃণ-গুচ্ছের উপর দিয়া ভাগীরথীর বীচিমালার উপর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সপ্তমীর চন্দ্র কেবল পৃথিবীর উপর হাসিতেছে। কিন্তু সে হাসি যেন ম্লান। মহিম চিতার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছে, হাতে তাহার সেই পবিত্র ভস্ম। ভগবান তাহার সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু শেষ চিহ্নটুকু যেন সে জোর করিয়া তাঁহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিতেছে না। আকাশে চন্দ্র এ করুণ-দৃশ্য পাছে দেখিতে হয় বলিয়া ছিন্ন শুভ্র মেঘ-খণ্ডের ভিতর মুখ লুকাইয়া দৌড়াইতে লাগিল, আর সেই মৃত্যুপথ যাত্রীর করুণ-স্বর "স্বামিন্—আমি চল্লুম—জগতের—কাজ—করো,—কর্ত্তব্য—ভুল না—" দূর নদীতীর হইতে সেই শব্দ যেন ধীরে ধীরে তাহার কানের কাছে ভাসিয়া আসিতেছিল।

বসরায় যাইবার জন্য বোম্বাই-বন্দরে একখানি জাহাজ প্রস্তুত। বাঙ্গালী সৈন্যদল বীর-রসে গাহিতে গাহিতে, বীরদর্পে তালে তালে 'মার্চ্চ' করিতেছে,—

"চল চল চল সবে মাতি রণরঙ্গে,
শুভদিন এত দিনে উদিত এ বঙ্গে।
ব্রীটনের অরিকুল, করি গিয়ে নির্ম্মূল,
যে যাহারে পার তারে লয়ে চল সঙ্গে।"

মহিমও ইহাদের সহিত, তাহার প্রিয়ার সেই শেষস্মৃতিটুকু বক্ষে ধারণ করিয়া 'মার্চ্চ' করিতেছিল। সেই 'মার্চ্চ' সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও তাহার কাণে যেন তখনও বাজিতেছিল,—"স্বামিন্——আমি চল্লুম———জগতের কাজ কোরো———কর্ত্তব্য ভুল না—"।

শ্রীসুশীলকুমার রায়।

কবিকুঞ্জ।

মিনতি।

দীনের দয়াল প্রভু হে মোর দেবতা,
এসেছি জানাতে তোমা হৃদয়ের ব্যথা।
খুঁজেছি কতই ওগো গহন কাননে
বারেক দাওনি দেখা দীন অকিঞ্চনে!
সহেছি কাতর হয়ে দৈন্য-দুঃখ কত
ডাকিয়াছি উচ্চৈঃস্বরে তোমা অবিরত!
কিন্তু প্রভু একবার নিমেষের তরে
সান্ত্বনা করে নি আসি দগ্ধহৃদি'পরে!
নাহি আছে ধূপ, দীপ, বিল্বপত্র, মোর
কি দিয়া পূজিব তোমা কিবা উপচার?
দয়া করে এস প্রভু এ'দীন কুটিরে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজিব তোমারে।
নয়নের বারি আর হৃদয়ের জ্বালা
এই দিয়া সিক্ত মোর সাধের এ' মালা।
আজ মোর আয়োজন অভিসার যত,
এ' অর্ঘ্য প্রদানে যেন হয় না বিরত।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

নির্ভরতা।

(গীত)

(আমি) ভাসিয়েছি ভব-সাগর জলে
দেহতরণী।
হাল ধরে তার আছেন ব'সে
প্রেমিক শিরোমণি॥
বিশ্বাস গাছে শ্রদ্ধাভরে,
বেঁধেছি পাল ভক্তিডোরে;
চ'লছে কৃপা-পবন জোরে বাধা না মানি,—
আমি ব'সে কেবল দেখ্‌ছি তাঁরই চরণদু'খানি॥
দাঁড়ি রিপু ছয় জনে,
মেতেছে তাঁর গুণগানে;
ল'য়ে সব ইন্দ্রিয়গণে তুল্‌ছে জয়ধ্বনি,—
আমার হৃদমাঝারে কি আনন্দ ব'লতে পারিনি॥
কে তোমরা যাবে এসো,
এই বেলা নায়েতে ব'সো
মাঝির চরণ লক্ষ্য ক'রে ঠিক সময় জানি,—
ঐ দেখা যায় অপর পারে আনন্দের খনি॥

"ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ"

দাম্পত্য-প্রেম।

একমাত্র গতি পতি সতীর আশ্রয়,
পতিসঙ্গে স্বর্গসুখ চিতে সদা রয়।
ছাড়িয়া পতির সঙ্গ, অন্তরে যাইতে,
সতীর অন্তর দহে, যেন চিতাগ্নিতে;
স্বামী-নিন্দাকারী পিতা, তাই অভিমানে
তাঁহার সৃজিত দেহ ত্যজিতে সেখানে
চলিলেন দক্ষসতী; বিষাদিত অতি,
না দিল আদেশ ভাবী ভাবি পশুপতি।
না মানি নিষেধ গিয়ে পিতৃ-যজ্ঞস্থলে,
সমাধিতে মনোব্যাধি নাশিলেন ছলে,
সতীগত প্রাণ পতি জানিয়া সকল,
আশুগতি আশুতোষ যান যজ্ঞস্থল;
অর্দ্ধাঙ্গিনী শব দেহ তুলিয়া মাথায়,
মাতিলা বিভোলা ভোলা মহা তপস্যায়।
সে ঘোর তাণ্ডবনৃত্য ভাবিলেও মনে,
প্রেমের মলয়া বহে হৃদয়-গহনে;

ধন্য হ'ল ধরা, তাই সেই দিন হ'তে ;
দাম্পত্য প্রেমের মূর্ত্তি পারিল চিনিতে।

"দুর্লভ"

সন্ধ্যা-তারা।

ওই ক্ষুদ্র তারকাটি অনন্ত আকাশ-গায়।
ছুটিয়াছে অবিরত দিবারাত্রি ভেদ নাই।
নদীবক্ষে বালুকণা ছুটিয়াছে স্রোতজলে,
নাহি জানে কত যুগে প্রবেশিবে সে অতলে।
নাহি ভয় জন্ম মৃত্যু, খেদ নাই ক্ষুদ্র বলি,
চলিয়াছে ধীরে ধীরে সুখ দুঃখ সব দলি'।
চাহে কিনা বিশ্ব তার অতি ক্ষীণ জ্যোতিকণা,
যশ কিংবা নিন্দা ঘোষে নাহি তার সে ভাবনা।
সে চাহে বিশ্বের মাঝে বিলাইতে নিজ প্রাণ,
হোক ক্ষুদ্র নহে তুচ্ছ সে যে বিধাতার দান।
কাটি ভব-মায়াপাশ অনন্ত গগন-পথে,
ছুটিয়াছে নিরন্তর মিশিতে অনন্ত সাথে।
তেমতি ত্যজিয়া এই ভব-মায়া-স্নেহ-সুখ,
সাধিয়া বিশ্বের হিত পায়ে দলি মৃত্যু-দুঃখ।
যশোনিন্দা নাহি গুনি অনন্ত জীবন-পথে,
সতত ব্রহ্মের পানে ছুটে যেতে সাধ চিতে।
পূর্ণ কি হবেনা আশা? সন্দিগ্ধ আমার প্রাণ
ভুলে যাই তুমি প্রভু কল্পতরু ভগবান।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

কই তুমি।

সমস্ত বিশ্বজুড়িয়া মানব তোমাকে খুঁজিতেছে ; কিন্তু কই নাথ কোথায় তুমি! কোথা কোন দেশে গেলে তোমায় পাইব! কোথায় যাইলে তোমার দর্শন পাইয়া এ দগ্ধপ্রাণ শীতল করিব! নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ক্রমেই যে ডুবিয়া যাইতেছি নাথ! তোমায় পাবার ক্ষীণ-রশ্মি যে ক্রমশঃই ক্ষীণতর হইতেছে প্রভু! হৃদয়ের আশাপূর্ণ করিবার সময় কি এখনও হয় নাই! বেশ ; ডোবাও, কিন্তু প্রভু ডুবিয়া গিয়াও তোমায় ডাকিব ; তোমায় ভাবিব, তা হ'লেও কি আশা পূর্ণ করিবে না? তা হ'লেও কি তোমার মধুর ঝঙ্কার আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-মন শীতল করিবে না! তাও যদি না পাই, তবে কোথায় তোমার দেখা পাইব!

"অতল জলধি-নীরে, অথবা পর্ব্বত-শিরে ;
কোথা অন্বেষিলে প্রভু পাবগো তোমায়!
কোথায় রয়েছ তুমি কোথায় কোথায়"—

কোন্ দেশে কোন্ স্থানে তোমায় পাইব? না-না-ভুল-মহাভুল কোথাও তো তোমায় খুঁজিতে যাইতে হইবে না—"তুমি যে সর্ব্বত্র প্রভো আছ বিদ্যমান"—সর্ব্বস্থানেই তুমি আছ ; সর্ব্ব বস্তুতেই তুমি জড়িত রহিয়াছ। এই খান হইতেই তোমায় পাইব! তাই প্রহ্লাদ যখন কত কষ্টে তোমার দেখা পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তোমায় বলিয়াছিল—ঠাকুর এত দেরী ক'রে এলে—এত কষ্ট দিয়া তবে এলে, তখন তুমি বলেছিলে—"প্রহ্লাদ, তুমি বৈকুণ্ঠনাথ ব'লে ডেকেছিলে কেন? তাই আমায় সেই বৈকুণ্ঠ হইতে আসিতে হইতেছে, আমি তো সর্ব্বত্রই আছি, যদি তুমি হৃদয়নাথ বলিয়া ডাকিতে তা'হলে আমি তখনই দেখা দিতাম।"—প্রভু!

এ তোমারই বাণী হইলেও ডাক্‌বার সে বল কোথায় হরি! দাও বল দাও; দাও বিশ্বাস দাও! অন্তরের দেবতা অন্তরে আপনা হইতেই হৃদি আলো করিয়া প্রকাশ হও। তোমায় দেখিতে চক্ষু দাও। তোমার অমৃতোপম বাণী শুনিতে কর্ণ দাও—আমি সার্থক হইয়া যাই। সংসারে জড়াইয়া রাখিয়াছ; ইহার ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাত হইতে মাথা তুলিবার সাধ্য দাও—সংসারে জড়িত থাকিয়া ক্রমেই হৃদয়ের বল হারাইতেছি, তাহার মধ্য হইতে তোমাকে ডাকিতে শক্তি দাও দয়াময়! দিবানিশি সংসারের তীব্র জ্বালায় প্রাণ যখন ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকে; যখন সংসারের কোন পদার্থ ই প্রাণকে শীতল করিতে পারে না—তখন, হে নাথ!—তোমার মোহন মূরতি খানি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া প্রাণে বিমলানন্দ দান ক'র প্রভু! অন্ধ আমি! কোথায় তোমায় পাইব! কে তোমাকে ধরিয়া দিবে! কে তোমাকে দেখাইয়া দিবে! তুমি স্বপ্রকাশ না হইলে, তুমি নিজে সাধিয়া দেখা না দিলে, তোমায় কি করিয়া ধরি হরি! তাই তোমার ভাবুক ভক্তের ভাষাতেই ডাকি—"তুমি ধরা না দিলে ধরিতে পারি কি হরি—দাও দাও প্রভু, ধরা দাও! বিষয়ে নিবিষ্ট মন তোমার প্রতি ধাবিত করিয়া দাও। যদি দেখা নাই দাও, তবে তোমায় দেখিবার পক্ষে অযোগ্য মনটাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দাও। এই পূতিগন্ধপূর্ণ হৃদয়টাকে তোমার আসনের উপ-যুক্ত করিয়া নাও প্রভু! পরীক্ষা করিও না হরি, তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি—সে ক্ষমতা আমার নাই। তুমিই দয়া করিয়া উত্তীর্ণ করাইয়া দাও। তোমার পরীক্ষা কত জন্ম ধরিয়া দিব হরি, ততদিন কি তোমাহারা হইয়া থাকিব! তুমি দয়া করিয়া আমায় তোমার দিকে টানিয়া নাও! আমার জ্ঞান নাই; জ্ঞানের দ্বারা তোমায় পাইব না। কর্ম্ম কিছুই করি নাই; জানি না—তা হ'তেও তোমায় পাব না; আর ভক্তিও নাই যে, প্রাণ খুলিয়া কেবল তোমায় ডাকিব। হায়! তবে কি আছে! কি গুণে তোমায় পাইব। তবে কি তোমায় পাবনা! তবে কি এ হৃদয়ের হাহাকার চির দিনই বুকে করিয়া থাকিতে হইবে! না—না; ওগো তা করিও না। তোমায় একবার ডাকিলেই তো তুমি ছুটে এস; কোথায় আছ, নিজগুণে ছুটে এসে ধরা দাও! প্রাণ খুলে তোমায় ডাক্‌তে দাও! প্রাণে তোমার ভাব জাগিয়ে দাও। "তোমার ভাবে মেতে যাই"—ভাব দাও, ভাব দাও। তোমায় ডাক্‌তে তুমিই শিখাও। প্রাণ-মন মাতায়ে দাও। তোমায় ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ তোমাময় হইয়া থাক্—জগৎ নয়ন হ'তে অন্তরাল হোক্; শূন্য মাঝে থাকি কেবল তুমি আর আমি এক হইয়া।

তখন—"তোমাতে আমাতে এক হ'য়ে যাব নাহি রব আমি আমার॥"

শ্রীশশাঙ্ক।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

মানুষ বাহিরে দেখে, ভিতরে দেখে না—কেন বল দেখি? দুচারিজন একত্র হইলেই পরচর্চ্চা করিবে, একা থাকিলেই বিষয় চিন্তা করিবে, প্রাণান্তেও পরচর্চ্চা ও বিষয় চিন্তা ছাড়িয়া ভগবানের নাম করিবে না বা ধর্ম্মের আলোচনা করিবে না। বিষয়ের ভাবনা এত ভাল লাগে কেন? হরি কথায় এত বিতৃষ্ণা কেন?

কেন শুনিবে? বলি শুন—

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি বহির্ম্মুখ করিয়া রাখিয়াছেন, অন্তর্মুখ করিয়া দেন নাই। সেই জন্য মনুষ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎস্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাং পশ্যতিনান্তরাত্মন।"

যাহারা সাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী। তাঁহারা বাহিরের বিষয় হইতে চক্ষুকে প্রত্যাহৃত করিয়া মোক্ষ লাভের আশাতে আত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন:—

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

যাহারা অল্পবুদ্ধি কেবল তাহারাই কাম্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, এইজন্য তাহারা মৃত্যুর অধীন হয়।—

"পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।"

আমরা দেখিতে পাই যে আপামর সাধারণ লোক সংসার সুখে নিমগ্ন, বিষয়ভোগে আসক্ত, ইহলোকের সমৃদ্ধির জন্য লালায়িত। এমন কি তাহারা দুঃখসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াও সংসারের মায়া কাটাইতে অক্ষম। বল দেখি আমাদের মধ্যে কয়জন লোক পারমার্থিক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কয় জনেরই বা গভীর তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিবার শক্তি আছে। আমরা দেখিতে পাই অধিকাংশ লোকই আপনাপন ক্ষুদ্র পরিবারের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত। বিষয় চিন্তা অহোরাত্র আমাদের দেহ ও মনকে পেষণ করিতেছে। দিনের পর দিন যত অতিবাহিত হইতেছে তত আমাদের দুঃখের বোঝা বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা এত যে কষ্ট পাইতেছি, তত্রাচ আমরা সংসারের মায়াতে ভুলিয়া আছি। এত দুঃখ পাইয়াও আমরা বিষয় সুখের লালসা ত্যাগ করিতেছি কৈ? ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিতেছি কৈ? আমাদের কষ্টের হেতু আমাদের অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল, আমাদের পুণ্যের ক্ষীণতা—আমাদের ধর্ম্মবল নাই; না আছে সাধন বল, না আছে তপোবল। তবে থাকিবার মধ্যে আছে বাক্য বল। অসার বাহ্যিক আড়ম্বর পরিপূর্ণ জীবনে বাক্যবলে কিছুই হইবে না; শুধু বাক্যবলে জীবনের ব্রত উদযাপন হয় না, কস্মিনকালেও হয় নাই। এ ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে বাহুবলও চাই না, বাক্যবলও চাই না, —চাই ধর্ম্মবল, তপোবল, সাধনাবল। সনাতন ধর্ম্মে আমাদের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। যাহাতে আমাদের ধর্ম্মে আস্থা বৃদ্ধি হয়, তার বিহিত চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। ধর্ম্মে আস্থা বাড়িলে ধর্ম্মের বিশিষ্ট আলোচনা হইবে, তাহা হইতে ধর্ম্মবলের সঞ্চয় হইবে, ও কর্ম্মফল ক্ষয় হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতির বিধান কল্পিত হইয়া থাকে। এই স্থলে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলা আবশ্যক, আত্মোন্নতির মূলে শক্তির উদ্‌বোধন। আত্মাতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি নিবিষ্ট আছে। এই শক্তিত্রয় উদ্‌বোধিত না হইলে আত্মার উন্নতি হয় না। ইচ্ছাশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইলে ক্রিয়াশক্তির বা রজোগুণের কার্য্য আরম্ভ হয়। অতএব ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিতে হইলে তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মবল সঞ্চয় করাই আমাদের জীবনে প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে কর্ম্মরহস্যের মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িলাম। কি ভাবে আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে? নিষ্কামভাবে? নিষ্কামকর্ম্মের পরিণাম কি? কর্ম্মফলক্ষয়। তার পরিণাম কি? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং পরমশান্তি লাভ। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়, সে কেমন? "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বা হীরে দিয়ে হীরে কাটা যেমন; ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির কথা বুঝা গেল কিন্তু ইহাদ্বারা কি জ্ঞান লাভ হইল? জ্ঞানশক্তির কার্য্যটী এই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। আমরা শিখিলাম বাহ্যজগৎ মায়ের যজ্ঞাগার আর আমাদের শরীরটা ও বাহ্যজগতের মধ্যে, সুতরাং আমাদের দেহটা ও যজ্ঞাগার। এই যজ্ঞাগারে যজ্ঞ হইতেছে।

মাই কর্ত্তা, আমরা কর্ত্তা নহি ; মা করাইতেছেন, আমরা করিতেছি। ফলকামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি কারণ কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে, কর্ম্মফলে ত অধিকার নাই। আমরা কর্ম্মরহস্যের মূলমন্ত্রটী শিক্ষা করিলাম যে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। নিয়তির নিগড় অচ্ছেদ্য ও অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়" একথা বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। অদৃষ্ট অখণ্ডনীয় হইলে কি প্রকারে জীবের মুক্তিলাভ হইত ? এই তর্কযুক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন করা যায়। আমাদের কর্ম্মরাশি গর্ভাকাশ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে তাহার পরিধি মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং আমাদের প্রতিকুলাচরণ করে। যাঁহার সাধন বলে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিকশিত হইয়াছে, তিনি মায়া রচিত গর্ভাকাশকে অপসৃত করিয়া আপন ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি বলে জ্ঞান কল্পিত নূতন গার্ভাকাশ নির্ম্মাণ করিয়া লন এবং প্রতিকুল অবস্থা পরম্পরকে বিধ্বস্ত করিয়া সানুকুল অবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। এইরূপে কর্ম্মফল নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। উপরে শক্তির কথা বলা হইল ; শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলা হইল। এখন বিচার করিতে হইবে এ শক্তি কাহার ? যে শক্তি বলে গ্রহতারা, চন্দ্র সূর্য্য নিজ নিজ চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে, যে শক্তি বলে ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন কার্য্য করিতেছে, যে শক্তি বলে সৃষ্টিস্থিতি লয় সংঘটিত হইতেছে, সে শক্তি কাহার ? তিনি পুরুষ না নারী ?

উপনিষদ্ বলেন—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ॥
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি।
চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি ॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো
যদ্বাচোহবাচং সউ প্রাণস্য
প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষু রতিমুচ্য ধীরা
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।
অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মস্য
জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে
পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥
এতদ্ধ্যে বাক্ষ রং ব্রহ্ম
এতদেবাক্ষরম্পরম ইত্যাদি।
সপর্য্যগাচ্ছ ক্রমকায়মব্রণম স্নাবিরং
শুদ্ধম পাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষা পরিভূঃ স্বয়ম্ভু র্যাথাতথ্য
তোহর্থান্ব্যদধীচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সম্যাভ্যঃ
কিমেতদ যক্ষমিতি ?—ব্রহ্মোতিহোবাচ।

যাঁর শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে উপনিষদ্ তাঁর নাম দিলেন ব্রহ্ম। তিনি কেমন ? তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ, প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি ওঁ—সমুদায় বেদ যাঁর কীর্ত্তন করে, সমুদায় তপস্যা যাঁকে ব্যক্ত করে, যাঁকে লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

করিতে হয়। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী, শিরাত ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু, সর্ব্বকালে ভোগ্য বস্তু সকল বিধান করিতেছেন। মন তাঁর শক্তিতে চালিত হইয়া বিষয়ে গমন করে, প্রাণ তাঁরই শক্তিতে নিযুক্ত হইয়া আপন বিষয় গ্রহণ করে, রসনা তারই শক্তিতে বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষু ও কর্ণ তাঁরই শক্তিতে দর্শন ও শ্রবণ করে। তিনি শক্তিধর পুরুষ, তাঁর নাম ব্রহ্ম।

বেদান্ত বলেন—তিনি অবাঙ্‌মনস্‌ গোচরঃ অখণ্ডঃ সচ্চিদানন্দঃ অখিলাধারঃ অর্থাৎ আত্মা বা পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিলাধার বাক্য ও মনের অগোচর।

গীতা বলেন সেই শক্তি শ্রীভগবানে আছে। গীতা সেই শক্তিমানসে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। তিনি অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ।

শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়মিত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম।
জীবভূতাং মাহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই আটরূপে বিভক্ত। ইহা নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর একটী জীবস্বরূপ চেতনাময়ী আমার প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব" —সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে।

শ্রীভগবান আর এক স্থলে বলিতেছেন—

কবিং পুরাণ মনুশাসিতার মনোরণীয়াংসমনু
স্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ মাদিত্যবর্ণং তমনঃ
পরস্তাৎ।

আমি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ অনাদি নিয়ন্তা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের পালনকর্ত্তা মলিনমনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পরপারে বর্ত্তমান, সূর্য্যসম ভাস্বর ইত্যাদি।

গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

আমি জগতের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা সংহর্ত্তা, আধার লয়স্থান এবং বীজ অবিনাশী কারণ।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ বিভূতিযোগে তিনি বলিয়াছেন—জগতে যাহা কিছু সুন্দর, মধুর, মহান সে সমুদয়ই আমি, সংক্ষেপতঃ এই ব্যক্তচরাচর আমার এক পাদ মাত্র, অপর তিন পাদ আমার অব্যক্ত আছে—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ। এই অসীম শক্তির কথা চণ্ডীতেও আছে। যাঁর শক্তিতে এই বিশ্ব চালিত, যাঁর আলোক শক্তিতে এই ভূমণ্ডল প্রকাশিত, যাঁর শক্তিতে জীব শক্তিমান, তিনি নারী, তিনি প্রকৃতি, তাঁর নাম দুর্গা, তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী শক্তি। সমস্ত স্ত্রীলোক তাঁহার মূর্ত্তি, সমস্ত বিদ্যা তাঁরই কলা অংশ।

চণ্ডীতে আছে—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
যচ্চকিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং ইত্যাদি॥
দারিদ্রদুঃখভয়হারিণি!··· সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতাজগৎ।
নমস্তস্যৈ ইত্যাদি॥
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা!
আধারভূতা জগতস্তমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায়্যতে কৃৎস্নমলজ্ব্যবীর্য্যে।
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবিসমস্তমেতৎ। বিদ্যাসমস্তাস্তব দেবি! ভেদা। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!
গুনাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মা জগদম্বে! তুমি জগৎ ধারণ করিয়া আছ, তুমি এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি ইহাকে পালন করিতেছ, তুমিই ইহাকে অন্তে গ্রাস করিবে। সৎ ও অসৎ যাহা কিছু আছে তুমিই সে সমুদয়ের আত্মা। তাহাদের ভিতরে যে শক্তি আছে সে তোমারই শক্তি। মা! তোমার নাম করিলে দারিদ্র্য দুঃখ ভয়ে পলায়। তুমি সদা দয়ার্দ্র চিত্ত, সকলের উপকার তুমি করিয়া থাক। যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে বিদ্যমান, তাঁকে বার বার নমস্কার করি। যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে বিদ্যমান, তাঁকে বার বার নমস্কার করি। চৈতন্যরূপে যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁকে বার বার নমস্কার করি। আমি একাই আছি, এজগতে দ্বিতীয়া কেহ নাই। আমি ক্ষিতি অপ রূপে বিদ্যমান। আমি বৈষ্ণবী শক্তি। তাই চণ্ডী তাঁকে মা বলিতেছেন।

তিনি আমাদের মাই হউন আর বাপই হউন, তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি আমাদের উপাস্য। তাঁহাকে আমরা ভক্তি, সহকারে পূজা করিয়া থাকি। তিনি আমাদের প্রাণশক্তি, তিনি প্রাণরূপে আমাদের অন্তরে আছেন বলিয়া আমরা জীবিত আছি। এই বিশ্ব সংসারকে শঙ্করাচার্য্য মায়ার রচনা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা সন্ন্যাসী নহি, মায়াবাদে আমাদের কাজ কি? মায়া না বলিয়া তাঁকে মহামায়া বলিলে ক্ষতি কি? আর বৃক্ষলতা পাহাড় পর্ব্বত, জীবজন্তু রবিশশীকে তাঁহারই মূর্ত্তি বলায় দোষ কি? যাহা কিছু আমরা এবিশ্বমাঝে দেখি, তাই মার রূপ—মহামায়া জগদম্বা মা আমার নানারূপ ধরিয়া আমাদের মনকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—মার রূপ; চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ উপগ্রহ—মার মূর্ত্তি। চিন্তা কল্পনা, সংকল্প; দয়া ক্ষমা শান্তি; রাগ দ্বেষ হিংসা; আহার নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা; মেধা জ্ঞান স্মৃতি, লক্ষ্মী লজ্জা; এসমস্তই আমার মার মূর্ত্তি।

চারিদিকে মাকে দেখিতেছি; অষ্টপ্রহর মা দর্শন দিতেছেন। আমরা এমনই নরাধম, এতই অবিশ্বাসী যে আমরা অন্তরে বাহিরে মাকে দেখিয়াও বলিয়া থাকি মা নিরাকারা। ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, নররূপে মা অন্ন ব্যঞ্জনের থালা আনিয়া তোমার সম্মুখে ধরিলেন; তৃষ্ণায় তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে মা নারীরূপে তোমাকে শীতল জল আনিয়া দিলেন; বহু ভ্রমণ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছ, পবন রূপে মা তোমাকে বাতাস করিতেছেন। তথাপি বল, মা নিরাকারা! ভোরে পক্ষীর কলরবে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়; সে পক্ষী নয়, সে মা। শক্তি কি তাহা জানিয়াছি। শক্তির নাম, রূপ ও কার্য্য কি তাহাও শিখিয়াছি। শক্তি কাহার তাহাও বুঝিয়াছি; যাঁর শক্তি তাঁর সহিত একটা নিকট সম্পর্ক পাতাইয়াছি—তাঁকে আমরা মা বলিয়া ডাকিয়াছি। তিনি করুণাময়ী মা, আমরা তাঁর অবোধ সন্তান। তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে করিবেন বলিয়া নিজ কর প্রসারণ করিয়া আছেন। কৈ আমরা মার কোলে যাই কই! আমরা তাঁর নিকট হইতে তফাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেই ভালবাসি, তাঁর কোলে যেতে চাই না। আমাদের কর্ত্তব্য কি? মার কাছে যাওয়া, মার কোলে উঠা। এস ভাই! আমরা মার ছেলে মার কাছে যাই। ভক্তিভরে মার পূজা করি এস; তাঁর রাঙ্গা চরণে বেলপাতা ও জবা ফুল দিয়ে প্রত্যেকে বলি এস "মা! আমি তোমার।" পূজা শেষ হইলে ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে। সেই সময়ে নিমিলিত নেত্রে তাঁর রূপধ্যান করিয়া মনে মনে তাঁর পদে তুলসী চন্দন দিয়া প্রেমে গদগদ হইয়া প্রত্যেকে তাঁকে বলি এস "মা! তুমি আমার।" শেষে যখন সামীপ্য অতিক্রম করিয়া নিদিধ্যাসনের দ্বারা সাযুজ্য উপস্থিত হইবে, যখন আমাদের প্রত্যেককে মা আপনার কোলে তুলিয়া লইবেন, তখন প্রত্যেকে মার কোলে বসিয়া তাঁকে বলিব "মা! তুমি আমি এক সোঽহং। এইবার সেই করুণাময়ী মার সেবার কথা কিছু বলিব। ঘোর সাংসারিক-লোকে মার সেবার কথা শুনিয়া হয়ত বলিবেন "আমরা সংসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছি; স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী পিতামাতা লইয়া মায়াকূপে পড়িয়া রহিয়াছি। অগ্রে এ গণ্ডীর সীমা পার হই, এ মায়াকূপ হইতে উদ্ধার পাই তার পরে ভগবানের সাধন ভজন করিব। যত দিন তাহা না পারি, ততদিন মার সহিত সাক্ষাৎ ও হইবে না মার সেবা করাও হইবে না।" এটা তাদের মহাভ্রম। মার সেবা ঘরে বসেই হইতে পারে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। গৃহে বসিয়াই মার সেবা ও সাধনা করা যাইতে পারে, পর্ব্বত গুহায় যাইবার কি আবশ্যক? তবে কথা এই যে, আমাদিগকে অনাসক্তভাবে সংসারে থাকিতে হইবে, লিপ্ত হইয়া থাকিলেই গোল। যাঁহারা বলেন সংসারে থাকিয়া, গৃহে বসিয়া মার সেবা বা সাধনা করা অসম্ভব, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি পরিবারের মধ্যে বা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি মার সেবা করা যায় না? এ সংসারকে মায়ার আগার বল কেন?

এ সংসারকে অবিদ্যার আগার না বলিয়া বরং মার লীলাচত্বর বল না কেন? বল না কেন—জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, তরুলতা, চন্দ্রসূর্য্য জল স্থল অনল অনিল আকাশ—এ সমস্তই মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; তাঁর অনন্ত বিভূতি, অনন্তরূপ, অনন্ত নাম; তিনি নানারূপে, নানা মূর্ত্তিতে, নানা নামে, বিরাজিত ও পরিচিত। একথা ভাবিতে পার না কি যে তোমার সন্তানগণ তোমার নহে, মার? তাঁহারই পুত্র কন্যারা তোমার পুত্র কন্যারূপে তোমার কাছে আছে? আর তাদের ভার মা তোমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন! তুমি তাদের স্নান করাইতেছ, খাওয়াইতেছ, শোয়াইতেছ, রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, কত যত্ন করিতেছ, স্নেহ করিতেছ, ভালবাসিতেছ। এই সকল কাজ কে সেবা কাজ মনে কর; তোমার পুত্রকন্যারা মারই প্রতিমূর্ত্তি এই কথা মনে কর। তাহা হইলেই বুঝিবে তুমি তোমার মারই সেবা করিতেছ তুমি কি কেবল এই কথা শিখিয়াছ—মন্দিরের মধ্যে যে বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, শাঁক ঘণ্টা বাজাইয়া, কাঁশর ঘড়ি পিটিয়া ফুল বেলপাতা, ধূপ-ধুনা নৈবেদ্য দিয়া তাঁকে পূজা করিলেই মার সেবা করা হয়? আর পুত্র, কন্যা, ভাই ভগিনী, বাপ, মা, স্বামী, দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, শাশুড়ীর, বাড়ীর অপর লোকজনের সেবা করিলে মার সেবা করা হয় না? যদি এ ধারণা মনে আনিয়া থাক, ভুলে যাও, কারণ এটা ভ্রান্ত ধারণা। সার কথা জানিয়া রাখ—জীবসেবাতেই ভগবৎসেবা হইয়া থাকে। গরীব দুঃখীরা নারায়ণের মূর্ত্তি। তাদের অন্ন বস্ত্রদান কর, তাদের প্রতি দয়া কর, তা হলেই নারায়ণের সেবা করা হবে। মার কাছে তোমার সেবা পৌঁছিবে। ভেদ জ্ঞান ভুলিতে না পারিলে সমদর্শন আসে না; সমদর্শন না এলে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হয় না। তুমি মানুষ হয়ে মানুষেরই কেবল সেবা করিয়া থাক, জীব জন্তুর ত সেবা কর না, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের ত সেবা কর না। জীবজন্তু পশুপক্ষী কীট পতঙ্গও জানিও সেই মারই মূর্ত্তি। জীবজন্তুকেও সেবা কর—ক্ষুধার সময় খেতে দেও, তৃষ্ণার সময় জল দেও; সে সেবাও মার সেবা। আর একটু উঠ। তরুলতা এরাও মার মূর্ত্তি। এদের সেবাতেও মার সেবা হইয়া থাকে। আরও একটু উপরে উঠ। পাহাড় পর্ব্বত এরাও মার মূর্ত্তি। এদেরও তোমায় সেবা করিতে হবে; আর সেই সেবা তোমার মার নিকট পৌঁছিবে। সকলই জীব, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই জীব। জীবে দয়া করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়; জীবের সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হয়। এটা সেবার মন্ত্র। বৃন্দাবনে গিরি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিদ্যমান আছেন। ব্রজবাসীরা গোবর্দ্ধনকে পর্ব্বত বলেন না, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বলেন; গোবর্দ্ধনের পূজা হয়, উৎসব হয়। পল্লীগ্রামে ষষ্ঠী ও পঞ্চানন্দ ঠাকুর শীলা বা প্রস্তর খণ্ড, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, রাঢ়ে তারকেশ্বর, নেপালে পশুপতি, চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর প্রস্তর মূর্ত্তি—এ সব সেই মার বিগ্রহমূর্ত্তি, ভক্তগণ পূজা করেন। অশ্বথ, বিল্ব, তুলসী, বট, নিম এই সকল বৃক্ষের তলায় জলদানের ব্যবস্থা আছে। এত সেবা, সেই মারই সেবা। গরু,

ভগবতী। গোপার্ব্বণ বৎসর বৎসর হইয়া থাকে, গোসেবা অর্থে ভগবতীর সেবা। কুকুর, বিড়াল, পক্ষী আমরা পুষিয়া থাকি—তাহাদের ক্ষুধায় খাবার দিই, তৃষ্ণায় জল দিই। এও সেই মাতৃসেবা জানিবে।

ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র বলে। ভারতবর্ষ ও মা ব্রহ্মময়ীর মূর্ত্তি, শক্তির আধার, ভারত শক্তি। স্বর্গীয় বঙ্কিম্ বাবু "বন্দেমাতরং" মন্ত্রে এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আগাগোড়া তাহাদের সমস্ত জীবনটা মা জগদ্ধাত্রীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। একান্ত মনে সেই দেবীর সাধনা করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধি আর কিছুই নহে—ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি এবং পরলোকে সদ্‌গতি। উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে যোগদ্বারা ঘটাকাশ ছাড়িয়া চিদাকাশে উঠিয়া মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়।

আদ্যাশক্তি মা আমার একাধারেই সব—সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ। মার সহিত তাঁর সন্তানের মিলন-সম্ভোগ, ভুক্তিতে ও হয় আবার মুক্তিতে ও হয়; প্রভেদ এইমাত্র যে প্রথমটা স্থূল রকমের, দ্বিতীয়টা সূক্ষ্ম রকমের। সাধারণ লোকে সৃষ্টিরূপাদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। যে সকল সাধু ব্যক্তির বিষয় বাসনার বীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল নিরাকারের উপাসনা করিয়া থাকেন। সগুণ হইতে নির্গুণে পঁহুছিতে পারা যায়, সাকার হইতে নিরাকারে যাওয়া যায়। তুমি যাঁরই উপাসনা কর না কেন, ফলতঃ সেই একই মার পূজা হয় বুঝিতে হইবে। সেইদেবী আমাদের পূজা গ্রহণ করেন ও আমাদের পূজার ফল দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা সৃষ্টিরূপা দেবীর পূজা করেন, তাঁহারা জন্ম-জন্মান্তর সংসারের নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে মুক্তি লাভ করেন। আর যাঁহারা নিরাকার নির্গুণের উপাসনা করেন, তাঁরা এক জন্মেই সাধনালব্ধ মুক্তি চান ও মুক্তি পান। মিল্, বেন্‌থাম্ স্পেন্‌সার প্রভৃতি য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন না বটে কিন্তু পাকেপ্রকারে স্বীকার করিতেন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা এই জগতের তাবৎ কার্য্যই পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাদিগকে শক্তি মন্ত্রের উপাসক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন—"কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদকে রাধাতন্ত্র বলা যাইতে পারে।" ইহার অর্থ অগত্যা কোমৎ শক্তির উপাসক ছিলেন।

এই বার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শেষ কথা সমাজ সংস্কার আবশ্যক এবং ধর্ম্ম-বলই তাহার প্রধান উপাদান। বাহুবল অপেক্ষা ধর্ম্মবল যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ একথা বলা বাহুল্য! বাহুবলের দ্বারা ধন মান, প্রতাপ প্রভুত্ব, রাজ্য দেশ, লাভ করা যায়; ধর্ম্ম বলেও অনায়াসে সে সমস্ত সম্পদ লাভ হইতে পারে। তবে ধর্ম্মবীরগণ সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও প্রত্যাখ্যান করেন। বাহু-বলে গ্রহণ আর ধর্ম্মবলে ত্যাগ হয়, এই নিয়ম।

অনেক সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা অসার ও ভিত্তিশূন্য। ইহার বাহ্যিক চাকচিক্যে সহজেই মন আকৃষ্ট হয় বটে কিন্তু জিনিষটা অন্তঃসার শূন্য। আমাদের অনুমান হয়—ইহার প্রধান কারণ ধর্ম্মবলের অভাব। এই ধর্ম্মবলের অভাবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হয় না; অথবা সামাজিক ও রাজনৈতিক যে কিছু উন্নতি দেখা যায়, সে সব প্রাণশূন্য কলের ছবির মত অস্থায়ী ও বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। ধর্ম্মবলের ভিত্তির উপরে সমাজ সংগঠিত না হইলে, উহা কখনও স্থায়ী ভাব ধারণ করে না, সামান্য ঝটিকাতে ভূতলশায়ী হইতে পারে। সংস্কারের মূলে ধর্ম্মবল থাকা আবশ্যক। যতকাল ধর্ম্মবল প্রবল থাকে, ততকাল সমাজ অক্ষুণ্ণ থাকে। ধর্ম্মবল ক্ষীণ হইলে দুর্ব্বলতা আসে ও জাতীয় পতন সংঘটিত হয়। য়ুরোপে ফরাসি দেশে এক সময়ে ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মবল প্রবল থাকিলে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে না। যদি বা কোন দুর্দ্দৈব কারণে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, শীঘ্রই সে অনল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে যাহাতে জগতে ধর্ম্মবল জাগ্রত হয়, পৃথিবীর সমগ্রজাতির তদ্‌বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দাবদগ্ধ প্রাণে শীতল শান্তিবারিবরিষণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র ধর্ম্মবলই সেই সুশীতল শান্তিবারি বর্ষণ করিতে সক্ষম। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ।

কাকা বাবু।

(গল্প)

১

হরেনের বয়স যখন একুশ বৎসর, তখন তাহার পিতা মারা যান,—বীরেন শেষের সন্তান, তাহার বয়স তখন তের বৎসর। হরেনের পিতা নারান বাবু বনিয়াদি ঘরের সন্তান,—কলিকাতায় তাঁহাদের কয়েকখানি বাড়ী ছিল, —কাপড়ের দোকান ছিল, কিন্তু নারান বাবুর পিতার দোষে সে সব গিয়াছিল। যখন নারান বাবুর পিতা মারা যান, তখন দু'খানি বাড়ী ছাড়া, আর কোন সম্পত্তিই নারান বাবু পাইলেন না। পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পরে, স্ত্রীর পরামর্শে নারান বাবু কলিকাতার বাড়ী দু'খানি বিক্রয় করিয়া, উত্তরপাড়ায় আসিয়া একখানি ছোট বাড়ী খরিদ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন, এবং বাড়ী বিক্রয় লব্ধ বক্রি অর্থদ্বারা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান করিলেন। দোকানের আয় হইতে, তাঁহার সংসার বেশ সচ্ছলভাবেই চলিত। হরেন যে বৎসর আইন কাননে উপস্থিত হইল, সেই বৎসর নারান বাবু মারা গেলেন, হরেন কিন্তু পড়া ছাড়িল না। যথা সময়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সে শামলাধারী উকিলদের দলভুক্ত হইয়া, প্রত্যহ হাওড়া কোর্টে যাতায়াত করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী হরেন, অল্পদিনেই বেশ পশার করিয়া লইল। বীরেন তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ করিয়া, ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হইয়াছে। এইবার হরেন-জননী পুত্রের বিবাহের জন্য

পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত কুলিন-ব্রাহ্মণ-সন্তানের পাত্রীর অভাব হয় না, নানাস্থান হইতে পাত্রীর সন্ধান আসিতে লাগিল, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল, শঙ্কিত হৃদয়ে নারান বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা নানাস্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে শিবপুরের বনবিহারি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবীর সহিত, হরেনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। রাঙা টুক্‌টুকে বৌ দেখিয়া স্বামীর কথা মনে পড়িল, দুই বিন্দু অশ্রু মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বধু লইয়া তিনি কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়িলেন,—ধনীর কন্যা মন্দার কথার উপর কেহ কথা কহিলে, সে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়। হরেন সুন্দরী স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, স্ত্রীকে শাসন করিবার ক্ষমতা কাহার মোটে ছিল না। এই কারণে বৃদ্ধা নিজের পূজা অর্চনাদি লইয়া থাকিতেন, বধুর সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, বীরেনই মাতার অভাব অভিযোগ শুনিত, তাঁহার খোঁজখবর লইত, এটা কিন্তু মন্দার চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইত। কেন! যাঁহার উপার্জ্জনে সংসার চলিতেছে, তাঁহাকে ছোট করিয়া, মন্দাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সে সকল বিষয়ে প্রভুত্ব দেখাইবার কে? এই কথা লইয়া মন্দা বীরেনের সহিত বহুবার কলহ করিয়াছে। বিবাহের দেড় বৎসর পরে মন্দা একটী পুত্রপ্রসব করিল, আর ঠিক তাহার তিন দিন পরে পৌত্রের বদনে চুম্বন আঁকিয়া, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, হরেন-জননী পরলোকে স্বামী সদনে প্রস্থান করিলেন। এখন সংসারের কর্ত্তা—হরেন, গৃহিনী—মন্দা। ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র সংসারের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

২

বৌদিদি ও বীরেনের সম্পর্ক অনেকটা খুনা ও মনসার মত দাঁড়াইয়াছিল, যদি ও সেটা এক তরফা,—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, পত্নী-প্রেমিক হরেন সমস্ত অপরাধ বীরেনের স্কন্ধে চাপাইয়া, পত্নীর দিক হইতে, ভ্রাতাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতেন। পিতৃ মাতৃহীন, ভ্রাতৃভক্ত বীরেন, ডব্‌ডবে অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটি নিচু করিয়া, ভ্রাতার অযথা তিরস্কার নীরবে সহ্য করিত, কয়েক দিন হইতে হরেনের পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রের সামান্য জ্বর হইতেছে, রীতিমত চিকিৎসাও চলিতেছে, কিন্তু মাতার কৃপায় শিশুর রোগমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল।

সে দিন শনিবার। কলেজ ফেরত বীরেন বাটীপ্রবেশ করিয়া দেখে, খোকা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া, পাঠ্যপুস্তকগুলির সহিত আলাপ যুড়িয়া দিয়াছে। বীরেন তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া, পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া,খুলিয়া খোকার সম্মুখে ধরিল। শুভ্র-সুগোল আঙ্গুর দেখিয়া খোকা, "কাকাবাবু" "কাকাবাবু" শব্দে গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। কাকাবাবু আঙ্গুরগুলি খোকার হস্তে দিয়া অযত্নবিন্যস্ত পুস্তকগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিতে লাগিলেন।

আহার্য্য পাইয়া ক্ষুদ্র শিশু,—"কাকাবাবু আঙ্গুর দিলে, কাকাবাবু আঙ্গুর দিলে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। বীরেন পুস্তক সাজাইতে লাগিল।

মন্দাকিনী তখন একখানি রেশমী রুমালের উপর ফুল তুলিতেছিল,—এমন সময় আঙ্গুর হস্তে নৃত্যরত খোকা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রুমালের উপর হইতে চোখ তুলিয়া মাতা পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন,—"কি খাচ্ছিস রে খোকা?"

আনন্দে অধীর খোকা উত্তর করিল,"আঙ্গুল—কাকাবাবু দিলে!"

কাকাবাবুর নামে মন্দার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। রাগতস্বরে কহিল,—খেয়ে মর্‌বি না কি!—ফেলে দে বল্‌ছি—শিগ্‌গীর।"

আয়ত চক্ষুদুটি জননীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া, খোকা কহিল,—"খাবো না? বালে! ফেলে দেবো!! পয়থা লাগে না!!!

"তোর পয়সার কপালে আগুন, ফেল বল্‌ছি, নহিলে মেরে হাড় ভেঙে দেবো।" ক্রোধে মন্দার মুখ লাল হইয়া উঠিল। খোকা কোন কথা কহিল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্রের এই অবাধ্যতায় জননীর ক্রোধ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। মন্দা উঠিয়া খোকার হস্ত হইতে কাগজ সমেত আঙ্গুর লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া খোকার পৃষ্ঠে কয়েকটা কিল বসাইয়া দিল। প্রহৃত শিশু গগনভেদী চীৎকারে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

খোকার ক্রন্দনে বীরেন ত্রস্তপদে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রোষদৃপ্তা বৌদিদি দাঁড়াইয়া আছেন, খোকা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, আর রোগাক্রান্ত শিশুর জন্য বড় সাধ করিয়া বীরেন যে আঙ্গুরগুলি আনিয়াছিল সেগুলি উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দার প্রতি চাহিয়া কঠোর অথচ বিনীত স্বরে বীরেন কহিল,—"হ্যা বৌদিদি, আঙ্গুর গুলো কি এতই খারাপ জিনিষ যে ছেলেমানুষকে না কাঁদা'লেই চল্‌ছিল না?"

"খাইয়ে খাইয়ে ত ছেলেটাকে মর্‌বার পথে এগিয়ে দিচ্ছ, আর কেন, মা'র বাছাকে মা'র কোল যোড়া কোরে থাক্‌তে দাও! ও না ম'লে কি তোমার বুক ঠাণ্ডা হ'বে না!" তীব্র কঠোর স্বরে মন্দা কহিল।

তুমি কি জান্‌বে বৌদি, কে ম'লে কা'র বুক ঠাণ্ডা হয়, তা' হ'লে বুঝি তুমি অমন কোরে বোল্‌তে পার্‌তে না। বংশের দুলাল, আঁধার ঘরের মাণিক খোকা আমার চিরজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুক, এই প্রার্থনাই ঈশ্বরের কাছে—"

ঝঙ্কার দিয়া মন্দা কহিল,—"কে ম'লে কা'র বুক ঠাণ্ডা হয়!—তার মানে আমি মলেই সকলের বুক ঠাণ্ডা হয়,—তা' স্পষ্ট কোরেই বল না, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। বাপ! এত কোরে লেগেছ সব! তবু কারু সাতে নেই, পাঁচে নেই।"

"তুমি আমার মাতৃস্থানীয় বৌদি! যা' ইচ্ছে তা'ই বল্‌তে পার। কিন্তু মঙ্গল ছাড়া কা'রো অমঙ্গল চিন্তা যেন কোন দিন না করিতে হয়।" এই বলিয়া বীরেন সে স্থান ত্যাগ করিল। মন্দা বকিতে লাগিল, আর খোকা

কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

(৩)

সে দিন হরেন যথা সময়ে আদালত হইতে আসিয়া মন্দাকে দেখিতে পাইল না। বেশ পরিবর্ত্তনান্তর, তোয়ালে না পাইয়া, রাগত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল,—"বাড়ীতে কেহ আছে, না সব মরেছে।" স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে ত্রিতলের ছাদ হইতে মন্দা নামিয়া আসিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"কি হয়েছে কি, অত চেঁচাচ্ছ কেন?" হরেন কহিল,— "তুমি বাড়ীতেই আছ, আমি মনে করি গেছ কোথাও।" ছলছল চক্ষে অভিমানের স্বরে মন্দা কহিল;—"যা'ব কোন চুলোয়, যা'বার জায়গা আমার থাক্‌লে কি আর বাড়ীর কুকুর বেড়ালের লাথী খেয়ে এ বাড়ীতে পড়ে থাকি?"

একটা ভাবী আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া হরেন কথাটা ঘুরাইয়া কহিল,—"খোকা কোথায়? তা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে"

কথাটা চাপা পড়া দূরে থাকুক তাহার মূল সূত্র বাহির হইয়া পড়িল। মন্দা কহিল,— "তা'র জন্মই ত এত হ'ল গো। ছেলেটা অসুখে সারা হয়ে গেল,—সেই ছেলেকে কি না যা' তা' এনে খাওয়ান হয়, তাই বলেছিলুম ব'লে,—উঃ যত বড় মুখ তত বড় কথা। যা' মুখে এলো তাই বল্লে, কেন,—আমি কা'র কি করেছি? তুমি আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমরা মায়ে পোয়ে বিদেয় হই, তুমি তাই নিয়ে সুখে সংসার কর।"

"কি হয়েছে কি তাই বল না, মাথামুণ্ডু কতকগুলো বকে গেলে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

মন্দা তখন মূল ঘটনা চাপা দিয়া বীরেনের একখানি নূতন রকমের দোষাবহ চিত্র স্বামীর সম্মুখে ধরিল। সমস্ত শুনিয়া হরেন কহিল, "তোমাদের যখন এক জায়গায় থাক্‌লেই এই রকম হবে, তখন, বীরু যতদিন পড়া শেষ না করে, ততদিন কোলকাতার কোন মেসে গিয়েই থাকুক।" তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,— "বীরু একবার এদিকে এস।" ধীর পদক্ষেপে নতমস্তকে বীরেন দাদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "কি বল্‌ছেন?"

হরেন কহিল, "তোমার বৌদিদির সঙ্গে তোমার যখন বনিবনাও হচ্ছে না, তা সে স্থলে একটা কাজ করলে ভাল হয় না? তা আমি বল্‌ছিলুম কি, যতদিন তোমার পড়া শেষ না হয়, ততদিন তুমি কোলকাতার কোন মেসে গিয়ে থাক, আমি তোমার খরচ দেব। এখানে থেকে অহেতুক একটা ঝগড়া, মনোমালিন্য হওয়া আমি ভাল বিবেচনা করি না।"

অবনতমস্তকে বীরেন কহিল,—"তা বেশ! আপনার যদি অসুবিধা হয়, আমি না হয় অন্যত্র থাকব। তবে দুঃখ এই যে বিনা কারণে আপনি আমায় নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন।" কাকার গাঢ়ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠস্বরে খোকার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে আসিয়া কাকার নিকট দাঁড়াইল। কথাটা অন্য দিকে ঘুরাইয়া লইয়া হরেন কহিল,— "তোমাদের এগজামিন্ বুঝি মে মাসে?"

"—হাঁ।—"

হরেন ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল,—"তা' হ'লে কালই তুমি যাচ্ছ ত ?"

গম্ভীরভাবে বীরেন উত্তর করিল,—"হাঁ।"

যাইতে যাইতে হরেন কহিল,—"খরচের জন্য তুমি ভেবো না, মাসে তোমার যা' লাগ্‌বে, সব আমি দোব।"

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে, ক্রোধে বীরেন তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কঠিন কণ্ঠে কহিল,—"আপনার খরচে আমার প্রয়োজন নাই, আপনি আমায় যে কয় বৎসর প্রতিপালন করেছেন, সেই কয় বৎসরের সুদ সমেত খরচ আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পার্‌লে, তবে আপনার সঙ্গে আমার হিসাব শেষ হয়।" বীরেনের সমস্ত শরীর তখন কাঁপিতেছিল, সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। খোকা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পিতামাতাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বীরেনের নিকট আসিয়া সাদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে বলিল,—"তলে দাবে কাকাবাবু ?—আমিও তোমাল থঙ্গে দাব !—তুমি কোথায় দাবে ?"

খোকা উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া গেল। বীরেন সস্নেহে খোকার মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "আমি কাল যা'বরে খোকা,—সে অনেক দূর —তুই আমার সঙ্গে কোথায় যাবি !" এক গুঁয়ে খোকা একসুরে বলিয়া যাইতে লাগিল, "না, আমি তোমাল থঙ্গে দাব।" বীরেন অনেক বুঝাইল, কিন্তু খোকা নিরস্ত হইল না। শিশু অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিল। উপস্থিত সান্ত্বনা দিবার জন্য বীরেন কহিল, "আচ্ছা যাস্। কিন্তু হাঁট্‌তে পার্‌বি ?"

দেবশিশুর মত হাসিয়া অশ্রুসুন্দর মুখখানি তুলিয়া খোকা কহিল, "খুব পালুব ! দখন হাঁপিয়ে দাব, তখন তোমাল কোলে তলুব।"

(৪)

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও পাঠ্যপুস্তকগুলি গুছাইয়া লইয়া, বীরেন পড়িবার ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল,—হরেন নিজের অফিস-রুমে বসিয়া মামলাসংক্রান্ত কতকগুলি কাগজ দেখিতেছে। বীরেনকে দেখিয়া কহিল,—তা' হ'লে তুমি কি এখনই যাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে—হাঁ।", বলিয়া বীরেন প্রাতঃকৃত্য সমাপন মানসে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতিমধ্যে কোট প্যাণ্ট সজ্জিত খোকা কাকাবাবুর সহিত যাইবার জন্যপ্রস্তত হইয়া আসিল। বাটীর ভৃত্য বনমালী গাড়ী ডাকিয়া নির্দ্দেশমত দ্রব্যাদি তাহাতে বোঝাই করিতে লাগিল। বালক আনন্দে অধীর হইয়া অশ্বযানে গিয়া বসিল। বেশ পরিবর্ত্তনান্তর দাদা ও বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বীরেন আসিয়া দেখে, খোকা গাড়ীতে বসিয়া চালকের সহিত মহানন্দে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। নানাপ্রকারে বুঝাইয়াও বীরেন খোকাকে নামাইতে পারিল না—পিতা হরেন বাবু আসিয়া অনেক প্রলোভন দেখাইলেন,—খোকা কোন কথাই শুনিল না। "আমি কাকাবাবুর থঙ্গে দাব গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া হরেন খোকাকে টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। পথের ধূলি রাশির উপর লুটাইয়া

পড়িয়া,—"কাকাবাবু! আমি তোমার থকে দাব, আমায় নিয়ে চলগো" বলিয়া খোকা কাঁদিতে লাগিল। স্তম্ভিতহৃদয়ে, রুদ্ধ নিশ্বাসে, বীরেন গাড়ীর দরজা ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দা দ্বারপার্শ্বে থাকিয়া সব দেখিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, মাথার কাপড় টানিয়া, বাহিরে আসিয়া, খোকাকে টানিয়া বাড়ীর মধ্যে আনিয়া সিমেন্ট করা মেঝেয় ফেলিয়া কয়েকটী মুষ্টাঘাত করিল। হরেন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। প্রহৃত বালক ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাকার নিকট যাইবার জন্ম দ্বারাভিমুখে ছুটিল,—বন্ধদরজায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শিশুর ক্লান্তদেহ তৎক্ষণাৎ সশব্দে ভূমি চুম্বন করিল। দরজায় আঘাত লাগিয়া তাহার মস্তকের একস্থল কাটিয়া প্রবলবেগে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, শিশুর ক্রন্দনশক্তি তখন লোপ পাইয়াছিল,—ক্ষীণ হৃদয়বিদারক স্বরে খোকা কেবল, "কাকাগো! কাকাগো!" বলিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। বহির্দেশে দণ্ডায়মান বীরেনের প্রাণের ভিতরটা তখন জ্বলিয়া যাইতেছিল, কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গাড়িতে উঠিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"হাঁকাও।" গাড়ী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরেনের হৃদয়ে শকটের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ ভেদ করিয়া খোকার ক্ষীণ করুণ আর্ত্তনাদ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল,—"কাকাগো! কাকাগো।"

(৫)

বীরেনের সহপাঠী বিজয় একাই একটী সতন্ত্র বাসায় থাকিত, তাহার বাসাটি কলেজ-ষ্ট্রীটে। বীরেনের গাড়ী গিয়া বিজয়ের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল। বিজয় তখন সবেমাত্র চা-পান শেষ করিয়াছে, গাড়ীর শব্দে সে বাহিরে আসিয়া বীরেনকে দেখিয়াই, প্রফুল্ল মুখে কহিল,—"কিরে আজ এত সকাল সকাল গাড়ী কোরে একেবারে যে এখানে, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার পরে বলব।—আপাততঃ কিছু দিন তোমার বাসাতেই আমায় থাকতে হ'বে।"

"তা বেশ ত, একলা মন লাগে না, দুজনে বেশ থাকা যা'বে। চেহারা এমন বিগড়ে গেল কেন? অসুখ করেছে নাকি?"

"কৈ—না!"

"দেখি—" বলিয়া বিজয় বীরেনের কপালে হস্তস্পর্শ করাইয়া কহিল," ষ্টুপিট!—১০৩ ডিক্রী হয়েছে, তবু বলবে, না!"

বিজয় বি, এ, পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িতেছিল।

জোর করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি আনিয়া বীরেন কহিল,—"সাবাশ ডাক্তার মশায়! কপালে হাত দিয়েই ১০৩ ডিক্রীতে তুলে দিলে —টেম্পারেচার নিলে বোধ হয় বলবি যে, "বীরু তুই মরে গেছিস! ক্ষমা করো, ডাক্তারি চালগুলো দূরে রেখে দাও।"

"যা যা, আর চালাকি করতে হ'বে না, আজ আর স্নান করিস নি, একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।"

বীরেনের সত্যসত্যই বেশ জ্বর হইয়াছিল, তবু বন্ধুকে বিদ্রুপ করিয়া বলিল,—"তাই স্পষ্ট বলনা—'খেতে দিতে পারব না!' অত ভনি-

তার প্রয়োজন কি ?” কথা কহিতে কহিতে দুই বন্ধুতে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় উড়ে ব্রাহ্মণকে এক বাটি দুগ্ধ আনিতে বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বীরেনের নিকট উপবেশন করিয়া কহিল,—“তারপর, কি খবর ? হঠাৎ যে তল্পী তাল্পা নিয়ে !”

বীরেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিজয়কে বলিল। সমস্ত শুনিয়া রাগত স্বরে বিজয় কহিল,—“আমার ইচ্ছে করে যে, এই নন্‌-সেন্স ভাই গুলোকে কালাপানি চালান দিই।” তারপর কহিল,—“তা হ'লে তুমি একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়, আরাম হয়ে যা'বে। ও কিছু নয়, উত্তেজনায় শরীরটা একটু গরম হয়েছে, কোন ভয় নেই। আমি এখন কলেজে চল্লুম, সকাল সকাল ফির্‌তে চেষ্টা কোর্‌ব।” যথা সময়ে স্নানাহার করিয়া বিজয় কলেজে চলিয়া গেল।

রাণীগঞ্জের প্রসিদ্ধ কোল-কণ্ট্রাক্টর হর-বল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র বিজয় কলি-কাতায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়িতেছে। তাহার পিতার ইচ্ছা ছিল, তাহাকে ল পড়াইবেন, কিন্তু এই ডাক্তারি পড়াটা বিজয়ের ছেলেবেলাকার সখ,—তাই বি, এ, পাশ করিয়াই বিজয় মেডি-কেল কলেজে নাম লেখাইল, আর বীরেন আইনের দুর্ব্বোধ্য অর্থ বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করিল। দুইজনে বরাবর একসঙ্গে একই কলেজে পড়িয়া আসিতেছে, উভয়েই উভয়কে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে। সহপাঠী হইতে কলেজের অধ্যাপক অবধি, সকলেই বলিতেন, —“বিজয় আর বীরেন ছোকরা দু'টির বন্ধুত্ব আদর্শও অনুকরণীয়।

(৬)

আহত খোকা “কাকাবাবু—কাকাবাবু” করিয়া অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িল,—ঝি তুলিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া হরেন কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিল।

আহার করাইবার জন্য পুত্রের অনুসন্ধানে আসিয়া মন্দা দেখিল, খোকার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্ম-সিক্ত - প্রবলবেগে জ্বর হইয়াছে। শীঘ্র নিজের আহার সম্পন্ন করিয়া মন্দা পুত্রের নিকট আসিয়া বসিল। রোগাক্রান্ত খোকা সমস্ত দিন শয্যায় পড়িয়া, “কাকাগো” করিয়া ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল, উৎকন্ঠিত হৃদয়ে মন্দা দিনাতিবাহিত করিল। হরেন আসিয়া পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আনিল, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন, খোকা নিয়মিত ঔষধ খাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয়টী দিন কাটিয়া গেল, খোকার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কাকা-বাবুর নাম করাও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম প্রথম পুত্রের মুখে বীরেনের নামে, মন্দার সমস্ত শরীরে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হইত। কিন্তু তিন চারি দিন পরে সে ভাবটা কাটিয়া গেল। এখন অনুতপ্ত মন্দা কেবলই ভাবিত, “আহা! ঠাকুরপো কেন চলে গেল—বেশ ত ছিল।” এখন হইতে খোকা কাকার নাম করিলে মন্দা নম্রস্বরে বলিত,—“তোমার কাকাবাবু আসবে খোকন, তোমার জন্য কত খাবার আন্‌বে। “দুর্ব্বল শিশু শয্যায় উঠিয়া

বসিবার চেষ্টা করিত—পারিত না, ক্ষীণকণ্ঠে কহিত, "কাকাবাবু কবে আসবে মা।" সান্ত্বনার স্বরে মন্দা কহিত,—"এই আসে ব'লে, বনমালী তোমার কাকাবাবুকে আনতে গেছে। কাকাবাবুর আগমন সংবাদে খোকা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইত, মন্দা খোকার শিয়রে বসিয়া তপ্ত অশ্রুধারা বর্ষণ করিত। হায়! সেই যে বীরেনকে তাড়াইয়াছে, কোন্ মুখে আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে, সে আসিবেই বা কেন। উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় আরও দু'দিন কাটিয়া গেল, খোকার রোগের কিছুমাত্র পার্থক্য লক্ষিত হইল না। নবম দিনে ডাক্তার হরেন্দ্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন,—"ব্যাপার বড় ভাল বুঝ্‌ছি না, আপনি আরও দু'জন ভাল ডাক্তার আনুন।" ভীত হরেন কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তবে কি খোকা—" বাধা দিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—"সে পরমেশ্বরই জানেন, তবে আপনি চেষ্টার ক্রুটী কেন করেন। সেই দিন হরেন উত্তরপাড়া হাসপাতালের বড় ডাক্তার এবং অমৃত মুন্‌সীকে লইয়া আসিল। ডাক্তারত্রয় পরামর্শ করিয়া খোকাকে ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে আরও চার দিন কাটিল, পঞ্চম দিনে খোকার জ্বর কমিল, কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। বড় ডাক্তার বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। খোকা জননীর সহিত কথা কহিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কৈ কাকাবাবু কোথায়?" খোকাকে সান্ত্বনা দিয়া মন্দা কহিল,—"এখনি আসুছে তোমার কাকাবাবু।" কাকা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে করিতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। মন্দা গিয়া স্নানান্তে স্বামীকে আহার করাইয়া নিজে আহার করিল। খোকা রোগাক্রান্ত হওয়া অবধি হরেন আদালতে যাইত না। "আজ খোকা ভাল আছে" শুনিয়া আহারান্তে দীর্ঘ দিনের পর মন্দা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আসিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। খোকার শিয়রে বসিয়া মন্দা বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। প্রথম রাত্রে খোকা বেশ ছিল, কিন্তু শেষ রাত্রে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। খোকার পরিবর্ত্তনে শঙ্কিত মন্দা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নিশা অবসান করিল। বেলা আট্‌টার সময় ডাক্তারগণ আসিলেন, খোকাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এ যে দেখ্‌ছি বিকার হয়েছে।" শয্যাপ্রান্তে ঘোমটা দিয়া মন্দা বসিয়াছিল, ডাক্তারের কথায় তাহার মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আর্ত্তকণ্ঠে হরেন কহিল,—"খোকাকে কোন রকমে বাঁচাতে পার্‌বেন না—ডাক্তার বাবু!" বড় ডাক্তার তখন খোকার বক্ষ পরীক্ষা করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া কহিলেন,—"সাধ্য মত চেষ্টার ক্রুটী হবে না, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।" সেদিন ডাক্তারদের হরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে থাকিতে হইল,—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বাক্যশূন্য মন্দা স্পন্দিত হৃদয়ে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৭

বিজয় কলেজ হইতে আসিয়া, রোগীর পথ্য গুলি বামুন ঠাকুরের হাতে দিয়া বীরে-

নের কক্ষে প্রবেশ করিল। বীরেনকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল, জ্বরের প্রভাব যে এত দূর অগ্রসর হইবে তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। আর বেশ পরিবর্ত্তন করা হইল না, সে বীরেনের শুশ্রূষা করিতে বসিল, আল্‌মারি হইতে ছোট বড় নানা প্রকার ঔষধের শিশি লইয়া একটীর পর একটী বীরেনকে সেবন করাইতে লাগিল। দুই ঘণ্টা নিয়মিত ঔষধ সেবনের পর বীরেন সংজ্ঞালাভ করিল। আরও দুই ঘণ্টা অতীত হইল কিন্তু জ্বর কমিল না। সারারাত্রি সমভাবে কাটিল—বিজয় বীরেনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায় উৎকণ্ঠায় সমস্ত রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে জ্বরটা কিছু কমিল। বিজয় কহিল,—"কেমন আছিস্ বীরু ?"

ক্ষীণকণ্ঠে বীরেন কহিল, "বেশ আছি। কিন্তু বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি, বোধ হয় আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।"

"ছিঃ ভাই, অমন অধীর হইও না।" বিজয়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বীরেনের মস্তকে পড়িল। বীরেন উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, অভিমানমিশ্রিত করুণকণ্ঠে কহিল, "কাঁদ্‌ছিস্ বিজয়! তবু মরে সুখী হ'তে পারব, এইটে জেনো যে, এ জগতে এমন একজন আছে, যা'র প্রাণ এই হতভাগার জন্য কেঁদে উঠে।" ধীরে ধীরে বন্ধুর মস্তক টানিয়া নিজের বুকের মধ্যে আনিয়া সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বহু ক্ষণ দুই বন্ধুতে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিল। বিজয় যখন বীরেনের বক্ষ হইতে মুখ তুলিল, তখন তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটী গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

বিজয় আবার বীরেনকে ঔষধ দিল। কিন্তু বেলা দশটার পর হইতে জ্বর পুনরায় প্রবল বেগে দেখা দিল, সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত একই ভাবে যাওয়ায় এইবার বিজয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, উড়ে বামুনের দ্বারায় তাহার পরিচিত দুই জন ডাক্তারকে ডাকাইল, তাঁহারা রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন! ব্যাকুল কণ্ঠে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা মহেন বাবু! কোন ভয় নেই ত?" গম্ভীর-কণ্ঠে মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "বিশেষ কিছু ত' দেখ্‌ছি না, তবে বড় দুর্ব্বল, বেশী উত্তেজনায় হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যদি তা' না হয় ত রোগী এ যাত্রা বেঁচে যাবে।" মহেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলেন।

বীরেনের পীড়ার সংবাদে তাহার সমপাঠী বন্ধুগণ আসিয়া প্রাণপণে বীরেনের শুশ্রূষা করিতে লাগিল, বড় বড় ডাক্তার আনিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—আরও তিন দিন পরে কষ্ট, নিরাশা, উপেক্ষা, অনাদর, অপমান এগুলি পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিয়া,—সহোদরপ্রতিম বন্ধুদের প্রাণপণ শুশ্রূষা ব্যর্থ করিয়া, বিজয়কে কাঁদাইয়া, বীরেন মৃত্যুর কোলে শান্তিলাভ করিল। শতাধিক বন্ধু-বেষ্টিত বীরেনের মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইল, চিতাভস্মে বীরেনের ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিমিষে লয় প্রাপ্ত হইল। ভগ্নহৃদয় ছাত্রবৃন্দ 'হরিধ্বনিতে' দিগন্ত প্লাবিত করিয়া নিজ নিজ আবাসে ফিরিল।

৮

হরেন কখন ঔষধের জন্য কখন বরফের জন্য ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল ; বীরেনের কথা তাহার মনে পড়িল,—আজ যদি সে থাকিত ত খোকার জন্য একাই এক শ হইত—প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইত, আর সে থাকিলে বোধ হয় খোকার এরূপ হইতও না। এখন সে কথা মনে করিয়া হরেনের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে চলিয়া পড়িলেন—সন্ধ্যারাণী নব বধূটীর মত উঁকি মারিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে খোকার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। উন্মত্ত শিশু প্রলাপ-ঘোরে কখন "কাকা গো—আমি তোমার সঙ্গে যাব!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কখন "কাকা আমায় আঙ্গুল দিলে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল। নয়, দশ করিয়া বারটা বাজিল, বড় ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "যদি বিবেচনা করেন ত আমায় খবর দিবেন, আমি আস্‌ব।" সমভিব্যাহারী দুইজনকে ঔষধাদির উপদেশ দিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল,—ভোরবেলা খোকা অসম্ভব অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিতে লাগিল। বড় ডাক্তার আসিয়াছিলেন, খোকার ভাব দেখিয়া তিনি হরেনকে কহিলেন, "হরেন বাবু! ক্রমেই অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, একবার ডিষ্ট্রীক্ট মেডিকেল সার্জ্জনকে আনিয়ে দেখান। যা' হ'বার তা ত' হ'বেই!" হরেন সম্মতি জ্ঞাপন করিল, সহযোগী অমৃতবাবু তৎক্ষণাৎ সার্জ্জন সাহেবকে আনিবার জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মোটর আরোহণে সার্জ্জেন সাহেব ও অমৃত বাবু আসিলেন। বড় ডাক্তারকে জ্ঞাতব্য প্রশ্নাদির পর সাহেব খোকাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনোনিবেশ সহকারে বহু ক্ষণ পরীক্ষা করিয়া, বিকৃতমুখে কহিলেন,—The case is most serious and hopeless. I am sorry to say that I can't do anything. তারপর নিজের টুপিটী তুলিয়া লইয়া, "Good day" শব্দে সকলকে অভিবাদন পূর্ব্বক কক্ষ ত্যাগ করিলেন। হরেন ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এই কয়দিন মন্দা—বীরেনের কথাই ভাবিতেছিল,—সেই তাহাকে তাড়াইয়াছে, কোন্ মুখে সেই আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু আজ তাহার শোকাতুর অবোধ প্রাণ কোন কথাই শুনিল না। মন্দা সব ভুলিল, বর্ত্তমান তাহার চক্ষের সম্মুখে তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল। কক্ষে যে তিনজন পুরুষ রহিয়াছে, মন্দা তাহা ভুলিয়া লজ্জা, সম্ভ্রম, সঙ্কোচের বাধা ঠেলিয়া আকুল-কণ্ঠে কহিল, "ওগো, ঠাকুর-পোকে একবার নিয়ে এস, সোণার যাদুকে আমার শেষ দেখা দেখে যাক্, খোকা যে তা'র গলার হার ছিল গো!" পত্নীর কথায় হতাশ-হৃদয় হরেন বড় ডাক্তারের প্রতি চাহিল, ভাব বুঝিয়া ডাক্তার কহিলেন, "যদি কারুর সঙ্গে দেখা করা'তে ইচ্ছা করেন ত এই বেলা করিয়ে নিন, বড় জোর দশটা অবধি আছে।" ডাক্তার বাবুর সম্মতি পাইয়া স্খলিত-পদে হরেন বাটীর

বাহির হইয়া গেল। হরেন ডেলি প্যাসেঞ্জার ছিল, সমস্ত রেল-কর্ম্মচারী তাহাকে চিনিত, হরেন জানিত বিজয় কুমারই বীরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু. সে একেবারে বিজয়ের বাসাতেই উপস্থিত হইল। বিজয় তখন অন্যমনস্কভাবে রোয়াকে পদচারণা করিতেছিল।

কোন ভূমিকা না করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে হরেন জিজ্ঞাসা করিল,—বীরু-বীরু এসেছে, বিজয় ?" সহসা হরেনকে দেখিয়া ও তাহার প্রশ্নে বিজয় থতমত হইয়া পড়িল, তার পর নিজেকে সাম্লাইয়া সংযত-স্বরে উত্তর দিল,—"হ্যা এসেছিল।"

"কোথায় সে, তা'কে ডেকে দাও ত!"—হরেনের কণ্ঠস্বরে আকুল-আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। হরেন ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "কি হয়েছে বিজয় ?"

"হরেন-দা বীরু ত' নেই, সে আমাদের সকলকে ফাকি দিয়ে চলে গেছে।"

হরেন চক্ষে অন্ধকার দেখিল, তাহার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতেছিল। রোয়াক ধরিয়া হরেন বসিয়া পড়িল।

হরেনের তখন একস্থানে বসিয়া দু'দণ্ড কাঁদিবারও অবসর নাই, গৃহে পুত্রকে মৃত্যু-শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছে। ঘটনা শুনিয়া বিজয় হরেনকে লইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তরপাড়া অভিমুখে রওয়ানা হইল।

* * *

ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় দুইজনে বাটী পৌছিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই হরেন দেখিল, বীরেনের পড়িবার ঘরে ডাক্তারত্রয় বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, সে নিজ কক্ষাভিমুখে একপ্রকার ছুটিয়াই চলিল। মন্দার আর্ত্ত-অস্ফুট কণ্ঠস্বর তখন "খোকন্ বাপ্ রে আমার" শব্দে গৃহখানি মুখরিত করিতেছিল। পদশব্দে চমকিত মন্দা ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"ঠাকুরপো এলে—"পরে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল,—"কৈ ঠাকুরপো ?—"

"সে ত আর আস্‌বে না,—সে একেবারে গেছে—তুমি যে তা'কে তাড়িয়ে দিয়েছ!—খোকা কেমন আছে ?"

"সে কি কাকাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে ? কাকাকে সে যে বড় ভালবাসে—তাই কাকার সঙ্গে গেছে!—ওগো সে যে তা'র সঙ্গে যা'বার জন্য বড় কেঁদেছিল!" মন্দার জ্ঞানহীন দেহ ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল।

পুত্রহারা,—ভ্রাতৃহারা স্তম্ভিত হরেন কাঁদিল না, তাহার চক্ষের অশ্রুরাশি বুঝি শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল—প্রাণটা মরুভূমি অপেক্ষা শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িল।

শ্রীবিমলকান্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রাণ-শক্তি।

প্রাণ-শক্তিকে চলিত কথায় আমরা জীবনী শক্তি বলিয়া থাকি, ইংরাজিতে ইহার নাম ভাইট্যালিটি vitality. সূর্য্যদেব যেমন আমাদিগকে আলোক দিতেছেন, উত্তাপ দিতেছেন, সেইরূপ তিনি অবিরত এই প্রাণ-শক্তিও বিতরণ করিতে-

ছেন। এই প্রাণ-শক্তি স্বর্গলোক, পিতৃলোক, প্রেতলোক প্রভৃতি উচ্চতম লোক সকলেও বিতরিত হইতেছে। তবে পৃথিবীতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

এই পৃথিবীতে সূর্য্যদেব কতই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি দিতেছেন তাহার ইয়ত্তা করা আমাদের সাধ্য নহে, তবে আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে তিন প্রকার শক্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। ইলেকট্রিসিটি বা বৈদ্যুতিক শক্তি, ভাইটালিটি বা প্রাণ-শক্তি এবং কুণ্ডলিনী-শক্তি। পৃথিবীতে এই তিন প্রকার শক্তি পৃথক আকারে বরাবর থাকিয়া যায়, একটীকে অপর একটীতে পরিণত করা যায় না।

বিজ্ঞান-বলে যে প্রকৃতির বিকার উৎপাদন করিয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমুদয় পদার্থ জীব-জন্তু গাছ-পাথর আদির দেহ সেই প্রকৃতির বিকারমাত্র, বায়ু জল ও বাষ্পও ঐরূপ বিকৃতির অন্তর্গত। ঐ প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিত পৃথিবীর যে কোন পদার্থ লইয়া তাহাকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ভাগ করিয়া যাইলে শেষে এত ক্ষুদ্র অংশ হইয়া পড়িবে যে, আমরা চক্ষের দ্বারা আর সেই খণ্ডগুলি দেখিতে পাইব না, তার পর যদ্যপি অণুবীক্ষণ চক্ষে দিয়া সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল দেখিয়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করিতে থাকি, তবে শেষে এমন এক ক্ষুদ্র অংশ হইবে, যাহার পর সেই অংশকে আর ভাগ করা যাইবে না, এই অবস্থার এক একটী অংশের নাম পরমাণু, ইংরাজিতে ইহাকে এ্যাটম্ atom বলে।

তাহা হইলেই জড়-বিজ্ঞানমতে পৃথিবী মধ্যস্থিত তাবৎ পদার্থ, জল, বায়ু, জড় ও প্রাণীর দেহ সমস্তই এই পরমাণু সমষ্টি একত্রিত করিয়া গঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাণ-শক্তি সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এইরূপ এক একটী পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করে, এইরূপ প্রবেশ হেতু ঐ পরমাণুতে একপ্রকার আকর্ষণ-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাতে একটী পরমাণু আর ছয়টী পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া দানা বাঁধা মত হইয়া যায়।

এই দানা বাঁধা ও বিশেষ আকারের এক একটী সাতটি পরমাণু ঘটিত অণুকে প্রাণশক্তির অণু বলা যায়। যাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শন-শক্তি আছে, তাঁহারা এই সকল অণু দেখিতে পান। শ্রীমতী আনিবেশান্ত ও শ্রীযুক্ত লেডবিটার সাহেব কর্ত্তৃক ওকাল্‌ট কেমিষ্ট্রি (Occult Chemistry) নামক একখানি রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ প্রাণ শক্তির অণুর আকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

প্রাণ-শক্তির দানা বা অণু সকল দেখিতে অতি উজ্জ্বল বর্ণ এবং ইহারা অতিশয় গতিশীল, এইজন্য অন্য অন্য প্রকার অণুর মধ্যে ইহা-দিগকে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বায়ুমণ্ডলে ইহারা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কেরোসিন তৈল পূর্ণ করিয়া একটি ডিপা জ্বালিয়া দিলে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ বাষ্পাকার ধুম উড়িয়া যাইতে থাকে, সেইরূপ সূর্য্যদেব হইতে প্রতিনিয়ত এই প্রাণ-শক্তিরূপ পরমাণু নির্গত হইতেছে, এবং উহারা ছয়টি অপর সাধারণ পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদের সহ মিলিত হইয়া

জ্যোতির্ম্ময় অণুরূপে নভোমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রে এইরূপ অণু সৃষ্ট হয় না, মেঘাচ্ছন্ন দিনেও ইহাদের উৎপত্তির সংখ্যা অনেক কম হয়। খট খটে রৌদ্রের দিনে এই অণুর সৃষ্টি বেশী হইয়া থাকে।

যাহাদের জীবন আছে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণিগণই সেই অণু নিজ নিজ দেহে পোষণ করিয়া থাকে। মানবের দেহে যেস্থানে প্লীহা রহিয়াছে সেই স্থানের চক্রটীর মধ্য দিয়া এই অণু মানব দেহে শোষিত হয়। এই চক্রটীর ছয়টী দল আছে। জলে যেরূপ এক একটী ঘূর্ণীপাক হইয়া থাকে চক্রগুলিও অনেকটা সেইরূপ। ইহাদের মধ্যস্থল গর্ত্তযত এবং গর্ত্ত হইতে গাড়ীর চাকার যেরূপ মধ্যস্থল হইতে বেড় পর্য্যন্ত কয়েকটী আড়ভাবে বাতা দেওয়া থাকে সেইরূপ চক্রের মধ্যের গর্ত্ত হইতে প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা কয়েকটী উচ্চ উচ্চ রেখার মত থাকা হেতু চক্রটীকে দুই দল, চতুর্দ্দল বা ষড়দল মত দেখায় ও শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

আমাদের কথিত প্লীহার স্থানস্থিত চক্রটীর ছয়টী দল, যে পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যস্থলে নিয়মত হইয়া আছে সেই ঘুরিবার পথটী তরঙ্গায়িত বলিয়াও একস্থান উচ্চ ও পরস্থান নিম্ন হইয়া থাকে, এই ভাবেও চক্রমধ্যে ছয়টী উচ্চস্থান থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, অনেকে ঝোড়া দেখিয়াছেন, ঝোড়া বুনিবার সময় বেতের ছয়টী লম্বা টান দিয়া একটীর নিম্ন দিয়া ও পরেরটীর উপর দিয়া অপর একটী লম্বা বেত ক্রমাগত ঘুরাইলে যেরূপ একটী ঝোড়া হইবে চক্রটীকে সেইরূপ ভাবিতে হইবে।

আমাদের পূর্ব্ব কথিত প্রাণ-শক্তির অণু বায়ুতে ভাসমান থাকা কালে উহা জ্যোতির্ম্ময় হইলেও উহার বিশেষ কোন বর্ণ থাকে না, উহাকে শাদাবর্ণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু চক্রের পাকে পড়িলেই ইহার বিকৃতি হইতে থাকে এই অণুটী চূর্ণ হইয়া গিয়া কয়েকটী স্রোতে পরিণত হয়। আমরা দেখিয়াছি, একটী এইরূপ অণুতে সাতটী পরমাণু থাকে, তন্মধ্যে একটীতে প্রথমে সূর্য্যদেবের শক্তি প্রবেশ করে এবং পরে সেই শক্তি অপর ছয়টী পরমাণুকে টানিয়া লইয়া থাকে। যে অণুকে টানিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহারা প্রত্যেকে এক একটী স্রোত আকারে পরিণত হইয়া এক একটী অর অর্থাৎ চক্রের ছয়টী লম্বা লম্বি রেখাকার পথে চালিত হয়, অবশিষ্ট মূল পরমাণু যাহার ভিতর প্রথমে সূর্য্যদেবের তেজ প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেটী অপর ছয়টীকে টানিয়াছিল সেইটী অর্থাৎ সেই আদি পরমাণুটী চক্রের মধ্যস্থিত গর্ত্তযত স্থানে স্রোতাকারে চালিত হইতে থাকে।

এইরূপে ক্রমাগত প্রাণশক্তির অণুসকল জীবদেহে শোষিত হইতেছে। যাহাদের শোষণ করিবার শক্তি কম হয়, তাহারা দুর্ব্বল ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ সুস্থকায় লোকের মধ্যে যে পরিমাণ শোষিত হয়, তাহা তাহাদের দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী, এ কারণ একজন সুস্থলোকে অপর এক-জন দুর্ব্বল ও প্রাণ-শক্তির অল্পতাযুক্ত লোককে

এই জীবনীশক্তি দান করিতে পারেন, এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারেও ক্ষীণ জীবনীশক্তির লোক, অধিক জীবনীশক্তিশালী লোকের সঙ্গ করিয়া তাহার দেহ হইতে নিজ দেহে টানিয়া লইতে পারে। আমাদের এইরূপ আদান-প্রদানের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রাণশক্তির অণুসকল এইরূপে চক্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেহের ভিতর কি ভাবে ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ ৬টী অর মধ্য দিয়া ছয়টি পরমাণু যাইয়া যে ৬টী স্রোত সৃষ্টি করে এবং চক্রমধ্যস্থিত গর্ত্ত দিয়া আদি পরমাণু, যাহাতে প্রথমে প্রাণ-শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পরমাণুর অপর একটী স্রোত হইয়া মোট ৭টী স্রোত হইয়া থাকে। এই স্রোতগুলির বর্ণ পৃথক পৃথক এবং ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া থাকে। উপরোক্ত ৬টি স্রোতের বর্ণ—বেগুনে, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও ঘোর কৃষ্ণাভ লাল। আদি পরমাণু-ঘটিত সপ্তম স্রোতটীর বর্ণ গোলাপী লাল। কাজেই আমরা দেখিতে পাই, প্রাণ-শক্তি শরীরে সাতবর্ণের সাতটী স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চ-বায়ুর কথা আছে, তাহা এই প্রাণ শক্তির স্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, এই স্রোতসকল চক্রমধ্য দিয়া যাইবার সময় নীল ও বেগুনি স্রোত দুইটী মিলিয়া একটী স্রোত হইয়া প্রবাহিত হয়। সেইরূপ কৃষ্ণাভ লাল ও কমলার বর্ণ স্রোত দুইটীও ঐরূপে মিলিয়া একটী হইয়া থাকে।

নীল বেগুনে মিশ্রিত স্রোতটী আমাদের গলার দিকে যায়। গলদেশে আমাদের যে চক্রটী আছে তাহাতে যাইয়া পুনরায় ইহা বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং নীল স্রোতটী গলদেশে বিশুদ্ধ নামক চক্রকে সঞ্জীবিত করিবার জন্ত থাকিয়া যায়। এই স্রোতটীও ভাঙ্গিয়া গিয়া গলদেশের চক্রে মাত্র ফিকে নীল একটী স্রোত ক্রিয়া করে ও অবশিষ্ট ঘন নীলবর্ণ অংশ এবং বেগুনে স্রোত মস্তিকে চলিয়া যায়। তথায় যাইয়া মস্তিকের মধ্য ও নিম্নাংশকে শক্তিমান্ করিয়া থাকে। মস্তিকের উর্দ্ধদেশে যে সহস্রার পদ্ম আছে, সেই চক্রের বহির্দ্দেশে ৯৬০টি দল মধ্যে বেগুনে বর্ণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে।

হলুদবর্ণ স্রোতটী হৃদয়স্থিত চক্রে প্রবাহিত হইয়া এখানকার আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া মস্তিকে গমন করতঃ সহস্রার চক্রমধ্যে দ্বাদশ-দলপদ্মে গমন করে এবং তাহাকে শক্তিমান্ করে।

সবুজবর্ণ স্রোত উদর ও কোষ্ঠদেশে প্রবা-হিত হইয়া থাকে। নাভিদেশস্থ চক্র এবং যকৃৎ, মূত্রপিণ্ড ও অন্ত্রসকলের উপর ইহার শক্তি বিস্তৃত হয়। পরিপাক-শক্তি এই স্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

গোলাপী লাল স্রোতটী শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়। স্নায়ু বা নার্ভের মধ্যদিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হয়,ইহাকে স্নায়ুশক্তি বা 'নার্ভ পাওয়ার' বলা যায়। —এইটীই সাধারণতঃ জীবনী-শক্তি বলিয়া আখ্যাত হয়, এই অংশই একজন অপরকে দিতে পারে। এই শক্তি কম হইলে লোকের খিট্‌খিটে স্বভাব হইয়া থাকে।

কোন অবস্থায় থাকিয়াই সুস্থবোধ করে না। সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠে। এইরূপ অবস্থার লোককে যদি কোন সুস্থদেহী এই শক্তি দান করে, তবে তাহার দেহ সুস্থ হয় এবং দাতারও ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায়, ক্লান্তিবশতঃ এবং পীড়িত অবস্থায়—লোকে উপরোক্ত প্রাণ-শক্তি প্লীহার মধ্যদিয়া চালিত করিতে পারে না, কিন্তু অন্যের শরীর হইতে আপন শরীরে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে। মানব-শরীর ভিন্ন তুলসী, দেবদারু,ইউক্যালিপটস্ প্রভৃতি গাছেও ঐরূপ গোলাপী বর্ণের পরমাণু পাওয়া যায়। যাহারা স্নায়ুশক্তিহীন তাহারা এই গাছের নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত স্নায়ুর জন্য খাদ্য পাইয়া সুস্থবোধ করিবে।

কমলাবর্ণ ও কৃষ্ণাভ লালবর্ণের স্রোত দুইটী মিলিতভাবে যাইয়া মেরুদণ্ডের মূলে নামিয়া আসে, ইহারা জননেন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধি করে, রক্তমধ্যে প্রবেশ করে ও রক্তশোধন ও রক্তসৃষ্টির সহায়তা করে এবং শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিয়া থাকে। যদ্যপি কেহ এই শক্তির পোষণ করিতে পারেন, অর্থাৎ এই শক্তির দ্বারা যে কামশক্তি উত্তেজিত হয় তাহাকে দমন করিতে পারেন তাহা হইলে এই স্রোতের সেই অংশ চেষ্টা করিলে মস্তিকের দিকে উর্দ্ধগতি করান যায় কিন্তু ইহা বহু কষ্টসাধ্য ও চেষ্টা-সাপেক্ষ। এই স্রোত মস্তিষ্কে নীত হইলে ইহার বর্ণ কমলার পরিবর্ত্তে খাঁটি হলুদের মত হয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির সমূহ উন্নতি হইয়া থাকে। কৃষ্ণাভ লালবর্ণ স্রোত ঘোর লাল স্রোত হইয়া পড়ে এবং পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। এই স্রোতের সহিত ফিকে বেগুনে স্রোত মিশ্রিত থাকে, তাহাতে মানবের মনকে পারমার্থিক উন্নতির দিকে লইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোককে কখনও কামবৃত্তি আক্রমণ ও বশীভূত করিতে পারে না। ইহাকেই উর্দ্ধরেতা অবস্থা কহে। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিবার পূর্ব্বে এই অবস্থায় আসিতে পারিলে সাধককে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না।

এই স্রোতের প্রবাহ জন্য মানবের স্বাস্থ্য ভালমন্দ হইয়া থাকে। যাহার পরিপাকশক্তি ক্ষীণ, সূক্ষ্মদর্শী লোক দেখিতে পাইবেন, তাহার দেহে সবুজবর্ণের স্রোতটীর শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। হলুদ স্রোতটী ঠিক থাকিলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া ও বল অক্ষুন্ন থাকিবে এব নীলবর্ণ স্রোত নিয়মমত চালিত হইলে সুস্বর হয় ও গলদেশের পীড়াদির আশঙ্কা থাকে না।

যাহারা পবিত্রভাবে থাকে, অখাদ্য খায় না, তাহাদের এই সকল স্রোত নিয়মিতভাবে চলিয়া থাকে। তামাক, মদ, মাংস প্রভৃতি ভোজনে শরীর তত পবিত্র থাকে না, কাজেই জীবনী-শক্তির এই স্রোতসকল ঠিকভাবে চলে না। মদ্য-মাংসভোজী লোক, সাত্বিক লোক অপেক্ষা বলবান্‌ও হইতে পারে কিন্তু সে বল তাহাদের অভ্যাসজনিত শারীরিক অবস্থামাত্র।

চক্রসাধনে লোকের যেরূপ চক্রসিদ্ধি হয়, তাহাতে সেই চক্রটী যেভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তাহা এই প্রাণ-স্রোত প্রবাহিত ক্রিয়া হইতে

ভিন্ন রকমের। জীবনীশক্তির অণু-পরমাণু-সকল পার্থিব, তবে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পাঁচ প্রকার পার্থিব অণু-পরমাণু মধ্যে ক্ষিতি, অপ ও তেজঘটিত অণুসকল চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায়। ইহার উপরের অণুসকল অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সচরাচর দেখা যায় না। দেখিবার জন্য দৃষ্টিশক্তি-সাধন দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে হয়। এই স্রোত ও চক্রাদি আমাদের স্থূলদেহের মরুৎ ও ব্যোমঘটিত পিণ্ডদেহ নামক অংশে রহিয়াছে। ভাণ্ডদেহ নামক ক্ষিতি, অপ, তেজ ঘটিত অংশে নাই, এ কারণ আমরা দেখিতে পাই না।

যাহারা এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত সি, ডাব্লিউ লেড-বিটার সাহেব প্রণীত "হিডেন্ সাইড্ অফ্ থিংস্' নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল।

শঙ্কর মঠ।

বি-এন্-রেলের সাঁতরাগাছি ষ্টেসনের নিকট সম্প্রতি শঙ্কর-মঠ নামে একটী বৃহৎ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। সাঁতরাগাছি নিবাসী শ্রীচরণ দাস শেঠের পুত্র বদান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ শেঠ মহাশয় প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অনেক আতুর-অনাথ, অনেক সন্ন্যাসী এই মঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে। বিলাস-ব্যসন প্লাবিত, স্বার্থ-বিষ জর্জ্জরিত বঙ্গ-দেশে আজও যে এইরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান হইতেছে, আজও যে পরদুঃখ-কাতর ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা স্থানে স্থানে বিরাজ করিয়া দরিদ্রের তপ্তাশ্রু মোচনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন, তাহা মনে করিলে বাস্তবিকই হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। অর্থ অনে-কেরই আছে, কিন্তু কয়জন সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন? জীবমাত্রেই আত্মসুখে রত, কিন্তু যে মানব আত্মসুখের সীমা ছাড়াইয়া পরের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, মানব-সমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চে, আর যে ধনী বিলাসিতার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া সৎকার্য্যে তাহা নিয়োজিত করেন, তিনিই ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। তাই কবিবর হেমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—

"সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।

* * * * *

বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে,
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।"

মন্মথ বাবুর কীর্ত্তি অতুলনীয়। শুধু "শঙ্কর-মঠ" নয়, আশ্রয়হীনের আশ্রয় দানেও তিনি মুক্ত-হস্ত, অভাব অভিযোগে দান করিয়া আরও কত মহৎ কীর্ত্তি করিয়া তিনি যে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন, তাহার বিস্তারিত বিব-রণ বারান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। ভগবান এই পরোপকার পরায়ণ, দরিদ্রের বন্ধু, ধর্ম্মপ্রাণ যুবককে দীর্ঘজীবি করুন—ইহাই প্রার্থনা।

আলোচনা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৫ সাল।

ব্রহ্মচর্য্য। *

(১)

মানবের চরমলক্ষ্য শান্তি। সবল, সুস্থদেহ ও নির্ব্বিকার প্রশান্ত মনই শান্তিলাভের সুবর্ণ সোপান। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত মন স্থির ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব। এ জন্যই এ বিশ্বে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির, ভোগী অপেক্ষা যোগীর, ব্রহ্মচারীর সংযমী শান্তস্বভাববলীর এত গৌরব। এ যুগের নূতন ঋষি স্বর্গীয় মহাত্মা বিবেকানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মচারী-ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, তিনি কাম-বিজয়ী উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই তিনি বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ। এই কামজয় বা শুক্ররক্ষাই যে মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক—শারিরীক, মানসিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বসুখের, পরমশান্তির নিদান, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে সে কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ক্ষমতার অভাবে এবং অশ্লীলতা ও প্রবন্ধবাহুল্য ভয়ে সে কথাটী যেমন করিয়া বলা উচিত ছিল, তেমন করিয়া বলিতে সমর্থ হই নাই। কবি বলিয়াছেন—

"হয়ত এ ফুল সুন্দর নয়, ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে,
ভুলে কারো ভাল লাগে।"

ইহা ভুলে কাহারও ভাল লাগিলে, ইহা পাঠে একটী লোকও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, আত্ম-মঙ্গল চিন্তা করিলে, এ অযোগ্য লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

(২)

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন সময়ের নাম পরমায়ু। ইহার সাধারণ অর্থ—জীবিতকাল। মনুষ্যগণ ইচ্ছা করিলে কিয়ৎপরিমাণে পরমায়ুর হ্রাসবৃদ্ধি সংসাধন করিতে পারে; কিন্তু কেহই অমর হইতে সমর্থ নহে। আত্মার ধ্বংস নাই, কিন্তু দেহীর দেহ নিত্য ধ্বংসশীল। তবে মনুষ্য যত্ন করিলে—স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রতিপালন করত ধর্ম্মপথে চলিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই সম্মিলনকাল বা পরমায়ু যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়া স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন যাপন পূর্ব্বক পরমাশান্তি উপভোগে সমর্থ হইতে পারে।

মানবদেহ একটী যন্ত্রস্বরূপ। প্রাণবায়ু দ্বারা এ যন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। ত্রেতা

---

* হাঁসাইল "বাল্য-সমিতির" দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

ও দ্বাপর অপেক্ষা সত্যযুগের লোক সুদীর্ঘজীবী ছিলেন। চারিযুগ মধ্যে কলির জীবই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বজীবী। সুতরাং বর্ত্তমানকাল মানবজাতির অবনতির কাল। উন্নতির যুগে মানবস্বাস্থ্য উন্নত ছিল বলিয়াই তখনকার লোক দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইত। শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি নিকটবর্ত্তী; তাই সত্যযুগের লোকের মানসিক অবস্থা এত উন্নত ছিল। পূর্ব্বকালে মুনিঋষিগণ যোগচর্য্যা ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট খাদ্য ও ভৈষজ্যাদি সেবনে স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন লাভে সুখী হইতেন। দীর্ঘজীবন ব্যতীত ঐহিক যশঃ ও পরমার্থলাভ সম্ভব হয় না। আধুনিক লোক-সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়; এ যুগের লোক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রতিপালনে আর সেরূপ যত্ন করে না। তাই বঙ্গগৃহে বিলাসিতার শত অত্যাচার এবং দৈন্যের ঘোর হাহাকার নিত্য বিরাজিত; তাই বঙ্গবাসী আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি, তাই বঙ্গে আজকাল অকালমৃত্যুর এত বাড়াবাড়ি—অকাল বার্দ্ধক্যের এত ছড়াছড়ি।

এ জগতে যে জাতি যত সবল, সুস্থকায়, সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্ সে জাতিই তত দীর্ঘজীবী—সে জাতিই তত উন্নত ও সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন। বাঙ্গালী-বধূ কুড়ি না হইতেই বুড়ী হইয়া থাকেন, বাঙ্গালার নর-নারী পঞ্চাশ না হইতেই মৃত্যুর করালগ্রাসে ঢলিয়া পড়েন! ইহার কারণ কি? কি পাপে—কোন্ দেবতার অভিশাপে আজ বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা? বাঙ্গালীর এ অকালবার্দ্ধক্যের ও অকালমৃত্যুর কারণ কি? তাহা কি আমরা কেহ কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি?—না, আমাদের অনেকের আজও সে চিন্তার অবসরই হয় নাই। দীর্ঘকাল এরূপ স্রোতে গা ভাসাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে এ জাতির অকালধ্বংস অনিবার্য্য। আমরা জন্মিতে হয় তাই জন্মগ্রহণ করি, বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন তাই কায়ক্লেশে শাকান্ন সংগ্রহ জন্য ভিক্ষা বা গোলামবৃত্তি অবলম্বনে কিছু অর্থসংগ্রহে যত্ন করি, আর মরিতে হয় তাই নানা অত্যাচারে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অকালে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়ি। ইহাই হইল আমাদের বর্ত্তমান সমাজের লোকধর্ম্ম। জানি না, এ ধর্ম্মের সহিত পশুধর্ম্মের পার্থক্য কি? পশুরাও ত জন্মগ্রহণ, খাদ্যসংগ্রহ ও বংশবৃদ্ধি করিয়াই অবশেষে মরিয়া যায়। ইহাই কি মনুষ্যধর্ম্ম? তবে আর মানুষে ও পশুতে পার্থক্য রহিল কোথায়?

না, পশুধর্ম্ম কখনই মানবধর্ম্ম নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে জনন,মরণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনুষ্য ও পশুধর্ম্ম একরূপ হইতে পারে না। কেন না পশুরা সহজাত বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত, আর মানব জ্ঞানবিবেক দ্বারা পরিচালিত। জ্ঞান ও বিবেকের নিকট সহজাত বুদ্ধি ও সংস্কার দাঁড়াইতেই পারে না। জীবনপ্রবাহ পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এ অল্পকাল স্থায়ী জীবনে শুধু পশুবৎ ভোগসুখে নিরত থাকিলে এ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ধারণে ফল কি? জ্ঞানিগণ জানেন, একমাত্র পরমাত্মাই অবিনশ্বর নিত্যপদার্থ; তাই তাঁহারা সেই নিত্যপদার্থেরই চির-উপাসক।

এ বিশ্বে যে জাতি যত অজ্ঞান ও অশিক্ষিত, সে জাতিই তত পশুভাবাপন্ন। কিন্তু বহুদিনের আদিম আর্য্যজাতি আমরা,—আমরা পশু ভাবাপন্ন হইব কেন? একদিন শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে আমরা যে মনুষ্যত্বের সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া দেবত্বলাভে প্রয়াসী হইয়াছিলাম, সেই আর্য্যসন্তান আমরা আজ পশুপ্রকৃতি হইব কোন্ পাপে—কাহার অভি-শাপে? যে দেশ হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জন্মভূমি—সে দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন?

এ কথার উত্তর অদৃষ্টবাদীর "কপাল" নহে, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন, ব্রহ্মচর্য্য এবং নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই আজ আমাদের এ ঘোর অবনতির মূল। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাই আজ আমাদিগকে এমন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী, লালসা পরায়ণ ও বিলাসী গড়িয়া তুলিতেছে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই আজ আমাদিগকে মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বের দিকে অলক্ষিতে আকর্ষণ করিতেছে। অবশ্য আধু-নিক অর্থকরী শিক্ষাই এখনকার দিনে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ প্রয়ো-জনীয়; কিন্তু তাহার সহিত প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিগুলির শিক্ষায় সম্পূর্ণ অবহেলা করা সঙ্গত নহে। সেই অবহেলার ফলেই আজ আমরা এত বিলাসী, এমন জীর্ণ-শীর্ণ, এমন অকালবৃদ্ধ ও ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ি-য়াছি। উদ্দাম লালসা এবং ঘোর স্বেচ্ছাচারি-তাই আমাদের অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে।

চিরযৌবন ও স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন মানব মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কয়জন লোক সে জন্য যত্ন করিয়া থাকেন? কয়জন লোক স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি পালন করেন,—কয়জন লোক "ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ" এই মহাবাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন? কয়জন বাঙ্গালী প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে হিতামত আহার-বিহার ও ইন্দ্রিয় সেবন করিতে যত্ন করেন? কয়জন বাঙ্গালী ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি আহার্য্য, সাত্ত্বিক খাদ্য ফলমূলাদি, বসন্তের মুক্ত মলয় পবন ভোগ করিতে পাইয়া থাকেন? দৈন্য, ঔদাসীন্য, এবং স্বাস্থ্য-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ-তাই তাঁহাদের এ অভাব ও সর্ব্বনাশের কারণ।

মানুষকে কঠোর মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়া দেবত্বে পঁহুছিতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষায় আদর্শ হইবার নিমিত্ত কঠোর উপাসনা করিতে হইয়া থাকে। "ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ" অধ্যয়নই ছাত্রদিগের তপস্যা। পূর্ব্বে স্মরণাতীত কালে এদেশে অতি শৈশবে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরের মহা তপস্যায় এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইত। শিষ্য উপনীত হইলে—অর্থাৎ গুরু গৃহে উপস্থিত হইয়া পাঠা-রম্ভ করিলে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলা হইত। এবং পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষকাল অথবা যত দিন তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইত তত কাল তাঁহাকে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচারীব্রতের অনুষ্ঠানে জীবন ধারণ করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ শুক্র

ধারণ করা। উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীরা চির-ব্রহ্মচারী। সাত্বিক আহার-বিহারে এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশে চিত্তবৃত্তিগুলি সুসংযত হইয়া থাকে—লালসাকুল উদ্দাম মনোবৃত্তি আপনি নিবৃত্তির অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া শীতল, স্নিগ্ধ ও সুসংযত হয়। তখন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন বা শুক্ররক্ষা আর তেমন কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। এই শুক্ররক্ষা এবং নীতি-শিক্ষাও শাস্ত্রালোচনা ধর্ম্মজীবন লাভের—মানুষ হইয়া দেবত্বে পঁহুছিবার একমাত্র উপায়। ইহাই স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন লাভের একমাত্র নিদান। এ দেশের প্রাচীন মুণিঋষিরা এ পন্থা অবলম্বন করিয়াই এ বিশ্বে নরদেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

নিখিল জ্ঞানসম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ জন্ম সংস্কারকেই মানবজাতির প্রধানতম সংস্কার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রমোদ মত্ত হইয়া উদ্দাম মনোবৃত্তির চরিতার্থ করা সন্তান উৎপাদনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সুসন্তান উৎপাদন, কঠোর সংযম ও ধর্ম্ম-সাধনা সাপেক্ষ। পতি সংযত মনে শুদ্ধান্তঃকরণে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সন্তান লাভের নিমিত্ত শ্রী-ভগবানের মধুররূপ ধ্যান ও তাঁহারই পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া শুভ দিনে শুভক্ষণে সাত্বিক ভাবে—পতিগতপ্রাণা পবিত্র হৃদয়া সংযমশীলা শুদ্ধমতী ঈশ্বরচিন্তানিরতা পুত্রার্থিনী ঋতুমতী* পত্নীতে প্রফুল্ল চিত্তে অপত্য উৎপাদন করিবেন, ইহাই আর্য্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ এবং শরীর-বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিধান। সন্তান-উৎপাদন কালে জনক জননীর মনের ভাব যেরূপ থাকে, সন্তানের মনের ভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। তৎকালে দম্পতীর মনে আসুরিক ভাবের বিকাশ পাইলে—তাঁহারা সুরাপানাশক্ত ও আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া পশু-দম্পতীর ন্যায় সন্তান উৎপাদনে প্রয়াস পাইলে—সন্তানের মন-প্রাণও যে অধঃপতিত, নীচগামী এবং পশুভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বরং ঐরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক, এরূপ ভাবজাত সন্তানের শারীরিক তাড়িত প্রবাহ অধোগামী হয়, এবং

* ঋতুর প্রথম রাত্রি হইতে ১৬ শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল তন্মধ্যে প্রথম পাঁচ রাত্রি স্বামি-স্ত্রী সম্মিলন নিষিদ্ধ অবশিষ্ট কয় রাত্রিতে নিষিদ্ধ তিথি ও পর্ব্বদিন (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা) ব্যতীত পতি-পত্নীর মিলন হইতে পারে। দম্পতীর যুগ্ম রাত্রির সম্মিলনে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রির সম্মিলনে কন্যাসন্তান জন্মিয়া থাকে। ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত সময় মধ্যে শেষভাগে উৎপন্ন সন্তান সমধিক শ্রীমান, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়।

মনু বলেন, প্রথম ৪ রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি নিষিদ্ধ; অবশিষ্ট দশ রাত্রি দম্পতী সম্মিলনে প্রশস্ত কাল। কিন্তু চরকের মতে ৪র্থ রাত্রি নিষিদ্ধ নহে। এসব বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে মাসে দুই দিনের অধিক দাম্পত্য সম্মিলন অসম্ভব। এদেশে একটা প্রবাদ আছে যে,—"মাসে এক, বছরে বার, তার পর যত কমা'তে পার।" শুক্র প্রবাহ রক্ষার্থ এরূপ বৈধ ক্রিয়ায় গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না।

দিনে, প্রাতে, সন্ধ্যায়, গর্ভাবস্থায় ও ঋতুকালে দাম্পত্য-মিলন নিষিদ্ধ। উহাতে সন্তান বধির বিকলাঙ্গ ও চিররুগ্ন এবং পুরুষ ধাতুদৌর্ব্বল্য ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়—এমন কি তাঁহার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষুজ্যোতি ও পরমায়ু পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

উহারা একরূপ তরুণ বয়সেই ঘোরতর বিলাসী, অমিতাচারী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া পড়ে। উহাদের পক্ষে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত প্রতিপালন অসম্ভব।

ঋতুকালে ঋতুমতী যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন বা চিন্তা করেন, সন্তানের আকৃতি প্রকৃতি ও তদনুরূপ হওয়াই সম্ভব। এজন্য ঋতুকালে বিশেষতঃ ঋতুস্নানান্তে আর্য্যমহিলাগণ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের মূর্ত্তি দর্শন বা চিন্তা করেন না। এ দেশে ঋতু-স্নানান্তে দেব-মূর্ত্তি, আদর্শ মহাপুরুষগণের পবিত্র চিত্র, অথবা সূর্য্য দর্শন এবং তাঁহাদের ধ্যান (চিন্তা) করিবার একটি সুন্দর প্রাচীন প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। ঋতুকালে জননীর মন সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ থাকিলে সন্তানের মনও দেবভাবপূর্ণ হয়, এবং তৎকালে, মাতার মনে আসুরিক ভাব বিদ্যমান থাকিলে, সন্তানের মনেও পাশবিক ভাবের প্রাবল্য হয়। যে সকল সমাজে স্বামি পরিত্যক্তা বা বিধবা রমণীর পুনঃ পতিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ নারীর সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব স্বামীর কোনরূপ শারীরিক-সংস্রব না থাকিলেও প্রসূতীর অভিনব পতিজাত সন্তান, পূর্ব্ব পতির অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। অনেক সময় সন্তান যে বহুল পরিমাণে মাতার চিন্তা শক্তির অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধত্ব এবং পাণ্ডুরাজার পাণ্ডুত্ব প্রভৃতি পৌরাণিক সত্যও কি এ কথারই সমর্থন করিতেছে না?

নিরন্তর ধর্ম্মশীলতা, মিতাচার, মিতাহার, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, দান-ধ্যান, আরাধনা, উপাসনা বা তপস্যা কিংবা দেবতার আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল না হইলে, কেহ ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবি সন্তান লাভে সমর্থ হইতে পারে না। অসংযমী, অধার্ম্মিক ও উৎশৃঙ্খল প্রকৃতি নরনারীর সন্তান জন্মিলেও সেরূপ পিতামাতার সন্তান ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ, মেধাবী, সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হইবার আশা খুবই কম। এজন্যই ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিলাসী বড়লোকেরা প্রায়ই নিঃসন্তান হইয়া থাকেন। এবং প্রায় অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের সন্তানগণও তেমন বলবান, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী, ধর্ম্মশীল ও দীর্ঘজীবি হইতে দেখা যায় না। উৎকৃষ্ট বীজ ও উর্ব্বরা ভূমি এবং অনুকূল জল-বায়ু ব্যতীত উত্তম শস্য লাভের আশা করা যায় না। সুসন্তান সুপিতামাতারই অঙ্গভূষণ।

জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিলে ধার্ম্মিক, বলবান ও দীর্ঘজীবি সন্তান জন্মিবে কেমন করিয়া? উৎকৃষ্ট বীজের ন্যায় উৎকৃষ্ট শুক্রই সুসন্তান লাভের একমাত্র নিদান। যোগ ও দেবারাধনা প্রভাবে মন নির্ম্মল, সুসংযত, ধর্ম্মভাব পূর্ণ ও বিমল আনন্দযুক্ত হয়। মানুষের এ অবস্থাই সুসন্তান লাভের প্রকৃষ্ট অবস্থা। বহুতত্ত্ববিদ্ চিন্তাশীল আর্য্যঋষিরা এসব তত্ত্ব ভালরূপ জানিতেন বলিয়াই হিন্দু-শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের এত প্রশংসা—বীর্য্য ও চরিত্র রক্ষার এত আদর।

শরীর সর্ব্বাবয়বপূর্ণ ও সুগঠিত না হইতে

রেতঃস্কন্দন সম্পূর্ণ অবিধি। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচারীগণ ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন এবং অন্যান্য রসায়ন বিধানগুলিও সর্ব্বত্র পালন করা হইত। সে যুগের লোক "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" প্রভৃতি বিধান অতিক্রম করা মহাপাপজনক মনে করিতেন। তাঁহাদের এত অসাধারণ মনস্বীতা, আধ্যাত্মিক বল এবং সবল, সুস্থ ও সুখ-শান্তিপ্রদ দীর্ঘজীবন লাভের ইহাই নিদান। ভোগের কালিমা অপেক্ষা ত্যাগের মহামন্ত্রই – প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির পূজাই তাঁহারা ভাল বুঝিতেন ; তাই এ সুদীর্ঘ কাল পরে আজও প্রাচীন আর্য্যসমাজকে আদর্শ লোক-সমাজ বলিয়া এ বিশ্ব গৌরবের পুষ্পাঞ্জলি দানে কুণ্ঠিত নহে।

অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা ও স্বেচ্ছামত আহার-বিহার আধুনিক অধিকাংশ লোকের নিত্যব্রত হইয়া পড়িয়াছে। তাই নিত্য ব্যাধি—অকাল জরা তাহাদের অঙ্গভূষণ! যৌবনের পূর্ণ বল, অসাধারণ কর্ম্মশক্তি এবং দেবতুল্য শরীরকান্তি এ দেশ হইতে বহু দিন অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক বাঙ্গালী যুবকের মন নিস্তেজ, মানসিক বৃত্তি অবিকশিত—স্ফূর্ত্তিহীন, মুখ নিয়ত ম্লান, চক্ষু কোটরগত, বাহু দুর্ব্বল, দেহ সর্ব্বকার্য্যে মহা অলসতাপূর্ণ! তাঁহারা অনেকেই প্রায় পূর্ণ যৌবনেই শুক্লকেশ ও ক্লীবভাবাপন্ন অকাল বৃদ্ধ! ঋতু পরিবর্ত্তনের সামান্য পরিবর্ত্তনেই তাহারা পীড়িত হইয়া সর্দ্দি-কাশির ভয়ে চা-চুরুটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের কল্যাণে সোমরসের দেশ এখন তীব্র সুরা-স্রোতে প্লাবিত! আয়ুর্ব্বেদীয় অমৃত কুম্ভের অমূল্য সুধা চ্যবনপ্রাশের স্থানে এখন বিদেশীয় কড্‌লিভার অয়েল ও সিরাপে সমাচ্ছাদিত! এরূপ কত দিকে কত আছে, কত দেখাইব? হায়! রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সমূহের জন্মভূমি এখন অকালবৃদ্ধ ক্লীব ও বালখিল্যে পরিপূর্ণ!—স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য এবং শ্বাস, কাস ও ক্ষয় এখন বাঙ্গালীর জীবনসহচর।

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যং" বীর্য্য (শুক্র) ধারণই ব্রহ্মচর্য্য। নিরামিষ ভোজন এবং শত কঠোর নিষেধ-বিধির নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও যদি বীর্য্য ধারণে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত রক্ষা হয় না। আর যদৃচ্ছা মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিয়া শুক্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে তাহাতেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু পিয়াজ, রসুন ও মদ্য-মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ—রাজসিক ও তামসিক আহার-বিহার করিয়া নিয়ত আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় ডুবিয়া থাকিয়া বীর্য্যরক্ষা করা বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নহে ; তাই ব্রহ্মচারীর নিকট সাত্ত্বিক আহারবিহার ও বিলাসিতা বর্জ্জন প্রভৃতি কঠোর বিধান সমূহের এত আদর।

ব্যায়াম ব্রহ্মচর্য্যের পরম সহায়। ব্যায়ামে মানব শরীর সবল, স্বাস্থ্যবান ও সুগঠিত, মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তি পরিবর্দ্ধিত, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূর এবং মন স্থির হয়। ব্যায়াম ও ব্রহ্মচর্য্য ঐহিক সুখ-শান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম সহায়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুতে মানব শরীর গঠিত। ইহারা দেহ ধারণ করে বলিয়াই ধাতু নামে অভিহিত।

"রসাদ্রক্তং ততোমাংসো মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জাৎ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥
(আয়ুর্ব্বেদ)।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে রসের সারভাগই রক্ত, রক্তের সারভাগই মাংস, মাংসের সারভাগই মেদ, মেদের সারভাগই অস্থি, অস্থির সারভাগই মজ্জা এবং মজ্জার সারভাগই শুক্র। ভুক্ত দ্রব্য রসে পরিণত হইতে এক অহোরাত্রের প্রয়োজন; এইরূপে এক মাসে খাদ্য পদার্থের এক সপ্তমাংশ শুক্রে পরিণত হয়। অর্দ্ধ সের রক্ত হইতে বিন্দু পরিমাণ শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্র যে অতি মূল্যবান সার পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; শুক্রই মানুষের জীবনী শক্তি। এই শুক্র সুদৃশ্য শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং শক্তি ও পুষ্টিজনক। ইহাই গর্ভবীজ এবং ইহাই জীবনের প্রধানতম সম্পদ এই শুক্রসার হইতে "ওজঃ" নামধেয় এক মহা তেজস্কর বস্তুর উদ্ভব হয়; ইহাই জীবনের একমাত্র আশ্রয়। ওজঃ ধ্বংসে জীবন ধ্বংস হয়। তাই বীর্য্যধারণ বা ব্রহ্মচর্য্যের এত গৌরব।

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥"
(শিব-সংহিতা)।

বিন্দুপাতেই মৃত্যু, বিন্দু ধারণেই জীবন; এ জন্য যোগীগণ সযত্নে বিন্দু (শুক্র) ধারণ করিয়া থাকেন। একমাত্র অতিরিক্ত বীর্য্যপাত—বিশেষতঃ অনৈসর্গিক বীর্য্যক্ষয় হইতে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ ক্ষতি সংসাধিত হইতে পারে। অপরিমিত ও অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত মহা অনর্থের নিদান। ইহা হইতে না জন্মিতে পারে এমন ব্যাধি নাই। এক কথায় বলিতে গেলে অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক রেতঃস্খলনই ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী। বীর্য্য রক্ষা ব্যতীত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ সম্পুর্ণ অসম্ভব। এ জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের এত গৌরব।

"সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে,
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ॥"

মহাযত্নে বিন্দুসিদ্ধি লাভ করিলে (ঊর্দ্ধরেতাঃ হইলে) এ বিশ্বে কোন কার্য্যই অসাধ্য হয় না। এই বিন্দু সিদ্ধি (শুক্ররক্ষা) প্রভাবেই আমি (ভগবান শঙ্কর) এইরূপ মহিমা লাভ করিয়াছি।

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু সদেবো নতু মানুষঃ॥"

কোন তপস্যাই তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা; ঊর্দ্ধরেতা মানুষ নহেন, তিনি দেবতা।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্য প্রচক্ষতে॥"

মনে, মুখে ও বাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় বীর্য্য রক্ষার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

"আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণাম্ সংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

ইন্দ্রিয় উচ্ছৃঙ্খলতা বিপদের এবং ইন্দ্রিয় জয়ই সম্পদের পথ; যে পথ ভাল তাহাই অবলম্বন করিতে পার।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥"

রজোগুণ হইতে কাম ও ক্রোধের উদ্ভব হইয়াছে; মহাপাপজনক ভোগেও উহাদের তৃপ্তি হয় না; উহাদিগকে মহাশত্রু মনে করিবে।

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর বিমো-
ক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

এ শরীর ধ্বংস হইবার অগ্রে যে কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারে, সে ব্যক্তিই ধীর ও সুখী।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

কবিকুঞ্জ।

বজ্রাঘাত।

মিলন আনন্দপূর্ণ প্রথম যৌবনে
নিরাশায় ঢাকি' হৃদি হরি' প্রিয়জনে
আজি যে হানিলে শিরে অশনি ভীষণ
তোমার প্রেমের দান বুঝিনু এখন।
আলোকিয়া বজ্রানলে হৃদয়কন্দর
দেখাইলে হের বিশ্ব বড়ই সুন্দর
মেঘের আড়ালে যথা নক্ষত্র নির্ম্মল
লুক্কায়িত দীপ্তমান, তেমতি সকল।
বিশ্বের ভঙ্গুর তুচ্ছ সৌন্দর্য্যের পিছে
শাশ্বত সৌন্দর্য্য তব নিত্য বিকশিছে
সংসার সম্বন্ধে মোর প্রিয় পরিজন
সব পর, শুধু তব সম্বন্ধে আপন।
বিদ্যুতে চমকি হিয়া দিয়া বজ্রাঘাত
ভুলভাঙ্গি' এইরূপে বুঝাইও নাথ।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

প্রভাত।

নিঝুম রাতের কূজন তানে,
ভেঙ্গে গেল ঘোর
জেগে উঠল অমনি সবাই
দিয়ে প্রেম ডোর!
গাইছে বিহগ আপন মনে
যাচ্ছে নদী বয়ে
ফুরফুরে বায়, ফুলের গন্ধ
আনছে কত নিয়ে!
প্রেমিক আপন প্রিয়ায় পেয়ে
হর্ষে মৃদু হাসে
দুইটী পরাণ একের লাগি
ধীরে ধীরে মেশে।
বনের মাঝে "বউ কথা কও"
গাচ্ছে পাখী গান
মিলন মধুর প্রভাত গীতি
তুলে নব তান।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

গয়ার ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতাংশের পর)

গয়া জেলার মধ্যে নবাব দাউদর্খার পৌত্র দাউদনগর নিবাসী আহম্মদ খাঁ ই কেবল নিজ গাউশগড়ের দুর্গে সুরক্ষিত থাকিয়া মহারাষ্ট্র বীরগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধাবস্থায় কিছুকাল থাকিয়া শেষে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পান। দুই বৎসর পরে রঘুজী ভোঁশলা গয়া লুণ্ঠন করিয়া সাসেরাওর জঙ্গল হইতে মস্তফা খাঁর অনুচরবর্গকে উদ্ধারসাধন করিয়া বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহার পর গয়া জেলায় কিছুদিন পর্য্যন্ত শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। ১৭৭৭ সালে বিহারের ডেপুটী গভর্ণর রামনারায়ণ সিংহ শিরিশকুটুম্বার জমিদার পাওয়াই ও মালী-ডালী-রাজ রাজা বিশুন সিংহের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুরের বন্দোবস্তি রাজকর দিতে অস্বীকৃত হইলে এক অভিযান লইয়া দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ডেপুটী গভর্ণর বাহাদুরের পরাক্রান্ত সৈন্য দেখিয়া নবাব সুজাদ্দৌলার মৃত্যুর পর হইতে এ তাবৎকালের যাবতীয় বকেয়া রাজস্ব সমস্ত আদায় দিয়া ইংরাজরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সময় নরহট্টের সামন্ত নবাব কামগার খাঁর সাহায্যে সম্রাট সাহ আলম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বীয় প্রাধান্য ও স্বামীত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বিহার সুবা আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলে ইংরাজ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব নাজীম তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য একদল প্রবল সৈন্যসহ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয় দলে রাঢ়ে এক তুমুল যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্য পরাজিত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিলে সম্রাটের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। অবশেষে সম্রাট এবং নবাব কামগার খাঁর সৈন্যদল টিকারী, পাওয়াই প্রভৃতির রাজাগণের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া রাঢ় যুদ্ধ-পরাজয়ের পরিশোধ তুলিতে লাগিলেন। এই লুণ্ঠনকারী সৈন্যদলকে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য আশু দমন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিলে, একদল ইংরাজ সৈন্য মেজর কার্ণাকের নেতৃত্বে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরণের অধীনে তাঁহার এবং ডেপুটী গভর্ণর রাজা রামনারায়ণের যুক্ত সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইয়া মানাপুরের যুদ্ধে ১৭৬১ সালে সম্রাটপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া গয়া জেলাকে শত্রুমুক্ত করিলেন। এই সময়ের পরে গয়া জেলা নবাব মীরজাফরের অধীনে স্থাপিত হয় কিন্তু মীরণ ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করায় পুনশ্চ ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীরণ এবং বাদসাহ সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে গয়া, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সহিত ইংরাজ অধিকারে নীত হইল।

এ দিকে সহকারী বা ডেপুটী গভর্ণর নবাব হেদায়েৎ আলি খাঁ হুসেনাবাদে থাকিয়া সোনপুরার রাজাকে শাসনে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি জাপলা পরগণার মাহুরমগর-দহ মহালের অন্তর্গত কতকগুলি তালুক ও অন্যান্য কতিপয় লাভজনক মৌজা বাদশাহদত্ত

পূর্ব্বলিখিত ফারমান বলে খাসে রাখিয়া বক্রীগুলি সোনপুরারাজ দম্বরনাথ সাহী সিংহ দেওকে ফিরাইয়া দিয়া সোনপুরা রাজকে স্বীয় পৈতৃক গদীর উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত নগর হোসেনাবাদে স্বীয় জীবনের শেষভাগ যাপন করিয়া পরলোকগমন করেন। নবাব হেদায়েৎ আলি খাঁ খুব উচ্চ হৃদয়, দয়ালু ও পরোপকারপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যার বংশধরগণ হোসেনাবাদের বর্ত্তমান নবাববংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সাইর মতাক্ষরীণের লেখক নবাব গোলাম হোসেন খাঁ নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুর্শিদাবাদের দরবার হইতে নিজ নামে ফারমান ও সনন্দপত্র আনাইয়া লন। এই সময়ে তাঁহার সহিত সোনপুরা রাজার খুবই বিবাদবিসম্বাদ হয় কিন্তু ইংরাজের মধ্যস্থতায় তাহা একরূপ মীমাংসা হইয়া যায়। সোনপুরা রাজের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে উচ্ছেদ করিয়া, নবাবগণ ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট তায়দাদী টাকা করস্বরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোনপুরা রাজগণ জাত্যংশে অকুলীন হইলেও আমী-ডামী ও পাওয়াইর রাজবংশের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠাবান হইয়া পড়িয়াছেন। সোনপুরার রাজবংশে বহোরিয়া আলমবাসী কুঁয়ার একজন বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী রাণী ছিলেন। ইনি পাওয়াই রাজ রাজা বিশুন সিংহের কন্যা এবং সোনপুরারাজ দম্বরনাথ সিংহ সাহীদেবের পুত্রবধূ ছিলেন। জাপলা এবং বিলৌঞ্জা পরগণার সম্রাট মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক নবাব হেদায়েৎ আলি খাঁর সহধর্ম্মিণী মুসম্মাৎ আমাতুল জোহরা বেগমকে (সাইর মতাক্ষরীণ লেখক গোলাম হোসেন খাঁর মাতা) আল্‌তামগ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই রাজকীয় দানসূত্রে নবাব এবং রাজার মধ্যে বহুকালব্যাপী ঝগড়া ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়; অবশেষে ইংরাজের মধ্যস্থতায় সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

সোনপুরারাজের এই বিবাদে তাঁহাদের পুরোহিত বংশ কাজরু-পাঁড়ুর পাঁড়ে, মোতীরাম এবং তাঁহার জ্ঞাতিগণ সৈন্য আদি দিয়া খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। কীতাত, হায়দরনগর, ডালা, মোরবে, কাদল, পাঁড়েপুরা প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে এই পাঁড়েবংশ খুব সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া সোনপুররাজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কাজের জন্য সোনপুরারাজ উক্ত পাঁড়ে মোতীরামকে মৌরশী মোকররী ইস্তমরারী পাট্টাসূত্রে কাজরু ষ্টেটের অন্তর্গত চাঁচাবার, ডালা, রতনাগ, কাজরু ইত্যাদি মৌজাসমূহ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পাঁড়েগণের এই বিশাল ষ্টেটে নানাবিধ জঙ্গলি কাষ্ঠ, চুণ, লৌহ, তামা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ আছে। তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পাঁড়ে মোতীরামের পৌত্র পাঁড়ে রণজীৎরাম এই বিশাল জমিদারী ১৮৬৭ সালে পাঁড়ুর পাঁড়ে শিবরত্নরাম, গোবর্দ্ধনরাম আদির সহিত হকীয়তী, দেওয়ানী মোকর্দ্দমার ব্যয়ভার সঙ্কুলন জন্য সর্ব্বপ্রথমে গয়ার সে কালের প্রখ্যাত গভর্ণমেন্ট উকীল বাবু উমেশচন্দ্র সর-

কারের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করেন। ক্রমে ক্রমে পাঁড়ে রণজীৎরাম ও তাঁহার চারি পুত্র ও পৌত্রগণ উমেশ বাবুর নিকট হইতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ঐ সম্পত্তিসমূহ বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ করেন। ১৮৮৪ সালে শেষ খত হয়। তাহার পর হইতে পাঁড়ে অধমর্ণগণ ঐ টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় অবশেষে ১৮৯২ সালে গয়ার জজ আদালতে মকর্দ্দমা রুজু করা হয়। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত বহু আদালতে বিবাদের পর উক্ত সম্পত্তি উমেশ বাবু পরলোক গমন করিলে বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার এই বিশাল জমিদারী খরিদ করিয়া বহু আয়াসে খাসদখল করেন। এখন এই "সোনারথাল" বিশাল কাজরু জমিদারিটী সরকার ভূম্যধিকারীগণের বিশাল ষ্টেটভুক্ত। *

এই পর্ব্বতসমন্বিত দেশের সুন্দর বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক এই পর্ব্বতের উপর অনেকগুলি স্তূপ চৈত্য এবং বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া অত্র স্থানে বুদ্ধদেবের আগমনের কথাটি স্মরণ রাখিবার পথ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ গয়ার বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া তাহার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গুণমতি মঠের ২০ লি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হুয়েন সাঙ লিখিত শিলাভদ্র মঠ অবস্থিত ছিল।

ইংরাজ যুগের মধ্যে গয়া জেলার যে সকল সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা একপ্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি। ইংরাজাধিকারের ইতিবৃত্ত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়; সেইজন্য এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশটিকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল, তাহার তরঙ্গ গয়া জেলাকে অব্যাহত রাখে নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে মহান্ তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল; সেই তরঙ্গাঘাত গয়া জেলায়ও পতিত হইয়া সাধারণ নিঃস্ব অধিবাসিগণের অশেষ প্রকার দুঃখ ও যন্ত্রণা আনয়ন করিয়াছিল। মিরাট্, কানপুর,বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়ার, ঝান্সী প্রভৃতি স্থানে যে সকল লোমহর্ষণ অভিনয় অভিনীত হইয়াছিল, সেইরূপ দৃশ্য গয়া জেলায় অভিনীত না হইলেও আরা জেলার বাবু কুঁয়ার সিংহ ও অমর সিংহের প্রভাব বশতঃ গয়া জেলাও স্থির থাকিতে পারে নাই। সেই সময় গয়ায় মিঃ এ, মোসী সাহেব কালেক্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। সহসা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিদ্রোহীগণ অসহায় ইংরাজ ললনাগণকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া, জেল ভাঙ্গিয়া, খাজানা লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসিগণের সরল হৃদয়ে মহা ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল; ইহার ফলে বিদ্রোহীগণ সাহসী হইয়া দেশে অধিকতর অত্যাচার আরম্ভ করায় জনগণ

* ১৩০২ সালের ভারতী ৩২৫ পৃষ্ঠা।

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। গয়া জেলার অবস্থা বরাবরই শান্তিযুক্ত ছিল; কিন্তু কাশীর অশান্তি ও সিকরোলে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পরেই গয়ার অবস্থা অশান্ত হইয়া পড়িল, স্থানীয় গুণ্ডা ও বদমায়েশগণ দুর্ব্বলের ও হীনের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, বদলোকে স্থানীয় নিঃসহায় ইংরাজ কর্ম্মচারী ও তাহাদের স্ত্রী ও বালকদের হত্যা করিবার সংকল্প করায় স্থানীয় ভদ্রলোকগণ ভীত হইয়া উঠিল। বেনে, চৌধুরী ও দোকানী পসারি হাট বাজার বন্ধ করিয়া ফেলিল, বদমাশগণ দিনে লুট্‌পাট আরম্ভ করিল, রাজশক্তি ও কোম্পানি-বাহাদুরের শাসন যেন জেলা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে (১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই) একদল সরকারী সৈন্যকে সহরঘাটী হইয়া গয়ায় আসিবার জন্য কলিকাতা হইতে আদেশ হয়; ঐ আদেশ মতে ৬৪নং দেশীয় পদাতি দল রাণিগঞ্জ হইতে সেরঘাটী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা দিয়া কুচ্ করিয়া আসিতে লাগিল। তাহারা কতকদূর পশ্চিমে আসিয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং নিজেদের কাপ্তান সাহেবকে গুলি করিয়া দেশ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে মোসী সাহেব কালেক্টারের স্কন্ধে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও অর্পিত হয়। কাজেই এই বিপদপূর্ণ সমস্যার সময় অসহায় অবস্থায় মোসী সাহেব কয়েকটি মাত্র বরকন্দাজ ও শীখ পদাতিক সৈন্য লইয়া গয়া রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। মোসী সাহেব কলিকাতায় বড় লাটের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন বটে কিন্তু সাহায্য এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পহুঁছিল না। গভর্ণমেণ্টের কোষাগারে এ সময়ে ৭ লক্ষ টাকা বর্ত্তমান ছিল এবং কাশী হইতে ১২ লক্ষ টাকা দুই তিন দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিল; ইহার জন্য কালেক্টার আরও অধিকতর ভীত হইলেন যে যদি বিদ্রোহীগণ এই অনুসন্ধান পায় তাহা হইলে গয়ানগর রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে; সেইজন্য তিনি নগরে শান্তি ভঙ্গ যাহাতে না হয় তজ্জন্য একদল গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নগরের যাবতীয় বদলোক ও বদমাশদের ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোনটিকে বিনা বিচারে গাছে ঝুলাইয়া দিয়া ফাঁসী দিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদল বিদ্রোহী টীকারীর দিক হইতে আসিয়া গয়ানগর লুণ্ঠন করিয়া জেলের কয়েদীগণকে তালা ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিল এবং খাজানা লুণ্ঠনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া রেকর্ড ঘরে অগ্নি ধরাইয়া দিয়া উজীরগঞ্জাভিমুখে ধাবিত হইল। ইহার পূর্ব্বেই মিঃ মোসী সাহেব গয়া ট্রেজারিতে যে টাকা ছিল, তাহা ৺প্রসন্নকুমার সরকার মহাশয়ের সাহায্যে নগরের যাবতীয় গোশকট ধরিয়া আনাইয়া স্থানীয় ইংরাজ সৈনিক পুরুষগণেরও সেখ গার্ডগণের তত্ত্বাবধারণে ও ৬৪নং ও ৪৫নং পদাতিক দলের সংযোগে রাণীগঞ্জ হইয়া কলিকাতায় নিরাপদে পাঠাইয়া দিলেন। টাকা যাইবার সময়ে অর্থলোলুপ বদমায়েশগণ কিছু গোলযোগ করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে কিন্তু মিঃ মোসী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের লৌহময় কঠিন আদেশে কতকগুলি বদমায়েশ বিদ্রোহী-

গণকে হতাহত করিলে, তবে সব আশঙ্কা দূর হইল এবং যথা সময়ে টাকা কলিকাতায় পহঁছিয়া গিয়াছিল। এই কার্য্যের জন্ম পরে মোসী সাহেব লাটবাহাদুরের নিকট হইতে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। এই জেলায় বিদ্রোহীগণের নেতা হইয়াছিলেন নরহট্ এবং তে সোঢ়ার হায়দার আলি খাঁ। ইঁহার প্রধান আড্ডা-ইঁমুয়ায়ও ছিল। উজীরগঞ্জ ইলাকায় ডাকাত শ্রেষ্ঠ খুশীয়াল সিংহ, গয়ানগরের কতিপয় লুণ্ঠন প্রিয় গয়ালী, অওরঙ্গবাদ থানার ইন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহীগণ বিশেষ অশান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু ধন্য ভগবানের মহিমা, এক এক করিয়া বিদ্রোহী নেতাগণ ধৃত হইয়া কাছারির কম্পৌণ্ডের নীম, বেল ও অন্যান্য গাছে ঝুলাইয়া বিদ্রোহের শান্তি করা হইল। ২৫শে আগষ্টে মোসী সাহেব কলিকাতায় টাকা রাখিয়া আসিয়া এবং বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গয়ায় পুনশ্চপ্রত্যাবর্ত্তন করিলে এই সময়ে কাপ্তেন রাট্রের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য কাশী হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করিয়া গোহ, দাউদনগর কাশনা, ডুমরা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে করিতে উত্রেনের সন্নিকট পারাইয়া গ্রামে মোরহর নদীর তীরে বিশ্রাম স্থান স্থাপন করিয়া কুচ্ করিল। মোসী সাহেব স্বীয় চর মারফৎ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে টীকারী রাজ মহা রাজা মিত্রজীব সিংহ বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করিতেছেন এবং টীকারী দুর্গে কামান সাজাইয়া ইংরাজ সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন যে কাপ্তেন রাটের অধীনে যে পদাতিক সৈন্য ছিল, তাহার সহিত নিজ সংগৃহীত দেশী সেখ ও নজীব সৈন্য উভয়ে সংযোজিত করিয়া টীকারী অবরোধ করিয়া সহরটিকে উড়াইয়া দিবেন কিন্তু ইহা সময় সাপেক্ষ এবং অবরোধের জন্য তখন যথেষ্ট সৈন্যও ছিল না; অধিকন্তু সাহেবের ২১৩ জন বিশ্বস্ত চর আসিয়া মহারাজ টীকারীর বিদ্রোহী দলের সহিক নিলির্প্ততার পোষকতা করিল। মোসী সাহেব রাজাকে তলব করিলেন, রাজা করযোড়ে উপঢৌকনাদি সহ আসিয়া কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার ও মিত্রতা ভিক্ষা করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, বিদ্রোহীগণ তাঁহার নগর দুই বার লুণ্ঠন করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে, তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। মহারাজ ৩০০ বাছাই সৈনা বহেলিয়া বিধার ব্রাহ্মণ পদাতি হইতে মোসী সাহেবকে জেলায় শান্তি স্থাপন করিবার জন্য দিলেন। এই অবসরে কাশী ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ৫ নং ইর্‌রেগুলার পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া বহুসংখ্যক বিদ্রোহীদের সহিত টীকারী লুণ্ঠন করিতে আসিতেছিল। তাহারা সংবাদ পাইল যে, নিকটেই মেজর রেট্রের দল যুদ্ধ সজ্জায় সন্নিকটস্থ গ্রামে কুচ করিয়া আছে এবং সহর ঘাটীর দিক হইতে মেজর ইংলিশ ৫৩ নং পদাতি সৈন্যদল সহ শনৈঃ শনৈঃ রেট্রের সহিত সংযোগ করিবার জন্য আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী দল কিছু স্তম্ভিত হইয়াছিল। ভিন্ন

হইয়া একদল পশ্চিম দিকে সোন নদ পার হইয়া সাহাবাদ অভিমুখে লুট্‌পাট্ করিতে করিতে পলায়ন করিল, একদল হোসেনাবাদ হইয়া পালামু জেলায় প্রবেশ করিয়া রামগড়াভিমুখে ধাবিত হইল এবং আর একদল উত্রেন, টীকারি ও গয়া যত্নে পরিহার করিয়া গয়ার ১৪ মাইল পশ্চিমে উজীরগঞ্জে গিয়া লুট্‌পাট্, মারপীট করিতে লাগিল। এই সংবাদে টীকারি আক্রমণাশা ত্যাগ করিয়া মেজর ইংলিশ, মেজর রেট্র এই বিদ্রোহীদলকে আক্রমণ করিবার জন্য উজীরগঞ্জাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গয়া হইতে কালেক্টার মোসী সাহেবও একদল রক্ষী লইয়া ঐ সৈনিক পুরুষদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে ৩২ নং এবং ৫ নং পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া দেওঘর ও খড়কডীহা এবং নওয়াদা হইয়া উজীরগঞ্জের এই বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মেজর রেটে ও মেজর ইংলিশ বিদ্রোহীগণকে বিষ্ণুপুর টাড়োয়ার মাঠে ঘিরিয়া গুলি ও কামান বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অল্পকালের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহীগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহুজন যুদ্ধে হতাহত হইল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পলাইয়া গিয়া নওয়াদার সন্নিকট বিদ্রোহী নেতা হায়দার আলী খাঁর হালুয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইখানে একটী ছোট খাট গোছের বেশ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পুনশ্চ বিদ্রোহীদল পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উত্তর এবং পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিল। রাজমহলের দিক হইতে একদল বিদ্রোহী আসিয়া উত্তরদিকে পলায়মান বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইল; ইহারা যে যে পথ গ্রাম দেশ দিয়া যাইল সেই সেই দিক মরুভূমি করিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বগামী বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইয়া দেশে মহা অশান্তি উপস্থিত করিল এবং জাহানাবাদের নিকট ছাউনী স্থাপন করিয়া গয়াকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। মেজর ইংলিশ ও কাপ্তেন রেটের দল আসিয়া মুকদুমপুর ও জাহানাবাদে উপর্য্যুপরি দুইটি যুদ্ধে বিদ্রোহীদলকে এককালীন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া নওয়াদা ও জাহানাবাদ শত্রুমুক্ত করিলেন। এই দুই স্থানে শান্তি স্থাপন ও রক্ষণের ভার মোসী সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়া সৈনিক পুরুষদ্বয় উভয়ে দাউদ নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একজন সের সাহী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইয়া সহরঘাটি দিয়া এবং অপর জন টিকারী, কোঁচ, গোহ, বাখানী হইয়া তুরুক তেলপা দিয়া দাউদনগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোহ, পরোয়েজাবাদ, কাড়া এবং দাউদনগরের বিদ্রোহীগণের সহিত মেজর রেটে ও ইংলিশের সাহসী ও সুশিক্ষিত সৈনিকদলের সহিত যুদ্ধ হয়; সকল গুলিতেই বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়া কুয়ার সিংহের হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আশা আকাশ-কুসুমের মত জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজ-কেশরীর দুর্দ্দম্য বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। গয়া জিলার শান্তি পুনঃ

স্থাপিত হইল, ইংরাজ পতাকা উড্ডীন হইল, দেশের লোক নিরাপদে ইংরাজ-কেশরীর বল বিক্রমের শান্তিময়ী ছায়ায় বিদ্রোহের দিনের অত্যাচারের কথা ভুলিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল এবং নিজেদের সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল। গয়ায় ৺রামচরণ লাল পেশকার, ৺শ্যামলাল মিত্র, ৺ছোটলাল সিজুয়ার, গয়ালী; ৺প্রমথ কুমার সরকার, ৺রামহরি ঢেঁড়ী গয়ালী, প্রভৃতি এবং সহরঘাটিতে ৺আনন্দ কুমার রায় এবং রজব আলী দারোগা লোকজন সংগ্রহ করিয়া বদমাশ বিদ্রোহী-দলকে লুট পাট হইতে বিরত রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কার্য্যদক্ষতায় স্থানীয় ইংরাজগণের ধন-মানাদি অব্যাহত ছিল। এই রূপে গয়ায় বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল।

"আমার সই।"

জীবনের প্রভাতে সবেমাত্র সূর্য্য উঠিতেছে, উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালনে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি সুখ শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তটিনীর কূলে যাইয়া কত রঙ্গে খেলা করিতেছি—কত রকমের সাদা, কাল, লাল, নীল বর্ণের পাথর কুড়াইতেছি—তন্মধ্যে কোনটা রাখিতেছি, কোনটা বা ফেলিয়া দিতেছি; এইরূপে আপন খেলায় আমি আপনি বিভোর হইয়া আছি।

সারাদিন ব্যাপিয়া খেলিলাম তথাপি আমার খেলিবার লালসা "কি যেন কেমন" অতৃপ্ত রহিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া শ্রান্তকায়ে পশ্চিম গগনের নিভৃত অংশ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি কিন্তু আপন মনে পূর্ব্ববৎ খেলিতেছি এবং দিনমণির আলস্য ভাব দর্শনে তাঁহাকে ধিকার দিতেছি, তাহাকে আমার সহিত খেলিবার জন্য সোহাগ ভরে কত ডাকিলাম, কত সাধিলাম, কত মিনতি করিলাম, সে কিছুতে স্বীকৃত হইল না—অধিকন্তু আমার প্রতি অবজ্ঞাসূচক হাসির কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল!

দুষ্ট দিবাকরের অবজ্ঞায় ও উপহাসে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া দারুণ মানে অধোবদনে বসিয়া কি যেন কেমন এক বেদনা অন্তরে বোধ করিতেছি—এমন সময়ে দেখিলাম ঠিক আমারই মত খেলিতে খেলিতে একজন আসিয়া আমার অজ্ঞাতসারে অনতিদূরে আমার সম্মুখে স্থির নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার তুষারশুভ্র, অর্দ্ধ-বিকসিত প্রাতঃশিশির স্নাত গোলাপ-কুসুম-সদৃশ নিষ্কলঙ্ক বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্য আপনহারা হইলাম এবং বিগত ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া প্রাণে কেমন এক অজানা ভাবের উদয় হইল—আমি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। তাহার কমল-নিন্দিত নয়নের দৃষ্টি যেন দিবা অপেক্ষাও উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নালোক অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও প্রাণ-উন্মাদকারী। তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার প্রাণে অদম্য বাসনার উদ্রেক হইল। বলি বলি বলা হ'লো না, এইরূপ এক ভাব

আসিয়া আমায় সরম কুহেলিকায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ অপরূপ, তাহা সরমে বাধে না—বাধে কেবল মরমে। আমার পিপাসা মিটিল, মেঘ না চাহিতেই বৃষ্টির আবির্ভাব হইল—কারণ, সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমাকে বলিল,—"আমি তোমার সহিত খেলিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কি আমার সহিত খেলা করিতে পারিবে? আমার কঠিন দেহ, কঠোর প্রাণ—আর তোমার ঐ সুকোমল শৈবালসম নবনীনিন্দিত কোমল দেহখানি, মৃণালনিন্দিত সুঠাম সুগোল ভুজলতা কি এই কঠিন ক্রীড়ায় তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে?" যাহা হউক, সে স্বীকৃতা হইল। তখন আমরা উভয়ে পৃথক প্রাণে সম আকাঙ্ক্ষা লইয়া বেশ মন দিয়া খেলিতে লাগিলাম।

তখন সুধাকরের স্নিগ্ধ, শীতল প্রাণ উন্মাদকারী জ্যোৎস্নালোকে জগৎ উদ্ভাসিত, খেলিতে খেলিতে শ্রান্ত কায়ে আমরা উভয়ে এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম—তখন বসন্তের চিরসহচর মলয়ানীল আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে—তখন আমার নয়ন যুগল সঙ্গীর বদনচন্দ্রের সুধাপানে রত; তাহার যৌবন ভারাক্রান্ত দেহ যষ্টি আমার বাম বাহু কর্তৃক বেষ্টিত। আহা! তাহার সকলি সুন্দর—কিন্তু তাহার ঐ ঢলঢল বদন-চন্দ্রমা যেন কেমন একটা বিষাদ মাখান—তাহা নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন শারদীয় পূর্ণশশী একখানি অস্পষ্ট, লক্ষ্য ভ্রষ্ট ছিন্নবিচ্ছিন্ন জলদাবৃত। কিন্তু ইহাতে তাহার সৌন্দর্য্যের লাঘব না হইয়া যেন আরও অধিকতর প্রাণ মাতান ভাব হইয়াছে। এই-রূপে কিছুকাল অবস্থানের পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই, আমি তোমার কে? তোমায় আমি কি নামে ডাকিব?" তখন সে বলিল যে নাম ভাই তোমার প্রাণ চায়, তোমায় আমি আমার মন প্রাণ দিয়া ফেলিয়াছি—এখন তুমিই আমার নূতন নামে সাজাও; তদপরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া তাহার সুঠাম সুগোল ভুজলতা আমার হৃদয় বেষ্টন করিয়া, আমার মুখের প্রতি তাহার মৃগ নয়ন বিনিন্দিত লোচনের শান্তস্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবেগভরে বলিল, "আমি তোমার "সই"! আজ হইতে তুমি আমায় সই বলিয়া ডাকিও; আজ হ'তে আমি তোমার "সই" ও জীবন পথের নিত্য সঙ্গিনী।"

তখন আমার প্রাণ এক অজানা ভাবে বিভোর। আমি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। তখন কে যেন আমার বীণার কনক হৃদয়-তন্ত্রী সকল যোজনা করিয়া তাহার মোহন অঙ্গুলি-স্পর্শে সপ্তসুরে বেহাগ, ভৈরবী, ইমণ, পূরবী, সাহানা সিন্ধুর করুণ মধুর সুরে আমার হৃদয়-কন্দর নিনাদিত করিয়া সঙ্গীতের লহরী তুলিয়াছে। তখন আমার মনে পড়িল, সেই দূর অতীতে "কালোরূপে আলো করা" বৃন্দাবনের প্রেমের খেলা—সেই কথা, সেই হাসি, সেই লীলারাশি সেই কলতানে ভেসে আসা মুরলী রবে নদী কুলে বেতস বনের মুখরতা। যখন আবেগের প্রথম তরঙ্গ চলিয়া গেল তখন তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখি সেই তাহার উভয় গণ্ড

বাহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে; সেই অশ্রুতে আমার বক্ষ সিক্ত হইয়া গিয়াছে; আমি সোহাগভরে সযতনে তাহা মুছাইয়া দিলাম।

এইরূপে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তটিনীকূলে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী রজনীর নৈশ শোভায় মোহিত হইয়া আমরা আপন খেলা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের দৃষ্টির বিনিময় করিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছি, তখন আমার সইয়ের ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদামের সুষমা গন্ধে আমার প্রাণ মাতোয়ারা—সেই আলুলায়িত-কেশ-পাশ দুষ্ট সমীরণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। মাঝে মাঝে সে তাহার চম্পক সদৃশ অঙ্গুলি দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশজাল বদনশশী হইতে সরাইয়া যথা স্থানে সন্নিবেশ করিতেছে।

সহসা আমার চমক ভাঙ্গিল; দেখিলাম অদূরে কতকগুলি কিয়া ও কেতকীফুল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার সৌগন্ধ ভারাক্রান্ত সমীরণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই গন্ধে আমাদেরও প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে; পিককুল পঞ্চম তানে সঙ্গীত গাহিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে এবং সেই পরশ্রীকাতর পাপিয়া "চোক্ গেল" বলিয়া অন্তর ভেদী তানে দিগন্ত ব্যাপিয়া দোহার গাহিয়া গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আমরা তাহাদের করুণ সুধা-স্বর উতরাও হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু অধিকক্ষণ আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—তখন আমি উঠিয়া আমার সইয়ের আলিঙ্গন পাশ উন্মুক্ত করিয়া বলিলাম, "সই! ঐ মরাল-গামিনী বীণাবাদিনী কল্লোলিনীর বক্ষের উপর রজতকিরণ সমুদ্ভাসিত জীবনবক্ষে আমার ভ্রমণ করিতে কেমন ইচ্ছা করিতেছে। তখন আমার জীবন-পথের নিত্য সঙ্গিনী সই পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল এবং নিকটস্থ একটী স্বভাবসুন্দর বিটপীসমাচ্ছন্ন অরণ্য হইতে কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেগুলি সস্নেহে যৌবন-শ্রী বিকশিত উন্নত বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল; তদুপরে সেগুলি বনলতা দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া ভেলা প্রস্তুত করিল। অবশেষে তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় মৃণালনিন্দিত বাহু দ্বারা আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল। ইহাতে তাহার ঈষৎ করকম্পনে হস্তস্থিত কাঞ্চনগুলি মৃদুমধুর স্বরে ঠুন্‌ঠুন্ করিয়া যেন একতন্ত্রে বাজিয়া উঠিল। আহা! সে কি মনোমোহিনী দৃশ্য! যেন প্রণয়-ভালবাসার মূর্ত্তিমতী প্রতিমাখানি তটিনীতটে দণ্ডায়মানা হইয়া মুক্তপ্রাণে স্বীয় প্রণয়ীকে প্রণয় জানাইতেছে এবং নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া পদতলস্থ তটিনী বাহিয়া একূল ওকূল দুকূল বিধৌত করিয়া জগৎবাসীকে যেন প্রেম কি জিনিষ তাহা নীরবে জানাইয়া যাইতেছে।

আমি ধীরে ধীরে যাইয়া ভেলায় আরোহণ করিলাম এবং সইয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক আমার পার্শ্বে তুলিয়া লইলাম। ভেলা আমা-

দের বহন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে নদী-বক্ষে ভাসিয়া চলিল। তখন সই আমার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক সুললিত স্বরে আবেগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একটি গান গাহিতে লাগিল:—

"বসেছিল বঁধু তটিনী কুলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগণে
রেখেছিল দুটী নয়ন তুলে॥
শাখে শাখে পাখী গাহিছে গান
প্রাণের বঁধুয়া আজ করেছে মান
সমীর লতায় ধীরে চলে যায়
ধর ধর বঁধু পড়িবে ঢলে॥

আমি তখন আমার সইয়ের সম্পূর্ণ আবেগপূর্ণ আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ—আমার হৃদয় তটিনীতে কত রকমের সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। আমি আমার সইকে স্বীয় বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার প্রস্ফুটিত সুকোমল কমল সম বদনচন্দ্রমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহার অধর সুধা পান করিতে করিতে উভরাও হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলাম। "আহা! সে কি মধুযামিনী! মরি, মরি!! সে কি নয়নানন্দকর প্রেমময় দৃশ্য!!" ভেলা আপন মনে উদাস প্রাণে মন্থরগতিতে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। এইরূপে কিয়দ্দুর-গমন করিবার পর সহসা দেখিলাম সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রজনী ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে। এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ আসিয়া কুমুদবান্ধবকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ধীর মলয়ার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিক হইতে ধূলিরাশি উত্থিত করিয়া বেগে বায়ু বহিতে লাগিল—বাতাহত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া আমাদের উপর পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমার হৃদয়-তটিনীর উপর দিয়া কত সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে উত্তাল-তরঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে; ইহাতে সইকে আমার কিঞ্চিৎ উতলা করিয়া তুলিল এবং ভীতা হইয়া সে তাহার আলিঙ্গন পাশ দৃঢ়তর করিয়া রাখিল। আমি তাহার সে ভাব দর্শনে তাহাকে স্বীয় বক্ষ মধ্যে আনিয়া আপন বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া রহিলাম। তখন তাহার বদনকমল যেন সহকার-চ্যুত বিশুষ্ক লতিকা সম হইয়াছে; এমন সময় প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল এবং উত্তাল তরঙ্গজালে আবৃত হইয়া ভীতি বিহ্বল-নেত্রে তাহা দেখিতে দেখিতে আমাদের সংজ্ঞালোপ পাইল। আমাদের সুখালিঙ্গন চিরতরে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিষ্ঠুর তরঙ্গ প্রবল আঘাত করিল—তাহার করাল আঘাতে ভেলা বন্ধনচ্যুত হইল এবং আমরা উভয়ে জল মগ্ন হইলাম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আর এক তরঙ্গের আঘাতে আমরা উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনচ্যুত হইলাম। তখন কাতর প্রাণে সইয়ের জীবন রক্ষার্থ তাহাকে ধরিবার জন্য পুনঃপুনঃ ডুবিতে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! সেই প্রেমপ্রতিমার আর সাক্ষাৎ মিলিল না। আমার চেতনা লোপ পাইল—আমি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া কূলে লাগিলাম। যখন চেতনা হইল তখন দেখিলাম আমি একা! সই আমাকে এই গভীর ঝটিকাময়ী রজনীতে একা রাখিয়া জীবনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে।

প্রথমে ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইল তখন বুঝিলাম এখন হইতে আবার আমি এই বিশাল অসীম পৃথিবীতে একা, আমারও আর কেহ নাই—"এখন আর কই কেউ তো আমায় তেমন করিয়া ভালবাসে না—কেউ তো তেমন করিয়া সোহাগভরে আহ্বান করে না। কেহ তো আমায় আমি তোমারি এ কথা বলে না। তাই তো বলি এ সংসারে আজ আমি একা! আহা! সেই বিষাদ-কালিমা-মাখা বদনকমল আজও আমার হৃদয়পটে পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় দেদীপ্যমান আছে। সেই শেষ জীবনের শেষ মিলনটুকু আর ভুলিব না। হায়! সকলই "প্রাক্তন!!!"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

নীরবে নীরবে।

(কিবা) নীরব নিশীথে-ভাসিছে বিশ্ব
গাহিছে নীরব গান।
নীরবে নিষেধ পরশ স্বপন
মদিরা বিভোর প্রাণ॥
নীরব ধেয়ানে কোকিল রচিল
নীরস বিরস কবিতা।
কোকিলা তখন নীরবে শুনিল
অমিয় বিভুর গাথা॥
প্রকৃতি কেন গো নীরবে নীরবে
গাহিছে ওঙ্কার গান।
নীরব নিঝুমে পড়িলা বিধি
নীরব নির্গুণ প্রাণ॥
নীরবে দেখে (কে) মিলন স্বপন
(যথায়) মিলিছে নর-নারায়ণ।
নীরবে সাধে (কে) মনের মন্দিরে
লভিতে রাতুল চরণ॥
নীরব তুমি নীরবে নীরবে
(চির) নীরব প্রভুরে নিবেদন।
নীরবে নীরবে বাসিব ভাল
দাসেরে দিও দরশন॥

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

শ্রাদ্ধকৃত্য।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আমাদের অধুনা যতগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপাদি প্রকাশিত আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—হোম, পূজা ও শ্রাদ্ধ। অন্নপ্রাশন উপনয়নাদি বিভিন্ন সংস্কার কার্য্যে অথবা দোল দুর্গোৎসবাদি বিভিন্ন ব্রত পূজাতে বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকিলেও স্থূল হিসাবে দেখিতে গেলে, হোমের সামান্য-কুশণ্ডিকা ও অন্যান্য মন্ত্রাদি অথবা পূজার ন্যাসাদি ও পঞ্চো-পচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার ক্রিয়াদি, সর্ব্বত্রই প্রায় এক; কার্য্য বিশেষে কোথাও সংক্ষেপ, কোথাও বা আড়ম্বর, কোথাও ইতর, কোথাও বা কিছু বিশেষ করা হইয়াছে মাত্র।

আমাদের শ্রাদ্ধকৃত্যও বহুবিধ। বিভিন্ন শ্রাদ্ধকৃত্যে বিভিন্ন মন্ত্র ও ক্রিয়া কলাপাদির ব্যবস্থা থাকিলেও, সকল শ্রাদ্ধের মূলধারা এক। এই শ্রাদ্ধকৃত্য গুলিকেও আবার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ। এক পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম একোদ্দিষ্ট এবং পর্ব্বদিনে পিতৃ-মাতৃ-পক্ষের তিন তিন পুরুষ এবং বিশ্বদেবতাকে লইয়া যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ। পর্ব্বদিন বলিতে দুই ঋতু বৎসরাদির সংযোগ দিন বুঝায়। এ সম্বন্ধে শ্রাদ্ধকৃত্যের কালাকাল বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ ব্যতীত আমাদের ইষ্টি, নান্দীমুখ, নৈমিত্তিক, কাম্য প্রভৃতি বহুবিধ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। এগুলি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধেরই অনুরূপ। সুতরাং ইহাদিগকে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধেরই শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

শ্রাদ্ধকৃত্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পিতৃপূজার অনুষ্ঠান। সুতরাং ইহাতে ভেদবুদ্ধির সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু ইহাতে ব্যষ্টি উপাসনার মধ্য দিয়া সমষ্টি-জ্ঞানটিকে, এরূপ উচ্চ আদর্শে বিকাশিত করা হইয়াছে, ইহাতে জগন্নিহিত শক্তিগুলিকে বিশ্বদেবের রূপে পরিকল্পিত করিয়া, পৃথিবীর ধূলিকণাটিকেও পর্যান্ত মধুময় রূপে দর্শন করিয়া, এরূপ সুন্দররূপে বহুত্বের উপর একত্বের মিশ্রন অথবা একত্বের উপর বহুত্বের আবরণের ভাবটি পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে যে, এরূপ উদার অথচ মহানভাব, হিন্দুর হিন্দুত্বের ভাব, হিন্দুত্বের আদর্শ, আমাদের আর কোনও ক্রিয়াকলাপাদিতে এরূপভাবে দেখান হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথমে বিশ্বদেবের কথাই বলি। ইহাঁদের নাম গুলি হইতেই বুঝা যায় যে, ইহাঁরা জগতের দ্রব্যশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতিরই প্রতিনিধি।

বসুসত্যৌ ক্রতুদক্ষৌ কালকামৌ ধুরিলোচনৌ,
পুরুরবামাদ্রবাশ্চ, বিশ্বেদেবা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

বসু ও সত্য (ধন ও সত্য), ক্রতু ও দক্ষ (যজ্ঞ ও দক্ষতা) ; কাম ও কাল, (ইচ্ছা ও সময়), ধূরি ও লোচন (ভারগ্রাহিতা ও পরিনাম দৃষ্টি) এবং পুরুর ও মাদ্রবস (স্থলজাত ও জলজাত দ্রব্য নিচয়), ইহাঁরাই বিশ্বদেব নামে পরিচিত। মনু শ্রাদ্ধের প্রথমে এই বিশ্বদেবগণের পূজার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন,—

তেষামারক্ষভূতন্তু পূর্ব্বং দৈবং নিযোজয়েৎ।
রক্ষাংসি হি বিলুম্পন্তি শ্রাদ্ধমারক্ষবর্জ্জিতম্ ॥
দৈবাদ্যন্তং তদীহেত পিত্রাদ্যন্তনং ন তদ্ভবেৎ।
পিত্রাদ্যন্তং ত্বীহমানঃ ক্ষিপ্রং নশ্যতি সান্বয়ঃ ॥
[মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ২০৪।২০৫ শ্লোক]

অর্থাৎ শ্রাদ্ধকার্য্যের রক্ষা কর বলিয়া, অগ্রে বিশ্বদেবগণের আবাহনাদি করা উচিত। শ্রাদ্ধ রক্ষাহীন হইলে রাক্ষসেরা উহা নষ্ট করে। সুতরাং শ্রাদ্ধের আদিতে বিশ্বদেবের আবাহন এবং অন্তে নির্জ্জনাদি দেবকার্য্য করা উচিত। শ্রাদ্ধের আদি অন্তে পিতৃকার্য্য কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের আদি ও অন্তে দেবকার্য্য না করিয়া পিতৃকার্য্য করে, সে শ্রাদ্ধের বিঘ্নহেতু সত্বর সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পিতৃযজ্ঞকে নানারূপ বিঘ্ন হইতে রক্ষা

করিবার জন্য বিশ্বদেবগণের অথবা জগন্নিহিত শক্তি নিচয়ের পরিকল্পনা। পিতৃযজ্ঞগুলি বিভিন্ন, একারণ যজ্ঞরক্ষাকর শক্তি অথবা বিশ্বদেবও বিভিন্ন।

ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুদক্ষং সত্যোনান্দীমুখে বসুঃ.
নৈমিত্তিকে কামকালৌ কাম্যে চ ধূরিলোচনৌ
পুরুরবা মাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণে সমুদাহৃতৌ॥

ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতু ও দক্ষ বিশ্বদেব। অভিলষিত ফল কামনায় পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে উপযুক্ত যজ্ঞ ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন; অন্যথা যজ্ঞ পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। একারণ ইষ্টিশ্রাদ্ধে যজ্ঞ ও দক্ষতার অধিষ্ঠাতৃ বিশ্বদেবগণের পূজা সর্ব্বাগ্রে করা হইয়া থাকে। এইরূপ অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি সংস্কার কার্য্যে ধন ও সত্তা এই দুই শক্তির প্রয়োজন হয়। এই হেতু নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসু ও সত্য বিশ্বদেবরূপে পূজিত। নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে ইচ্ছা ও সময় এবং কাম্যশ্রাদ্ধে ভারগ্রাহিতা ও পরিণাম দৃষ্টি বিশ্বদেব নামে পরিকীর্ত্তিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুই ঋতু, দুই বৎসর, দুই মাস প্রভৃতির সংযোগ দিনকেই পর্ব্বদিন বলে। পূর্ব্বে বিভিন্ন শস্যাদির উৎপন্নের সময়ে বিভিন্ন পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করা হইত। এই বিভিন্ন সময় জাত নব শস্যাদি বিভিন্ন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মূল উপকরণ। সুতরাং স্থলজাত ও জলজাত দ্রব্য নিচয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব পুরুরবা ও মাদ্রবস পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিশ্বদেব।

হিন্দুর সংযম, তীর্থ দর্শন, স্নান প্রভৃতি যতগুলি বিশেষত্ব আছে, যেগুলির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দুগণ আজও পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সাত্ত্বিক দান তাহাদের অন্যতম। এই দান শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ। দান ব্যতীত শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না, শ্রাদ্ধ করিতে অধিকারও জন্মে না। এ কারণ শ্রাদ্ধ করিতে বসিবার পূর্ব্বে আমাদের অবস্থানুসারে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গকামনায় ষোড়শ অথবা অন্নজল বস্ত্রাদি উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। যাঁর কিছুই ক্ষমতা নাই, তিনি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে অন্ততঃ সামান্য একটী ভোজ্যও উৎসর্গ করিতে বাধ্য হন। শ্রাদ্ধের পর দান নিষিদ্ধ।

শ্রাদ্ধকৃত্যটীকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাদির সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক। বিভিন্ন শ্রাদ্ধের বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান থাকিলেও, সকলগুলির মুখ্য ধারা অনেকটা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুরূপ। সুতরাং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, সকল শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইবে।

শ্রাদ্ধকৃত্যের একপ্রকার বিশেষ রীতি আছে। ইহার নাম পিতৃরীতি। বামজানু পাতিয়া ও দক্ষিণজানু উন্নত রাখিয়া দক্ষিণাস্যে উপবেশন করা, যজ্ঞোপবীতের সহিত উত্তরীয় বিপরীত দিকে অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করা এবং পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মূলের মধ্য স্থান দ্বারা স্বধান্ত মন্ত্রে প্রায় সমস্ত কার্য্য করাকে পিতৃরীতি বলে। ইহার বিপরীত রীতির নাম দৈবরীতি। অঙ্গুল্যগ্র সকলের নাম দৈবতীর্থ। দেবপূজায় দৈবরীতি এবং পিতৃপূজায় পিতৃরীতি অনুষ্ঠেয়। পার্ব্বণের বিশ্বদেবগণ দেবতা; এ কারণ ইহঁাদের পূজাদি যাবতীয় কার্য্য দৈবরীতি ও দৈবতীর্থ দ্বারা করিতে হয়।

সকল প্রকার শ্রাদ্ধই, যে বাটীতে শ্রাদ্ধ হয়—তাহার অধিষ্ঠাতৃদেব অর্থাৎ বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞমাত্রেই অধিষ্ঠাতৃদেব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, গাঙ্গ-প্রদেশে গঙ্গা এবং পিতৃরীতিতে যে ভূমিতে শ্রাদ্ধ হয়, সেই ভূস্বামীর পিতৃগণের সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়া, শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা লওয়া হইয়া থাকে। গঙ্গাগর্ভজাত দেশে গঙ্গা পূজা করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও যমুনা গর্ভজাত দিল্লী প্রদেশের শ্রাদ্ধে গঙ্গা পূজাই চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণকে অথবা আধুনিক কুশময় ব্রাহ্মণকে পিতৃপুরুষগণের প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের যে অনুমতি লওয়া হয়, তাহাকে অনুজ্ঞা লওয়া বলে। আজ কাল কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া, কর্ম্মকারয়িতৃ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। এই অনুজ্ঞা লওয়া হইলেই শ্রাদ্ধ আরম্ভ করা হয়। ইহার পর অশৌচাদি কোন প্রকার প্রতিবন্ধক, শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।

শ্রাদ্ধকৃত্যের প্রত্যেক অনুষ্ঠান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন ; এবং সম্ভবপরও নহে। কেবলমাত্র শ্রাদ্ধের প্রধান প্রধান মন্ত্রগুলির উল্লেখ করিলে, বোধ হয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আংশিক সফল হইতে পারে।

অনুজ্ঞা লওয়ার পর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বলা হইয়া থাকে,—"দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ... অর্থাৎ দেবতাগণ, পিতৃগণ, মহাযোগীগণ, স্বধা (পিতৃপত্নী অর্থাৎ পিতৃশক্তি) এবং স্বাহা (অগ্নি-পত্নী অর্থাৎ অগ্নির শক্তি), ইহাদিগকে আমি নমস্কার করি, যেন নিত্যই এইরূপ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হয়।

অতঃপর পিতৃপুরুষগণকে আসন দান করা হয়। অবশ্য, এখানে বলিয়া রাখি, পার্ব্বণের অনুজ্ঞা লওয়া হইতে যাবতীয় কার্য্য প্রথমে বিশ্বদেব, পরে পিতৃপক্ষ এবং শেষে মাতৃপক্ষের উদ্দেশে করা হইয়া থাকে।

আসন দানের পর আবাহন। আবাহনে বিশ্বদেবগণের প্রতি বলা হয় "বিশ্বদেবান আগতঃ ইত্যাদি" হে বিশ্বদেবগণ, আসুন, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। এই কুশাসনে উপবেশন করুন। "বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং......ইত্যাদি" যে বিশ্বদেবগণ আমার পরিত্রাণকারক এবং অগ্নিজিহ্বা, যাহারা আকাশে, স্বর্গে এবং পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমার আহ্বান শ্রবণ করুন এবং এই কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দিত হউন। "ওষধয়ঃ সমবদন্ত...ইত্যাদি" ওষধিগণ (কুশা সকল) আপনাদের অধিষ্ঠানযুক্ত আত্মাকে বহুমত করিয়া নিজ নাথ নিশাকরের সহিত আনন্দিত হইয়াছেন। হে রাজন্ সোম আপনি ব্রাহ্মণ, অতএব যে ব্রাহ্মণগণের আসনকে আপনি দর্ভদ্বারা সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধ ভোজন কৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।